বোখারী শরীফ
হামিদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার - ঢাকা - ১১

বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা

কর্ত্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার - ঢাকা - ১১

প্রকাশক :
আল্‌হাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম আযম
হামিদিয়া লাইব্রেরী
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা—১১
দূরালাপনী : ২৪৪৪০৮
(বাংলাদেশ)

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ :
জিলকদ
১৩৯৭ হিজরী, ১৩৮৪ বাংলা।

হাদিয়া :
৩৪.০০ চৌত্রিশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা—১
(বাংলাদেশ)

সূচীপত্র

বিংশতিতম অধ্যায়

২১তম অধ্যায়

২২তম অধ্যায়

আরম্ভ

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে আরম্ভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার—স্বষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা বিধানদাতা। দরূদ এবং সালাম সর্ব্বশেষ পয়গাম্বরের প্রতি যিনি সমস্ত রসুলগণের সর্দ্দার। তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতিও রহমতের দোয়া ও সালাম

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আয় আল্লাহ! আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করিয়া নেও। তুমি সব কিছু শুন এবং জান। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

রহমানুর রহীম আল্লার নামে—

অষ্টাদশ অধ্যায়

—●—

ছাহাবীগণের ফজিলত (৫১৫ পৃঃ)

যাঁহারা ঈমানের হালতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বা তাঁহাকে এক নজর দেখিয়াছিলেন (এবং ঈমানের উপরই মৃত্যু হইয়াছিল) তাঁহাদিগকে ছাহাবী বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইসলামে ছাহাবীগণের গুরুত্ব সমধিক। ছাহাবীগণের এই গুরুত্ব কেন এবং কিরূপ ? তাহার একটি নজীর লক্ষ্য করুন। ইসলামের মূল কলেমা-তৌহীদের দুইটি বিষয়—(১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, (২) মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ—মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল। ঈমান-মোফাচ্ছাল-কলেমায় আছে—آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ “আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি—আল্লার প্রতি, আল্লার ফেরেশতাগণের প্রতি, আল্লার কেতাবসমূহের প্রতি এবং আল্লার রসুলগণের প্রতি···।

লক্ষ্য করুন ! আল্লাহ এবং রসুলের মধ্যস্থলে আল্লার কেতাব এবং তাহার পূর্ব্বে আল্লার ফেরেশতাগণের বিশ্বাস ও ঈমানের উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, উহাকে ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই গুরুত্বের একটি বিশেষ কারণ এই যে, ওহী ছাড়া নবী হইতে পারে না। আর ওহী এবং আল্লার কেতাব প্রেরণ একমাত্র ফেরেশতার মাধ্যমেই হয়। তাই যেখানে রসুল এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিতে হইবে সেখানে ফেরেশতাগণের প্রতিও ঈমান আনিতে হইবে। ফেরেশতার প্রতি ঈমান ছাড়া কেতাব ও রসুলের প্রতি ঈমানের অর্থই হইতে পারে না।

এই দৃষ্টান্তেই বুঝুন! আল্লার কালাম কোরআন মজিদ এবং আল্লার রসুল মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিচয় এবং তাঁহার জীবনাদর্শ বিশ্ব-মানব একমাত্র ছাহাবীগণের মাধ্যমেই লাভ করিতে পারিয়াছে। এবং আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনিত আদর্শ ও দ্বীনের ভিত্তিতে তিনি স্বয়ং নিজ পবিত্র হাতে ছাহাবীগণকে গড়াইয়া তাঁহাদের জমাত গঠন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আমল এবং বয়ান ও প্রচারের মাধ্যমেই দ্বীন-ইসলাম বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছিয়াছে।

আল্লাহ এবং রসুল হইতে দ্বীন লাভের মাধ্যম এই ছাহাবীগণের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়ার অর্থই হইবে কোরআন-হাদীছ হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়া।

ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রু ইহুদী-খৃষ্টান এবং ছদ্মবেশী মোসলমান নামধারী মোনাফেকের দল উক্ত উপলব্ধি ভালভাবেই রাখে। তাই তাহারা ছাহাবীগণের প্রতি মোসলমানদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরকে শিথিল করার নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

দ্বীন-ঈমান ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ইমাম ও হক্কানী আলেমগণ শত্রুদের ঐ কৌশল ব্যর্থ করার জন্য পূর্বের পূর্ব যুগ হইতেই ছাহাবীগণ সম্পর্কে ইসলামের (Dimand) দাবী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ছাহাবীগণ সম্পর্কে মোসলমানদের আকীদা, মতবাদ ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন; যাহাতে শত্রুরা তাহাদের অপচেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়ার ছিদ্রপথ পাইতে না পারে।

(১) ইসলামী আকীদা বা মতবাদের প্রসিদ্ধ شرح عقيدة الطحاوية কেতাবের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বাপর ইমামগণের সর্ব্বসম্মত আকীদা বর্ণনা করিয়াছেন।

لَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ حُبُّهُمْ دِيْنٌ وَإِيْمَانٌ وَإِحْسَانٌ

"আমরা ছাহাবীগণের কাহারও গুণচর্চ্চা ব্যতীত দোষচর্চ্চা মোটেও করিতে পারিব না। ছাহাবীগণের প্রতি ভক্তি-মহব্বত রাখাই ধর্ম্ম, ঈমান ও আল্লাহনূরুক্তির পরিচয়।"

(২) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ আকীদার কেতাব شرح فقه اكبر গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

لَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিজন ছাহাবীরই শুধুমাত্র গুণ-চর্চ্চাই আমরা করিব; কোন ছাহাবীরই দোষ-চর্চ্চা আমরা করিতে পারিব না।"

(৩) ইসলামী আকীদা ও মতবাদ বর্ণনার প্রসিদ্ধ কেতাব "আল-মোছামারা" ৩১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

وَاعْتِقَادُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَزْكِيَةُ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ
تَعَالٰى عَنْهُمْ وُجُوْبًا بِاِثْبَاتِ الْعَدَالَةِ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ وَالْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ
فِيْهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ

"নবীজীর সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং খাঁটী মোসলেম জমাতভুক্ত সকলের সর্ব্বসম্মত মতবাদ ও আকীদা এই যে, সমস্ত ছাহাবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণকে দোষমুক্ত গণ্য করা ওয়াজেব—অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রত্যেককে ভাল ও খাঁটী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের কাহাকেও দোষী মনে করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তাঁহাদের গুণ-চর্চ্চা করিতে হইবে।"

ইসলামে ছাহাবীগণের গুরুত্ব এবং তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা হইতে বিরত থাকার অবশ্য কর্ত্তব্যকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের ভিত্তিরূপে প্রকাশ করিতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। হাদীছ—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ
اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ
اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ

"সাবধান! সাবধান!! আল্লাহকে ভয় করিও আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে। খবরদার! খবরদার!! আমার পরে আমার ছাহাবীদেরকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করিও না। অধিকন্তু যে কেহ আমার ছাহাবীদিগকে ভালবাসিবে বস্তুতঃ সেই ভালবাসা আমার প্রতিই ভালবাসা হইবে। আর যে কেহ তাঁহাদের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করিবে বস্তুতঃ সেই খারাব ধারণা আমার প্রতি পোষণ করা গণ্য হইবে। যে কেহ তাঁহাদিগকে ব্যথা দিবে সেই ব্যথা আমাকেই দেওয়া হইবে, আর যে আমাকে ব্যথা দিবে সে যেন আল্লাহকে ব্যথা দিল। এবং যে আল্লাহকে ব্যথা দিবে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিবেন।

(তিরমিজি শরীফ)

হাদীছ— قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَنِىْ وَاخْتَارَ اَصْحَابِىْ فَجَعَلَهُمْ اَصْحَابِىْ وَاَصْهَارِىْ

وَجَعَلَهُمْ اَنْصَارِىْ وَاِنَّهٗ سَيَجِيْءُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُوْنَهُمْ

اَلَا فَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ اَلَا فَلَا تُنْكِحُوْا اِلَيْهِمْ اَلَا فَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ فَاِنْ

اَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَلَا تَدْعُوْا لَهُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ

"রসুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাছনী করিয়াছেন (নবীগণের শ্রেষ্ঠ রূপে), আমার ছাহাবীগণকেও বাছনী করিয়াছেন (নবীর পরে সমগ্র মানব-শ্রেষ্ঠরূপে)। তাহাদিগকে আমার এত ঘনিষ্ঠ বানাইয়াছেন যে, আমার শশুর-জামাতা সব তাহাদের মধ্য হইতে বানাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে আমার সাহায্যকারী বানাইয়াছেন।

হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মতগণ! তোমরা সতর্ক থাকিও—আমার পরবর্ত্তী যুগে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা আমার ছাহাবীদের প্রতি সম্মান-হানীকর কথা বলিবে। হুশিয়ার! হুশিয়ার!! এই শ্রেণীর লোকদের মেয়ে তোমরা বিবাহ করিবে না এবং তাহাদের নিকট তোমাদের মেয়ে বিবাহ দিবে না। খবরদার! তাহাদের সঙ্গে তোমরা নামাযও পড়িবে না। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য তোমরা দোয়াও করিবে না; নিশ্চয় জানিও, এই শ্রেণীর লোকদের উপর আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। (মোছনাদে ইমাম শাফেয়ী)

ছাহাবীগণের এই সব মান-মর্য্যাদা খামাকা অকারণে নিশ্চয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যে তাঁহাদের মধ্যে এমন গুণেরই সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার অনিবার্য্য ফল ছিল এইরূপ মান-মর্য্যাদা।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে অসংখ্য অলৌকিক গুণাবলী দান করিয়া বিশেষ করুণারূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরতের একটি বিশেষ গুণ ছিল তাঁহার পরশ-দৃষ্টি। যেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতে পরশপাথরে এই শক্তি ও তাছির রহিয়াছে যে, উহার মামুলী ঘর্ষণে লোহা স্বর্ণ হইয়া যায়; সেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতেই হযরতের পরশ-দৃষ্টির ক্রিয়া ও তাছিরে অল্প সময়ে মাটির মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হইয়া যাইত। হযরতের এই গুণটিরই আভাস দেওয়া হইয়াছে সুন্দর একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রথম খণ্ডের ৫ নং হাদীছে।

ক্রিয়া ও আছর গ্রহণে ক্ষেত্র ও পাত্রের যোগ্যতা তথা অক্ষুন্ন ঈমানের সহিত যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি এবং তাঁহার সাহচর্য্য লাভে সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন তাঁহাকেই ছাহাবী বলে। হযরতের পরশ-দৃষ্টির ক্রিয়ায় এইরূপ প্রতিটি মাটির মানুষই সোনার মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন।

হযরতের পরশ-দৃষ্টিতে ছাহাবীগণের মধ্যে যে গুণাগুণের সঞ্চার হইয়াছিল পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে উহার অনুভূতি দুরূহ হইলেও আল্লাহ এবং রসুলের যে সব সাক্ষ্য তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে উহার দ্বারা তাঁহাদের সেই গুণাগুণের আভাস লাভ হইতে পারে। যথা, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا........

"মোহাম্মদ আল্লার রসুল ; তাঁহার ছাহাবীগণ আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি অতি কঠোর, পরস্পর অতি কোমল। তাঁহাদিগকে দেখিবে, (১) আল্লার প্রতি অতিশয় নত ও রত—রুকু-সেজদায় অবনত, (২) আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার অন্বেষণে সদা মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত, (৩) আল্লাহনুরুক্তির আভা তাঁহাদের চোখে-মুখে উদ্ভাসিত। তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ (পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব) তৌরাত এবং ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রহিয়াছে।" (২৬ পাঃ ১১ রুঃ)

কোন কাজই হীনস্বার্থ বশে না করা, একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টি লাভ-উদ্দেশ্যে করা—ইহাকেই এখ্লাছ বা একনিষ্ঠতা বলে। এই "এখ্লাছ" একটি অতি মহৎ গুণ ; ইহার অনুক্রম ও শ্রেণী বা পর্য্যায় এত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে যে, নিম্ন পর্য্যায়ওয়ালারা সেই উর্দ্ধ ও উচ্চ পর্য্যায়ের উপলব্ধিও করিতে সক্ষম হয় না ; আর যাহাদের মধ্যে এই গুণ নাই তাহাদের ত প্রশ্নই উঠে না। এই "এখ্লাছ" গুণের তারতম্যে মানুষ অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের গৌরব লাভে ধন্য হয়।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচর্য্যে ছাহাবীগণের মধ্যে ঐ "এখ্লাছ" গুণ এত উর্দ্ধ পর্য্যায়ের বিদ্যমান ছিল যে, আমরা তাহা ব্যক্ত করিব দূরের কথা তাহা উপলব্ধি করিতেও সক্ষম হইব না। ছাহাবীগণের মধ্যে এখ্লাছ গুণের অসাধারণ পর্য্যায় হাসিল থাকার কারণেই তাঁহাদের বহু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও হাসিল ছিল। যথা--

হাদীছ—রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মত ! তোমরা) আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বলিও না ; তোমাদের কাহারও ওহোদ পর্ব্বৎ পরিমাণ স্বর্ণ দান-খয়রাত করা তাঁহাদের কোন একজনের মাত্র এক মুদ্দ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা উহার অর্দ্ধ পরিমাণ কোন বস্তু দানের সমানও হইতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ, মোছলেম শরীফ)

ইহা অপেক্ষা আরও অসাধারণ অতি অসাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য ছাহাবীগণের জন্য সুস্পষ্টরূপে হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে—

হাদীছ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ কানে রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার পরে আমার ছাহাবীগণের (ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য) বিরোধ সম্পর্কে আবেদন করিলাম। তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওহী পাঠাইয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ ! আপনার ছাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্ররাজী তুল্য—কম-বেশ প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রহিয়াছে। অবশ্য কাহারও আলো কাহারও অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ; (কিন্তু অন্ধকার কাহারও মধ্যে নাই,) প্রত্যেকের মধ্যেই আলো আছে। অতএব কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বিরোধ হইলে যে কেহ তাহাদের যে কোন একজনের মত ও পথ অবলম্বন করিবে সে আমার নিকট সৎ পথের পথিকই সাব্যস্ত হইবে।

হাদীছখানা মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় আছে, এতদ্ভিন্ন আরও ৯ খানা বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে— (১) মোছনাদে আব্দ-ইবনে-হোমায়দ (২) দারমী (৩) ইবনে মাজাহ (৪) আল-আব্বারী (৫) ইবনে-আছাকের (৬) হাকেম (৭) দার-কোৎনী (৮) ইবনে-আবদুল বর্র (৯) মাদখাল-বায়হাকী।

হাদীছখানার মর্ম্ম সকল প্রকার মতবিরোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণ মছআলাহ-মাছায়েলের মধ্যে ত প্রযোজ্য আছেই ; চার মজহাবের চার ইমামগণের সাধারণ মছলা-মাছায়েলে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে উহার অধিকাংশই ছাহাবীগণের মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পূর্ব্বাপর সমস্ত ইমাম ও আলেমগণের সর্ব্বসম্মত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে, চার মজহাবের প্রত্যেকটিই আল্লাহ তায়ালার নিকট হেদায়েত—সৎ ও সত্য সাব্যস্ত।

আলোচ্য হাদীছখানার মর্ম্ম ছাহাবীগণের ঐ সব বিরোধেও প্রযোজ্য যে সব বিরোধকে আমরা বৈষয়িক বা রাজনৈতিক গণ্য করিয়া থাকি। ছাহাবীগণের পরস্পর এই শ্রেণীর বিরোধে যে সব মোনাফেক গোষ্ঠী ইসলামের শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বা যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরোধমান কোন ছাহাবীর দলে গা-ঢাকা দিয়া ছিল—ঐ শ্রেণীর লোক ব্যতীত যত মোমেন-

মোছলমান কোন ছাহাবীর পক্ষকে অবলম্বন করিয়া ছিল তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট মোটেই কোন রকম অপরাধী গণ্য হইবে না, কোন প্রকারে অভিযুক্ত হইবে না। খাঁটী আন্তরিকভাবে কোন পক্ষের দাবী ও মতামতকে মোসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণজনক ভাবিয়া সেই পক্ষের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিরোধ, বিবাদ, লড়াই-যুদ্ধে যত মোসলমান ছাহাবীগণের যে কোন পক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল – কোন পক্ষের কেহই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হইবে না, কোন প্রকারে অভিযুক্ত হইবে না।

আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ক্, সাব্যস্ত, বিরোধ ক্ষেত্রে তাঁহার দাবী ও মতামতই হক্ক্ ও নির্ভুলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। এতদ সত্ত্বেও আবদুল্লাহ-ইবনে-ছাবার মোনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের যে সব লোক গা-ঢাকা দিয়া ষড়যন্ত্র করার বা আত্মরক্ষার জন্য আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ সমর্থনকারীরূপে তাঁহার দলে ভিড়িয়া ছিল তাহারা জাহান্নামী হইবে। পক্ষান্তরে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধীতা যে সব ছাহাবীরা করিয়াছেন ; যেমন—তাল্হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)—এই সব ছাহাবী এবং যে সব খাঁটী মোমেন-মোসলমান তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দাবী ও মতামতকে মোসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণজনক মনে করিয়া—তাঁহাদের কেহই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী গণ্য হইবেন না, অভিযুক্ত হইবেন না। এই মহা সত্য আলোচ্য হাদীছেরই আওতাভুক্ত এবং ইহা বাস্তব ও প্রকৃত তথ্য ; ঐতিহাসিক সত্যরূপে ইহা প্রমাণিত।

জামাল-যুদ্ধে তাল্হা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ক হওয়া অবধারিত ; তাঁহার পক্ষ প্রকৃত হক্ক্ এবং নির্ভুলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। তাল্হা (রাঃ) তাঁহার সহিত বিরোধ ও মতভেদ করিয়াছিলেন, এমনকি সেই বিরোধের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আল্লার রাস্তায় তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য জেহাদে শহীদ হওয়ার পূর্ণ মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। যাহার প্রমাণে চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক ঘটনা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ছাহাবীগণের এই বৈশিষ্ট্য আল্লার দান বটে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের সুফল। সেই বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহাদের **ঐকান্তিক একনিষ্ঠতা তথা উর্দ্ধ স্তরের "এখ্লাছ"।**

আলোচ্য হাদীছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরতের আবেদনের উত্তরে বলিয়াছেন,

أَصْحَابُكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ......لِكُلٍّ نُورٌ

"আপনার ছাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায়......তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রহিয়াছে।"

হযরতের সাহচর্য্যেই ছাহাবীগণ ঐ নূর লাভ করিয়াছিলেন। সেই নূর ও আলোই ছাহাবীগণের বিভিন্ন অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের উৎস। ঐ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই একটি ছিল চরম "এখ্‌লাছ"।

النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

"আল্লাহ-প্রেম, আল্লার দাসত্ব এবং আল্লার দ্বীনের উন্নতি কামনা; রসুলের মহব্বৎ, রসুলের এত্তেবা এবং রসুলের মিশনের সাফল্য সাধন; মোসলেম জাতির শক্তির উৎস নেজামে-খেলাফতের সুষ্টুতা বজায় রাখা; মোসলমান জনসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা—এই সব বিষয়ে "এখ্‌লাছ" তথা ঐকান্তিক একনিষ্ঠতার চরম পর্য্যায় ছাহাবীগণের হাসিল ছিল। তাঁহাদের অন্তর হীন উদ্দেশ্যাবলী হইতে কত পাক-পবিত্র ছিল এবং কত উর্দ্ধের উর্দ্ধ পর্য্যায়ের এখলাছ তাঁহাদের হাসিল ছিল তাহা আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জানা ছিল নিশ্চয়। এই নির্ম্মল অসাধারণ একনিষ্ঠতার কারণে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই আল্লাহ তায়ালার নিকট মকবুল পরিগণিত। এমনকি বিরোধের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের কার্য্যধারা বিপরীত হইলেও সৎ উদ্দেশ্যে নির্ম্মল একনিষ্ঠতার দরুন কার্য্যধারার ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমার্হই নয় শুধু, বরং সৎ উদ্দেশ্য হাসিলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ছওয়াবও তাঁহারা লাভ করেন। এই শ্রেণীর ভুল-ভ্রান্তিকেই "খাতায়ে-এজ্‌তেহাদী" বলা হয়—যেখানে ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার্হ গণ্য হইয়া মূল উদ্দেশ্যের ছওয়াব হাসিল হয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ছাহাবীগণের মর্য্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবেও বিদ্যমান ছিল। যথা—তৌরাত শরীফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব আলোচনায় মক্কা-বিজয় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে—"তিনি দশ সহস্র পবিত্রাত্মা মহাত্মা সহ এমন অবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক অগ্নিশিখা তুল্য (জ্যোতির্ম্ময়) বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে।" মক্কা-বিজয় অভিযানে নবীজীর সঙ্গে দশ সহস্র ছাহাবী ছিলেন। তৌরাত কেতাবে ঐ ছাহাবী-গণকেই কুদ্দুসী বা পবিত্রাত্মা মহাত্মা বলা হইয়াছে।

নবীগণের পরে কোন স্তরের মানুষই যে কোন একজন ছাহাবীর সমমর্য্যাদা দুরের কথা নিকটবর্ত্তী মর্য্যাদারও হইতে পারে না। এই আকিদা ও বিশ্বাস ইসলামী মতবাদরূপে ইসলামের সোনালী যুগ—ইমামগণের যুগ হইতেই প্রচলিত।

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের শাগের্দ মোহাদ্দেছ—হাদীছবেত্তা আবদুল্লাহ ইবনে-মোবারক (রঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ছাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আওলিয়াকূল শিরোমণি ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলাইহের মধ্যে কাহার মর্ত্তবা বড় ?

ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ (রঃ) অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। (১) তিনি প্রথম নম্বরের বিশিষ্ট তায়েবী ছিলেন। (২) তিনি এই উম্মতের সর্ব্বপ্রথম মোজাদ্দেদ ছিলেন। (৩) বিশিষ্ট আওলিয়াকুল শিরোমণি ছিলেন। (৪) খলীফাতুল-মোছলেমীনরূপে এত নেক ও সৎ শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে, তাঁহাকে পঞ্চম খলীফায়ে-রাশেদ অর্থাৎ আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম তুল্য শাসনকর্ত্তা গণ্য করা হইত। (৫) এই উম্মতের দ্বিতীয় মহান—ওমরে ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তুলনায় তাঁহাকে "দ্বিতীয় ওমর" বলা হইত।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ (রঃ)কে ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে পরিমাপের প্রশ্ন করা হইলে ইমাম আবদুল্লাহ-ইবনে-মোবারক (রঃ) উত্তরে বলিলেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) যেই ঘোড়ায় চড়িয়া জেহাদে গমন করিতেন ঐ ঘোড়ার পায়ের দাপটে ধূলি উড়িয়া ঘোড়ার নাকের ডগায় যে ধূলি-কণা লাগিত ঐ ধূলি-কণার মর্ত্তবা এবং মর্য্যাদাও ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলাইহের মর্ত্তবা ও মর্য্যাদার অনেক উর্দ্ধে। (মেরকাত—শরহে মেশকাত)

এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হইল, ছাহাবীগণ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস ইসলামের বিশেষ আকিদা এবং মোসলমানদের বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কারণেই অধিকাংশ হাদীছ গ্রন্থে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বিশেষ অধ্যায় উল্লেখ হয়। এমনকি বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ ও তিরমিজী শরীফ যে শ্রেণীর গ্রন্থ, উহাকে হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় "জামে" বলা হয়। যেই গ্রন্থে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের অধ্যায় না থাকিবে সেই গ্রন্থ "জামে" পরিগণিত হইবে না।

১৮১৩। হাদীছঃ— عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال —

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ

يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ

وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ -

অর্থ—এ'ম্রান ইবনে হোছাঈন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যুগ ও জমাত আমার (গঠিত) যুগ ও জামাত (তথা আমার ছাহাবীগণের যুগ।) তারপর ঐ যুগ সংলগ্ন যুগ (অর্থাৎ ছাহাবীদের হাতে গঠিত—তাবেয়ী'নদের যুগ ও জমাত।) তারপর এই দ্বিতীয় যুগ সংলগ্ন তৃতীয় যুগ (আর্থৎ তাবেয়ী'নদের দ্বারা গঠিত—তাবয়ে'-তাবেয়ী'নদের যুগ ও জমাত ;) এই যুগটির উল্লেখ হযরত (দঃ) করিয়াছিলেন কি না—সেই সম্পর্কে বর্ণনাকারী ছাহাবী সন্দিহান রহিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলীয়াছেন—এই সব উত্তম যুগ চলিয়া যাওয়ার পর এমন যুগের সৃষ্টি হইবে যে, (লোকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পরিণামের চিন্তা মোটেই থাকিবে না, যেমন—সাক্ষ্য দানের ন্যায় দায়িত্বের কাজেও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু কোন প্রকার স্বার্থের খাতিরে,) সাক্ষী না বানাইলেও সাক্ষ্য দানে দৌড়িয়া আসিবে। খেয়ানত করিতে অভ্যস্ত হইবে, আমানতের নির্ভরযোগ্যতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিবে। আল্লার নামে মান্নত করিয়াও উহা পুরা করিবে না। (আখেরাতের চিন্তা-শূন্য ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিবে এবং আখেরাতের উন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুধু) দৈহিক মেদবহুল বা মোটা হওয়ার অভিলাসী হইবে এবং মোটা হইতে থাকিবে।

১৮১৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানব সমাজের মধ্যে সর্ব্বোত্তম সমাজ ও যুগ আমার (গঠিত) সমাজ ও যুগ, অতঃপর যে যুগ উহার সংলগ্ন, তারপর যে যুগ এই দ্বিতীর যুগের সংলগ্ন। তারপর এমন লোকগণ সৃষ্টি হইবে যে, (তাহাদের মধ্যে দ্বীন ও শরীয়তের মোটেই কোন প্রভাব ও মর্যাদা থাকিবে না, যেমন—আল্লার নামে কসম বা শপথ করার ন্যায় মহান কাজেরও তাহারা গুরুত্ব দিবে না ; সাক্ষ্যদান কার্য্যে কসমের আবশ্যক না থাকা সত্ত্বেও কসম ব্যবহার করিবে এবং দ্বিধাহীন ও দিশাহারা রূপের তাড়াহুড়ার পরিচয় দিবে যে,) কখনও বা সাক্ষ্যদান করিয়া কসম খাইবে, কখনও বা কসম খাইয়া সাক্ষ্য দান করিবে।

ব্যাখ্যা– কসম বা শপথ করার ন্যায় মহান কাজকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং স্বেচ্ছাচারীতার স্রোতে উহার মহত্বকে বিনষ্ট করা তথা প্রয়োজন ছাড়া কথায় কথায় বা সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে কসম ব্যবহার করা অতিশয় দোষণীয় কাজ ; তাই আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ তাবেয়ী' ইব্রাহীম নখ্‌য়ী' (রঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মুরব্বীগণ কথায় কথায় কসমের বাক্য ব্যবহার করার উপর আমাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকিতেন।

বোখারী শরীফ ৪৯৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) কোন এক ব্যাপারে কসম করিয়াছিলেন, অতঃপর বহু লোকের সুপারিশে তিনি বাধ্য হইয়া কসম ভঙ্গ করেন এবং ঐ একটি মাত্র কসম ভঙ্গের দরুন আয়েশা (রাঃ) কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা চল্লিশ গুণ তথা চল্লিশটি ক্রীতদাস বা গোলাম আজাদ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। সর্ব্বদাই অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া থাকিতেন, কসম ভঙ্গের কথা স্মরণ হইলেই কাঁদিতেন।

১৮১৫। হাদীছ ঃ—(৫১৮ পৃঃ) عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ

اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ -

অর্থ— আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বলিও না ; (তাঁহাদের মর্ত্তবা তোমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে।) তোমাদের কেহ যদি ওহদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে, (তাহার এত বড় দানও) ছাহাবীদের কোন এক জনের এক মুদ্দ্‌ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা অৰ্দ্ধ মুদ্দ্‌ মাত্র (গম বা যব) ব্যয় করার সমান হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা– এক এক জিনিষের মূল্য এক এক গুণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং সেই গুণের অনুপাতেই উহার মূল্যমান নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। নেক আমলের মূল্য এখ্‌লাছ ও লিল্লাহিয়তের মাপ কাঠিতে পরিমিত হয়। এই দিক দিয়া ছাহাবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের ছোহ্‌বতের অছিলায় এত উর্দ্ধে পৌঁছিয়া ছিলেন যে, অন্য কোন মানুষের পক্ষে তথায় পৌঁছা সম্ভবই নহে। ইহা কোন ভাবাবেগের কথা নহে, বরং বাস্তব সত্য ; ছাহাবীগণের জীবন-ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) (৫১৫ পৃঃ)

"আবুবকর" তাঁহার উপনাম ছিল, আসল নাম ছিল "আবছুল্লাহ"। তাঁহার পিতার উপনাম ছিল "আবু কোহা'ফাহ" আসল নাম ছিল "ওসমান"।

পঞ্চম খণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের বর্ণনায় এবং হযরতের মৃত্যুর চার দিন পূর্ব্বেকার তাঁহার সর্ব্বশেষ ভাষণে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনেক ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে।

১৮১৬। হাদীছ :– عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ

اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যদি (আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য) কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে আবুবকরকে নিশ্চয়ই সেই মর্য্যাদা দান করিতাম। অবশ্য সে আমার (দ্বীনী) ভাই এবং ছাহাবী; (সেই সূত্রে তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বোচ্চে)।

১৮১৭। হাদীছ :-আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আমরা লোকদের মর্ত্তবা নির্ণয় করিয়া থাকিতাম এইরূপে—সর্ব্বোচ্চে আবুবকর (রাঃ), তারপর ওমর (রঃ), তারপর ওসমান (রাঃ)।

১৮১৮। হাদীছ :-জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়ে'ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি মহিলা তাহার কোন প্রয়োজন লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিকট উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাকে অন্য সময় পুনরায় আসিতে বলিলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি আসিয়া আপনাকে না পাই অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হইয়া যায় তবে আমি কি করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইও।

১৮১৯। হাদীছ : আবুদ্‌দরদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম হঠাৎ আবুবকর (রাঃ)কে দেখা গেল, তিনি আসিতেছেন এবং তিনি পথ চলিতে স্বীয় লুঙ্গির এক কিনারাকে

উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, একনকি এক একবার তাঁহার হাঁটু খুলিয়া যাইত। হযরত (দঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের এই লোকটি কোন বিবাদের সমুখীন হইয়ছে।

আবুবকর (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আমার এবং খাত্তাবের পুত্র (ওমর)-এর মধ্যে একটু বিতর্ক হইয়াছিল এবং উহাতে আমি কিছু অতিরিক্ত বলিয়াছিলাম। তারপর আমি লজ্জিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই, (বরং ওমর রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পেছনে পেছনে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে গিয়াছেন, কিন্তু ওমর(রাঃ) তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতঃ দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।* আবুবকর বলেন,) অতএব কারণে আমি আপনার দরবারে চলিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবুবকর! আল্লাহ আয়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন—হযরত (দঃ) তিনবার এইরূপ বলিলেন।

এদিকে আবুবকর (রাঃ) চলিয়া আসার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় ব্যবহারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে না পাইয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে চলিয়া আসিলেন। তখন হযরতের চেহারা মোবারকের উপর রাগ ও অসন্তুষ্টির ধারা ফুটিয়া উঠিল, এমনকি স্বয়ং আবুবকর (রাঃ) ভীত হইয়া পড়িলেন (যে, হযরত (দঃ) ওমরের প্রতি অধিক রাগান্বিত হইয়া উঠেন না-কি!) সেমতে আবুবকর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমিই অন্যায়কারী ছিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন তোমাদের প্রতি। প্রথম অবস্থায় তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ, কিন্তু আবুবকর তখন হইতেই আমাকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় জান-মাল দ্বারা আমার সাহায্য সহায়তা করিয়াছে। তোমরা অন্ততঃ আমার খাতিরে আমার বন্ধুকে রেহায়ী দিতে পার কি? দুইবার হযরত (দঃ) এইরূপ উক্তি করিলেন। ঐদিন হইতে প্রত্যেকেই আবুবকর (রাঃ)কে কোন প্রকার উৎপীড়ন না করার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হইয়াছে।

১৮২০। হাদীছ ঃ—আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে "জাতুস্‌-সালাসেল" নামক অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ হযরতের খেদমতে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনার সর্ব্বাধিক প্রিয়?

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়বস্তু ৬৬৮ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) (৫১৫ পৃঃ)

"আবুবকর" তাঁহার উপনাম ছিল, আসল নাম ছিল "আবদুল্লাহ"। তাঁহার পিতার উপনাম ছিল "আবু কোহা'ফাহ" আসল নাম ছিল "ওসমান"।

পঞ্চম খণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের বর্ণনায় এবং হযরতের মৃত্যুর চার দিন পূর্ব্বেকার তাঁহার সর্ব্বশেষ ভাষণে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনেক ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে।

১৮১৬। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যদি (আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য) কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে আবুবকরকে নিশ্চয়ই সেই মর্য্যাদা দান করিতাম। অবশ্য সে আমার (দ্বীনী) ভাই এবং ছাহাবী ; (সেই সূত্রে তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বোচ্চে)।

১৮১৭। হাদীছ :-আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আমরা লোকদের মর্ত্তবা নির্ণয় করিয়া থাকিতাম এইরূপে—সর্ব্বোচ্চে আবুবকর (রাঃ), তারপর ওমর (র ঃ), তারপর ওসমান (রাঃ)।

১৮১৮। হাদীছ :-জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়ে'ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি মহিলা তাহার কোন প্রয়োজন লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিকট উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাকে অন্য সময় পুনরায় আসিতে বলিলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি আসিয়া আপনাকে না পাই অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হইয়া যায় তবে আমি কি করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইও।

১৮১৯। হাদীছ : আবুদ্‌দর্‌দা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম হঠাৎ আবুবকর (রাঃ)কে দেখা গেল, তিনি আসিতেছেন এবং তিনি পথ চলিতে স্বীয় লুঙ্গির এক কিনারাকে

উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, একনকি এক একবার তাঁহার হাঁটু খুলিয়া যাইত। হযরত (দঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের এই লোকটি কোন বিবাদের সমুখীন হইয়ছে।

আবুবকর (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আমার এবং খাত্তাবের পুত্র (ওমর)-এর মধ্যে একটু বিতর্ক হইয়াছিল এবং উহাতে আমি কিছু অতিরিক্ত বলিয়াছিলাম। তারপর আমি লজ্জিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই, (বরং ওমর রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পেছনে পেছনে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে গিয়াছেন, কিন্তু ওমর(রাঃ) তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতঃ দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।* আবুবকর বলেন,) অতএব কারণে আমি আপনার দরবারে চলিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবুবকর! আল্লাহ আয়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন—হযরত (দঃ) তিনবার এইরূপ বলিলেন।

এদিকে আবুবকর (রাঃ) চলিয়া আসার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় ব্যবহারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে না পাইয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে চলিয়া আসিলেন। তখন হযরতের চেহারা মোবারকের উপর রাগ ও অসন্তুষ্টির ধারা ফুটিয়া উঠিল, এমনকি স্বয়ং আবুবকর (রাঃ) ভীত হইয়া পড়িলেন (যে, হযরত (দঃ) ওমরের প্রতি অধিক রাগান্বিত হইয়া উঠেন না-কি!) সেমতে আবুবকর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমিই অন্যায়কারী ছিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন তোমাদের প্রতি। প্রথম অবস্থায় তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ, কিন্তু আবুবকর তখন হইতেই আমাকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় জান-মাল দ্বারা আমার সাহায্য সহায়তা করিয়াছে। তোমরা অন্ততঃ আমার খাতিরে আমার বন্ধুকে রেহায়ী দিতে পার কি? দুইবার হযরত (দঃ) এইরূপ উক্তি করিলেন। ঐদিন হইতে প্রত্যেকেই আবুবকর (রাঃ)কে কোন প্রকার উৎপীড়ন না করার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হইয়াছে।

১৮২০। হাদীছ ঃ—আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে "জাতুস্-সালাসেল" নামক অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ হযরতের খেদমতে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনার সর্ব্বাধিক প্রিয়?

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়বস্তু ৬৬৮ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষদের মধ্য হইতে কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশার পিতা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার পরে? হযরত (দঃ) বলিলেন, ওমর। এইরূপে প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) পর পর কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেন।

১৮২১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

"যে ব্যক্তি আত্মম্ভরিতা ও দাম্ভিকতা-প্রসূত ফ্যাসনের তাবেদারীরূপে এবং অহঙ্কার ও গরিমাজনিত ভাবাবেগে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রকে মাটিতে হেঁচড়াইবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন দৃষ্টিপাতও করিবেন না।"

এতচ্ছ্রবনে আবুবকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার পরিধেয় লুঙ্গির এক কিনারা নিচের দিকে লট্‌কিয়া যায়, অবশ্য বিশেষ তৎপতার সহিত লক্ষ্য রাখিলে উহা বারণ করা সম্ভব হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার কার্য্য (যতটুকু) নিশ্চয়ই উহা তোমার অহঙ্কার, গরিমা ও দাম্ভিকতা প্রসূত নহে।

ব্যাখ্যা—পায়ের গিঁটের নীচ পর্য্যন্ত লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি ঝুলাইয়া দেওয়ার মাছতালাহ ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা সম্মুখে পোশাক পরিচ্ছেদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। ইহা যে নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে অনেক হাদীছ তথায় উল্লেখ হইবে। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কার্য্যক্রমটা শুধুমাত্র অসাবধানতা প্রসূত সাময়িক শ্রেণীর ছিল, ফ্যাসন বা অভ্যাসগত মোটেই ছিল না—হযরত (দঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৮২২। **হাদীছ ঃ**—আবু মূছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি অজু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, আজিকার দিনটি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া কাটাইব। এই মনোভাব নিয়া তিনি প্রথমতঃ হযরতের মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত লোকগণ বলিল, তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া এই দিকে গিয়াছেন।

আবু মূছা বলেন, তখন আমি মসজিদ হইতে বাহির হয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত দিকে অগ্রসর হইলাম এবং লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এমনকি হযরত (দঃ) "বীরে-আরীস্" নামীয় কূপস্থিত বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া খোঁজ পাইলাম। আমি তথায় যাইয়া বাগানের গেটে বসিয়া থাকিলাম।

হযরত (দঃ) বাগানের ভিতরে পেশাব-পায়খানার আবশ্যক পূর্ণ করিয়া অজু করিলেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম তিনি ঐ কূপের কিনারায় বসিয়া আছেন এবং পায়ের গোছা উন্মুক্ত করতঃ পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন। আমি হযরতকে সালাম করিলাম এবং পুনরায় গেটের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে, আজ আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দারোয়ান হইয়া থাকিব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দরওয়াজা ধাক্কা দিলেন। ভিতর হইতে আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি তাঁহার নাম বলিলেন। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন; অতঃপর আমি হযরতের নিকট যাইয়া বলিলাম, আবুবকর অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত লাভের সুসংবাদও দান কর। আমি আসিয়া আবুবকরকে বলিলাম, ভিতরে আসুন! রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনাকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইতেছেন। আবুবকর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাঁহার ডান পার্শ্বে কূপের কিনারায় বসিলেন এবং হযরতের ন্যায় পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন।

আবুমূছা (রাঃ) বলেন, আমি যখন হযরতের খোঁজে বাহির হইয়া ছিলাম তখন আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি অজু করিতেছেন এবং আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করিতেছেন। (যখন আমি এস্থলে হযরতের বেহেশতের সুসংবাদ দানের উদারতা দেখিতে পাইলাম তখন) আমি আমার ভ্রাতা সম্পর্কে ভাবিতে লাগিলাম যে, যদি সে আল্লাহ তায়ালার নিকট সৌভাগ্যশীল হইয়া থাকে তবে এখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এস্থানে উপস্থিত করিবেন; (এবং হযরতের মুখে বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করিয়া চির সৌভাগ্যশীল প্রতিপন্ন হইবে।) এমতাবস্থয় আর এক ব্যক্তি দরওয়াজা নাড়া দিল। আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, আমি ওমর-ইবনুল-খাত্তাব। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ওমর অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ দান কর। আমি ওমর (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইলাম। তিনি বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাঁহার বাম পার্শ্বে কূপের কিনারায় বসিলেন, পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। এইবারও দরওয়াজার নিকট বসিয়া বসিয়া আমি আমার ভ্রাতা সম্পর্কে পূর্ব্বের ন্যায় ভাবিতে লাগিলাম; এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া দরওয়াজা নাড়া দিল। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি

বলিলেন, আমি ওসমান ইবনে আফ্‌ফান। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে ওসমানের সংবাদ জানাইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদও দান কর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দাও যে, তিনি বালা-মুছিবতের সম্মুখীন হইবেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া ওসমান (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ শুনাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বালা-মুছিবতেরও সংবাদ জ্ঞাত করিলাম। (তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা।) অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত (দঃ) কূপের কিনারায় যে পার্শে বসিয়াছেন ঐ পার্শ্বে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া বসিবার স্থান নাই, (কারণ সেই স্থান আবুবকর ও ওমর দখল করিয়া নিয়াছেন, তাই তিনি হযরতের বরাবরে সম্মুখস্ত অপর দিকে বসিলেন।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী তাবেয়ী' সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ঘটনার দৃশ্য অনুযায়ীই তাঁহাদের কবরের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হযরতের কবর শরীফের সংলগ্নে কবরের স্থান লাভ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ওসমান(রাঃ) হযরতের কবর হইতে দূরে মদিনার সর্ব্বসাধারণের কবরস্থানে সমাহিত হইয়াছেন।

খলীফাতুল-মোছলেমীন পদে আবুবকর (রাঃ) ঃ

খলীফা পদে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন-ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া সুফলপ্রদ হইবে। ১ম—খলীফা-পদে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনোনীত হওয়া সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ২য়—তৎকালীন উপস্থিত জরুরী অবস্থা ও উহার ভয়াবহতার উদ্ভব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক আবুবকরের মনোনয়ন ঃ

(১) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা খলীফারূপে মনোনীত করা সম্পর্কে এত দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকিতেন যে, তিনি অন্তিম রোগে শায়িত হইলে পর উহা লিখিতরূপে ঘোষণা জারি করিয়া দেওয়ার পর্য্যন্ত তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং সেই ঘোষণা জারির ব্যবস্থা করার জন্য আবুবকরকে ডাকিয়া আনিতে আয়েশা (রাঃ)কে আদেশও করিয়াছিলেন। অবশ্য আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া সম্পর্কে তিনি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এইরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, সেই ঘোষণা জারিকে তিনি অনাবশ্যক মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই তথ্যই নিম্নের হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

১৮২৩। হাদীছ ঃ—(৮৪৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,........ মাথা ব্যথায় আমি বলিতেছিলাম—আমার মাথা গেল! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার অন্তিম শয্যার যাতনা প্রকাশে) বলিলেন, বরং আমার মাথা গেল!

অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়াছিলাম—আবুবকর এবং তাহার ছেলেকে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকিয়া আনি এবং (তোমাদের সাক্ষাতেই আমার পরে আবুবকর খলীফা হওয়ার) ঘোষণা করিয়া যাই; যেন অন্য কেহ কিছু বলার সুযোগ না পায় এবং অন্য কেহ আশা করার অবকাশ না পায়। কিন্তু পরে ভাবিলাম, আল্লাহ তায়ালা অন্য কাহাকেও হইতে দিবেন না, মোসলমানগণও অন্যকে গ্রহণ করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের হাদীছে নবী (দঃ) কর্তৃক ঐরূপ আদেশ করাও উল্লেখ রহিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও মোসলমানগণের নিকট নির্দ্ধারিত খলীফারূপে আবুবকরের নাম উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা আমাকে আদেশ করিলেন, আবুবকর এবং তোমার ভ্রাতাকে ডাকিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর। আমি একটি লিপি লিখিয়া দিয়া যাই। আমার আশঙ্কা হয় অন্য কোন আশাধারী আশা করিবে এবং বলিবে, আমি অগ্রাধিকারী। কিন্তু আল্লাহ এবং মোমেনগণ একমাত্র আবুবকর ব্যতীত অন্য কাউকে হইতে দিবে না। (মোশলেম শরীফ ২৭৩)

অতএব, ইহা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বয়ং হযরত (দঃ) কর্তৃক আবুবকর (রাঃ) খলীফা মনোনীত ছিলেন। অবশ্য যেহেতু হযরতের এই মনোভাব তাঁহার মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাই সাধারণভাবে ছাহাবাদের মধ্যে উহার প্রসার হইয়া ছিল না, তাই সাময়িকভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন মতামতের শব্দ শুনা যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা মুহূর্ত্তের জন্যও উহার উদয়ই হইত না।

(২) রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন হযরত (দঃ) মসজিদে পদার্পণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন হইতে তিনি নামাযের ইমামরূপে আবুবকরকে তাঁহার স্থলে দাঁড় করাইয়াছিলেন। এমনকি ইহার বিরুদ্ধে অনেক রকমের বুঝ-প্রবোধ ও পরামর্শকেও তিনি বিরক্তিকররূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ড ১৭৩০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ছোট ইমাম তথা নামাযের ইমামরূপে আবুবকরকে মনোনীত করিয়া বড় ইমাম তথা খলীফা হওয়ার পথকে আবুবকরের জন্য স্বয়ং হযরত (দঃ)ই সুগম করিয়া গিয়াছিলেন। ওমর ফারুক (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচিত

করার পক্ষে ছাহাবীগণের সম্মুখে এই তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (নাছায়ী শরীফ দ্রষ্টব্য)

জরুরী অবস্থা ও উহার ভয়াবহতার উদ্ভব ঃ

আরবের মধ্যে মোসলমানদের শক্তি ও আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার চতুর্দিকের প্রত্যেকটি শক্তিই মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছুনিয়া ত্যাগের ছুই চার দিন পূর্ব্বেও রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা-বাহিনী প্রেরণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন হযরতের ইহজগৎ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের অভ্যন্তরেও এক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাই শুধু ছিল না, বরং সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের দৃষ্টিতেও উহা অবশ্যম্ভাবীরূপে মাথার উপর দণ্ডায়মান ছিল। এমনকি ছুই চার দিনের মধ্যেই উহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল এবং আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়া প্রথম দিকেই স্বশস্ত্র অভিযান দ্বারা উহার মূল উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; যাহার বিবরণ ২য় খণ্ডে ৭৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তদুপরি মোনাফেকদের আনাগোনা ত মদিনার অভ্যন্তরে বিষাক্তময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেই ছিল। সর্ব্বোপরি গুরুতর অবস্থা যাহার আত্মপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক ছিল—উহা ছিল এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নির্ব্বাচনে মোহাজের ও আনছারদের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। এমনকি ছুপুর বেলায় হযরতের ইহজগৎ ত্যাগের পরক্ষণে—বিকাল বেলায়ই মদিনা শহরের "সক্কিফা-বনু সায়েদাহ" নামক স্থানে আনছারগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জনকে খলীফা মনোনীত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আনছারগণের মধ্যেও প্রধানতম ছুইটি গোত্র ছিল—"আউস" এবং "খয্‌রজ" তাঁহাদের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল এবং খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কে সেই প্রতিযোগিতার ব্যাপার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছিল।

সায়া'দ-ইবনে-ওবাদা (রাঃ) যাঁহাকে খলীফা মনোনীত করার চেষ্টা করা হইতেছিল তিনি খয্‌রজ গোত্রের সর্দ্দার, তাই আউস গোত্রীয় লোকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—২৪২)

প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনা বোধ, বরং সামান্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করিতে পারে যে, তখন কিরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল! সেই ভয়াবহ জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাড়াহুড়ার মধ্যে উপস্থিত সমাবেশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবর্জ্জিতভাবে আবুবকরের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচন ঃ

বোখারী শরীফ ৫১৮ পৃষ্ঠায় আয়েশা (রাঃ) কর্ত্তৃক একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইন্তেকালের পর ঐদিন বিকালবেলা আনছারগণ সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কেন্দ্র করিয়া "সক্কিফা-বনী-সায়েদাহ্" নামক স্থানে একত্রিত হইলেন।

আবুবকর, ওমর ও আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তথায় পোঁছিলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উদ্যত হইলেন, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তথায় সর্ব্বাগ্রে বক্তৃতা দিতে চাহিয়াছিলাম এই জন্য যে, আমি একটি বক্তব্য চিন্তা করিয়া, তৈরী করিয়া নিয়াছিলাম ; আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, আবুবকর যেহেতু ঐরূপ করিয়া ছিলেন না তাই হয়ত তাঁহার অন্তরে ঐ ধরণের বক্তব্য উপস্থিত নাই। কিন্তু আবুবকরই বক্তৃতা দানে দাঁড়াইলেন এবং তিনি অতিশয় বিচক্ষণতা সম্পন্ন বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, কোরায়েশদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচিত হইবেন এবং মদিনাবাসী আনছারদের মধ্য হইতে ওজীর বা সহকর্ম্মী হইবেন।

আনছারদের মধ্য হইতে হোবাব-ইবনুল-মোনজের (রাঃ) বলিলেন, সেরূপ হইতে পারে না, বরং মদিনাবাসী আনছারদের মধ্য হইতে একজন খলীফা হইবে এবং মোহাজের কোরায়েশদের মধ্য হইতে অপর একজন খলীফা হইবে। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পূর্ব্ব উক্তিকেই পুনরায় দোহ্রাইলেন যে, কোরায়েশদের হইতে খলীফা হইবে এবং আনছারদের মধ্য হইতে সহকর্ম্মী হইবে।

আবুবকর (রাঃ) তাঁহার উক্তির উপর একটি যুক্তিও পেশ করিলেন যে, কোরায়েশগণ হইতেছেন সমগ্র আরববাসীদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র এবং সর্ব্বোচ্চ বংশীয়, সুতরাং সকলে ওমর বা আবু-ওবায়দাহ্‌কে খলীফা নির্ব্বাচিত কর। তখন ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে বলিলেন, না—না, বরং আমরা সকলে আপনাকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিব ; আপনি হইতেছেন আমাদের সকলের শিরোমণি ও সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে খলীফারূপে বরণ করিয়া নেওয়ার উপর বায়য়া'ত বা অঙ্গীকার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হাতে হাত দিয়া খলীফারূপে বরণ করিয়া নেওয়ার বায়য়া'ত বা অঙ্গিকার করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— কোরায়েশ বংশ হইতে খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ) যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা একটি বাস্তব তথ্য ত ছিলই, তদুপরি তথাকার উপস্থিত সময়ের জন্য অপরিহার্য্য পন্থাও ছিল।

খলীফা নির্ব্বাচনের শুভ ও সঠিক পন্থা এই যে, খলীফা হওয়ার জন্য এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে হইবে যে ব্যক্তি তাহার নিজ আহরিত এবং খোদা-প্রদত্ত—সর্ব্বপ্রকার গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর সর্ব্ব-সাধারণের মনকে জয় ও বাধ্য করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই শ্রেণীর খলীফা নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিতে পারে। ইসলামী শরীয়ত খলীফা নির্ব্বাচনে বিভিন্ন গুণাবলীর শর্ত্ত নির্দ্ধারণে একমাত্র উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকেই সম্মুখে রখিয়াছে।

আরব দেশে বংশ ও গোত্রীয় বিভিন্নতাকে এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত যে, অন্য কোন গুণ বা বিষয় বস্তুকেই তদ্রূপ গুরুত্ব দেওয়া হইত না। এমনকি অন্ধকার যুগে যখন খোদা ভিন্ন অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করা হইত তখন প্রত্যেক গোত্র ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করিত; এক গোত্র অন্য গোত্রের উপাস্যকে উপাস্য বানাইত না। তাহাদের এই স্বভাব ও প্রকৃতির কারণেই ইসলাম-যুগের পূর্ব্বে সংঘবদ্ধ আকারের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আরবের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই গোত্রীয় কোন্দলের ভিতর দিয়াও সমগ্র আরব কোরায়েশ বংশকে মুকুট-মণির মর্য্যাদা দিয়া থাকিত। যেই অন্ধকার যুগে জাতিগত ব্যবস্থা ছিল বিদেশী পথিককে লুণ্ঠন করা সেই যুগেও কোরায়েশগণ স্বীয় মর্য্যাদার প্রভাবে সর্ব্বত্র নিরাপত্তা উপভোগ করিত; যাহার প্রতি পবিত্র কোরআন ছুরা কোরায়শের মধ্যেও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ইসলামী জগতে সর্ব্বেপ্রথম খলীফা নির্ব্বাচনকালে কেন্দ্রীয় এলাকা মদিনার পাশাশাশি অবস্থানকারী দুইটি গোত্র আউস্ ও খয্‌রজ্—তাহাদের মধ্যে গোত্রীয় কোন্দল ক্রিয়া করিয়া উঠিতেছিল, অতঃপর অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন গোত্রগুলি যে, কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে গোত্রীয় কোন্দলে সৃষ্ট ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় এই ছিল যে, খলীফা কোরায়েশদের হইতে নির্ব্বাচন করা হউক যাঁহাদের প্রভাব এবং মর্য্যাদা সমগ্র আরবে স্বীকৃত ছিল। আবুবকর (রাঃ) স্বীয় যুক্তিতে এই তথ্যটিই তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং এই যুক্তি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি তথ্য হইতেই গৃহিত ছিল। মোসলেম শরীফ ১১৯ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ

"নেতৃত্বের মর্য্যাদার জন্য জনসাধারণ কোরায়েশকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। কোরায়েশদের প্রতি জনসাধারণের এই আকর্ষণ কুফুরী তথা অন্ধকার যুগেও বিদ্যমান ছিল, ইসলামের পরেও বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ইসলামে যেহেতু উহার সমগ্র এলাকায় একজন মাত্র খলীফা নির্ব্বাচনের আইন রহিয়াছে, এমনকি যদি সারা বিশ্ব ইসলামের করায়ত্ব হয় তবে সারা বিশ্বের জন্য একজন খলীফাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাঁহার অধীনে আরব আ'জম সকলেই থাকিবে। সুতরাং আরব-আ'জম সকলের মিশ্রিত রাষ্ট্রের খলীফা নির্ব্বাচনে উক্ত কোন্দলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে এবং উহার মোকাবিলার পন্থাও ঐ একই।

কোরায়েশদের প্রতি পূর্ব্বাপর জনসাধারণের যে একটা প্রগাঢ় আকর্ষণ রহিয়াছে সেই তথ্যটির ভিত্তিতেই হযরত (দঃ) একটি ভবিষ্যৎ সংবাদ পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন যে, اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ "খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোরাশেগণ অগ্রগণ্যতা লাভ করিবে" (মো'জামে-তবরানী)। ভবিষ্যৎ সংবাদ পরিবেশন মর্ম্মেই বোখারী শরীফ ১০৫৭ এবং ৪৯৭ পৃষ্ঠায় আর একটি হাদীছ রহিয়াছে—

اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ -

"খেলাফত কোরায়েশদের মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পুর্ণরূপে পরাজিত করিবেন। (কোরায়েশদের এই বিশেষত্ব তাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবে) যাবৎ তাহারা দ্বীন-ইসলামকে সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে অর্জ্জন ও প্রবর্ত্তন করার দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।"

এই ভবিষ্যৎ সংবাদটি পরিবেশন করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে যে, উল্লেখিত শর্ত্ত বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত অন্য লোকদের পক্ষে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়া জাতির মধ্যে অধিক বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের সূত্রপাত করা মোটেই সমীচীন হইবে না। এই মর্ম্মেই আবুবকর (রাঃ) ও মোহাজেরগণ মদিনাবাসীদের সম্মুখে আলোচ্য তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং মদিনাবাসীগণও উহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলেন। এমনকি পরবর্ত্তীকালেও ওলামাগণ খলীফা নির্ব্বাচনে অন্যান্য যোগ্যতার সঙ্গে কোরায়শী হওয়ার শর্ত্তও আরোপ করিয়াছেন ; শুধু এই সূত্রে যে, অন্যান্য সমুদয় যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটিও বিদ্যমান থাকিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং জন-সাধারণের অধিক আস্থা বিশেষরূপে কায়েম হইবে, যেহেতু কোরায়েশদের প্রতি জন-সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে আরও অধিক বিবরণ সপ্তম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিরোনামায় বর্ণিত হইবে।

আবুবকরের প্রতি অকুণ্ঠ গণ-সমর্থন ঃ

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের দিন—সোমবারের বিকাল বেলায়ই উল্লেখিত "সকিফা-বনু সায়েদাহ্" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায়

সুদীর্ঘ বিতর্কের শেষ ফলে শুধু মাত্র সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) ব্যতীত উপস্থিত সকল আনছারগণ এবং ওমর (রাঃ) ও আবু ওবায়দাহ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে খলীফারূপে বরণ করিয়া তাঁহার হাতে হাত দিয়া "বায়য়া'ৎ" বা অঙ্গিকারাবদ্ধ হইলেন এবং উক্ত সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পর দিন তথা মঙ্গলবার দিন মদিনার জন-সাধারণকে মসজিদে-নববীতে আহ্বান করা হইল। সকলে তথায় একত্রিত হইলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সম্মুখে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে বক্তৃতা দান করিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মিম্বরের উপর বসিয়া জন-সাধারণ হইতে বায়য়া'ৎ বা খলীফারূপে বরণ করার স্বীকৃতি গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। আবুবকর (রাঃ) সম্মত হইতেছিলেন না, অবশেষে অনুরোধের চাপে আবুবকর (রাঃ) মিম্বারে আরোহন করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই থাকে বসিতেন উহার নিম্নের থাকে বসিলেন। জন-সাধারণ একে একে আসিয়া তাঁহার হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ৎ বা অঙ্গিকার করিয়া গেলেন (সীরাতে মোস্তাফা ৩—২৪৩)। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বায়য়া'ৎ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ড ১৭৫৩ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার সামগ্রিক বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তাঁহার মনোনয়ন সম্পর্কে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতি উজ্জ্বল কতিপয় ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার নির্ব্বাচনও ঘরোয়া ভাবে বা নিজস্ব গঠিত কোন কলেজ বা শুধু স্বদলীয় লোকদের সমবায়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ছিল না। বরং বিপরিত বাতাস বহনকারী একটি জন-সমাবেশে সকলের নির্ব্বাচনেই তিনি খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অতঃপর তাঁহার সমর্থনও লাভ হইয়াছিল ব্যাপক আকারে। অবশ্য নির্ব্বাচন অপেক্ষা সমর্থন ছিল তথায় অধিক এবং সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণে। নতুবা সুষ্ঠু পরিবেশ থাকিলে তখন সমর্থনের ব্যবস্থা অপেক্ষা নির্ব্বাচনের মাধ্যমে খলীফা হওয়াই ইসলামের বিধান। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টির প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

১৮২৪। হাদীছ :-(১০০৯ পৃঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের সর্ব্বশেষ হজ্জ সমাপনে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিনায় অবস্থান কালে একদা বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) তাঁহাকে একটি ঘটনা শুনাইলেন যে, অদ্য ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট একটি লোক এই সংবাদ দিল যে, এক ব্যক্তি বলিতেছে, খলীফা ওমর (রাঃ) ইন্তেকাল করিয়া গেলে

আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফারূপে গ্রহণ করিব এবং তাহার হাতে বায়য়া'ৎ করিব, (পরে অন্য লোকদের সমর্থন আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে।) আবুবকরের নির্ব্বাচন এইরূপে হঠাৎ ভাবেই হইয়াছিল, অতঃপর উহাই বহাল হইয়া গিয়াছিল।

এই সংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আজই বিকাল বেলা আমি এই সম্পর্কে জনগণের সম্মুখে ভাষণ দান করিব। তাহাদিগকে ঐ শ্রেণীর লোকদের হইতে সতর্ক করিব যাহারা শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচনে তাহাদের তথা জনগণের অধিকার হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! আপনি এরূপ করিবেন না। কারণ, হজ্জ উপলক্ষে পাকা-পোক্তা বুদ্ধিহীন—নিম্ন শ্রেণীর বাচাল লোকদেরও সমাবেশ হইয়াছে। এবং আপনি এখানে কোন সম্মেলন আহ্বান করিলে ঐ শ্রেণীর লোকগণই আপনার চতুষ্পার্শ দখল করিয়া নিবে; এমতাবস্থায় আশঙ্কা হয় আপনি কোন কথা বলিলে তাহারা উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং উহার যথার্থতা বিবেচনা করা ব্যতিরেকেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে এবং উহার অব্যবহার বা অপব্যবহার করিবে। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন মদিনায় পৌঁছা পর্য্যন্ত; মদিনা হইল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত সম্পর্কীয় জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিজরত করিয়া তথায়ই সমাবেশিত হইয়াছেন। অতএর তথায় আপনি কেবলমাত্র জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে যে কথা বলিবেন তাঁহারা উহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা উহার সদ্ব্যবহারও করিবেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাই করিব এবং মদিনায় পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথম ভাষণেই এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে মদিনায় পৌঁছিলাম এবং জুমার দিন আমি যথাসত্বর মসজিদে উপস্থিত হইলাম। ওমর (রাঃ) মসজিদে আসিয়া মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হাম্দ-ছানা ও প্রসংশা করতঃ বলিলেন, আমি কতকগুলি বিষয়বস্তু তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি; হইতে পারে ইহা আমার শেষ জীবনের ভাষণ। তোমাদের মধ্য হইতে যে আমার কথার যথার্থ ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার কর্ত্তব্য হইবে উহাকে অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর যে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া আশঙ্কা করিবে তাহার জন্য জায়েয হইবে না আমার কথাকে বিকৃত আকারে প্রকাশ করা। তোমরা সকলে লক্ষ্য করিয়া শুন!

(১) আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য দ্বীনের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানী

বা ব্যভীচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান সেই পবিত্র কোরআনেরই একটি আয়াত ছিল—যাহা আমরা তেলাওয়াত করিয়াছি, উহার মর্ম্ম ভালরূপে অনুধাবন করিয়াছি এবং উহাকে অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। সেই আয়াতের বিধানকে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—তিনি ব্যভিচারের অপরাধীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে আমরাও ঐরূপ করিয়াছি। (উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হইয়া যাওয়ার কারণে উহা বর্ত্তমানে কোরআন শরীফে লিখিত নাই।) তাই আমার ভয় হয়, আমাদের যুগের পরে কোন মানুষ এইরূপ দাবী করিয়া না বসে যে, "রজম" তথা ব্যভীচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান কোরআনে নাই। এইরূপ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করিলে লোকগণ আল্লাহ কর্তৃক পবিত্র কোরআনে অবতারিত ও নির্দ্ধারিত একটি ফরজ তরক করতঃ গোমরাহ ও ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা শুনিয়া রাখ! আল্লার কেতাব পবিত্র কোরআনে রজমের বিধান প্রকৃত প্রস্তাবেই বলবৎ রহিয়াছে, (অবশ্য উহার তেলাওয়াত নাই বলিয়া লেখার মধ্যে রাখা হয় নাই।) কোন মোসলমান বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া (চারজন) সাক্ষী পাওয়া গলে বা গর্ভ (ইত্যাদি সন্দেহের কারণ) স্থলে স্বীকারুক্তি পাওয়া গেলে তাহাকে রজম করা হইবে—প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা হইবে।

(২) আরও কটি বিষয় পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান ছিল যে, কোন মোসলমান যেন স্বীয় বাপ-দাদা (তথা স্বীয় বংশ) ছাড়িয়া অন্য বাপ-দাদার (তথা অন্য বংশের) প্রতি সম্পর্কের দাবী না করে; ইহা কুফুরী সমতুল্য পাপ গণ্য হইবে।

(৩) আরও জানিয়া রাখ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন, মর্‌য়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাছারাগণ যেরূপ অতিরঞ্জিত উক্তি করিয়াছে—খবরদার! তোমরা আমার সম্পর্কে ঐ শ্রেণীর উক্তি করিও না; আমার সম্পর্কে এই ঘোষণাই তোমরা দিবে যে, আমি "আল্লার সৃষ্ট বন্দা এবং তাঁহার রসুল।"

(৪) আরও একটি অতি জরুরী খবর—

আমি সংবাদ পাইয়াছি, কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকে—ওমর ইন্তেকাল করিলে আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করিয়া তাহার হাতে বায়য়াৎ করিব।

খবরদার, খবরদার! (এইরূপ ধারণা কেহ পোষণ করিবেনা। এবং) কেহই এই ধারণার বশীভূত হইয়া প্রবঞ্চিত হইবে না যে, আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া আকস্মিক ঘটনাই ছিল এবং পরে উহা বহাল ও বলবৎ হইয়া গিয়াছিল।

আবুবকরের খলীফা হওয়ার ঘটনা ঐরূপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আবু করকে এমন ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছিলেন যদ্দারা তাঁহাকে উহার ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমাদের মধ্যে আবুবকরের ন্যায় এমন ব্যক্তি নাই

যাহার প্রতি জনসাধারণের সর্ব্বসম্মত আকর্ষণ আছে। সুতরাং মোসলমানগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কাহাকেও খলীফা নির্ব্বাচন করা হইলে সেই খলীফা ও তাহার নির্ব্বাচনকারীর অনুসরণ তোমরা করিবে না, কারণ তাহারা উভয়ে অচিরেই প্রাণ হারাইবে। আবুবকরের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র—

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে আমাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন আবুবকর (রাঃ)। অবশ্য (তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে) মদীনাবাসী—আনছারগণ বিরোধী হইয়া গেল এবং তাহারা "সকীফা-বনু সায়েদাহ্" নামক স্থানে সকলে একত্রিত হইল। এতদ্ভিন্ন আলী (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহাদের সমর্থকগণও ঐ ব্যাপারে মত বিরোধ করিল।

এতদৃষ্টে মোহাজেরগণ আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হইল, তখন আমি আবুবকরকে বলিলাম, চলুন! আমরা আনছার ভাইদের সমাবেশে উপস্থিত হই। অতঃপর আমরা তাহাদের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলে একজন শুভাকাঙ্খী লোকের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে তাহাদের প্রস্তাবাদি শুনাইয়া বলিলেন, তথায় আপনাদের উপস্থিত হওয়ার আবশ্যক নাই; আপনাদের যাহা করিবার তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। কিন্তু আমি বলিলাম, আমরা তথায় যাইবই। (তাথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, কম্বলে আবৃত একজন লোক তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট এবং জানিতে পারিলাম, তিনি সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)—তিনি জ্বরাক্রান্ত।
অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন বক্তা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা আল্লার দ্বীনের আনছার বা সাহায্যকারী এবং ইস্‌লামের সৈনিক দল। পক্ষান্তরে আপনারা মোহাজেরগণ হইলেন সংখ্যালঘু দল; এখন আপনাদের কতিপয় ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে! বক্তা যখন ক্ষান্ত হইলেন তখন আমি কিছু বলিতে উদ্যত হইলাম; আমি পূর্ব্ব হইতেই একটি বক্তৃতা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং উহাতে আমি আবুবকরের সাম্ভাব্য রাগ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আবুবকর আমাকে বারণ করিয়া নিজেই বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তখন দেখিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অধিক শান্ত এবং ধীর-স্থির। আমার সাজান বক্তৃতার সব-গুলি ভাল কথা বরং আরও অধিক উত্তম কথা তিনি ভাষণে সমাবেশ করিলেন।

আনছারদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, আপনাদের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন বাস্তবিকই আপনারা তাহার অধিকারী, কিন্তু খেলাফৎ বা শাসন-ক্ষমতা একমাত্র কোরায়েশদের পক্ষেই শোভনীয়। কারণ, সমগ্র আরবের লোকগণ

বংশ-মর্য্যাদা এবং মক্কা দেশের মর্য্যাদার দরুণ তাহাদিগকে সর্ব্বোত্তম গণ্য করিয়া থাকে। সুতরাং ওমর বা আবু ওবায়দাহ—এই দুইজনের একজনকে খলীফা নির্ব্বাচতি করা আমি আপনাদের পক্ষে ভাল মনে করি।

ওমর(রাঃ) বলেন, আবুবকরের বক্তৃতার সব কথাই আমার নিকট অতি উত্তম ছিল, কিন্তু এই একটি কথা আমার নিকট অতিশয় না-পছন্দ ছিল। আমার কোন প্রকার গোনাহ না হয় এই ভাবে আমার গলা কাটিয়া ফেলা আমার নিকট তদপেক্ষা শ্রেয় যে, আমি আবুবকরের বিদ্যমান থাকাবস্থায় লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করি।

এই কথাবার্ত্তার মধ্যে মদিনাবাসী আনছারদের পক্ষ হইতে একটি লোক দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এই বিতর্কের চুড়ান্ত মিমাংসা পেশ করিতেছি এই যে, আমাদের মদিনাবাসীদের হইতে একজন খলীফা হইবে এবং কোরায়েশদের হইতে একজন খলীফা হইবে। এই কথার উপর অধিক বিতর্ক এবং হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল, এমনকি পরস্পর বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিল। তখন আমি আবুবকরকে অনুরোধ করিলাম, আপনি হাত বাড়াইয়া দিন ; আমরা আপনার হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ত ও অঙ্গিকার করতঃ আপনাকে খলীফা মনোনীত করি। আবুবকর সম্মত হইলেন এবং আমি তথায় উপস্থিত মোহাজেরগণ সহ সকলে তাঁহার হাতে বায়য়া'ত করিলাম, অতঃপর উপস্থিত আনছারগণও বায়য়া'ত করিলেন। এই ভাবে আমরা তথায় উপস্থিত প্রস্তাবিত খলীফা—সায়াদ ইবনে ওবায়দার উপর অগ্রগামী হইতে সক্ষম হইলাম। তখন উপস্থিত একজন লোক বলিয়া উঠিল, তোমরা সায়াদ ইবনে ওবায়দার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালাই করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) এই বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করিয়া বলিলেন, উল্লেখিত পরিস্থিতিতে আবুবকরকে খলীফা মনোনীত করিয়া নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত না করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তথায় অন্য কাউকে খলীফা নির্ব্বাচিত করা হইত। এমতাবস্থায় আমরাও তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিলে তাহা হইত আমাদের বিবেচিত উত্তম পন্থার সম্পুর্ণ পরিপন্থি। আর বিরোধিতা করিলে তাহা হইত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার কারণ।

(এইরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বাধ্য হইয়া মোসলমানদের হইতে পুরাপুরী পরামর্শ গ্রহণের পুর্ব্বে আবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু) অন্য কোন ব্যক্তিকে মোসলমানগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে খলীফা মনোনীত করা হইলে সেই খলীফা এবং তাহাকে মনোনয়ন দানকারীর অনুসরণ করা যাইবে না ; অচিরেই তাহারা উভয়ে প্রাণ হারাইবে।

খোলাফা-রাশেদীনের যুগে
ভোটদান-দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ঃ

সকল দেশ ও জাতির মধ্যেই ভোটাধীকার তথা ভোট দানের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নির্ব্বিচারে সকলের ভোট গ্রহণ কোন দেশেই আবশ্যকীয় গণ্য করা হয় না, বরং ঐরূপ ক্ষমতাও প্রদান করা হয় না। যেমন বর্ত্তমান গণতন্ত্রের গলাবাজদের শাসনতন্ত্রেও বাইশ বা উহার কম-বেশ বৎসর বয়সের শর্ত্ত আরোপ করিয়া কোটি কোটি মানুষকে ভোটদানের অযোগ্য করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন দেশেত আরও অধিক সঙ্কীর্ণ নীতি আরোপ করা হয়।

ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শাসন নীতিতে যেহেতু প্রেসিডেন্ট শুধু কেবল জনগণের প্রতিনিধি বা তাহাদের কার্য্য পরিচালক গণ্য হইয়া থাকেন, তাই সেই নীতিতে ভোটাধীকার সংরক্ষণে ভোটদাতাদের পরিপক্ক যোগ্যতার জন্য সেই দৃষ্টিতেই শর্ত্ত আরোপ করা হইয়া থাকে। ইস্‌লামের দৃষ্টিতে খলীফা বা প্রেসিডেন্ট শুধু জনগণের কার্য্য পরিচালকই নহেন, বরং সর্ব্বাগ্রে তিনি হইবেন মহান আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের পক্ষে আল্লার বিধান ও রসুলের আদর্শ জনগণের মধ্যে জারি ও প্রয়োগকারী। অর্থাৎ বিধানকর্ত্তা হইলেন আল্লাহ তায়ালা, আইন ও বিধান নির্দ্ধারণের সর্ব্বভৌম অধিকার হইল আল্লাহ তায়ালার এবং তিনি তাহা স্বীয় রসুলের মারফৎ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা জারিও করিয়া গিয়াছেন। এখন মোসলমানদের মধ্যে যিনি খলীফা বা প্রেসিডেন্ট হইবেন তিনি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের স্থলে তথা তাঁহাদের পক্ষে উক্ত বিধান জারি ও প্রয়োগকারী হইবেন। এই সূত্রেই ইস্‌লামী পরিভাষায় প্রেসিডেন্টকে "খলীফা" বলা হয়—খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত; তিনি হন আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের খলীফা। সুতরাং ইস্‌লামের নীতিতে ভোটদাতাদের পরিপক্ক যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে ভোটাধীকার সংরক্ষণের বেলায় আল্লার বিধান ও রসুলের আদর্শ সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং সেই আদর্শের আমলী-জেন্দেগী তথা উক্ত আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিক মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভোট-গ্রহণ কার্য্য এই দৃষ্টির উপরই পরিচালিত করা হইয়াছে।

খোলাফা-রাশেদীনগণের যুগে ইস্‌লামের কেন্দ্রীয় স্থল ছিল মদিনা-মোনাওয়ারাহ্ এবং মদিনাবাসীদের মধ্যে উল্লেখিত যোগ্যতা সর্ব্বাধিক ছিল, তাই তাঁহাদের প্রতি সকল মোসলমানদের পূর্ণ আস্থা ছিল। সেই সূত্রেই তখন মদিনাবাসীদের ভোট বিশেষতঃ তাঁহাদের সর্ব্বাধিক আস্থাভাজন লোকদের ভোটের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে এবং মোসলমানগণ বিনা দ্বিধায় উহা গ্রহণ করিয়ানিয়াছে।

আবুবকরের খেলাফৎ কাল ঃ

এসম্পর্কে পূর্ণ হিসাব নির্দ্ধারণকারীদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে—কাহারও মতে ২ বৎসর ২ মাস ২৫ দিন, কাহারও মতে ২ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, কাহারও মতে ২ বৎসর ৪ মাস। মোট কথা দুই বৎসরের অধিক প্রায় আড়াই বৎসর কাল তিনি খেলাফৎ করিয়াছিলেন।

১৩শ হিজরী সনের জোমাদাল-ওখ্‌রা মাসের ২২ বা ২৩ তারিখে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬৩ বা ৬৫ বৎসর ছিল।

ওমর-ইবনুল-খাত্তাব (রাঃ)

১৮২৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন আমি একটি কূপের কিনারায় দাঁড়াইয়া চরখির সঙ্গে লট্‌কান্‌ ডোল দ্বারা কূপ হইতে পানি উঠাইতেছি। এমতাবস্থায় আবুবকর তথায় উপস্থিত হইল এবং সে ঐ ডোলটি আমার নিকট হইতে নিজ হাতে নিয়া পানি উঠাইল, (কিন্তু বেশী উঠাইতে পারিল না,) শুধু মাত্র এক বা দুই ডোল পানি সে উঠাইল--তাহাও অতি ধীরে মন্থর গতিতে। (কিন্তু এত কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত তিনি উহা উঠাইলেন যে, তদ্দারা) আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া (তাঁহার মর্ত্তবা বাড়াইয়া) দিবেন।

তারপর ওমর তথায় পৌঁছিল এবং ঐ ডোলটি তাহার হাতে লইল। ওমরের হাতে আসিয়া ডোলটি অতি বড় আকারের হইয়া গেল এবং ওমর বিদ্যুত গতিতে অতিশয় শক্তি, বল ও বিশেষ দক্ষতার সহিত পানি উঠাইতে লাগিল—ঐরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইতে পারে এমন কোন পারদর্শী মানুষই আমি দেখি নাই। ঐভাবে ওমর এত অধিক পানি উঠাইল যে, সকল মানুষ উহা পানে তৃপ্ত হইল এবং তাহাদের যানবাহন উটগুলিও পানি পানে তৃপ্ত হইয়া শুইয়া পড়িল।

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া খেলাফত-কার্য্য পরিচালনার কাল ও অবস্থা এই স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল। হযরত (দঃ) যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছিল। আবুবকরের খেলাফত কাল এক ও দুই বৎসর কাটিয়া পূর্ণ তিনের সংখ্যায় পৌঁছিতে পারে নাই এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তনও কোন উল্লেখযোগ্যরূপে সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই এবং হযরতের ইহজগত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের উপর শত্রুদের ভয়ানক আক্রমন আশঙ্কা এবং মোসলমানদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির দরুন এক

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। আবুবকর (রাঃ) ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত এমন বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সাথে ঐসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লার নিকট বড় মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা লাভের যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে খেলাফত আসিলে পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন অনেক বড় হইয়া যায় এবং বিদ্যুৎ গতিতে উহা সম্প্রসারিত হইতে থাকে। তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল খেলাফত চালাইয়া ছিলেন এবং সুযোগ-সুবিধা এমন পাইয়াছিলেন যে, অতিশয় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ আদল-ইন্‌সাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার মধ্যে আরাম উপভোগের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

১৮২৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ খাটের উপর রক্ষিত হইলে পর লোকজন উহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা তাঁহার জন্য দোয়া ও মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল; আমিও তাহাদের মধ্যেই ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন দিক হইতে আমার কাঁধে হাত রাখিল; ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি আলী (রাঃ)। তিনি ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর রহমত নাজিল হওয়ার দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল লইয়া আল্লার দরবারে হাজির হইবার আকাঙ্খা করিতে পারি ঐরূপ ব্যক্তি আপনার পরে আর কেহ নাই। কসম খোদার—আমি পূর্ব্ব হইতেই ধারণা করিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুদ্বয় রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গেই স্থান লাভ করিবেন। কারণ, আমি অধিক সময় হযরত (দঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি নিজের সঙ্গে আবুবকর ও আপনাকে জড়াইয়া কথা বলিতেন। যেমন—তিনি বলিতেন, আমি এবং আবুবকর ও ওমর যাইব, আমি এবং আবুবকর ও ওমর প্রবেশ করিব, আমি এবং আবুবকর ও ওমর বাহির হইব, ইত্যাদি।

১৮২৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)। তাঁহাদের অবস্থানে পাহাড়টি কম্পিত হইয়া উঠিল; তখন হযরত (দঃ) পায়ের দ্বারা উহাকে আঘাত করিয়া বলিলেন, হে ওহোদ! স্থির থাক। তোমার উপর একমাত্র নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ শ্রেণীর লোকই রহিয়াছেন। (শহীদ বলিতে ওমর এবং ওসমান (রাঃ) উদ্দেশ্য ছিলেন।)

১৮২৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে কায়েম হইবে? হযরত (দঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি

করিয়াছ ? সে ব্যক্তি আরজ করিল, উহার জন্য আমার নিকট বিশেষ কোন পুঁজি নাই, তবে আমি খাঁটিভাবে আমার অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের মহব্বত রাখি। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি যাঁহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তুমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে।

আনাছ (রাঃ) বলেন, হযরতের এই সুসংবাদ যে, তুমি যাহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তাহার সঙ্গ লাভ করিবে—ইহা দ্বারা আমরা এত সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছি যে, অন্য কোন কিছুতে আমরা তত সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি নাই।

আনাছ (রাঃ) আরও বলেন যে, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ রাখি এবং আবুবকর ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মহব্বত রাখি ; এই অছিলায় আশাকরি আমি তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে পারিব যদিও তাঁহাদের সমান আমল করিতে পারি নাই।

১৮২৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মত—বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁহারা নবী ত ছিলেন না, কিন্তু "মোহাদ্দাছ" ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক (এই যুগে) কেউ হইয়া থাকিলে ওমর হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ওহীর ন্যায় অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য ফেরেশতার আগমন, সাক্ষাৎ ও উপস্থিতি ব্যতিরেকে ফেরেশতার অন্য কোন প্রকার মধ্যস্থাতায় উর্দ্ধ জগতের কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে "মোহাদ্দাছ" বলা হয়। নবুয়তের মর্ত্তবা ইহার অনেক উর্দ্ধে, কারণ উহা (নবুয়ত) অকাট্য এবং নবীর সম্মুখে ফেরেশতার আগমন ও উপস্থিতি নবীর জন্য সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে হইয়া থাকে, অবশ্য মোহাদ্দাছ হওয়া কাশ্‌ফ্‌ ও এল্‌হাম প্রাপ্তির উর্দ্ধের মর্ত্তবা।

১৮৩০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার বকরি-দল চরাইতেছিল, হঠাৎ বাঘ আসিয়া উহা হইতে একটি বকরি ধরিয়া নিয়া গেল। লোকটি বাঘের পেছনে ধাওয়া করিল এবং উহার মুখ হইতে বকরিটি ছিনাইয়া নিল। তখন বাঘটি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, যেই দিন হিংস্র জন্তুর রাজত্ব চলিবে এবং আমরাই এই বকরিদের মুরব্বি হইয়া দাঁড়াইব সেইদিন কে ইহাকে আমাদের হইতে রক্ষা করিবে ?

ঘটনা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল (যে, বাঘ মানুষের ন্যায় কথা বলিয়াছে !) হযরত নবী (দঃ) তখন বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালা বাঘকেও বাকশক্তি দান করিতে পারেন—) ইহার প্রতি আমি ঈমান রাখি ও বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আবুবকর ও ওমর ইহার প্রতি ঈমান রাখে। (তাঁহাদের সম্পর্কে হযরতের পূর্ণ ভরসা

থাকায় তিনি নিজের পক্ষ হইতে এই কথা বলিয়া দিলেন,) অথচ তাঁহারা কেহই তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা—বাঘটি যেই সময়ের কথা বলিয়া ছিল সেই সময়টি কাহারও মতে কেয়ামতের নিকটিবর্ত্তী সময়—যখন নানাপ্রকার বিভিষিকাপূর্ণ হাল-অবস্থার দরুন মানুষ তুনিয়া এবং তুনিয়ার দৌলত ও সম্পদ হইতে বীতশ্রদ্ধ ও বৈরী ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। তখন এইসব পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কোনই মনোযোগ থাকিবে না, ফলে পশুপালকে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করিবে না।

১৮৩১। হাদীছঃ—মেছওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) আততায়ীর হস্তে খঞ্জর বিদ্ধ হইয়া ভীষণভাবে আহত হইলে পর ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, হে আমিরুল-মোমেনীন! যদি ইহাতে আপনার মৃত্যু হইয়াও যায় তবুও আপনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী এবং আপনি হযরতের ছোহবতের—সাহচর্য্যতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উত্তমরূপে আদায় করিয়াছেন এবং তাঁহার বিদায়কালে তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গেও সেইরূপে চলিয়াছেন এবং তাঁহার বিদায়কালেও তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের সঙ্গী সহচারীগণের সঙ্গেও আপনি সেইরূপেই চলিয়াছেন, এখম যদি আপনি তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তবে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিবেন যে, তাঁহারা সকলেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুরাগী রহিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তুমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যতা ও তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছ উহা আমার প্রতি করুণাময় আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ কৃপা ও দান ছিল। তদ্রূপই যাহা আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছ। আর আমার মধ্যে যেই অস্থিরতা দেখিতেছ তাহা হইতেছে তোমার এবং তোমার ন্যায় সর্ব্বসাধারণ লোকদের সম্পর্কে। (অর্থাৎ যাহাদের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। ওমর (রাঃ) ভয় করিতেছিলেন যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করিতে পারিয়াছিলাম কি না? এবং এসম্পর্কে আমি আল্লার দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া বসি না কি? এই ভয়ে তিনি এতই ভীত ছিলেন যে, তিনি বলেন,) তুনিয়া ভরা পরিমাণ স্বর্ণ আমার হইলে উহাও আমি ব্যয় করিয়া দিতাম আল্লার আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—সেই আজাব আমার চোখের সামনে আসিবার পূর্ব্বেই।

১৮৩২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম ; আমরা দেখিয়াছি, হযরত (দঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া চলিতেছিলেন।

খলীফা পদে ওমর (রাঃ) ঃ

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা নির্ব্বাচিত হইতে মোটেই কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল না। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যক্তিত্ব সমস্ত মোসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবধারিত ছিল। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত সুদীর্ঘ পরামর্শের দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করতঃ ওমর (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচন করার ঘোষণাটি অছিয়তরূপে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইন্তেকালের পর মোসলমাগণ বিনা দ্বিধায় তাঁহার অছিয়তকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার খেলাফতকাল ১০ বৎসর ৪ মাস ছিল (রওজাতুল-আহাব ২—৬৬) এবং হিঃ ২৩ সনে মহরম মাসের ১লা ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বা ৫৮ বা ৫৫ বা ৫৪ ছিল।

(রওজাতুল-আহবাব ২—৫১

ওসমান-ইবনে-আফ্‌ফান (রাঃ)

১৮৩৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের—সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টি স্থিরকৃত ছিল যে, আমরা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমকক্ষ কাহাকেও গণ্য করিতাম না, তাঁহার পরেই ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরেই ওসমান (রাঃ)। তাঁহার পর অন্যান্যদের সর্ব্বা সম্পর্কে কাহারও কোন মন্তব্য ছিল না। (ইহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর উক্তি।)

খলীফারূপে তাঁহার নির্ব্বাচন ঃ

১৮৩৪। হাদীছ ঃ আম্‌র্ ইবনে মাইমুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর (রাঃ) আততায়ীর হাতে আহত হইলে পর যখন তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল তখন তাঁহার কন্যা উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) কতিপয় মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ; আমরা পূর্ব্ব হইতে তথায় বসিয়াছিলাম ; তাঁহাদিগকে দেখিয়া অমরা তথা হইতে উঠিয়া গেলাম। তখন তাঁহারা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে আসিলেন এবং হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) কান্নাকাটা আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় এক দল পুরুষ তথায় উপস্থিত হওয়ার

অনুমতি চাহিল, সেমতে হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) আন্দর মহলে চলিয়া গেলেন ; আমরা পুরুষ দল ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলাম। আন্দর মহল হইতে হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার ক্রন্দন শব্দ শুনা যাইতেছিল। উপস্থিত লোকগণ সকলেই ওমর (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার জন্য। ওমর (রাঃ) বলিলেন, কতিপয় লোক যাঁহাদের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষরূপে সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—ঐ লোকগণের তুলনায় অন্য কাহাকেও আমি এই কাজের যোগ্য মনে করি না। এই বলিয়া তিনি আলী (রাঃ), ওসমান (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাস্ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আইফ (রাঃ)—ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করিলেন। আর (লোকদের অভিপ্রায়ের উত্তরে স্বীয় পুত্র সম্পর্কে) বলিলেন, আবদুল্লাহ-ইবনে-ওমর তোমাদের পরামর্শে উপস্থিত থাকিবে, কিন্তু খলীফা হওয়া সম্পর্কে তাহার কোনই সুযোগ থাকিবে না ; আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এতটুকু মাত্র সুযোগও শুধু তাঁহার মন রক্ষার্থে দিয়াছিলেন।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাস খলীফা নির্ব্বাচিত হন তবে ত ভালই, নতুবা যে-ই খলীফা নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে সায়া'দ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা। আমি যে, সায়া'দকে (কুফার গভর্ণর পদ হইতে) অপসারিত করিয়াছিলাম তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা বা খেয়ানত ও অসাধুতার কারণে করিয়াছিলাম না।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, আমার পরে যিনি খলীফা হইবেন তাঁহাকে আমি বিশেষরূপে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি যে, তিনি যেন ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার মোহাজের ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁহাদের ইজ্জত ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলেন। আর আমি তাঁহাকে আনছারগণ সম্পর্কেও বিশেষ অছিয়ত করিতেছি—যাঁহারা মোহাজেরগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এই মদিনা শহরে বসবাস করিতেছিলেন এবং এই দেশে ঈমান-ইসলামকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেই আনছারগণের ভাল কার্য্যাবলীর যেন কদর করা হয় এবং তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি যেন ক্ষমার চোখে দেখা হয়। আর আমি আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে এই অছিয়তও করিতেছি যে, তিনি যেন রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর-বন্দরের অধিবাসীদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। কারণ, ঐসব লোক হইতেছে ইসলামের সাহায্যকারী এবং (ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য) অর্থ সংগ্রহকারী এবং শত্রুদের চোখের কাঁটা। বিশেষরূপে তাহাদের সম্পর্কে খেয়াল রাখিবে যে, (রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়কালে) তাহাদের আবশ্যকাতিরিক্ত ধন না থাকিলে যেন তাহাদের

হইতে কিছু আদায় করা না হয় এবং আবশ্যকাতিরিক্ত ধন হইতেও যেন এইভাবে আদায় করা হয় যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, আমি আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে এই অছিয়তও করিতেছি, তিনি যেন পল্লী অঞ্চলের লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন ; আরবের পল্লীবাসীগণ হইতেছে আরবের মূল ও খাঁটী অধিবাসী এবং ইসলামের বিশেষ সাহায্যকারী। তাহাদের সামর্থবান লোকদের হইতে কিছু আদায় হইলে তাহা যেন তাহাদেরই গরীব দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয় করা হয়। আমি তাঁহাকে আরও অছিয়ত করিতেছি—আল্লাহ এবং আল্লার রসূলের (তথা শরীয়তের) বিধানমতে যাহাদের জান-মাল রক্ষার জিম্মাদারী লওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ নাগরিকত্ব প্রাপ্ত সংখ্যালঘু) তাহাদেরে নাগরীকত্বের সুযোগ-সুবিধা যেন পূর্ণরূপে প্রদান করা হয় এবং তাহাদের জান-মাল রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে এবং রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের বেলায় তাহাদের সহজ-সাধ্যের অতিরিক্ত তাহাদের উপর চাপানো যাইবে না।

তারপর যখন ওমর (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার মুরব্বিদ্বয়ের সঙ্গে দাফন করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার দাফন কার্য্য হইতে অবসর হইয়া পূর্ব্বোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) এই প্রস্তাব করিলেন যে, ছয় জনের মধ্যে একজন অপরজনকে স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করতঃ মূল বিষয়ের মীমাংসা তিন জনের উপর ন্যাস্ত করা হউক। সেমতে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা আলী (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম ; তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা ওসমান (রাঃ)কে অর্পণ বরিলাম ; সায়া'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা আবদুর রহমান (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম।

অতঃপর আবদুর রহমান (রাঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে আলী ও ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যিনি রাষ্ট্র নায়ক হইবেন না বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারেন ! আমরা তাঁহাকেই রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করিব ; তিনি শপথ করিবেন যে, তিনি অবশ্য মহান আল্লাহ এবং ইসলামের দৃষ্টি-তলে থাকিয়া নিজেদের মধ্যে তাহার বিবেচনা অনুযায়ী প্রকৃত সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবেন।

ওসমান ও আলী (রাঃ) উভয়েই এই প্রশ্নের উত্তরে চুপ রহিলেন। তখন আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমি নিজে রাষ্ট্রনায়ক হইব না বলিয়া স্বীকৃতি দিতেছি—এই শর্ত্তে আপনারা আমাকে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিতে পারেন কি ? আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমাদের মধ্য হইতে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। ওসমান ও আলী (রাঃ) এই কথার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন।

*খলীফা নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ যখন আবদুর রহমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর অর্পিত হইল তখন (হইতে তিন রাত্র) সকল লোকই নিজ নিজ বক্তব্য, পরামর্শ ও ধারণা-খেয়াল তাঁহারই নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিল। এই অবস্থায়ই ঐ রাত্র কয়টি অতিবাহিত হইল। এমনকি যেই রাত্রের ভোরবেলা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইল—ঐ রাত্রে আবদুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মেস্ওয়ার ইবনে মাখ্রামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে আসিলেন। মেস্ওয়ার (রাঃ) বলেন, তিনি আমার বাড়ী উপস্থিত হইয়া গৃহ দ্বারে করাঘাত করিলেন ; আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া গেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি ত নিদ্রায় আছেন ! আমি কিন্তু খোদার কসম—এই রাত্র কয়টিতে বিশেষ নিদ্রা যাইতে পারি নাই। এই বলিয়া যোবায়ের (রাঃ) এবং সায়া'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আনার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাদেরকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে গভীর রাত পর্য্যন্ত গোপন আলাপ করিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ) আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন ; তাঁহার ধারণা হইতেছিল, হয়ত তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন। আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু আশঙ্কা করিতেছিলন (যে, তিনি অন্য কাউকে খলীফা স্বীকার করিবেন কি-না।) অতঃপর আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে আদেশ করিলেন, ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার জন্য। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম, তিনি তাঁহার সঙ্গেও গোপন আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং ফজরের নামাযের আজান হওয়া পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা করিলেন।

ফজরের নামায শেষ হইলে পর পূর্ব্বোল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—ছয়জন মিম্বারের নিকট একত্রিত হইয়া বসিলেন এবং মদিনায় উপস্থিত সকল মোহাজের ও আনছারগণের নিকট উপস্থিতির জন্য সংবাদ দিলেন। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন এলাকার গভর্ণরগণকেও সংবাদ পাঠাইলেন, তাহারা সকলেই এইবার হজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায়ই ছিলেন।

যখন সকলে একত্রিত হইল তখন আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ)কে হাত ধরিয়া নির্জ্জনে নিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আপনার নিকটতম আত্মীয়তা রহিয়াছে এবং আপনি যে কত আগে ইসলামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও আমি অবগত আছি, সেমতে

---

* এখান হইতে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হইল তাহা বোখারী শরীফ ১০৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কীয় অন্য একটি রেওয়ায়াতের অনুবাদ।

আপনি আল্লাকে নিজের উপর সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করুন যে, যদি আমি আপনাকে খলীফা নির্ব্বাচিত করি তবে নিশ্চয় আপনি আদল-ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়নতার উপর সুদৃঢ় থাকিবেন এবং যদি ওসমান (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচিত করি তবে নিশ্চয় আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিবেন এবং মানিয়া নিবেন।

তারপর আবদুর রহমান (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে নির্জ্জনে নিয়া তাঁহাকেও ঐরূপ বলিলেন। এইভাবে আবদুর রহমান (রাঃ) উভয় হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কলেমা-শাহাদৎ পাঠ পূর্ব্বক ভাষণ দান আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আলী! আমি সর্ব্বসাধারণের অভিমত তলাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমি ইহাই দেখিয়াছি যে, তাহারা (খেলাফতের জন্য) ওসমানকেই সকলের উপর স্থান দিয়া থাকে, অন্য কাউকে এই ব্যাপারে তাঁহার সমতুল্য মনে করে না। অতএব আপনি মনের মধ্যে অন্য কোন ভাবধারার অবকাশ দিবেন না; এই বলিয়া আবদুর রহমান (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খলীফা-রূপে স্বীকৃতি দান স্বরূপ আমি আপনার হাতে বায়য়া'ত করিতেছি। আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আপনি আল্লার এবং আল্লার রসূলের এবং তাঁহার উভয় খলীফার অনুসরণে দৃঢ়পদ থাকিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল মোহাজের, আনসার, গভর্ণর ও সাধারণ মোসলমানগণ এক বাক্যে খলীফারূপে তাঁহার হাতে বায়য়া'ত করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদিনার সকল লোকই মসজিদে প্রবেশ করিয়া বায়য়া'ত করিলেন।*

১৮৩৫। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী (রঃ) বলেন, মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনুল আছওয়াদ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, কোন্ বাধার কারণে আপনি খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা ওলীদ সম্পর্কে কথা বলেন না? লোকেরা তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে।

ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইতি মধ্যে খলীফা ওসমান (রাঃ) যখন নামায পড়িতে যাইতে ছিলেন তখন আমি তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইলাম এবং বলিলাম, আপনার নিকট আমার একটি আবশ্যক আছে, যাহা আপনারই হিত সম্পর্কে। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, দেখ মিঞা! আমি তোমা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

---

* খলীফারূপে ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন যে কিরূপ গণপ্রিয় ও পাক-পবিত্র ছিল উহার বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বোখারী শরীফ শেষ খণ্ড তথা ৭ম খণ্ডের পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে। খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির যে জঘন্য মিথ্যা অপবাদের গুজব সমাজের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে—ইতিহাসের মাধ্যমে উহা খণ্ডনে উক্ত ১০০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট সঙ্কলিত হইয়াছে।

এতদশ্রবণে আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং নামায পড়িতে গেলাম। নামাযান্তে আমি তাঁহাদের নিকট গেলাম যাঁহারা আমাকে খলীফা ওসমানের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার কথা এবং খলীফা ওসমানের উত্তরও শুনাইলাম। তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি আপনার কর্ত্তব্য আদায় করিয়াছেন।

আমি তাঁহাদের সহিত বসিয়াই ছিলাম—ইতি মধ্যেই খলীফা ওসমানের পেয়াদা আমার নিকট পৌঁছিল। আমি খলীফা ওসমানের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে হিতের কথা বলিতে চাহিয়াছিলে সেই কথাটা কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য দ্বীনের বাহকরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ডাকে সাড়া দানকারীদের একজন। আপনি দ্বীনের জন্য হাব্‌সা ও মদিনা উভয়ের হিজরত করিয়াছেন। আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন; হযতের রীতি-নীতি আপনি দেখিয়াছেন। ওলীদ সম্পর্কে লোকেরা নানা রকম কথা বলিতেছে; আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাহার শাস্তি-বিধান করা।

ওবায়দুল্লাহ বলেন, ওসমান (রাঃ) আমাকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না; তবে হযরতের প্রচারিত এল্‌ম ও জ্ঞান যাহা সকলের নিকটই পৌঁছিয়া থাকে আমার নিকটও পৌঁছিয়াছে। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য ধর্ম্মের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ডাকে সাড়া দানকারীদের একজন ছিলাম। আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে নিয়া আসিয়া ছিলেন আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলাম এবং আমি দ্বীনের খাতিরে দুইবার হিজরত করিয়াছি—যেরূপ তুমি বর্ণনা করিয়াছ। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহ্‌বত ও সাহচর্য্য লাভ করিয়াছি। হযরতের হাতে বায়য়াত বা জীবন-পণ গ্রহণ করিয়াছি। খোদার কসম—হযরতের নিকট অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকারের বরখেলাফ কোন কাজ কখনও করি নাই। হযরত (দঃ)কে কখনও কোন ধোকা বা ফাঁকি দেই নাই। হযরতের ইহজীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সম্পর্কই বজায় রাখিয়াছি। তাঁহার পর খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও ঐরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি। তাঁহার পর খলীফা ওমরের সঙ্গেও তদ্রূপই। অতঃপর আমাকে খলীফারূপে বরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী খলীফাদের সহিত আমি এবং আমরা সকলে যেরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি—আমি কি তোমাদের হইতে ঐরূপ সম্পর্কের অধিকারী ও হক্‌দার নহি?

ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমি বলিলাম—নিশ্চয়। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তবে তোমাদের পক্ষ হইতে এই সব নানা রকমের কথাবার্ত্তা আমার বিরুদ্ধে হয় কেন—যাহা আমি শুনিয়া থাকি ? ওলীদ সম্পর্কে তুমি যাহা উল্লেখ করিয়াছ ইনশা-আল্লাহ অনতিবিলম্বেই আমি সে সম্পর্কে সঠিক পন্থা অবলম্বন করিতেছি। তারপর আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং ওলীদকে বেত্রদণ্ডের আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা :—৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি তথা মদ্য পানের শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ ও মোহাদ্দেছগণের মতে ৪০ বেত্রাঘাতের উপর ক্ষান্ত করা হইয়াছিল—যেরূপ বোখারী শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। আর অনেকের মতে ৮০ বেত্রদণ্ডই পূর্ণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বিরতির সহিত। কিম্বা একত্র দুইটি বেত্রের আঘাত ছিল, যদ্দরুন প্রকাশ্য সংখ্যা চল্লিশ ছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ওলীদ ইবনে ওক্‌বা (রাঃ) একজন ছাহাবী ছিলেন। তিনি ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিয়োজিত কুফার গভর্ণর ছিলেন। কুফার কতিপয় দুষ্কৃতিকারী তাঁহার বিরুদ্ধে মদ্য পানের মিথ্যা অপবাদ এমনভাবে সাজাইয়াছিল এবং ছড়াইয়া ছিলা যে, মিথ্যা অপবাদটাই অনেক ভাল লোকের নিকটও উহা সত্য বলিয়া মনে হইল ; অথচ ঘটনা মিথ্যা ছিল। যেমন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নামে মোনাফেকগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত মিথ্যা অপবাদ হাস্‌সান (রাঃ) হামনা (রাঃ), এমনকি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘনিষ্ট আত্মীয় মেসতাহ্ (রাঃ)ও সত্য সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছিলেন। সর্ব্বপরি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও মহা ইতস্ততের মধ্যে দীর্ঘ একমাস কাল কাটিয়াছিলেন। এমনকি আয়েশা(রাঃ)কে ত্যাগ করার বিষয়ে চিন্তা এবং পরামার্শ গ্রহণ করিতে ছিলেন। আলী (রাঃ) আয়েশাকে ত্যাগ করার পক্ষে ইঙ্গিত দিয়া ছিলেন। যদি আকাট্য কোরআনের সুদীর্ঘ ওহী দ্বারা ঘটনার সমাপ্তি না হইত তবে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগ্যে কি ঘটিত তাহা বোখারী শরীফের হাদীছেই আভাস পাওয়া যায় (হাদীছটি সম্মুখেই আয়েশার আলোচনায় অনুদিত হইবে)। অথচ ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন ছিল।

তদ্রূপই ওলীদ-ইবনে-ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনায়ও মিথ্যা সাজানো এবং প্রচারণার দ্বারা ঐরূপ আকার ধারণ করা বিচিত্র নহে। যদ্দরুণ অনেক ছাহাবী ঘটনাকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছিলেন এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক ইতিহাসেও ঐ ঘটনা স্থান লাভ করিয়াছে। যাহার প্রভাবে অনেক ব্যাখ্যাকার মোহাদ্দেছও ঘটনাকে সত্য আকারেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা সাক্ষীও এমনভাবে গড়াইয়াছিল, ঘটনাকে আইনগত রূপ দানেও তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দুষ্কৃতিকারীরা আরও একটি জঘন্যতম এবং ঘৃণিত উদ্দেশ্যের মূলধনও

এই ঘটনা দ্বারা কুড়াইতে ছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) খলীফা ওসমানের দুর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। মোসলেম জাতির শত্রু মোনাফেক শ্রেণীর একটি সুসংঘবদ্ধ দলের ক্রীড়নকরা খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির ধুয়া উড়াইতে ছিল; তাহারা এই ঘটনা দ্বারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার সুযোগ নিতে ছিল। যদ্দরুন খলীফা ওসমান (রাঃ) অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন; নামাযে যাওয়ার পথে ঐরূপ একটি বিরক্তিকর গুজবের প্রতিই খলীফা ওসমান (রাঃ) অসন্তুষ্টি ও অনিহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। অভিযোগ শুনিবার প্রতি মুলতঃ তাঁহার বৈরীভাব ছিল না, তাই নামায হইতে অবসর হইয়াই অভিযোগ শুনিবার জন্য অভিযোগকারীকে খবর দিয়া আনিলেন। এই ঘটনার সর্ব্বময় বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পাঠক! বোখারী শরীফের আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম শুধু এতটুকু যে, খলীফা ওসমানের নিকট ওলীদের নামে একটি মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল। সেই মকদ্দমার চূড়ান্ত ফয়ছালায় বিলম্ব হইতেছে ভাবিয়া অনেকের পক্ষ হইতে খলীফার নিকট ওলীদের শাস্তি দাবী করা হইলে খলীফা তাঁহার শাস্তি বিধান করেন।

বোখারী শরীফের হাদীছের এই বর্ণনাটুকু সত্য—ইহাতে অবাস্তব ও অসত্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু ঐ মকদ্দমা সত্য কি মিথ্যা ছিল? মিথ্যা হইলে কি সূত্রে খলীফা উহার উপর শাস্তি দিলেন তাহা ভিন্ন বিষয়। উহারই বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিবেন। মকদ্দমা মিথ্যা ছিল এবং উহার উপর শাস্তি বিধানের হেতু ছিল—এই সব বিষয় বোখারী শরীফের হাদীছের আওতাভুক্ত নহে।

খলীফা ওসমানের খেলাফতকাল প্রায় ১২ বৎসর ছিল। তিনি হিজরী ৩৫ সনে জিলহজ্জ মাসের ১৩ বা ১৮ তারিখে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৯ বা ৯০ বৎসর ছিল। (তারীখুল-খোলাফা ১২৫)

খলীফাতুল-মোছলেমীন আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু

তাঁহার উপনাম ছিল "আবুল হাসান"। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতদুর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, তুমি আমার অঙ্গ স্বরূপ এবং আমি তোমার অঙ্গ স্বরূপ।

ওমর (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮৩৬। হাদীছ ঃ—এক ব্যক্তি সাহ্ল ইবনে সায়া'দ রাজিয়াল্লাহুর নিকট আসিয়া মদিনার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সম্পর্কে বর্ণনা করিল যে, সে মিম্বারে দাঁড়াইয়া আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর কুৎসা করিয়া থাকে। সাহ্ল (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করিলেন, সে কি বলিয়া থাকে? লোকটি বলিল, সে তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে, "আবু তোরাব"। (যাহার অর্থ "মাটি মাখা" ব্যক্তি।)

এতচ্ছ্রবনে সাহ্‌ল (রাঃ) হাঁসিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার ("আবু তোরাব" নাম কি কটাক্ষ করার বস্তু?) এই নাম ত স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক স্নেহভরে উচ্চারিত নাম এবং আলীর নিকটও এই নামটি সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল।

অতঃপর তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান পূর্ব্বক বলিলেন, একদা আলী (রাঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হইতে (রাগান্বিত হইয়া) বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং মসজিদে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে নবী (দঃ) ফাতেমার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং আলী (রাঃ)কে খোঁজ করিলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তিনি মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত নবী (দঃ) মসজিদে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার পিঠ হইতে চাদরখানা হটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পিঠে মাটি লাগিয়া রহিয়াছে। এতদৃষ্টে হযরত (দঃ) তাঁহার পিঠ হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আদর ও সোহাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে "আবু তোরাব"! (ঘুম হইতে) উঠ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলী (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অত্যাধিক নৈকট্য ও ভালবাসার অধিকারী ছিলেন। এমনকি নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি যাহার ভালবাসার হইব আলীও তাহার ভালবাসার হইবে (তিরমিজী শঃ)।

আবুবকর, ওমর এবং ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমেরও পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই নবী (দঃ)-এর প্রতিপালনে ছিলেন।

ফাতেমা (রাঃ), হাসান ও হোসায়ন (রাঃ) এবং আলী (রাঃ)কে নবী (দঃ) নিজ পরিবার বলিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট চিহ্নিত করিয়াছিলেন। (মোসলেম শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোনাফেক ব্যক্তিই আলীকে ভালবাসিবে না এবং কোন মোমেন আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। (তিরমিজী শরীফ)

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিবে সে যেন আমাকে গালি দিল। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন—"আয় আল্লাহ! আমাকে যে বন্ধু বানাইবে আলীকেও তাহার বন্ধু বানাইতে হইবে। আয় আল্লাহ! যে আলীকে ভালবাসিবে তুমি তাহাকে ভালবাসিও; যে আলীর শত্রু হইবে তুমি তাহার শত্রু হইও।" (ঐ)

খায়বর-জেহাদে চূড়ান্ত বিজয় অভিযানের পতাকা দান উপলক্ষে নবী (দঃ) এক মহাসৌভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র আলী (রাঃ)কে বানাইয়াছিলেন যে—"আল্লাহ এবং আল্লার রসূল তাঁহাকে ভালবাসেন। (তৃতীয় খণ্ড খায়বর জেহাদ দ্রষ্টব্য)

তবে মেশকাত শরীফে স্বয়ং আলী (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ আছে। আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সম্পর্কে (পয়গাম্বর) ঈসার একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা হইবে। তাঁহার প্রতি ইহুদী জাতির বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল এমনকি তাহারা (তাঁহার সম্পর্কে) তাঁহার মাতার প্রতি মিথ্যা গ্লানি করিয়াছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা তাঁহাকে এত উর্দ্ধে উঠাইয়াছে যত উর্দ্ধের তিনি নহেন। আলী (রাঃ) বলেন—আমার সম্পর্কেও দুই শ্রেণীর মানুষ ধ্বংস হইবে। এক শ্রেণী অতিরিক্ত মহব্বতের দাবীদার—আমার এমন মর্ত্তবা বয়ান করিবে যাহা আমার নাই। আর এক শ্রেণী আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষনকারী; আমার প্রতি বিদ্বেষের দরুন আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে (৫৬৫ পৃঃ)।

আলী (রাঃ) সম্পর্কে আমাদের তথা আহ্‌লে-সুন্নতের আকিদা এই যে, তিনি চতুর্থ খলীফা-রাশেদ-বরহক্ব। তাঁহার খেলাফতকাল প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)—এই তিন জনের পরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনি।

অবশ্য যে সব ছাহাবী বা ছাহাবীদের অনুসারীগণ তাঁহার সঙ্গে মতবিরোধ করিয়াছেন– যেমন, আশারা-মোবাশ্‌শারা তথা আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশত লাভের ঘোষণাপ্রাপ্ত দশ জনের দুই জন—যোবায়ের (রাঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) এবং নবীজীর প্রিয়তমা মোসলেম-জননী আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের অনুসারী বহু সংখ্যক ছাহাবী ও তাবেয়ী। তাঁহাদের সম্পর্কে আমরা খারাব ধারণা পোষণ করিতে পারিব না, নিন্দা-মন্দ বা দোষ-চর্চ্চার সমালোচনা মোটেই করিতে পারিব না। ঐরূপ ধারণা পোষণ বা সমালোচনা করা হইলে তাহা মস্ত বড় গোনাহ হইবে। ইহা ছাহাবীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ দ্বারা উহার প্রামাণিক আলোচনা এই অধ্যায়ের আরম্ভে করা হইয়াছে।

জা'ফর রাজিয়াল্লাহু আনহু

নবী(দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন, আকৃতি ও চরিত্রগুণে তুমি আমার অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৩৭। হাদীছঃ- আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকগণ অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ বেশী বয়ান করে। (আমার হাদীছ বেশী বয়ান করার কারণ এই যে,) আমি ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং চাকর চাকরাণী রাখার সামর্থবান হওয়ার পূর্ব্বে কোন প্রকারে পেট পুরিবার ব্যবস্থা হইলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিতাম। (তাই আমি হাদীছ শুনিবার ও স্মরণ রাখিবার সুযোগ পাইয়াছি অধিক।) আমি কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় কাঁকরময় জমিনের সঙ্গে পেটকে চাপা দিয়া থাকিতাম। কোন

কোন সময় আমি অন্য লোকদের নিকট কোরআনের কোন আয়াত জিজ্ঞাসা করিতাম এই উদ্দেশ্য যে, হয়ত এই অছিলায় কেহ আমাকে তাহার বাড়ী নিয়া খানা খাওয়াইয়া দিবে, নতুবা আমি পূর্ব্ব হইতেই উক্ত আয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।

ঐ সময় দেখিয়াছি, গরীব-মিছকীনদের পক্ষে সর্ব্বাধিক উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জা'ফর ইবনে আবু তালেব। তিনি আমার ন্যায় দরিদ্রগণকে স্বীয় গৃহে নিয়া যাইতেন এবং যাহা কিছু তৈয়ার থাকিত খাওয়াইয়া দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তাঁহার গৃহে খাবার কিছু থাকিত না তখন ঘৃত রাখিবার ছোট মশক যাহার মধ্যে ঘৃত শুধু পাত্রের সঙ্গে লাগিয়া থাকার পরিমাণই থাকিত; তিনি উহাকে ফাড়িয়া ছিন্ন করতঃ আমাদের সম্মুখে রাখিতেন আমরা উহার ঘৃত চাটিয়া খাইতাম।

জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফজিলত বর্ণনায় একখানা বিশেষ হাদীছ তৃতীয় খণ্ডে "মূতার জেহাদ" বিবরণে দ্রষ্টব্য।

আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু

১৮৩৮। **হাদীছঃ**– আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিলে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা "এস্‌তেস্‌কা" তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাইতেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বলিয়া ফ'রিয়াদ করিতেন—হে আল্লাহ! পূর্ব্বে আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অছিলায় বৃষ্টি চাহিতাম, তুমি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিতে; এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় তোমার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি; তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। এইরূপ দোয়ার ফলে লোকগণ বৃষ্টি লাভ করিত।

ফাতেমা (রাঃ) এবং আহ্‌লে-বাইত

নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তবাসীনী রমণীগণের সর্দ্দার হইবে ফাতেমা।

১৮৩৯। **হাদীছঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবুবকর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, (হে মোসলমানগণ!) তোমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ প্রকাশ কর তাঁহার আহ্‌লে-বাইত তথা তাঁহার পরিজনবর্গকে শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ করিয়া।

১৮৪০। **হাদীছঃ**—عن مسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ
أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي -

অর্থ—মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফাতেমা আমার (কলিজার) টুক্‌রা ; যে কেহ তাহাকে (বিরক্ত করিয়া) রাগাম্বিত করিবে সে বস্তুতঃ আমাকে রাগাম্বিত করিবে।

হাসান ও হোসাইন (রাঃ)

১৮৪১। **হাদীছ ঃ**—আবু বক্‌রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) মসজিদের মধ্যে মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, (বালক) হাসান (রাঃ) তাঁহার পার্শে বসিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) একবার লোকদের প্রতি তাকাইতেন, আর এক বার হাসানের প্রতি তাকাইতেন ; এই অবস্থায় আমি হযরত (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি হাসানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আমার এই দৌহিত্র ছাইয়্যেদ—সর্দ্দার বা শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা লাভকারী হইবে এবং আশা করা যায় (কোন এক সঙ্কটাপূর্ণ সময়) তাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের দুইটি পরস্পর বিরোধী দলের মিমাংসা ও শান্তি স্থাপন করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা—এস্থলে হযরত (দঃ) হাসান (রাঃ) সম্পর্কে দুইটি ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন ; উভয় ভবিষ্যদ্বানীই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ীত হইয়াছে। হাসান (রাঃ) দুনিয়াতেও মোসলেম জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্ব-মোসলেম তাঁহাকে এই মর্য্যদার সহিতই স্মরণ করিবে, এমনকি বেহেশতের মধ্যেও তাঁহার এই মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে। হযরত নবী (দঃ)ই বলিয়াছেন— الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة "যুবক শ্রেণীর জান্নাতবাসীদের সর্দ্দার হইবে হাসান ও হোসাইন।" মনে হয়—হযরতের এই উক্তি হইতেই "ছাইয়্যেদ" পদবীর সুত্রপাত। হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধরকে "ছাইয়্যেদ" বলা হইয়া থাকে ; ছাইয়্যেদ অর্থ সর্দ্দার বা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বানীও বাস্তবায়ীত হইয়াছিল যখন মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থনকারীদের দল এবং হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থনকারীদের দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঘনঘটা মাথার উপর আসিয়া গিয়াছিল তখন সেই বিরোধের মিমাংসা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ত্যাগ ও উদারতার অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৪২। **হাদীছ ঃ**—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে এবং হাসান (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া থাকিতেন, اللهم انى احبهما فاحبهما "হে আল্লাহ! আমি এই দুই জনকে মহব্বৎ করিয়া থাকি তুমিও তাহাদেরকে মহব্বৎ কর।

১৮৪৩। **হাদীছ**ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাঁধের উপর (বালক) হাসান (রাঃ) ছিলেন। নবী (দঃ) তখন বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি ইহাকে মহব্বৎ করি তুমিও তাহাকে মহব্বৎ কর।

১৮৪৪। **হাদীছ**ঃ—ওক্‌বা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, একদা আবুবকর (রাঃ) (বালক) হাসানকে কোলে উঠাইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই হাসানের আকৃতি হযরত নবী (দঃ)-এর আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আলীর আকৃতির সঙ্গে ততটা নহে। আলী (রাঃ) তথায়ই ছিলেন, তিনি হাসিতে ছিলেন।

১৮৪৫। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় আর কেহই ছিলেন না।

১৮৪৬। **হাদীছ**ঃ—একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ)কে এই মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিল যে, (হজ্জ বা ওমরার এহ্‌রাম অবস্থায় মাছি মারিয়া ফেলিলে কি হইবে? জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি ইরাকবাসী ছিল—যেই দেশের কারবালা ময়দানে ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে শহীদ করা হইয়াছিল। সেই ঘটনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইরাক বাসীগণ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৌহিত্রকে খুন করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, এখন তাহারা মাছি মারা সম্পর্কে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করে! অথচ হযরত নবী (দঃ) স্বীয় দৌহিত্রদ্বয় (হাসান ও হোসাইন) সম্পর্কে বলিয়াছেন, দুনিয়ার চিজ-বস্তুর মধ্যে আমার জন্য এই দুইটি হইল ফুল স্বরূপ।

বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

১৮৪৭। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবুবকর (রাঃ) আমাদের সর্দ্দার এবং তিনি আমাদের আর এক সর্দ্দারকে আজাদ বা মুক্ত করিয়াছেন; এই দ্বিতীয় সর্দ্দার ছিলেন বেলাল (রাঃ)।

ব্যাখ্যা—বেলালের এই সৌভাগ্য যে, আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেলাল (রাঃ)কে নিজেদের সর্দ্দার বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকিতেন।

১৮৪৮। **হাদীছ**ঃ—কায়ছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (নবীজীর তিরোধানের পর) বেলাল (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাকে আপনার নিজের জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন তবে আমাকে আপনার নিকট থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন। আর যদি আল্লার ওয়াস্তে আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন তবে আমাকে

আল্লার রাস্তায় কাজ করার জন্য ছাড়িয়া দেন (কোথাও জেহাদে আত্মনিয়োগ করিব। কারণ, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) বিহীন মদিনায় অবস্থান করিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর স্থানকে শূন্য দেখা আমার পক্ষে সহনীয় নহে।)

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের পর বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর শোকের প্রতিক্রিয়া এত অধিক হইল যে, মদিনায় অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িল। তিনি মদিনা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত আবদার আবুবকর (রাঃ)কে জানাইলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) বেলালকে ছাড়িতে রাজী হইলেন না। বেলাল (রাঃ)কে আবুবকর (রাঃ) আল্লার ওয়াস্তে ক্রয় করিয়াই মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, বেলাল মুক্তই ছিলেন, কিন্তু বেলাল (রাঃ) নিজ হইতেই আবুবকর (রাঃ)কে স্বীয় মনীবের ন্যায়ই গণ্য করিতেন। সেমতে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হায়াত পর্য্যন্ত বেলাল (রাঃ) মদিনায় অবস্থান করিতেই বাধ্য হইলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পর আর বেলালের পক্ষে মদিনায় অবস্থান সহনীয় হইল না। অবশেষে খলীফা ওমর (রাঃ) বাধ্য হইয়া বেলালকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন। বেলাল (রাঃ) সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

১৮৪৯। **হাদীছঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী (দঃ) আমাকে তাঁহার বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া এই দোয়া করিলেন— اللهم علمه الحكمة — اللهم علمه الكتاب। "আয় আল্লাহ! ইহাকে "হেকমত" তথা সঠিক সত্যের জ্ঞান দান কর, ইহাকে তোমার কেতাব (কোরআনের) জ্ঞান দান কর। ইমাম বোখারী (রাঃ) বলেন, "হেকমত" অর্থ সর্ব্ব বিষয়ে সঠিক নির্ভুল জ্ঞান।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)

১৮৫০। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন হযরত নবী (দঃ) অতিশয় সুচরিত্র, কোমল স্বভাব, সদাচারী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার চরিত্র অধিক উত্তম সেই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কোরআন শরীফ চার জনের নিকট হইতে হাসিল করার চেষ্টা কর—(১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, (২) সালেম, (৩) উবাই-ইবনে কায়া'ব, (৪) মোয়াজ ইবনে জাবাল।

১৮৫১। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বিশিষ্ট ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ)কে বলিলাম, এমন ব্যক্তির সন্ধান আমাদিগকে দান করুন যে ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বভাব চরিত্র ও চাল-চলনের সর্ব্বাধিক নিকটতম ; আমরা তাঁহার হইতে শিক্ষা লাভ করিব। হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় কাউকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ও আদত-অভ্যাসের নিকটতম দেখি না।

১৮৫২। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশয়া'রী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মদিনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গের লোক বলিয়া ধারণা করিতাম। তিনি এবং তাঁহার মাতা হযরতের গৃহে অত্যধিক আসা-যাওয়া করিতেন।

খাদিজাতুল্ কোব্রা (রাঃ)

১৮৫৩। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইস্রায়ীল উম্মতের সর্ব্বোত্তম নারী ছিলেন মরয়্যাম এবং (বিশ্ব জোড়া সর্ব্বোত্তম উম্মত—) আমার উম্মতের সর্ব্বোত্তম নারী খাদীজা।

১৮৫৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্য হইতে কাহারও প্রতি আমি ততদূর গায়রত (নিজকে তাহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করি নাই যতদূর গায়রত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি অনুভব করিয়াছি। অথচ আমার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছিল ; এমনকি আমি হযরতের সংস্পর্শ ও সহচার্য্যতায় আসিয়াছিলাম বিবি খাদিজার মৃত্যুর দীর্ঘ তিন বৎসরকাল পরে। এতদসত্বেও তাঁহার প্রতি গায়রত অনুভবের কারণ এই ছিল যে, হযরত নবী (দঃ) তাঁহার স্মরণ ও আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন। (হযরত (দঃ) বলিয়াছেন,) আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে একদা আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন খাদিজাকে সুসংবাদ জ্ঞাত করেন, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের যাহা একটি মাত্র শূন্য-গর্ভ মতি দ্বারা তৈরী হইবে।

হযরত (দঃ) অনেক সময় এক একটি বকরি জবাই করিয়া উহা বণ্টন করতঃ খাদিজার বান্ধবীগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়া থাকিতেন।

কোন কোন সময় আমি (বিরক্তির স্বরে) হযরত (দঃ)কে বলিতাম, মনে হয়— সারা জগতে খাদিজা ভিন্ন কোন নারী ছিলই না ! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিতেন,

হে আয়েশা ! আমি তাহাকে ভুলিতে পারি না (এবং পুনঃ পুনঃ খাদিজার প্রশংসা করিয়া বলিতেন,) সে এরূপ ছিল, সে এরূপ ছিল। একমাত্র তাহারই পক্ষে আমার সন্তানাদিও রহিয়াছে।

১৮৫৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) খাদিজা (রাঃ)কে সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়াছেন বেহেশতের মধ্যে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের যাহা একটি মাত্র শূন্য-গর্ভ মতির তৈরী হইবে এবং ইহা অতি নীরব-নিরালা বিশেষ আরাম-আয়েশপূর্ণ শান্তি-নিকেতন হইবে।

১৮৫৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা জিব্রায়ীল (আঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! খাদিজা একটি পাত্রে আপনার জন্য পানাহার বস্তু নিয়া আসিতেছেন; তিনি আপনার নিকট পৌঁছিলে তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম জানাইবেন এবং বেহেশতের মধ্যে শূন্য-গর্ভ এক মতির তৈরী একটি বিশেষ সুরম্য অট্টালিকা লাভের সুসংবাদ জানাইবেন যাহা নীরব-নিরালা শান্তি-নিকেতন হইবে।

আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সোহাগ করিয়া নাম সংক্ষেপ আকারে উচ্চারণ করতঃ) বলিলেন, হে আ'য়েশ ! আমাদের নিকটে ফেরেশতা জিব্রায়ীল আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে সালাম করিতেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তদুত্তরে বলিলাম, "আ'লাইকা অ-আ'লাইহেচ্ছালাম্ অ-রাহ্‌মাতুহু অ-বারাকতুহু—আপনার প্রতি এবং তাঁহার প্রতি (আমার পক্ষ হইতেও) সালাম, আল্লার রহমতের দোয়া এবং মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা। আমরা যাহা দেখিতে পাই না আপনি তাহা দেখিতেছেন। (যেমন জিব্রায়ীলকে আমরা দেখিতেছি না। আপনি দেখিতেছেন।)

১৮৫৭ হাদীছ ঃ— আবু মুছা আশয়া'রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেক লোকই হইয়াছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে ঐরূপ হইয়াছে শুধু এম্‌রানের কন্যা (হযরত ঈসার মাতা) মরয়্যাম, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া এবং আয়েশা—যাঁহার মর্ত্তবা নারী জাতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চে।

১৮৫৮। হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি, নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্ত্তবা সর্ব্বোচ্চ যেরূপ (আরব দেশে) খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদ" নামীয় খাদ্যের মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক।

বিবি আয়েশার প্রতি অপবাদ এবং আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক উহার খণ্ডন :

১৮৫৯। হাদীছ :- (৫৯৩পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিয়ম ছিল—ছফরে কোন বিবিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য তিনি লটারির ব্যবস্থা করিতেন। লটারিতে যাহার নাম আসিত তাহাকেই তিনি সঙ্গে নিতেন। সেমতে এক জেহাদের ছফরে লটারি করা হইলে আমার নাম আসিল ; আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গীনী হইলাম। এই সময় ইসলামে পর্দার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি উটের পৃষ্ঠে পর্দা আবৃত আসনে বসিতাম ; বিশ্রামকালের অবতরণে উহার ভিতরে রাখিয়াই সেবকগণ আমাকে ঐ আসন সহ অবতরণ করাইত এবং আরোহণ করাইত। এইভাবেই আমাদের ছফর কাটিতে ছিল ; আমরা ছফর শেষে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এবং মদিনার পথ কমই বাকি রহিয়াছে—এমতাবস্থায় আমরা রাত্রি যাপনে অবতরণ করিয়াছি। প্রভাতে যাত্রা আরম্ভের নির্দেষ প্রচারিত হইল ; এমন সময় আমার এস্তেঞ্জার (মল ত্যাগের) প্রয়োজনে আমি লোকজন হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমার গলায় হাত দিয়া দেখিলাম, গলার মালাটা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। তাই যথায় প্রয়োজন পুরণে গিয়াছিলাম তথায় ফিরিয়া আসিয়া মালাটা তালার্শ করিতে লাগিলাম। এই তালাশে আমার নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইয়া গেল। এদিকে লোক-জনদের যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেলে আমার সেবকগণ পর্দা আবৃত আমার আসনকে আমার বাহন—উটের উপর রাখিয়া বাঁধিয়াদিল। তাহাদের ধারণা, আমি ঐ পর্দার ভিতরে রহিয়াছি ; সেই যুগের মেয়েরা স্বল্প খাদ্যেই জীবন-যাপন করিত, তাহাদের দেহ মোটা হইত না। সুতরাং পর্দা আবৃত খালি আসনটির ওজন কম হওয়ার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য গেল না ; আমিত বয়সের দিক দিয়াও ছোটই ছিলাম।

সেবকগণ আমার উটের উপর ঐ খালি আসন বাঁধিয়া উটকে চালাইয়া দিল। ময়দান হইতে সব লোকজন যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছে—ইতি মধ্যে আমার মালাটি পাইলাম। আমাদের অবতরণ ময়দানে আসিয়া দেখি, এখানে কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। এতদৃষ্টে আমি আমার যে বিশ্রামস্থান ছিল ঠিক ঐ স্থানেই আসিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, আমার উটের আসনের ভিতরে আমি নাই—ইহার অবগতি ত নিশ্চয়ই হইবে এবং আমাকে তালাশ করা হইবে ; তখন সকলে এই স্থানেই আসিবে। বসিয়া বসিয়া আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল।

ছাফওয়ান-ইবনে-মোয়াত্তাল নামক একজন ছাহাবী ছিলেন ; (যাঁহার দায়িত্ব ছিল, অবতরণ-ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বশেষে সব কিছুর খোঁজ করিয়া যাওয়া।) তিনি

আমার অবস্থানের নিকটবর্ত্তী আসিলেন এবং দুর হইতে তন্দ্রারত মানুষ-আকৃতি দেখিয়া লক্ষ্য করিতেই আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন। কারণ, পর্দার বিধানের পূর্ব্বে তিনি আমাকে দেখিয়া ছিলেন। তিনি আতঙ্কিত হইয়া ইন্নালিল্লাহে·····পড়িলেন। তাঁহার সেই পড়ার শব্দে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ওড়না দ্বারা চেহারা ঢাকিয়া নিলাম। খোদার কসম! তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই, ইন্নালিল্লাহ·········ব্যতীত তাঁহার কোন শব্দও আমি শুনি নাই। অবিলম্বে তিনি তাঁহার বাহন উটটি আমার নিকটে বসাইয়া দিলেন; আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম। তিনি উটটির নাসারজ্জু ধরিয়া হাটিয়া চলিলেন; দ্বিপ্রহর হইতেই আমরা মূল যাত্রিগণের সহিত মিলিতে পারিলাম; তাহারা বিশ্রামে অবতরণ করিয়া ছিল।

এই মাত্র ঘটনা—ইহাকে সম্বল করিয়াই অপবাদ সৃষ্টিকারীরা তাহাদের ধ্বংসের পথ ধরিল (—অপবাদ গড়াইয়া উহাকে ছড়াইতে লাগিল।) অপবাদের মূল সৃষ্টিকারী ছিল মোনাফেক সর্দার আবহুল্লাহ ইবনে-উবাই। এবং তাহার নিকট এই আলোচনা আসিলেই সে আলোচনাকারীর কথায় সায় দিত, তাহার কথার প্রতি মনোযোগ দিত এবং অপবাদকে সাজসজ্জায় গড়াইয়া তুলিত।

অপবাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণে ছাহাবী হাস্‌সান (রাঃ) ও মেছতাহ (রাঃ) এবং হামনা-বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ) সহ কতিপয় লোক ছিলেন। (পবিত্র কোরআনে আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে) আল্লাহ তায়ালা একটি দল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; এই অপবাদ গড়াইবার প্রধান নায়কছিল আবহুল্লাহ ইবনে উবাই।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় পৌঁছিয়া আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। এক মাসকাল আমি অসুস্থ থাকিলাম; এই সময় অপবাদকারীরা আপবাদের খুব চর্চ্চা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু উহা সম্পর্কে আমি কোনই খোঁজ রাখি না। তবে আমার অসুস্থতার মধ্যে এই বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইতেছিল যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐরূপ মধুরতা দেখি না। পূর্ব্বে কোন সময় অসুস্থ হইলে তাঁহার যেরূপ মধুরতা আমি উপভোগ করিয়া থাকিতাম। এই বারের অবস্থা এই যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘরে আসিয়া সালাম করেন এবং (আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ঐ রুগীণীর কি অবস্থা? এতটুকু জিজ্ঞাসার পরেই তিনি ঘর হইতে চলিয়া জান। এই ব্যাপারটিই আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইতেছিল; মূল ঘটনার কোন খোঁজ আমার মোটেই ছিল না।

রোগ জনিত দুর্ব্বলতার অবস্থায় একদা আমি বাহ্য-ত্যাগে যাইতে ছিলাম; এই প্রয়োজনে তখনও আমরা প্রাচীনকালের প্রথায় রাত্রি বেলায় জনশূন্য এলাকায় যাইয়া থাকিতাম। ঘর-বাড়ীর সংলগ্নে পায়খানাকে ঘৃণা করা হইত। যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে আমার জ্ঞাতি মেছতাহ (রাঃ) ছাহাবীর মাতা ছিলেন। প্রয়োজন সমাপ্তে আমি মেছতাহের মাতার সহিত গৃহপানে আসিতে ছিলাম; তিনি তাঁহার পরিধেয় কাপড়ে পেঁচ লাগিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, মেছতাহের সর্ব্বনাশ হউক। আমি বলিলাম, আপনি কী খারাব কথা বলিলেন, বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন লোককে আপনি মন্দ বলিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি ত সোজা মানুষ; মেছতাহ যেই কথায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে উহার খবর ত আপনি রাখেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই কথাটা কি? তিনি আমাকে অপবাদকারীদের সমস্ত কথা অবগত করিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই সংবাদ শুনা মাত্র আমার রোগ বহুগুণে বাড়িয়া গেল। আমি তথা হইতে গৃহে পৌছিলাম, ঐ সময়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও গৃহে আসিলেন এবং (ঐ সময়ের মনোভাব জনিত রীতিতে) সালামান্তে বলিলেন, তোমাদের ঐ রুগীণীর অবস্থা কিরূপ? আমি নবী (দঃ)কে বলিলাম, আমাকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিবেন কি? আমার ইচ্ছা—মাতা-পিতার নিকট হইতে ঘটনার বাস্তবতা অবগত হইব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। পিত্রালয়ে আসিয়া আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! লোকেরা আমার সম্পর্কে কি বলিয়া থাকে? মাতা আমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, বৎসে! এই ঘটনাকে অতি সাধারণভাবে গ্রহণ কর। কোন সুন্দরী নারী স্বামীর নিকট প্রিয়পাত্র—তাহার যদি কতিপয় সতীন থাকে তবে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে শত মিথ্যা গড়াইয়া থাকেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি অনুতাপ-দগ্ধস্বরে বলিলাম, ছোবহানাল্লাহ! লোকেরা কি আমার নামে এই সব অপবাদ বলিয়া ফেলিয়াছে? আমি সারা রাত্র কাঁদিয়া কাটাইলাম; রাত্র ভোর হইয়া গেল আমার অশ্রুর বিরতি নাই এবং চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র স্পর্শ করে নাই। পরবর্ত্তী রাত্রও কাঁদা অবস্থায়ই কাটিল।

ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার এই ব্যাপারে) কোন ওহী প্রাপ্ত না হওয়ায় আলী (রাঃ) উসামা (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং আমাকে ত্যাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ করিবেন। উসামা (রাঃ) আমার পবিত্রতা সম্পর্কে যাহা জানিতেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ সম্পর্কে তাঁহার অন্তরে

যে বিশ্বাস ছিল তাহা অনুপাতেই তিনি বলিলেন, আপনার বিবি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ; তাঁহার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দের কোন ধারনাই আমাদের নাই। আলী (রাঃ) অবশ্য এতটুকু বলিলেন, আল্লাহ ত আপনার জন্য কোন অভাব রাখেন নাই—সে ভিন্ন আরও মহিলা অনেকই আছে। তবে পরিচারিকা বরীরাকে জিজ্ঞাসা করুন ; সে মূল ব্যাপার বলিতে সক্ষম হইবে। সেমতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বরীরা (রাঃ)কে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন সময় (আয়েশার মধ্যে) সন্দেহ জনক কোন ব্যাপার দেখিয়াছ কি ? উত্তরে বরীরা (রাঃ) বলিলেন, ঐ খোদার কসম যিনি আপনাকে সত্য রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন—আমি কোন সময় বিবি আয়েশার মধ্যে দোষণীয় কোন কিছু দেখি নাই। তিনি ত এতই সরল যে, বাল্য-সুলভ স্বভাবে রুটির জন্য আটা তৈরী করিতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল আসিয়া তাঁহার আটা খাইয়া ফেলে—তিনি খবরও রাখেন না।

এই সবের পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লোক জনকে একত্র করিয়া ভাষণ দানে মিম্বরে দাঁড়াইলেন এবং (অপবাদ গড়াইবার ও প্রচার করিবার প্রধান নায়ক) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ভূমিকায় অসহণীয় উদ্বিগ্নের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হে মোসলমান জনমণ্ডলী ! আছ কেউ—যে আমার পক্ষ হইতে একটি লোকের কোন ব্যবস্থা করিতে পার যাহার উৎপীড়ন আমার প্রতি চরমে পৌঁছিয়াছে। আমার পরিবারের প্রতি তাহার ভূমিকা আমাকে অত্যধিক ব্যথিত ও দুঃখিত করিয়াছে। খোদার কসম ! আমি আমার পরিবারকে সম্পূর্ণ ভালই পাইয়াছি ; তাহার কোন মন্দই আমি পাই নাই। অধিকন্তু যেই পুরুষটিকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ গড়ানো হইয়াছে তাহার সম্পর্কেও ভাল ছাড়া মন্দের কোন খোঁজই আমি পাই নাই। কোন দিন সে আমার সঙ্গ ছাড়া আমার গৃহে আসেও নাই।

নবীজীর বক্তব্যের পরেই (মদিনার "আওস" গোত্রীয় সর্দার) সায়াদ-ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি ঐ ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে পারি। যদি সে আমাদের গোত্র আওস বংশের হয় তবে এখনই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিব। আর যদি আমাদের ভ্রাতাবংশ খযরজ গোত্রের হয় তবে আপনি যাহাই আদেশ করিবেন তাহাই প্রয়োগ করিব। এই সময় খযরজ বংশীয় এক ব্যক্তি--খযরজ গোত্রের সর্দার সায়াদ-ইবনে-ওবাদাহ (রাঃ) যিনি বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় নেককার ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় বংশপ্রীতির আবেগ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রথম ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ ; খোদার কসম—খযরজ বংশীয় লোককে তুমি হত্যা করিতে পারিবে না, কখনও পারিবে না (অর্থাৎ নবীজীর প্রতি অপরাধী ব্যক্তি খযরজ গোত্রীয় হইলে তাহার শিরচ্ছেদন আমরা খযরজ বংশীয় লোকেরা করিব—তুমি অন্য বংশের

লোক তাহা করিতে পারিবে না।) তোমার গোত্রীয় লোক হইলে কখনও তুমি পছন্দ করিবে না—সে (অন্য গোত্রীয় লোকের হাতে) খুন হউক। এই কথার উত্তরে প্রথম সায়াদের পিতৃব্যপুত্র উসায়েদ দ্বিতীয় সায়াদকে বলিলেন, আপনি ভুল করিতেছেন। কসম খোদার—আমরা নির্দ্বিধায় ঐরূপ ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিব; (সে যেই গোত্রেরই হউক।) আপনি মোনাফেকদের পক্ষপাত মূলক কথা বলিয়া সেইরূপ গণ্য হইতেছেন! এইভাবে উভয় সায়াদের গোত্রদ্বয় আউস ও খযরজের মধ্যে উত্তেজনা জনিত বিতর্কের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। এমনকি উভয় দলের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলে সকলেই নিরব হইয়া গেলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ও (এই গণ্ডগোলের মধ্যে) ক্ষান্ত হইয়া গেলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরবর্তী রাত্রিও আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম; চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র নাই এবং অশ্রুরও বিরতি নাই। আমার মনে হইতে ছিল--কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে।

ইতি মধ্যেই একদা আমার মাতা-পিতা উভয়ই আমার নিকট বসিয়া ছিলেন; আমি অবিরাম কাঁদিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় মদিনাবাসী এক মহিলা আমার নিকট আসিল; আমার অবস্থা দৃষ্টে সেও আমার সহিত কাঁদিতে লাগিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঠিক এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের মধ্যে আসিলেন এবং সালামান্তে আমার নিকটে বসিলেন। ঘটনা আরম্ভের পর হইতে ইহার পূর্বে আর কোন দিন তিনি এইরূপে আমার নিকটে বসেন নাই। অথচ ঘটনা আরম্ভ হইয়াছে দীর্ঘ একমাস হইতে; এ যাবৎ আমার এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি কোন ওহীও আসে নাই।

আজ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকটে বসিয়া কলেমা-শাহাদৎ পাঠ পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এই এই কথা আমার গোচরে আসিয়াছে। যদি তুমি এই সব অপবাদ হইতে পবিত্রা হইয়া থাক তবে শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা প্রমান করিয়া দিবেন। আর যদি তোমার দ্বারা অপরাধ হইয়াই থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তওবা কর। নিশ্চয় বন্দা অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা করিলে আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করিয়া থাকেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বক্তব্য শেষ করিলে ক্ষেদ ও ক্ষোভে আমার প্রবাহমান অশ্রু একেবারেই শুকাইয়া গেল; এখন চোখে অশ্রুর বিন্দুও অনুভব হয় না। আমি পিতা আবুবকর (রাঃ)কে বলিলাম,

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনি বলিলেন, খোদার কসম—ইহার কোন উত্তর আমি খুঁজিয়া পাই না। তখন আমি মাতাকেও বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনিও বলিলেন, খোদার কসম—হইার কোন উত্তর আমিও খুঁজিয়া পাই না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি কম বয়স্কা মেয়ে হইয়াও নিজেই উত্তরে বলিলাম—আমি ভালভাবেই জানি, আপনারা এই সব কথা শুনিয়া অন্তরে গাঁথিয়া লইয়াছেন এবং বিশ্বাস করিয়া নিয়াছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিরপরাধা পবিত্রা ; আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি অপরাধের কোন একটু কিছু স্বীকার করি ; অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধা পাক-পবিত্রা তবে আপনারা আমার কথাকে বিশ্বাস করিয়া নিবেন। এমতাবস্থায় আপনাদের মোকাবিলায় আমার জন্য একমাত্র ঐ উক্তিই শ্রেয়ঃ যাহা ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের (ভ্রাতাগণের মিথ্যা উক্তির মোকাবিলায় তাঁহার) পিতা বলিয়াছিলেন—فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

"নিরবে ধৈর্য্য ধারণই আমার জন্য উত্তম ; তোমাদের বক্তব্যের উপর আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই সাহায্য কামনা করি।"

এই কথা বলিয়া আমি অন্য দিকে ফিরিয়া গেলাম এবং বিছানার উপর শুইয়া পড়িলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় জানেন—আমি নিরপরাধ পাক-পবিত্রা, নির্দ্দোষ এবং আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় আমার নিরপরাধ-নির্দ্দোষ হওয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এই ধারণা আমার মোটেও ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এই ব্যাপারে আল্লার কালামের আয়াত অকাট্য ওহী দ্বারা অবতীর্ণ করিবেন যাহা কেয়ামত পর্য্যন্ত মোসলমানদের মধ্যে তেলাওয়াত করা হইবে। আমি নিজকে এত বড় মর্যাদার অপেক্ষা ছোট মনে করিতাম। আমার ধারণা ছিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্বপ্ন দেখিবেন—যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ হওয়া প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার উক্ত আলোচনার বৈঠক হইতে এখনও উঠিয়া দাঁড়ান নাই, গৃহের অন্যান্য উপস্থিত লোকদের কেহই এখনও তথা হইতে সরে নাই—এমতাবস্থায়ই এবং ঐ স্থানেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার উপর ঐ সব অসাধারণ অবস্থা পরিলক্ষিত হইল যাহা ওহী অবতরণকালে হইয়া থাকে—যে, প্রবল শীতের সময়ও মুক্তার দানার ন্যায় তাঁহার ঘাম বহিয়া পড়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, বেশ কিছু সময় পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ অবস্থা কাটিয়া গেল—তখন তিনি হাসিতে ছিলেন। এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কথা এই ছিল, হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর; আল্লাহ তায়ালা তোমার পাক-পবিত্রতা এবং নির্দ্দোষ হওয়া ঘোষনা করিয়া দিয়াছেন।

এই কথা শুনিতেই আমার মা আমাকে বলিয়া উঠিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁহার সমীপে উঠিয়া দাঁড়াও। আমি (দাম্পত্য সুলভ অভিমানের কায়দায়) বলিলাম, আমি তাঁহার জন্য দাঁড়াইব না; আমি আমার এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও কৃতজ্ঞতা আদায় বা প্রশংসা করিব না।

এই ব্যাপারে সুদীর্ঘ দশটি আয়াত আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিয়া দিলেন। যাহার তর্জমা এই—"তোমাদের মধ্য হইতে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি এই অপবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। (মূল ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সে মোনাফেক ছিল—মোসলমান দলভুক্তই ছিল, আর মাত্র তিন জন ছিল যাঁহারা প্রকৃত মোসলমান ছিলেন এবং মোনাফেকের গঠিত অপবাদকে তাঁহারা সত্য সাব্যস্ত করিয়া উহার আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। মাত্র চার জন লোকের কথায় মনে বেশী ব্যথা নিও না। এই ঘটনা ব্যথার কারণ হইলেও পরিণামের দিক দিয়া) এই ঘটনাকে মন্দ জানিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য ভাল। (ইহাতে ধৈর্য্য ধারণের ছওয়াব লাভ হইবে।) এই অপবাদে যে যতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে ততটুকু গোনাহ তাহার হইবে। আর যে উহার বড় অংশের (তথা উহা গড়াইবার) জন্য দায়ী (তথা মোনাফেক সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) তাহার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি রহিয়াছে। মোসলমান নর-নারীগণ ঐ ঘটনা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল ধারণা পোষণ করতঃ কেন বলিল না যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ? অপবাদকারীরা তাহাদের কথার উপর চার জন সাক্ষী কেন সংগ্রহ করিল না; তাহারা সাক্ষী পেশ করিতে যখন সক্ষম হয় নাই তখন ত তাহারা আল্লার নির্দ্ধারিত আইনেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত। (যে কারণে তাহাদের প্রত্যেককে ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্য যে কতিপয় খাঁটী মোমেন-মোসলমান এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারা ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিয়া আখেরাতের আজাব হইতে রেহায়ী পাওয়ার যোগ্য হইবে—ইহা খাঁটী মোমেন-মোসলমানের প্রতি আল্লার বিশেষ রহমত।) তোমাদের প্রতি যদি ইহপরকালে আল্লার মেহেরবাণী এবং রহমত না থাকিত তবে যেই অপরাধে তোমরা লিপ্ত হইয়া ছিলে উহার দরুন তোমাদের আজাব ভোগ করিতে হইত। (যেমন মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহকে আখেরাতে চিরস্থায়ী ভীষন আজাব ভোগ করিতে হইবে।) তোমরা তখনই আজাবের যোগ্য হইয়া ছিলে যখন ঐ অপবাদকে চর্চ্চা করিতে ছিলে এবং মুখে এমন কথা বলিতে ছিলে যাহার কোন

প্রমাণ তোমাদের নিকট ছিল না। তোমরা উহাকে সামান্য ঘটনা গণ্য করিতে ছিলে, অথচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় ঘটনা। হে মোমেন-মোসলমানগণ! তোমরা যখন এই অপবাদ শুনিতে পাইয়া ছিলে তখন কেন তোমরা এইরূপ বল নাই যে, আমাদের মুখে এই কথা উচ্চারণও করিতে পারিব না—আল্লার পানাহ্; ইহা ত অতি বড় অপবাদ। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে চিরকালের জন্য বিরত থাকিতে আল্লাহ তোমাদেরে উপদেশ দিতেছেন; যদি তোমরা খাঁটী মোমেন হও তবে তোমরা এই উপদেশ গ্রহণ করিবে।

সম্মুখে আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

"(ঘটনার বাস্তব তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর নবী-পত্নীগণের ন্যায়) পাক-পবিত্রা সরল প্রকৃতির খাঁটী ঈমানদার মহিলাদের প্রতি যাহারা অপবাদের কোন কথা বলিবে তাহাদের উপর নিশ্চয় ইহপরকালে আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং তাহাদের ভীষণ আজাব হইবে—যে দিন তাহাদের হাত-পা ও জবান তাহাদের কৃত কর্ম্মের সাক্ষ্য দিবে।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—(প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম—) "খবিস নারীরা খবিস পুরুষদের জন্যই জুটিয়া থাকে এবং খবিস পুরুষদের জন্য খবিস নারীগণ জুটে। আর পাক-পবিত্রা নারীগণ পাক-পবিত্র পুরুষগণের জন্যই হন এবং পাক-পবিত্র পুরুষগণ পাক-পবিত্র নারীদের জন্য হন। (এই নিয়মের দৃষ্টিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্নীগণকে বিচার কর ;) তাঁহারা অপবাদকারীদের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্মল। (অপবাদের দরুন তাঁহাদের যে ব্যথা পৌঁছিয়াছে উহার বিনিময়ে) তাঁহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানের প্রতিদান রহিয়াছে।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মেসতাহ' (যিনি এই অপবাদে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন—তিনি) আবুবকরের আত্মীয় ছিলেন এবং দরিদ্র ছিলেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দ্দোষ হওয়ার বয়ান ওহী মারফত অবতীর্ণ করিলে আবুবকর (রাঃ) প্রতিজ্ঞা করিলেন, খোদার কসম—আয়েশার প্রতি এই অপবাদে অংশ নেওয়ার পর মেসতাহের (সাহায্যের) জন্য আমি কখনও আর কিছুই ব্যয় করিব না।

আবুবকরের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিবাদেও কোরআনের আয়াত নাযেল হইল যাহার মর্ম্ম এই—"সামর্থবান লোকদের কখনও উচিৎ নয় নিজ আত্মীয়কে সাহায্য না করার প্রতিজ্ঞায় কসম খাওয়া।"

উক্ত আয়াতের সমাপ্তিতে আল্লাহ তায়ালা একটি হৃদয়গ্রাহী কথা বলিয়াছেন যে—(তোমার আত্মীয় যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে ; যেমন 'মেসতাহ' করিয়াছে, তবে তাহার অপরাধের কারণে তাহার প্রতি সাহায্য বন্ধ করিও না ; তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং সাহায্য বহাল রাখ। যেরূপ তুমি আল্লার নিকট অপরাধ কর, কিন্তু

আল্লাহ তোমার প্রতি তাঁহার সাহায্য বন্ধ করেন না। সুতরাং তুমি তোমার অপরাধী আত্মীয়ের প্রতিও তোমার সাহায্য বন্ধ করিও না; তাহাকে ক্ষমা করিয়া সাহায্য বহাল রাখ। এই সরল যুক্তিটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রশ্নের সুরে আল্লাহ বলিয়াছেন,) "তোমার কি এই অভিলাস নাই যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল দয়াল।" অর্থাৎ তোমার যদি এই অভিলাস থাকে যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন এবং সাহায্য বহাল রাখেন তবে তুমিও অপরাধী আত্মীয়কে ক্ষমা করিয়া দিয়া সাহায্য বহাল রাখ--তাহার অপরাধের কারণে সাহায্য বন্ধ করিও না।

উল্লেখিত আয়াতের প্রশ্ন শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন— "নিশ্চয়! নিশ্চয়!! কসম খোদার—আমি অভিলাস রাখি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন।" এই উক্তি করিয়া মেসতাহের প্রতি সাহায্য পুনর্বহাল করিলেন এবং (প্রথম কসম ভঙ্গ করিয়া উহার কাফ্ফারা দানে এখন এই) কসম করিলেন যে, তাহার হইতে সাহায্য কখনও বন্ধ করিবেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (আমার এক সতিন—) বিবি যয়নবকে আমার ঘটনার তদন্তরূপে নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জান বা কি দেখিয়াছ? বিবি যয়নব (রাঃ) বলিয়াছিলেন, (মিথ্যা বলিয়া) আমি আমার চক্ষু-কর্ণ ধ্বংস করিতে চাই না; আয়েশা সম্পর্কে আমি শুধুমাত্র ভালই জানি! (আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে বিবি যয়নবই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি (বংশ ইত্যাদির গৌরবে) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা রাখিতেন। কিন্তু প্রবল খোদাভীরুতা তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সংযত থাকিতে। অবশ্য তাঁহার ভগ্নি 'হামনাহ' তাঁহার বিরোধীতা করিয়া ধ্বংসের পথিক দলে যোগ দিয়া ছিল।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যেই পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ গড়ানো হইয়া ছিল—ছাফ্ওয়ান (রাঃ); তিনি বলিতেন, খোদার কসম—জীবনে কোন দিন কোন বেগানা নারীর কাপড়ে হাত লাগাই নাই। সম্মুখ জীবনে তিনি আল্লার পথে জেহাদে শহীদ হইয়া ছিলেন।

১৮৬০। হাদীছ ঃ— (৫৯৬পৃঃ) মছরুক ইবনে আজদা' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মাতা—উম্মে-রুমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি এবং আয়েশা গৃহে বসিয়া আছি; হঠাৎ একজন মদিনাবাসীনী মহিলা আমাদের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের সর্ব্বনাশ করুন। উম্মে-রুমান তাঁহাকে এই বদদোয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমাদেরই সন্তান (যাহাকে বদদোয়া করিলাম;) সেও ঐ লোকদের মধ্যে যাহারা অপবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বিষয় ? ঐ মহিলা তদুত্তরে অপবাদের সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি এই ঘটনা শুনিয়াছেন ? সে বলিল, হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা আবুবকরও শুনিয়াছেন ? বলিল, হাঁ। তৎক্ষণাৎ আয়েশা (রাঃ) বেহোশ হইয়া পড়িয়া গেলেন ; দীর্ঘ সময় পর হুঁশ ফিরিল বটে, কিন্তু তখন তাঁহার গায়ে ভীষণ তাপে জ্বর আসিয়া গিয়াছে। অতএব আয়েশা (রাঃ)কে তাঁহারই কাপড়ে ভালভাবে জড়াইয়া দিলাম।

এই সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে ? আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ ! তাহার ভীষন জ্বর আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, বোধ হয় ঐ কথার ব্যাপারেই যাহা বলা হইতেছে। মাতা বলিলেন, হাঁ। ....

ব্যাখ্যা—আয়েশা (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম ঘটনার আভাস পাইয়া ছিলেন মেসতাহের মাতার নিকট হইতে যাহার উল্লেখ পূর্বের সুদীর্ঘ হাদীছটিতে হইয়াছে। ঘটনা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর ভীষন প্রতিক্রিয়াও হইয়াছিল, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) প্রথমবারেই পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিয়া ছিলেন কি যে, তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ কথা হইতে পারে ? প্রথমবারে নিশ্চয় এসম্পর্কে তাঁহার সংশয় উদিত হইয়াছে এবং সেই সংশয়ে মন কিছুটা হালকা হওয়ার সূচনায় ছিল। ইতি মধ্যেই আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মদিনাবাসীণী মহিলার বর্ণনায় বিশেষতঃ এই সংবাদে যে, নবীজী (দঃ) এবং পিতা আবুবকরও অপবাদ শুনিয়াছেন—আয়েশা (রাঃ) নিজকে আর সামলাইতে পারিলেন না। বেহুঁস অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং প্রশমিত জ্বর অত্যধিক প্রবল বেগে পুনঃ দেখা দিল।

১৮৬১। হাদীছ ঃ—(৫৯৭ পৃঃ) মছরুক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় তাঁহার নিকট কবি হাস্‌সান (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি কবিতার ভূমিকায় উত্তম নারীর গুণাবলীর উল্লেখে বলিলেন—"স্বভাবে পবিত্রা, চালচলনে গাম্ভীর্য্যা, নাই তাহাতে সন্দেহের অবকাশ, সরলদের প্রতি অপবাদে ভীষণ সঙ্কোচিতা।"

হাস্‌সান (রাঃ) সর্ব্বশেষ বাক্যটি (তথা সরলদের প্রতি অপবাদে ভীষণ সঙ্কোচিতা) উচ্চারণ করিলে আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনি নিজে সেইরূপ নহেন। (আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ন্যায় সরল পবিত্রাত্মার প্রতি অপবাদে অংশ গ্রহণকারী একজন ছিলেন উক্ত কবি হাস্‌সান (রাঃ) ; তাই আয়েশা (রাঃ) তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।)

মছরুক (রঃ) বলেন—আমি আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, হাস্‌সানকে আপনার নিকট আসিতে দেন কেন? আল্লাহ তায়ালা ত বলিয়াছেন, "তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি (অপবাদে) বড় অংশ গ্রহণ করিয়া ছিল তাহার বড় আজাব হইবে।" (সেমতে সাধারণ অংশ গ্রহণকারীদের সাধারণ আজাব হইবে।) আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, অন্ধতা অপেক্ষা বড় আজাব বা দুঃখ কি হইতে পারে? (হাসসান (রাঃ) শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।) আয়েশা (রাঃ) আরও বলিলেন, হাসসান (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কাফেরদের কুউক্তির উত্তর দিয়া থাকিতেন (কাব্যের মাধ্যমে)।

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেররা কাব্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কুৎসা গাহিত ; পদ্য-পাগল আরবদের মধ্যে উহা দ্রুত প্রসার লাভ করিত। ছাহাবী-গণের মধ্যে হাস্‌সান (রাঃ) বিশিষ্ট কবি ছিলেন ; তিনি কাফেরদের গ্লানি-গাথার উত্তর কাব্যের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য নবীজীর অনুমতি চাহিলেন। নবী (দঃ) অনুমতি দিলেন, এমনকি পরে তিনি উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থনও জ্ঞাপন করিলেন এবং দোয়া করিলেন— আয় আল্লাহ। জিব্রিল ফেরেশতা দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য কর। নবী (দঃ) স্বয়ং হাস্‌সান (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড় করাইতেন ; তিনি কাব্যে নবীজীর পক্ষ হইতে কাফেরদের কুৎসাবাদের উত্তর দিতেন এবং নবীজীর প্রশংসা প্রচার করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

فَاِنَّ اَبِىْ وَوَالِدَتِىْ وَعِرْضِىْ — لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ

"আমার পিতা, আমার মাতা, আমার সর্ব্বমান
মোহাম্মদের মান রক্ষায় করিব কোরবান।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)

নবীজীর জন্য হাস্‌সান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই সেবাকে আয়েশা (রাঃ) এত মূল্য দিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাস্‌সানের অপরাধকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসার ইহা একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া।

যোবায়ের (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফুফু-তনয় ভ্রাতা ছিলেন তিনি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নিপতি ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশতের ঘোষনা প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন।

১৮৬২। হাদীছ ঃ—(৫২৭ পৃঃ) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী ছিল আমার বিশেষ সাহায্যকারী যোবায়ের।

১৮৬৩। হাদীছ ঃ—(৫৬৬ পৃঃ) ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে সিরিয়াস্থ) "ইয়ারমূক" এলাকায় যে জেহাদ হইয়াছিল সেই জেহাদে যোবায়ের (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ অনুরোধ করিলেন, আপনি আক্রমণাভিযান আরম্ভ করিলে আমারাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ চালনায় অগ্রসর হইতে পারিতাম। তিনি বলিলেন, আমি আক্রমণ আরম্ভ করার পরে যদি তোমরা তোমাদের এই কথা না রাখ? তাঁহারা বলিলেন, সেরূপ আমরা করিব না।

সেমতে যোবায়ের (রাঃ) আক্রমণে এমনভাবে অগ্রসর হইলেন যে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গেলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে এইভাবে অগ্রসর হওয়ায় কেহই সাহসী হয় নাই। শত্রুদের ভিতর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহারা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ফেলার সুযোগ পাইয়া বসিল। ঐ সময় তাহারা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে তরবারির দুইটি ভীষণ আঘাত করিয়া ছিল। ঐ আঘাতদ্বয়ের মধ্য বরাবর আরও একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল—উহা লাগিয়াছিল বদর জেহাদের রনাঙ্গনে।

ঘটনার বর্ণনাদানকারী যোবায়ের-পুত্র ওরওয়া (রঃ) বলিয়াছেন, ঐ আঘাতগুলি এতই প্রশস্ত ছিল যে, শুষ্ক হওয়ার পরও তাঁহার পৃষ্ঠদেশে উহার যে গর্ত বিদ্যমান ছিল তাহাতে আমারা হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক খেলা করিয়া থাকিতাম।

ঐ যুদ্ধের দিন রনাঙ্গনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন। তিনি তখন মাত্র দশ বৎসর বয়সের ছিলেন, তাই আক্রমণাভিযানকালে তাঁহাকে একটি ঘোড়ার উপর বসাইয়া অন্য একজনের হাওয়ালা করিয়া গিয়াছিলেন।

যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যে তরবারিটি তিনি ইসলামের জেহাদে ব্যবহার করিতেন বদর-জেহাদে উহার কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঐ তরবারিটি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লার নিকট ছিল। আবদুল্লাহ-ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ঐ একটি তরবারি বিক্রি করা হইলে একজনে উহাকে (বরকতের জন্য) তিন হাজার দেরহামে ক্রয় করিয়া নিল।

যোবায়ের-পৌত্র হেশাম (রঃ) এই আলোচনা উল্লেখের পর অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কোন মূল্যে যদি ঐ তরবারিখানা আমি ক্রয় করিয়া রাখিতাম তবে আমার সৌভাগ্য ছিল।

১৮৬৪। হাদীছ ঃ—(৫৭০ পৃঃ) যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন— বদর রনাঙ্গনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ওবায়দা-ইবনে সায়ীদ আসিল। সে আপাদ-মস্তক

লৌহাবৃত ছিল ; চক্ষুদ্বয় ব্যততী তাহার শরীরের কোন অংশই উন্মুক্ত ছিল না। তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়াই আমি বর্শা চালাইলাম ; বর্শা তাহার চোখেই বিদ্ধ হইয়া গেল এবং ঐ এক আঘাতেই সে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। বর্ষাটি তাহার চোখ হইতে বাহির করার জন্য তাহার মুণ্ড পদতলে চাপা দিয়া অতি জোরে বর্ষাকে টান দিলাম। বহু কষ্টে উহাকে বাহির করিলাম, এমনকি উহার ফলকের উভয় কোণ বাঁকা হইয়া মোড়িয়া গেল।

(যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কৃতকার্য্যতা তাঁহার জন্য চরম সৌভাগ্য ছিল। এমনকি উহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ) তাঁহার ঐ বর্শাখানা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া নিয়া নিজের নিকট সযত্নে রাখিয়া দিলেন। হযরতের তিরোধানের পর যোবায়ের (রাঃ) উহাকে পুনঃ নিজহস্তে নিয়া গেলেন, কিন্তু খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার হইতে উহা চাহিয়া নিয়া গেলেন। আবুবকরের তিরোধানের পর খলীফা ওমর (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) হইতে উহা চাহিয়া নিলেন। খলীফা ওমরের তিরোধানের পর খলীফা ওসমান (রাঃ) উহাকে চাহিয়া নিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিজনের যত্নে উহা সুরক্ষিত থাকিল। তাঁহাদের নিকট হইতে যোবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে নিয়া গেলেন ; তিনি শহীদ হওয়া পর্য্যন্ত উহা তাঁহারই নিকট সযত্নে রক্ষিত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—লক্ষ্য করুন এক একটা বিশেষ নেক কার্য্যের মূল্য নবীজী (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণের নিকট কিরূপ ছিল ? একজন বড় আল্লাহদ্রোহীকে জেহাদে হত্যা করার আমালটা নবীজীর নিকট এতই সমাদৃত ছিল যে, উহার স্মৃতিচিহ্ন তিনি অতি আগ্রহের সহিত সযত্নে রাখিয়া দিলেন। বড় বড় ছাহাবীগণও উহার বরকত লাভে কত আগ্রহের সহিত যত্নবান হইলেন !

সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আম্মা বিবি আমেনার গোত্র "বনু-জোহরা" বংশেরই ছিলেন সায়াদ (রাঃ) ; এই সূত্রে নবী (দঃ) তাঁহাকে মামা বলিতেন।

হাদীছ—একদা সায়াদ (রাঃ) কোথাও হইতে আসিতে ছিলেন, তিনি নিকটে আসিলে নবী (দঃ) বলিলেন, এই দেখ—আমার মামা ; অন্য কেহ এইরূপ মামা উপস্থিত কর ত দেখি ! (তিরমিজি শরীক)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে বেহেশতের ঘোষনা প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন তিনি।

১৮৬৫। হাদীছঃ— (১০৪ পৃঃ) জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমর কর্তৃক নিয়োজিত কুফার গভর্ণর) সায়াদ (রাঃ) সম্পর্কে কোন কুফাবাসী খলীফা ওমরের নিকট বিভিন্ন অভিযোগ করিল। এমনকি ইহাও বলিল যে, তিনি নামাযও ভালভাবে পড়াইয়া থাকেন না। ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, কোন কোন লোক আপনার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছে। এমনকি তাহারা আপনার নামায সম্পর্কেও অভিযোগ করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি ত তাহাদের নামায পড়াইয়া থাকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের অবিকল রূপে ; তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ত্রুটি করি না। (যথা—) আমি নামাযের প্রথম রাকাতদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করি এবং পরবর্ত্তী রাকাতদ্বয় সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের অনুসরণে বিন্দু মাত্রও অবহেলা আমি করি না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য ; আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাও এইরূপই।

অতঃপর ওমর (রাঃ) (তাঁহার শাসনব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী তাঁহার গভর্ণর) সায়াদের সঙ্গে লোক পাঠাইয়া দিলেন ; কুফায় যাইয়া সরেজমিনে অভিযোগের তদন্ত করার জন্য। সেমতে তদন্তকারীগণ কুফার প্রতিটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া জনগণ হইতে মন্তব্য সংগ্রহ করিলেন। সকলেই সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ভাল মন্তব্য এবং তাঁহার প্রশংসা করিল। শুধু মাত্র বনু-আব্স গোত্রীর মসজিদে উসামা-ইবনে-কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তদন্তকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনারা যখন আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তখন আমাদের বলিতেই হয়। সায়াদ জেহাদ-অভিযানে সৈন্যবাহিনীর সহিত যায় না। (গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামাল) সঠিকরূপে বন্টন করে না। বিচারে ন্যায়ের পথে চলে না। (ঐ ব্যক্তি সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে তিনটি মিথ্যা অভিযোগ করিল।)

সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, কসম খোদার—আমিও আল্লার দরবারে তিনিটি আবেদনই করিব। আয় আল্লাহ! তোমার এই বন্দা যদি মিথ্যা বলিয়া থাকে এবং নিজের প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্যে ইহা করিয়া থাকে তবে—(১) তাহার বয়স বাড়াইয়া দিও (২) দারিদ্র বেশী করিয়া দিও (৩) এবং তাহাকে লাঞ্ছনার কাজে লিপ্ত করিও।

জাবের (রাঃ) হইতে মুল ঘটনা বর্ণনাকারী তাবেয়ী আবদুল মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি—তাহার বয়স এত অধিক হইয়াছিল যে, উভয় চোখের ভ্রূস্থানের চামড়া চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দারিদ্রের দরুন পথে পথে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায় এবং এই অবস্থায়ও সে যুবতি মেয়েদের গায়ে হাত দেয়, তাহাদের সহিত উত্ত্যক্তজনক আচরণ করিয়া বেড়ায় (যদ্দরুন সে ভীষণ লাঞ্ছনা-

গঞ্জনা ভোগ করে)। কেহ তাহাকে এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজেই বলিত, বৃদ্ধ বয়সে স্বভাব নষ্ট হইয়াছে ; সায়াদের বদদোয়া আমার উপর লাগিয়াগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত খলীফা ওমর(রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্ণরী হইতে অব্যাহতি দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— খলীফা ওমরের নীতি তাঁহার গভর্ণরগণের প্রতি অতিশয় কঠোর ছিল। তাঁহার গভর্ণরগণের প্রতি অভিযোগ আসিলে তিনি ভাবিতেন—দেশের সকল লোকের সন্তুষ্টি এই গভর্ণরের প্রতি নাই, অতএব এই গভর্ণর দ্বারা দেশবাসী সকলের শান্তি হইবে না এবং বিরোধ সৃষ্টি হইয়া যাওয়ার কারণে তাঁহার দ্বারা তাহাদের শংসোধনও সম্ভব হইবে না ; সুতরাং এই দেশে অন্য গভর্ণরের প্রয়োজন। এই নীতির অনুসরণেই খলীফা ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ওমর (রাঃ) তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি সায়াদ (রাঃ)কে তাঁহার পরে খলীফাতুল-মোসলেমীন হওয়ার যোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, পরবর্ত্তী খলীফাকে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের তাকিদ করিয়াছেন এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, কোন প্রকার খেয়ানত বা দুর্নীতির দরুণ আমি সায়াদকে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারণ করিয়াছিলাম না (১৮৩৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

● অভিযোগকারী সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ছিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী—এমন সাহাবী যিনি নবী (দঃ) কর্ত্তৃক বেহেশতের সনদ প্রদত্ত দশ জনের একজন ছিলেন ; তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা-মন্দ গড়াইয়া বস্তুতঃ সে নবীজীর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছিল। তাই সায়াদ (রাঃ) ভীষণ ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি বদদোয়া করিয়াছিলেন এবং তাহার বদদোয়া অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছিল। সায়াদ (রাঃ) "মোস্তাজাবুদ-দাওয়াত" ছিলেন ; তাঁহার দোয়া বিশেষরূপে আল্লার দরবারে গৃহিত হইত। এই বিষয়ে নবী (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন।

হাদীছ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বলিয়া দোয়া করিয়াছেন—"হে আল্লাহ ! সায়াদ যখনই দোয়া করে তুমি তাহার দোয়া গ্রহণ করিও। (তিরমিজি শরীফ)

১৮৬৬। হাদীছ ঃ— (৫২৭ পৃঃ) সায়াদ (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের একজন। সাত দিন পর্য্যন্ত আমি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ ছিলাম। (অর্থাৎ তখন আমার জানা মতে মোসলমানের সংখ্যা মাত্র তিনজন ছিল।) আল্লার পথে তথা ইসলামের জেহাদে সর্ব্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী আমি। (ইসলামের জন্য আমার এত ত্যাগ যে,) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছি এমন অবস্থায় যে, আমাদের খাদ্য শুধু গাছের পাতা ছিল, উহা খাইয়া আমাদের মল উট ও ছাগলের মলের ন্যায় হইত—ছিন্ন ছিন্ন।

এত দিনের এবং এত কষ্টের ইসলাম আমার! এখন আসাদ গোত্রের লোক ইসলাম সম্পর্কে আমাকে মন্দ বলে! তাহাদের অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে আমার জীবনই ব্যর্থ গেল এবং সকল দুঃখ কষ্ট নিস্ফল হইল।

সায়াদ (রাঃ) ব্যথিত হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন, কারণ আসাদ গোত্রের লোক খলীফা ওমরের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল—তাহারা বলিয়াছিল, তিনি ভালভাবে নামাযও পড়িতে পারেন না।

আনছারদের ফজিলত

১৮৬৭। হাদীছ ঃ—গায়লান ইবনে জরীর (রঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত "আনছার" উপাধিটা আপনারা নিজে অবলম্বন করিয়াছিলেন, না—আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, আমরা নিজেরা অবলম্বন করি নাই, বরং আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ -

ব্যাখ্যা—ইহা একটি অতি বড় সৌভাগ্যের কথা যে, মদিনাবাসী ছাহাবীগণকে দ্বীনের খেদমত ও সাহায্যের দরুণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে তাঁহাদিগকে "আনছার" তথা সাহায্যকারী জামাত নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮৬৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যিনি দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গল বিতরণকারী অর্থাৎ হযরত নবী (দঃ) তিনি বলিয়াছেন, লোকগণ যদি এক পথে চলে এবং আনছার ভিন্ন পথে চলে তবে আমি অবশ্যই আনছারদের পথ অবলম্বন করিব। আমি যদি হিজরতকারী না হইতাম তবে অবশ্যই আমি নিজকে আনছারদের দলভুক্ত রাখিতাম।

১৮৬৯। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আনছারদের প্রতি মহব্বৎ হওয়া মোমেনের নিদর্শন এবং আনছারদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা মোনাফেকের নিদর্শন। যে ব্যক্তি আনছারগণকে মহব্বৎ করিবে আল্লাহ তাহাকে মহব্বৎ করিবেন। যে ব্যক্তি আনছারদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন।

১৮৭০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পথের মধ্যে দুর হইতে দেখিতে পাইলেন, আনছারদের

স্ত্রী-পুত্র ও ছেলে-মেয়েগণ কোন এক বিবাহের দাওয়াত হইতে আসিতেছে। হযরত (দঃ) তাহাদের অপেক্ষায় মধ্য পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলিতেছি, নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট সর্ব্বাধিক ভালবাসার লোক---তিনবার এই কথা বলিলেন।

১৮৭১। হাদীছ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়ছেন, একদা একটি আনছারী রমণী তাহার ছোট শিশুকে কোলে করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহার প্রয়োজনীয় কথা তাহাকে বলিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) আনছার মহিলাকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিলেন যে, নিশ্চয় তোমরা আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় লোক—দুইবার এই উক্তি করিলেন।

১৮৭২। হাদীছ ঃ— (৭২৮ পৃঃ) যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছেন—"হে আল্লাহ! আনছারগণকে ক্ষমা কর এবং আনছারদের ছেলে-মেয়েদেরকেও এবং আনছারদের পৌত্র-পৌত্রীগণকেও ক্ষমা কর।

সায়া'দ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)

১৮৭৩। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে এক জোড়া রেশমের কাপড় উপঢৌকন রূপে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। উহা এত মোলায়েম ছিল যে, ছাহাবাগণ উহা স্পর্শ করিয়া উহার অতিশয় কোমলতায় আশ্চার্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তখন হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহা দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? সায়া'দ ইবনে মোয়াজের জন্য বেহেশতের মধ্যে (হাত, মুখ, নাক ছাফ করার) যে রুমাল হইবে তাহাও ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী মোলায়েম ও কোমল হইবে।

১৮৭৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সায়া'দ ইবনে মোয়াজের মৃত্যু-শোকে আরশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)

১৮৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, দুইজন ছাহাবী একদা অন্ধকার রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ একটি আলো তাঁহাদের সম্মুখে সম্মুখে চলিতে লাগিল, এমনকি তাঁহারা উভয়ে যখন পৃথক পৃথক পথ ধরিলেন তখন আলোটিও বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে চলিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)।

উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ)

১৮৭৬। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উবাই-ইবনে কায়া'বকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "লাম্-ইয়াকুনিল্-লাজীনা" ছুরা তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য। উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। তখন উবাই (রাঃ) (আল্লার নিকট স্মরণীয় হওয়ার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে) কাঁদিয়া উঠিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)

১৮৭৭। হাদীছ ঃ—সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি—তাঁহার ইহজগতে জীবিত থাকাবস্থায়ই নবী (দঃ) তাঁহাকে বেহেশতী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮৭৮। হাদীছ ঃ—কায়স্ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদিনার মসজিদে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিলেন—তাঁহার চেহারার মধ্যে নম্রতা ও খোদা-ভীরুতা প্রকাশ পাইতে ছিল। উপস্থিত লোকজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই লোকটি বেহেশতী। তিনি মসজিদে আসিয়া সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে রওয়ানা দিলেন, তখন আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি মসজিদে প্রবেশ করিলে পর লোকজন বলিয়া উঠিল যে, এই লোকটি বেহেশতী।

তিনি বলিলেন, অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ উক্তি না করাই ভাল, অবশ্য আমি তোমাকে ইহার মূল সূত্র বলিতেছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম এবং উহা আমি হযরতের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি দেখিলাম—আমি যেন একটি অতি বড় মনোরম বাগানে আছি, বাগানের মধ্যস্থলে একটি খুঁটি জমিনে পোতা ছিল, খুঁটিটির শির অনেক উর্দ্ধে ছিল এবং উহার সঙ্গে একটি কড়া বা আংটা ছিল। এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, তুমি খুঁটিটির উপর দিকে আরোহণ কর। আমি বলিলাম, আমার জন্য অসাধ্য; তখন একজন সাহায্যকারী আসিয়া আমাকে আরোহণে সাহায্য করিল, ফলে আমি খুঁটিটির শির ভাগে পৌঁছিয়া গেলাম এবং আংটাটি ধরিয়া ফেলিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, খুব মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও; সেই ধরা অবস্থায়ই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নটি হযরত নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি উহার ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিলেন, বাগানটি হইল "দ্বীন-ইসলাম" এবং খুঁটিট হইল ইসলামের মূল "ঈমান" এবং কড়াটি হইল (পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত) "ওর্‌ওয়া-ওছক্কা"—ঈমানের শক্ত আংটা। সামগ্রিক স্বপ্নটির ব্যাখ্যা হইল এই যে, তুমি খাঁটী ভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর আছ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উহার উপর মজবুত থাকিবে। এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)।

ব্যাখ্যা—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে তাঁহার স্বপ্ন দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, তুমি সারা জীবন খাঁটী ভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর মজবুত থাকিবে ; এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির বেহেশত লাভ সুনিশ্চিত ; এই সূত্রেই লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে বেহেশতী বলিত।

ঈমান হইল দ্বীন-ইসলামের মধ্যস্থলীয় খুঁটি যাহার উপর দ্বীন-ইসলামের তাবুটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িলে মূল তাবুই ভাঙ্গিয়া পড়িবে যদিও উহার পার্শ্বস্থ খুঁটি বিদ্যমান থাকে। মধ্যস্থ খুঁটি ব্যতিরেকে পার্শ্বস্থ খুঁটি মূল্যহীন। ঈমানের মজবুত আংটা বা কড়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অতি সংক্ষেপে সুন্দর ব্যাখ্যা উল্লেখ রহিয়াছে—

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আল্লাহতে সর্ব্বস্ব বিলীন ও উৎসর্গ করিবে সে-ই হইবে ঈমানের শক্ত কড়াকে মজবুতরূপে ধারণকারী।"

আনাছ-ইবনে-নজর (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দীর্ঘ দশ বৎসরের খাদেম প্রসিদ্ধ আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চাচা আনাছ ইবনে নজর (রাঃ)। ওহোদের জেহাদে তিনি অতি মর্ম্মান্তিকরূপে শহীদ হইয়াছিলেন ; তীর বর্শার প্রায় নব্বইটি আঘাত তাঁহার লাগিয়াছিল ; তাঁহার পরিচয় উপলব্ধি সম্ভব হইতে ছিল না। একটি আঙ্গুলের চিহ্ন দ্বারা তাঁহার ভগ্নি তাঁহাকে সেনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমুদয় আঘাত তাহার সম্মুখদিকে ছিল, পেছনদিকে কোন আঘাত ছিল না। রণাঙ্গনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর হওয়াকালে তিনি বলিতে ছিলেন, ওহোদ প্রান্ত হইতে বেহেশতের সুগন্ধী আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিতেছে। তিনি শহীদ হওয়ার পর তাঁহার আত্মত্যাগের ইঙ্গিত দানে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে—"মোমেনগণের মধ্যে এমনও লোক আছেন যাঁহারা আল্লার নিকট প্রদত্ব প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়াছেন।"

১৮৭৯। ছাদীছ ঃ (৩৭২ পৃঃ) আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মহিলা ছাহাবী রুবায়্যে (রাঃ) কোন একটি মেয়ের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলায় অভিযুক্তা হইলেন। মেয়েটির অভিভাবকগণ কেছাছ বা প্রতিশোধের দাবী করিল এবং তাঁহার পক্ষ অর্থ-বিনিময় দানের প্রস্তাব করিল। কিন্তু মেয়ের পক্ষ অর্থ-বিনিময় গ্রহণ অস্বীকার করিল ; তাহাদের দাবী কেছাছ তথা প্রতিশোধ গ্রহণ। উভয় পক্ষ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজ নিজ বক্তব্য লইয়া উপস্থিত হইল।

এরূপ ক্ষেত্রে বাদী পক্ষ অর্থ-বিনিময় গ্রহণে সম্মত না হইলে অভিযুক্ত প্রতিশোধ দানে বাধ্য। তাই নবী (দঃ) সেই আদেশই করিলেন। অভিযুক্তা মহিলার ভ্রাতা ছিলেন আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) ; তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রুবায়্যের দাঁত ভাঙ্গা হইবে ? ইয়া রসুলাল্লাহ ! খোদার কসম—তাহার দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোরআনের আইন ত দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ভাঙ্গিবার প্রতিশোধই ঘোষনা করে।

(কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় বন্দা আনাছের কথাই রক্ষা করিলেন ; রুবায়্যের দাঁত ভাঙ্গিতে হইল না।) বাদী পক্ষ প্রতিশোধ ক্ষমা করিয়া অর্থ বিনিময় গ্রহণে সম্মত হইয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আল্লার বন্দাগণের মধ্যে এমন এমন ব্যক্তিও আছে যাহারা আল্লার উপর ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ তায়ালা সেই কথাকে বাস্তবায়িত করিয়া থাকেন তাহার কসম ভঙ্গ হইতে দেন না।

যায়েদ-ইবনে-আম্র-ইবনে-নোফায়েল

এই লোকটি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে ছিল এবং হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার ইন্তেকালও হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় হযরতের নবুয়ত এবং দ্বীন-ইসলাম ধরা পৃষ্ঠে আসিয়াছিল না, তাই তিনি ইসলামের ছায়া লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের তালাশে তিনি আজীবন চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তৌহীদ তথা একত্ববাদ যাহাকে তৎকালে দ্বীনে-হানীফ বা শেরেক বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম এবং মিল্লাতে-ইব্রাহীম বা ইব্রাহীমের আদর্শ বলা হইত যথাসাধ্য সেই আদর্শের উপর থাকিয়া জীবন কাটাইয়া ছিলেন ; যাহার বিবরণ সম্বলিত ঘটনাই এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদা মক্কার নিকটবর্ত্তী "বালদাহ্" নামক স্থানে যায়েদ-ইবনে-আম্রের সঙ্গে

কোন এক (দাওয়াতের মজলিসে) মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে গোশত জাতীয় খাদ্য পরিবেশন করা হইল। (যেহেতু খাদ্যের ব্যবস্থাকারীগণ কাফের মোশরেক ছিল যাহারা সাধারণতঃ দেব-দেবীর নামে পশু জবেহ করিয়া থাকিত, তাই) নবী (দঃ) ঐ খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর উহা যায়েদ-ইবনে-আমরের সম্মুখে পেশ করা হইল। তিনিও উহা গ্রহণ করিলেন না; তিনি পরিষ্কার বলিলেন, দেব-দেবীর নামে জবেহ্‌কৃত আমি খাই না, আমি একমাত্র আল্লার নামে জবেহকৃতই খাইয়া থাকি।

যায়েদ-ইবনে-আমর সর্ব্বদা কোরায়েশগণকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকিতেন যে, (পশু—যথা) বকরিকে সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উহার খাদ্যও তিনিই জোটাইতেছেন, আর তোমরা সেই বকরিটাকে জবেহ করিতেছ আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামের উপর! ইহা কত বড় জঘণ্য কাজ!

যায়েদ-ইবনে-আমর স্বীয় দেশ মক্কা ত্যাগ করতঃ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন সত্য ধর্ম্মের তালাশে। তথায় এক ইহুদী আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন এবং তাহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী আলেম সাহেব বলিলেন, বর্ত্তমানে আমাদের দ্বীন ও ধর্ম্ম এমন সব জিনিষের সমবায় যে, উহা গ্রহণ করিলে আল্লার গজব অবশ্যই বহন করিতে হইবে। যায়েদ-ইবনে-আম্‌র বলিলেন, আমার শক্তি থাকিতে আমি আল্লার গজব বহনে প্রস্তুত নহি; আমি ত আল্লার গজব হইতে পরিত্রাণেরই চেষ্টা করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের পরামর্শ দান করুন। তিনি বলিলেন, দ্বীনে-হানীফ অবলম্বন কর। দ্বীনে-হানীফ কি তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন! ইহুদী আলেম বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আদর্শ—তিনি এক আল্লার উপাসক ছিলেন, তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাছরাণীও ছিলেন না। অতঃপর তিনি একজন নাছরাণী আলেমের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গেও ঐরূপ আলাপ করিলেন। নাছরাণী আলেম বলিলেন, বর্ত্তমান নাছরাণী দ্বীন অবলম্বন করিলে অবশ্যই আল্লার অভিসাপ বহন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আমার শক্তি থাকিতে আমি আল্লার অভিসপ্ত হইতে প্রস্তুত নহি—উহা হইতেই আমি বাঁচিতে চাই, অতএব আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের খোঁজ দান করুন। ঐ আলেমও তাঁহাকে দ্বীনে-হানীফ বা হযরত ইব্রাহীমের একত্ববাদের আদর্শের কথা বলিলেন। এইসব শুনিয়া যায়েদ ইবনে-আমর সিরিয়া হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং আল্লার দরবারে হাত উঠাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি ইব্রাহীমের আদর্শকেই অবলম্বন করিলাম। অতঃপর তিনি মক্কায় আসিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের সঙ্গে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের মিথ্যা দাবীদার কোরায়েশগণকে ডাকিয়া বলিতেন, তোমরা কখনও হযরত ইব্রাহীমের আদর্শবাদী

নও ; (কারণ, তোমরা হইলে মোশরেক, আর) ইব্রাহীমের আদর্শ ছিল খাঁটী তৌহীদ বা একত্ববাদ। যায়েদ-ইবনে-আমর কাফেরদের আরও অনেক কুকৃতির সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন, যেমন—তাহাদের কেহ তাহার মেয়ে সন্তানকে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া মারিতে চাহিলে তিনি ঐ মেয়েকে উদ্ধার করিয়া নিয়া আসিতেন এবং তাহাকে লালন পালন করিতেন। অতঃপর সে বয়স্কা হইলে মেয়ের পিতাকে যাইয়া বলিতেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার মেয়ে নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার ব্যয় ভার বহন করিয়া যাইব !

ব্যাখ্যা—যায়েদ-ইবনে-আমর ইসলামের যুগ পাইয়াছিলেন না, তাই তিনি সর্ব্বাঙ্গীন মোসলমান হইতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু তিনি অন্ধকার যুগের একেশ্বরবাদী ছিলেন, সুতরাং তিনি নাজাত পাইবেন এবং বেহেশত লাভ করিবেন।

আমের ইবনে রবিয়া'হ (রাঃ) নামক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলামের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে) যায়েদ-ইবনে-আমর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি আমার জাতির ধর্ম্মের বিরোধী, আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের আদর্শপন্থী, তাঁহারা যেই মা'বুদের বন্দেগী করিতেন আমি একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করি এবং আমি ইসমাঈলের বংশীয় ভাবী নবীর অপেক্ষায় আছি। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব কাল আমি পাইব বলিয়া আশা নাই ; অবশ্য আমি তাঁহার প্রতি ঈমান রাখি, তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করি এবং সাক্ষ্য দেই যে, তিনি পয়গাম্বর। হে আমের ! তুমি যদি সেই নবীর সঙ্গ লাভ করিতে পার তবে তাঁহাকে আমার সালাম জানাইও।

আমের (রাঃ) বর্ণনা কবিয়াছেন, আমি ইসলামের ছায়া লাভ করিয়া হযরত নবী (দঃ)কে যায়েদ ইবনে আমরের ঘটনা শুনাইলাম। হযরত (দঃ) তাঁহার সালামের উত্তর দান করিলেন, তাঁহার জন্য রহমতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে মান-গরীমার সহিত চলাফেরা করিতে দেখিয়াছি।

যায়েদ ইবনে আমর-এর পুত্র সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) একজন অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। "আ'শারা-মোবাশ্‌শারাহ্" তথা যে দশ জন ছাহাবী সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশতী হওয়ার ঘোষণা জারী করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার একজন ছিলেন এবং তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁহারই ইসলাম সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) স্বয়ং তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন (৫৪৫ পৃঃ)—

والله لقد رأتنى وان عمر لموثقى على الاسلام قبل ان يسلم عمر

"ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে হাত-পা বাঁধিয়া প্রহার করিয়াছিলেন।"

সালমান ফারেসী (রাঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে অতি প্রাচীনতম মানুষ ছিলেন তিনি। হযরতের ইহজগত ত্যাগের পঁচিশ বৎসর পর তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২৫০ বৎসর ছিল, কাহারও মতে ৩৫০ বৎসর ছিল। তিনি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান এলাকাভুক্ত রামহরমুজ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অগ্নিপূজক বংশের লোক ছিলেন। সত্য ধর্ম্মের তালাশে দেশ-খেস হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সর্ব্বশেষ নবীর আবির্ভাব কাল ও স্থানের খোজ তিনি পাইয়াছিলেন, তাই মদিনার উদ্দেশ্যে তিনি ছফর করিতেছিলেন। বিদেশী নিঃসম্বল পাইয়া তাঁহাকে দুষ্কৃতিকারীগণ ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছিল, এমনকি তিনি ক্রীতদাসরূপে দশ জনের অধিক মনীবের হস্ত-বদল হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্য এইরূপে হয় যে, তিনি এক মদিনাবাসী ইহুদীর হস্তে বিক্রিত হইয়া মদিনায় পৌঁছিতে সক্ষম হন।

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার ইতিহাস তাঁহার মুখেই বর্ণনা করিয়াছেন—

إِنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ

"(দশের অধিক—তের বা ততোধিক) মনীবের হস্ত-বদল হইয়াছিলেন তিনি।"

মোছনাদে-আহমদ ও শামায়েল-তিরমিজী কেতাবে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে। স্বয়ং সালমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি পারস্যের ইস্পাহান অধিবাসী। আমার পিতা তথাকার বড় জমিদার বা রাজা ছিলেন। আমি তাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলাম। অতিশয় আদর মমতার দরুন তিনি আমাকে নিজ গৃহে আবদ্ধরূপে রাখিয়াছিলেন, কোথাও বাহিরে যাইতে দিতেন না, আমি পূজার অগ্নি রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলাম। আমার পিতার বিশাল খামার ছিল, একদা তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ আমাকে তাঁহার খামার দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। পথিমধ্যে আমি নাছরাণীদের একটি উপাসনালয় গির্জ্জা হইতে কিছু পাঠ করার শব্দ শুনিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলাম এবং দেখিলাম, কতিপয় নাছরাণী তথায় নামায পড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও বাহিরে আসিবার এবং লোকদেরে দেখার সুযোগই পাইয়া ছিলাম না। তাহাদের নামায পড়া আমার নিকট খুবই ভাল লাগিল, তাই আমি আমার পিতার আদেশ ভূলিয়া গিয়া তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবদ্ধ রহিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ধর্ম্মের প্রসার কোন

দেশে ? তাহারা বলিল, সিরিয়ায়। অতঃপর আমি বাড়ী ফিরিলাম, এদিকে আমার পিতা আমার খোঁজে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ী পৌঁছিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খামারে না যাইয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে ? আমি তাঁহাকে গির্জ্জায় উপস্থিত হওয়ার ঘটনা শুনাইলাম এবং বলিলাম যে, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমার অতিশয় পছন্দ হইয়াছে তাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায়ই কাটাইয়াছি। তিনি বলিলেন, হে বৎস! ঐ ধর্ম্মের কোন সার নাই, তোমার বাপ-দাদার ধর্ম্মই উত্তম। আমি বলিলাম, না—ঐ ধর্ম্মই উত্তম। এতদ্দৃষ্টে আমার পিতা আমার প্রতি শঙ্কিত হইয়া আমার পায়ে শিকল লাগাইয়া দিলেন। আমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি গির্জ্জার লোকদিগকে সংবাদ পাঠাইলাম যে, সিরিয়ায় যাত্রী কোন কাফেলার খোঁজ পাইলে আমাকে অবহিত করিবে। কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা আমাকে সেই খোঁজ দান করিল। যে দিন কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইবে সেই দিন আমি পায়ের শিকল খুলিয়া ফেলিয়া কাফেলার সঙ্গে পলায়ন করিলাম এবং সিরিয়ায় পৌঁছিয়া গেলাম। তথায় আমি এক প্রধান পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণের এবং তাহার খেদমতে থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার আগ্রহ জানাইলাম, সে আমাকে তাহার নিকটে রাখিল। সে অত্যন্ত জঘণ্য মানুষ ছিল—লোকদিগকে দান-খয়রাতের ওয়াজ শুনাইত। লোকজন তাহার নিকট দান-খয়রাত আনিয়া দিলে সে তাহা গরীব-মিছকীনগণকে দিত না, নিজেই সব আত্মসাৎ করিত। এইভাবে সে সাত মটকি স্বর্ণ-রৌপ্য ভর্ত্তি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। লোকজন তাহাকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করিল। আমি তাহাদিগকে তাহার অপকর্ম্ম অবহিত করিলাম এবং লুক্কায়িত স্বর্ণ-রৌপ্য দেখাইয়া দিলাম। তাহারা তাহার দুষ্কার্য্যে ক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার লাশ শূলি কাষ্ঠে লটকাইয়া প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিল। অতঃপর তাহার স্থলে অন্য একজন পাদ্রী নিয়োগ করা হইল। তিনি ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, দুনিয়ার লিপ্সাহীন, আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁহার সহিত আমার অতিশয় ভালবাসা জন্মিল। তাঁহার যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে কি আদেশ করেন ? আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব ? তিনি বলিলেন, বর্ত্তমানে খাঁটী ধর্ম্ম কোথাও নাই, সকলেই ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইরাকের "মাওসেল" এলাকায় একজন খাঁটী খৃষ্ট ধর্ম্মীয় পাদ্রী আছেন, তুমি তাঁহার নিকট চলিয়া যাইও। সেমতে আমি তথায় চলিয়া গেলাম এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইয়া আমি তাঁহার নিকটে থাকিলাম, বাস্তবিকই তিনিও ঐরূপ উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু উপস্থিত হইল। তাঁহাকে আমি ঐরূপ বলিলাম, তিনিও উক্ত

পাদ্রীর ন্যায় মন্তব্য করিলেন এবং আমাকে ইরাকেরই "নছীবীন" এলাকার এক পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদ্রীর নিকট থাকিলাম, তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি আমাকে "আমুরিয়া" নামক স্থানের পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদ্রীর নিকট থাকিলাম এবং তথায় আমি সঞ্চয়ের দ্বারা কিছু পশুপাল সংগ্রহ করিলাম। তাঁহার মৃত্যু উপস্থিতিতে তাঁহাকে অন্য কাহারও খোঁজ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার নিকট খাঁটী একটি প্রাণীরও খোঁজ নাই, যাহার নিকট আশ্রয় লওয়ার পরামর্শ আমি তোমাকে দান করিব। অবশ্য এক নূতন নবীর আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে, যিনি হযরত ইব্রাহীমের খাঁটী একেশ্বরবাদী আদর্শ নিয়া আসিবেন, আরবে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় জমি আর মধ্যস্থলে খেজুর বাগানের আধিক্য—এইরূপ একটি এলাকায় হিজরত করিয়া তথায় বসবাস করিবেন। সেই নবীর নিদর্শন এই হইবে যে, তিনি হাদিয়া বা উপঢৌকন স্বরূপ খাদ্য সামগ্রী দিলে তাহা খাইবেন, কিন্তু ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাইবেন না। এবং তাঁহার স্কন্দে "মোহরে-নবুয়ত" থাকিবে। যদি তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তুমি সেই দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করিও।

তাঁহার মৃত্যুর পর আমি কিছু দিন তথায় অবস্থান করিলাম ; অতঃপর আরবের একদল বণিকের সাক্ষাৎ হইল, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যদি আমাকে তোমাদের দেশে নিয়া যাও তবে আমি তোমাদিগকে আমার পশুপাল সব দিয়া ফেলিব। তাহারা রাজি হইল এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা "ওয়াদিল-কোরা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অন্যায় ভাবে আমাকে ক্রীতদাস-রূপে এক ইহুদীর নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি একজন হইতে অপরজনের নিকট বিক্রি হইতে লাগিলাম। এমনকি তের বা ততধিক মনিবের হাত-বদল হইলাম।

অবশেষে আমি এক মদিনাবাসী ইহুদীর নিকট বিক্রিত হইয়া মদিনায় পৌঁছিলাম। মদিনার এলাকা দেখিয়া আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, ইহাই ঐ স্থান যাহার কথা আমাকে পাদ্রী বলিয়াছিলেন। তখনও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে মদিনায় আসেন নাই। আমি অতি যত্নের সহিত তাঁহার প্রতিক্ষায় ব্যাকুল থাকিলাম। একদা আমি আমার মনিবের উপস্থিতিতে খেজুর গাছের উপরে কাজ করিতে ছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া আমার মনিবকে সংবাদ দিল যে, কোবা মহল্লায় মক্কা হইতে একজন লোক আসিয়াছে সে নবী বলিয়া দাবী করে। বৃক্ষের উপর হইতে আমি এই কথা শুনিতে পাইলাম এবং আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, এমনকি বৃক্ষ

হইতে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কোন প্রকারে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া মনিবকে সংবাদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মুষ্ঠাঘাত করিয়া বলিল, তুই তোর কাজে থাক, এই সংবাদের তোর আবশ্যক কি?

আমি ত শুনিয়াই ফেলিয়াছি যে, নবী বলিয়া পরিচয় দানকারী এক ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাই বিকাল বেলা আমি কিছু খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া কোবা মহল্লায় উপস্থিত হইলাম এবং উহা হযরতের সম্মুখে পেশ করিলাম। হযরত (দঃ) উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি বলিলাম, ইহা ছদকাহ্ বা দান। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) উহা সঙ্গীগণকে দিয়া দিলেন, নিজে উহা খাইলেন না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, একটি নিদর্শন ঠিক হইল যে, তিনি ছদকাহ-খয়রাত নিজে ব্যবহার করেন না। আর একদিন আমি কিছু খাদ্য সামগ্রী তাঁহার নিকট পেশ করিয়া বলিলাম, আপনি ছদকাহ-খয়রাত ব্যবহার করেন না দেখিয়া অদ্য আমি ইহা আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিতেছি। হযরত (দঃ) নিজে সঙ্গীগণ সহ উহা খাইলেন। আমি ভাবিলাম দুইটি নিদর্শন ঠিক হইল। অতঃপর একদিন তিনি বসিয়াছিলেন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার পিছন দিকে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কাঁধের কাপড় হটাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার মোহরে-নবুয়ত দেখিলাম এবং শ্রদ্ধার সহিত চুম্বন করতঃ কাঁদিয়া উঠিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে সম্মুখে আনিলেন, আমি তাঁহাকে আমার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী শুনাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

ক্রীতদাসরূপে ইহুদীর হস্তে আবদ্ধ থাকায় স্বাধীনতার সহিত হযরতের সাহচর্য্যতা লাভ করা সম্ভব হইতে ছিল না, এমনকি বদর এবং ওহোদ জেহাদেও আমি শরীক হইতে পারি নাই। তাই হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি 'মোকাতব' তথা বিনিময় আদায়ের শর্ত্তে মুক্তি লাভের চুক্তি করিয়া নেও। সেমতে আমি আমার মনিবের সঙ্গে আলাপ করিলে সে আমার মুক্তির জন্য দুইটি শর্ত্ত আরোপ করিল—(১) তিন বা পাঁচ শত খেজুর গাছের চারা সঞ্চয় করতঃ উহা রোপণ করিয়া ঐসব গাছে ফল আসা পর্য্যন্ত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। (২) চল্লিশ "উক্কিয়া" তথা ৬ সেরের অধিক পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিতে হইবে—এই দুই শর্ত্ত পূর্ণ করিলে পর আমি মুক্তি লাভ করিব বলিয়া চুক্তি হইল। হযরত (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, খেজুরের চারা প্রদান করিয়া তোমরা সকলে সালমানকে সাহায্য কর। সেমতে পাঁচটা দশটা করিয়া কতেক জনে খেজুরের চারা আমাকে প্রদান করিলেন, তিন বা পাঁচ শত খেজুর চারা জমা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, গাছ রোপণ করার গর্ত্ত তৈরী কর। অতঃপর হযরত (দঃ) তথায় আসিয়া নিজ হস্তে গাছগুলি রোপণ

করিলেন ; শুধু একটি গাছ ওমর(রাঃ) রোপণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরত এক বৎসরেই ঐ গাছগুলিতে ফল ধরিল। অবশ্য যেই গাছটি ওমর (রাঃ) রোপণ করিয়াছিলেন উহাতে এক বৎসরে ফল না ধরায় হযরত (দঃ) উহাকে উঠাইয়া পুনঃ রোপণ করিলে পর ঐ বৎসরই উহাতে ফল আসিয়া গেল—এইভাবে প্রথম শর্ত্ত পূর্ণ হইল।

এদিকে হযরতের নিকট কোথাও হইতে মুরগির ডিমের আকার ও পরিমাণ একটি স্বর্ণ চাকা উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা সালমানকে দিয়া দাও এবং হযরত আমাকে উহা দ্বারা আমার মুক্তির শর্ত্ত পূরণ করিতে বলিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার জিম্মায় যে পরিমাণ স্বর্ণ রহিয়াছে ইহা দ্বারা ত উহার কিছুই হইবে না। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিবেন। বাস্তবিকই যখন শর্ত্ত আদায় করার জন্য উহা ওজন দেওয়া হইল তখন ইহা চল্লিশ উকিয়া পরিমাণ দেখা গেল। এইরূপে উভয় শর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল এবং আমি আজাদ ও মুক্ত হইয়া গেলাম।

পাঠকবর্গ! সত্যের সাধনায় জয় লাভের নিশ্চয়তা দেখার উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন সালমান ফারেসী (রাঃ)। বাস্তবিকই সত্যের জন্য খাঁটীভাবে সাধনা করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জয়ী করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে—وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যাহারা আমাকে লাভ করার জন্য আমার পথে সাধনা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে আমি তাহাদের জন্য অবশ্যই আমার পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথ সুগম করিয়া দিব।"

بود موری هوس داشت که در کعبه رسید
دست بر پای کبوتر زد و ناگاه رسید

"এক পিপীলিকা কা'বা শরীফের দ্বারে পৌঁছিবার খাঁটী আকাঙ্খা করিতেছিল ; তাহার নিকটে একটি কবুতর বসিল ; সে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। কবুতরটি উড়িতে উড়িতে কা'বা ঘরের নিকট চলিয়া গেল, পিপীলিকার আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রাঃ) এস্থলে উল্লেখিত ছাহাবীগণ ছাড়া আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণের মর্ত্তবা ও ফজিলত সম্পর্কীয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—তাল্‌হা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ), উসামা (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আম্মার ও হোযায়ফা (রাঃ), আবু-ওবায়দাহ (রাঃ), খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ), সালেম মওলা হোজায়ফা (রাঃ), মোয়া'বিয়া (রাঃ), মোয়া'জ ইবনে জাবাল (রাঃ), সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), আবু তাল্‌হা (রাঃ), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হোযাফা (রাঃ), হিন্দ বিনতে ওতবা (রাঃ)।

কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কীয় সমুদয় হাদীছের অনুবাদ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের তফছীর*

১৮৮০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে (পবিত্র কোরআনের) ক্বেরাত-বিশেষজ্ঞ হইলেন উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ) এবং বিচার ও আইন বিশেষজ্ঞ হইলেন আলী (রাঃ)। এতদ সত্ত্বেও আমরা উবাই ইবনে-কায়া'বের একটা মতবাদের বিরোধিতা করিয়া থাকি—তিনি বলিয়া থাকেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে যে কোন শব্দ বা বাক্য একবার (কোরআনরূপে) শুনিয়াছি উহাকে কখনও ছাড়িব না। (পবিত্র কোরআনে উহাকে সর্ব্বদার জন্য বিদ্যমান রাখিবই।)

ওমর (রাঃ) উক্ত মতবাদেরই বিরোধিতা করেন এবং উহা খণ্ডনের প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا........

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে সরাসরি কোরআন শরীফের শিক্ষা লাভকারী—যাঁহাদের সম্মুখে কোরআন শরীফ নাযেল হইয়াছিল অর্থাৎ ছাহাবীগণ তাঁহাদেরই বিবৃতি দ্বারা প্রমাণিত আছে, কতিপয় বাক্যাবলী এমন আছে যাহা প্রথমে কোরআনরূপে নাযেল হইয়া ছিল, কিন্তু পরে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশক্রমেই ঐ সবের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সম্পর্কে শরীয়তের যে সব বিশেষ নির্দ্দেশাবলী রহিয়াছে তাহা ঐ সব বাক্যাবলীর উপর প্রযোজ্য থাকে নাই। যেমন নামাযের মধ্যে ক্বেরাত তথা কোরআনের কোন অংশ পাঠ করা ফরজ রহিয়াছে, সেস্থলে ঐ ধরণের বাক্যাবলী দ্বারা নামাযের সেই ফরজ আদায় হইবে না। এই শ্রেণীর বাক্যাবলী কেতাবে সংগৃহিত রহিয়াছে—(আল্-এতক্বান, ২—২৫ দ্রষ্টব্যঃ)

---

* পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতের তফছীর ও বিভিন্ন তথ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ঐরূপ হাদীছ বয়ান করা হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রিতরূপে গ্রন্থাকারে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে সেইরূপ প্রচেষ্টা চালান হইলে পর এই সমস্যা দেখা দিল যে, উপরোল্লেখিত শ্রেণীর বাক্যাবলী কোরআনের মধ্যে শামিল করা হইবে কি না? এক্ষেত্রে উবাই ইবনে-কায়া'ব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, কোরআনরূপে যাহা একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনা গিয়াছে কোরআনের মধ্যে তাহা সবই শামিল থাকিবে। তিনি যেন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হওয়ার বিষয়টিকেই অস্বীকার করিতেন। ওমর (রাঃ) উহারই বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, কোরআন শরীফের কোন কোন অংশ মনছুখ বা রহিত করার নীতি ছিল। অতএব যে যে অংশের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে উহা কোরআনে শামিল থাকিবে না। মূল দাবীর প্রমাণে ওমর (রাঃ) নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন—ছুরা বাক্কারাহ প্রথম পারা ১৩ রুকুর আয়াত—

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا........

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি কোন আয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিলে কিম্বা হৃদয়পট হইতে মুছিয়া দিলে, অবশ্যই উহার স্থলে উহা অপেক্ষা উত্তম বা অন্ততঃ উহার সমতুল্য (কিন্তু অধিক সময়োপযোগী) আর একটি প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়া থাকি। তোমরা কি জান না যে আল্লাহ সব কিছুরই ক্ষমতা রাখেন এবং বিশ্বজোড়া আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই। আর আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের জন্য ঐরূপ বন্ধু ও সাহায্যকারী কেহ নাই। (একটি রহিত করিয়া অপরটি প্রবর্ত্তন করা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতেই হইয়া থাকে)।

তফছীর ঃ– কোন একটি সুদীর্ঘ বাণী বা প্রবন্ধের সঙ্কলক সাধারণতঃ স্বীয় বাণী ও প্রবন্ধের কোন কোন অংশ বাদ দিয়া, রহিত করিয়া বা রদ-বদল করিয়া থাকেন। এমনকি সম্পূর্ণ শুদ্ধ বিষয়ের কোন অংশ বা বাক্যকেও যে কোন সূক্ষ্ম কারণ বা শুধু স্বীয় নৈপুণ্যতাবলে পঠিত ও প্রচারিত রূপ হইতে বাদ দিয়া দেন; তখনও উহার মূল বিষয়বস্তু তাহার স্বীকৃত ও সমর্থিতই থাকে। তদ্রূপ চিকিৎসকও তাঁহার ব্যবস্থা-পত্রে এবং ঔষধ তালিকায় পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বা স্বীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা বলে। এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় পরিগণিত; ইহার কোন সমালোচনা কখনও করা হয় না।

অসীম জ্ঞান-গুণ, নৈপুণ্য-দক্ষতা এবং দয়া ও দরদের অধিকারী মহান আল্লাহ তায়ালাও স্বীয় কালাম ও সুদীর্ঘ বাণী পবিত্র কোরআনের মধ্যে ঐ শ্রেণীর নিপুণতা

ও মানবের প্রতি স্বীয় করুণা দেখাইয়াছেন এবং সেই ধরনের রহস্যজনক সূত্রেই উহাতে কিছু রদবদল সংঘটিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।* অবশ্য মানুষের রদবদল ও পরিবর্ত্তন ত অনেক সময় অজ্ঞতা, বিভিন্ন দুর্ব্বলতা বা অসতর্কতা সূত্রের ভুল-শুদ্ধিরূপেও হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ মহান আল্লাহ তায়ালার কালামে ঐ ধরণের রদবদলেয় কোন সম্ভাবনাই নাই।

পবিত্র কোরআনে মন্‌ছুখ বা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক রদবদলের প্রকার বিভিন্ন রহিয়াছে। আগ্রহশীল লোকগণ বিজ্ঞ আলেম বা তাঁহাদের রচিত জ্ঞান-ভাণ্ডার মারফৎ উহা জ্ঞাত হইতে পারেন।

উল্লেখিত আয়াতে দুইটি বস্তু রহিয়াছে—একটি হইল মন্‌ছুখ করা, এস্থলে পরিবর্ত্তিত ও প্রবর্ত্তিত উভয়টিই লোকদের গোচরে ও জ্ঞানে বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল—হৃদয়পট হইতে মুছিয়া দেওয়া, এস্থলে পরিবর্ত্তিত বিষয়বস্তু সকলের এমনকি স্বয়ং রসুলের গোচর ও জ্ঞান হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন—বর্ত্তমান ৭৩ আয়াত সম্বলিত ছুরা আহ্‌জাবটি আয়েশা (রাঃ) ও উবাই-ইবনে-কায়া'ব (রাঃ)-এর বয়ান অনুযায়ী প্রায় ছুরা-বাক্কারাহ পরিমাণ ২০০ আয়াতের ছিল। এই শ্রেণীর আরও কতিপয় তথ্য বর্ণিত আছে। (আল-এতক্কান ২—২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৮৮১। হাদীছঃ— ওমর (রাঃ) আনন্দ প্রকাশে বলিতেন, তিন ক্ষেত্রে প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশ ও বিধান আমার অভিলাস অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—

(১) হজ্জ ও ওমরা আদায়ে তওয়াফ করার পর যে দুই রাকাত নামায পড়ার বিধান রহিয়াছে সেই নামায "মকামে-ইব্রাহীম" নামক প্রস্তরটি যথায় রক্ষিত উহার নিকটবর্ত্তী আদায় করার বাসনা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলাম; ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাজেল হইল—

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"মাকামে-ইব্রাহীমকে (বিশেষ সময়ে) নামাযের স্থান বানাও।" (১ পাঃ ১৫ রুঃ)

(২) একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার নিকট ভাল-মন্দ সব রকম লোকই আসিয়া থাকে। (আপনার বিবি—) মোছলেম-জননীগণকে

* আয়াতের শানে-নজুল এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইসলামের বিধানপত্র পবিত্র কোরআনের কোন কোন বিষয় মনছুখ বা রদবদল হইতে দেখিয়া কাফেরগণ বিদ্রূপ করিতে লাগিল—মোসলমানদের খোদা ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, কি বিধান প্রবর্ত্তন করিবেন। এই অযৌক্তিক বিদ্রূপের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত নাযেল হইয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, এই রদবদল ভুল-ত্রুটিজনিত বা অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা প্রসূত রদবদল নহে, বরং বিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও স্নেহ-মমতা সূত্রের রদবদল।

পর্দ্দায় থাকিবার আদেশ করিলে ভাল হয়। ইতি মধ্যেই পর্দ্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযেল হইল।

(৩) বিবিগণের কাহারও কাহারও আচরণে নবী (দঃ) ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রতি নারাজ হইলেন। আমি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদের নিকট গেলাম এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিলাম যে, আপনারা এইরূপ আচরণ হইতে বিরত না থাকিলে আল্লাহ তায়ালা নবী (দঃ)কে আপনাদের স্থলে উত্তম বিবি দান করিবেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বিবির নিকট এই সতর্কবাণী লইয়া পৌছিলে তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,, হে ওমর রসুলুল্লাহ (দঃ) কি তাঁহার বিবিগণকে উপদেশ দান করিতে পারেন না? যদ্দরুন আপনি উপদেশ খয়রাত করিতে আসেন!

ইতিমধ্যেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিলেন—

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ -

হে নবী-পত্নিগণ! "তোমাদিগকে যদি নবী তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ অচিরেই এরূপ করিতে পারিবেন যে, তোমাদের পরিবর্ত্তে উত্তম পত্নি তাঁহাকে দান করেন।" (২৮ পাঃ ১৯ রুঃ)

১৮৮২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ইহুদী-নাছারা আহলে-কেতাবগণ তাহাদের হিব্রু ভাষার তৌরাত কেতাব আরবী ভাষায় তরজমা করিয়া মোসলমানদিগকে শুনাইয়া থাকিত। সে সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে বলিলেন, আহ্‌লে-কেতাবদের ঐসব পঠিত বিষয়াবলী (নিজের কেতাব ও রসুলের দ্বারা সত্য প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে) সত্যরূপেও গ্রহণ করিও না এবং (মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে) মিথ্যাও বলিও না, বরং (ঐ সবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিয়া) তাহাদিগকে ঐ ঘোষণাই শুনাইয়া দাও যাহা তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে শিক্ষা দিয়াছেন। ছুরা বাকারাহ ১ম পারা ১৬ রুকুর আয়াত—

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا......

তফছীর :—আহ্‌লে-কেতাব—ইহুদী-নাছারাগণ মোসলমাগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্ম অবলম্বনের প্রতি আকৃষ্ট করিত। তাহাদের হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আল্লাহ তায়ালা এই শিক্ষা দিয়াছেন—হে মোসলমানগণ! তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের স্পষ্ট ঘোষণা শুনাইয়া দাও যে, আমরা তোমাদের

কথার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিব না। তোমরা ত দাবী কর আল্লার প্রতি ঈমান রাখার, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের দাবী মিথ্যা। তাই তোমরা আল্লার নির্দ্দেশাবলী মান্য কর না, তাঁহার অনুগত হও না, তাঁহার সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করিয়া থাক। আমরা তোমাদের ন্যায় নহি, বরং আমরা সঠিকরূপে আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং (তাঁহার সর্ব্বশেষ রসুল মারফৎ) আমাদের নিকট যে কেতাব প্রেরণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

বিধর্ম্মীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেস্থলে বাঁচিবার সহজ উপায় ইহাই যে, সকল প্রকার inferiority complea আত্ম-হেয়তাকে এড়াইয়া মুখে, মনে এবং কার্য্যে স্বীয় খাঁটী ঈমানের ঘোষণা করিলে জ্বিন জাতীয় ও মানুষ জাতীয়—সকল প্রকার শয়তানই পালাইতে বাধ্য হইবে। দুঃখের বিষয় অধুনা আমাদের নব্য শিক্ষিত ভাইগণ বিধর্ম্মীদের মোকাবিলায় ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দিতেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও হেয়তা অনুভব করিয়া থাকেন ; ইহাই তাহাদের বিভ্রান্ত হওয়ার মূল কারণ।

১৮৮৩। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া আনা হইবে, তিনি পূর্ণ আদব ও তাওআজুর সহিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে হাজির হইবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি স্বীয় উম্মৎকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি ? তিনি বলিবেন, হাঁ। অতঃপর তাঁহার উম্মৎগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, নূহ (আঃ) তোমাদিগকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি ? তাহারা বলিবে, (সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া) সতর্ককারী কোন মানুষই আমাদের নিকট আসিয়াছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার দাবীর উপর কোন সাক্ষী আছে কি ? তিনি বলিবেন, হাঁ—আমার সাক্ষী মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মৎ। সেমতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মৎগণ সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আঃ) তাঁহার উম্মৎকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন।

(এই সাক্ষ্যের উপর জেরা করা হইবে—তোমাদের যুগ ত অনেক পরের যুগ ; পূর্ব্বের যুগের বিষয় বস্তু তোমরা কিরূপে জানিতে পারিলে ? উত্তরে উম্মতে মোহাম্মদীগণ বলিবে, আমাদের রসুল (দঃ) আমাদিগকে এই তথ্য জ্ঞাত করিয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলাম।) রসুলুল্লাহ (দঃ) ও তোমাদের উক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দান করিবেন। ইহাই হইল এই আয়াতের মর্ম্ম।

وكذلك جعلناكم امة وسطا ...

তফছীর ঃ— ছুরা বাকারাহ দ্বিতীয় পারা প্রথম রুকুর এই আয়াত—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

এই আয়াতের পূর্ব্বে আল্লাহ তায়ালা কেবলা পরিবর্ত্তনের ঘোষণা বর্ণনা করিয়াছেন। বহু শতাব্দী হইতে বনী-ইসরাইলের সমস্ত নবীগণের শরীয়তে যে কেবলা প্রচলিত ছিল, তথা বাইতুল মোকাদ্দাস আজ হইতে উহার স্থলে বাইতুল্লাহ বা কা'বা শরীফকে কেব্‌লা নির্দ্ধারিত করা হইল। বনী-ইসমাঈলের একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের জন্য এই কেব্‌লা প্রবর্ত্তিত হইল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা একটি দিকের পরিবর্ত্তন ছিল মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি বিরাট পরিবর্ত্তন ও রদবদলের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পর হইতে ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব বরং জাগতিক নেতৃত্বও বনী-ইসরাঈলদের হাতে চলিয়া আসিতেছিল। হযরত ঈছা আলাইহেচ্ছালামের যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বনী-ইসরাঈলগণ অগণিত অপরাধের শিকার হইয়াছে। তাহাদের অপরাধের কতিপয় নমুনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার পর আল্লাহ তায়ালা কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের ঘোষণা দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, নেতৃত্ববাহী জাতি বনী-ইসরাঈলগণ এই ধরনের অপরাধে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের হাত হইতে নেতৃত্ব ছিনাইয়া বনী-ইসমাঈল তথা হযরত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাহার উম্মতের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উহারই প্রভাবে সেই অপরাধী নেতৃত্ববাহীদের সর্ব্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত কেব্‌লা পরিবর্ত্তন করিয়া উম্মতে মোহাম্মদীর নিজস্ব কেব্‌লা প্রবর্ত্তিত হইল। সুতরাং কেব্‌লা পরিবর্ত্তন বিষয়টি শুধুমাত্র দিকের পরিবর্ত্তনই ছিল না, বরং ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব উহার সুদীর্ঘকালের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে আসিল—কেব্‌লা পরিবর্ত্তন বিষয়টি উহারই ইঙ্গিত, নিদর্শন ও জয়ধ্বনি।

উম্মতে মোহাম্মদীর এই বিরাট মান-মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত বহনকারী বিষয়টি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিতেছেন, وكذلك جعلنا كم...... অর্থাৎ—তোমাদিগকে দুনিয়াতে নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি, আবার মোহাম্মাদুর রসুলুল্লার সাহচর্য ও শিক্ষার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই নেতৃত্বের উপযোগী গুণ-জ্ঞানেরও সমাবেশ করিয়াছি। তোমাদের এই

ইহকালীন মান-মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায় পরকালেও তোমরা এক উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী হইবে। তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী (নবীগণের পক্ষে তাঁহাদের উম্মতী) লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানকারী হইবে এবং সে সম্পর্কে তোমাদের রসুল (দঃ) তোমাদের সমর্থনে সাক্ষ্য দান করিবেন, ইহা কত বড় মর্য্যাদা ও সম্মান!

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"হে মোমেনগণ তোমাদের উপর রোযা ফরজ হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের উপর ফরজ হইয়াছিল।" (২ পাঃ ৭ রুঃ)

যথা—হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের উপর মহরমের ১০ তারিখ তথা আশুরার রোযা ফরজ ছিল। ঐ রোযা ইসলামের প্রথম যুগে আমাদের নবীজীর উম্মতের উপরও ফরজ ছিল; রমজানের রোযা ফরজ হইলে আশুরার রোযা ফরজ থাকে নাই, অবশ্য উহার অনেক ফজীলত এখনও বাকি আছে এবং উহা ছুন্নত। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য

১৮৮৪। হাদীছ:—আশ্‌আছ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট আসিলেন তখন তিনি খানা খাইতে ছিলেন। আশ্‌আছ (রঃ) বলিলেন, আজ ত আশুরার দিন! আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, রমজানের রোযা ফরজ হইবার পুর্ব্বে এই আশুরার রোযা (ফরজরূপে) রাখা হইত। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব তুমিও আস এবং খাওয়ায় অংশ গ্রহণ কর।

২ পাঃ ৭ রুঃ ১৮৪ তম আয়াতের মধ্যবর্ত্তী অংশের অর্থ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর পঠন অনুযায়ী এই—"রোযা রাখা যাহাদের শক্তির বাহিরে তাহারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করিবে।

১৮৮৫। হাদীছ:—আতা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত সুযোগ রহিত হয় নাই এখনও উহা প্রচলিত। কোন পুরুষ বা মহিলা যদি এরূপ বৃদ্ধ হইয়া যায় যে, সে রোযা রাখায় সক্ষমই নহে তবে সে প্রতি দিন রোযার বিনিময়ে এক মিছকিনকে দুই ওয়াক্ত পরিপূর্ণরূপে খাওয়াইয়া দিবে।

১৮৮৬। হাদীছ: - আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধারণতঃ এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও ভাল অবস্থায় রাখ, আখেরাতেও ভাল অবস্থায় রাখিও। আর আমাদিগকে দোযখের আজাব হইতে বাঁচাইও।"

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা নবম রুকুর মধ্যে উক্ত দোয়াটি উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে শুধু হজ্জ উপলক্ষে উক্ত দোয়া করার উল্লেখ আছে। আলোচ্য হাদীছে ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বলিতেছেন, হযরত নবী (দঃ) হজ্জ উপলক্ষ ছাড়া অন্যান্য সময়েও এই দোয়া করিয়া থাকিতেন।

১৮৮৭। **হাদীছ ঃ**— নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ-ইবনে ওমর (রাঃ) (অত্যধিক আদব-তাজিম ও মগ্নতার সহিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া থাকিতেন।) কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করিলে উহা হইতে অবসর না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই বলিতেন না।

একদা আমি কোরআন শরীফ খুলিয়া তাঁহার কণ্ঠস্থ পড়া শুনিতেছিলাম। তিনি ছুরা বাক্বারাহ পড়িতে ছিলেন। যখন (نساؤكم حرث لكم) এইস্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক নীতির বিপরীত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, জান কি এই আয়াত কি বিষয়ে নাযেল হইয়াছে ? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, পশ্চাৎদিক হইতে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযেল হইয়াছে।

১৮৮৮। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ প্রবাদ ছিল যে, কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিক হইতে স্ত্রী সহবাস করিলে সন্তান টেক্‌রা হয় ; উহারই প্রতিবাদে এই আয়াত নাজিল হইয়াছে—

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم

তফছীর ঃ—ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা ১২ রুকুর এই আয়াত—

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করিয়াছেন, ঋতুকালে স্ত্রীসহবাসের ধারে-কাছেও যাইও না যাবৎ না স্ত্রী পাক হইয়া যায়। স্ত্রী ঋতু হইতে পাক হইলে পর তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পার ঐ পথে যে পথে আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে।)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য মানব-বীজ বপনের ক্ষেত্র ; সেমতে তোমরা তোমাদের বীজ-বপন ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিতে পার যে অবস্থায় বা যেদিক হইতে ইচ্ছা কর।" অর্থাৎ সহজ ও সরল তথা সম্মুখদিক ছাড়া যদি কোন অসুবিধাকে এড়াইবার জন্য পশ্চাৎদিক হইতে ব্যবহার করিতে চাও তাহাতেও কোন দোষ হইবে না।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আয়াতের মর্ম্ম শুধু দিকের স্বাধীনতা অর্থাৎ সম্মুখদিক হইতে বা পশ্চাৎ দিক হইতে উভয় দিক হইতেই অনুমতি রহিয়াছে,

কিন্তু উভয় অবস্থায়ই মূল কার্য্য-স্থান একমাত্র আল্লার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে হইবে এবং উহা হইল "জননেন্দ্রিয়"; একমাত্র উহাই মানব-বীজ বপনের স্থান। স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গেও মল দ্বারে সহবাস করা সকল ইমামগণের মতেই হারাম।

১৮৮৯। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোরআন একত্রে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধকারী) ওসমান (রাঃ)কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم......

আয়াতটি সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, এ সম্পর্কীয় অন্য একটি আয়াত দ্বারা এই আয়াতটির হুকুম মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে উক্ত আয়াতকে কোরআন শরীফে শামিল রাখা হইল কেন? ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যাহা কিছু পবিত্র কোরআনে শামিল থাকা স্থিরীকৃত রহিয়াছে উহার কোন একটি বস্তুও আমি হটাইতে পারি না।

তফছীরঃ— ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা ১৫ রুকুর আয়াত—

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ -

"যাহারা স্ত্রীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের কর্ত্তব্য—তাহাদের স্ত্রীগণ সম্পর্কে অছিয়ত করিয়া যাওয়া যে, তাহাদিগকে যেন এক বৎসরকাল খোর-পোষের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে যেন (স্বামীর ঘর-বাড়ী হইতে) তাড়াইয়া দেওয়া না হয়।"

ইসলামের পূর্ব্বে অন্ধকার যুগে মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপর ইদ্দৎ এক বৎসরকাল ছিল এবং এ সম্পর্কে নারীদের উপর নানাপ্রকার অমানুষিক দুঃখ কষ্ট ভোগের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রথম যুগেও এই ইদ্দৎ এক বৎসরকালই ছিল। এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য দুঃখ কষ্টের কুপ্রথা সমূহকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখনও মিরাছ বা উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধান জারি হয় নাই। তাই এই এক বৎসরকাল থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য স্বামী কর্ত্তৃক অছিয়ত করিয়া যাওয়ার বিধান ছিল।

পরবর্ত্তীকালে উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে পর উক্ত অছিয়তের আদেশ মনছুখ বা রহিত হইয়া যায়। যেহেতু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা স্ত্রীর প্রাপ্ত-মিরাছের দ্বারাই যথেষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন এক বৎসর কালকেও কম করিয়া ইদ্দতের সময় চার মাস দশ দিন করিয়া দেওয়া হয়। এ সম্পর্কেই এই আয়াত নাযেল হয়—

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"যে সব স্ত্রীদের স্বামী মারা যায় তাহারা নিজকে ইদ্দতে আবদ্ধ রাখিবে চার মাস দশ দিন।"

তেলাওয়াতের মধ্যে এই আয়াতটি কোরআন শরীফে উপরোল্লেখিত আয়াতটির পূর্ব্বে রহিয়াছে; কিন্তু নাযেল হওয়ার সময় পূর্ব্বোক্ত এক বৎসরকাল বর্ণিত আয়াতটি প্রথমে নাযেল হইয়াছিল এবং চার মাস দশ দিন বর্ণিত আয়াতটি পরে নাযেল হইয়াছিল, সুতরাং নাছেখ মন্‌ছুখ হওয়ার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এক বৎসরকাল বর্ণিত আয়াতটি যেহেতু মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে তাই আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই আয়াতের বধিান ও আদেশ যখন বাকি থাকে নাই, তখন ইহাকে লেখায় এবং তেলাওয়াতে বাকি রাখা হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোরআন শরীফের আয়াত সমূহের সঙ্গে দুইটি বিষয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে— (১) আয়াতের মর্ম্ম ও অর্থ অনুযায়ী বিধান ও আদেশ-নিষেধ, (১) তেলাওয়াত তথা উহার প্রতি অক্ষরে দশ দশ নেকী হওয়া, অজু ব্যতিরেকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ হওয়া, উহা দ্বারা নামাযের কেরাত পড়া ইত্যাদি।

আলেমুল-গায়েব বিধানকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা যে কোন রহস্য সূত্রে কোন কোন আয়াতের মর্ম্ম ও বিধান বলবৎ রাখিয়াও উহার তেলাওয়াত মন্‌ছুখ ও রহিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮০ নং হাদীছে ওমর (রাঃ) এই শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কেই বলিয়াছেন যে, উহা পবিত্র কোরআনে শামিল থাকিবে না। ইহার বিপরীত কোন কোন আয়াত এই রূপও আছে যাহার মর্ম্ম ও বিধান মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তেলাওয়াত মন্‌ছুখ হয় নাই। আলোচ্য হাদীছে এই শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কেই ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা অবশ্যই কোরআন শরীফে শামিল থাকিবে, উহার এক অক্ষরও পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। বক্ষ্যমান হাদীছের প্রশ্নজনিত আয়াতটি এই শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীর আরও কতিপয় আয়াত কোরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮৯০। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে-আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে কথা বলিয়া থাকিতাম। আবশ্যকীয় জিজ্ঞাসাবাদে পরস্পর কথা বলা হইত যাবৎ না এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ "নামাযের মধ্যে আল্লার প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুন পালনার্থে একাগ্রচিত্তে শান্ত, ক্ষান্ত, নিবৃত্ত ও নির্লিপ্তরূপে দাঁড়াও।" এই আয়াত নাযেল হইলে পর আমরা নামাযের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলা হইতে বিরত থাকায় আদিষ্ট হইলাম।

১৮৭১। হাদীছঃ একদা ওমর (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বলিতে পার কি, এই আয়াতটি কি মর্ম্মে নাযেল হইয়াছিল? ...اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিলেন, তাহা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। এই উত্তরে ওমর (রাঃ) রাগতঃ স্বরে বলিলেন, তোমরা জান, কি—জান না, তাহা বল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন! এ সম্বন্ধে আমার মনে একটা বিষয় আছে। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, নিজকে (এরূপ ক্ষেত্রে) তুচ্ছ না ভাবিয়া মনের কথা বলিয়া ফেল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতে মানুষের আমল সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আমল সম্পর্কে? বয়ঃকনিষ্ঠ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বিস্তারিতরূপে অধিক কিছু বলিলেন না। তখন ওমর (রাঃ) নিজেই অধিক বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে—কোন লোক যাহার ধন-দৌলত ছিল, সুতরাং সে সব রকম এবাদত ও নেক কাজই করিতে পারিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যে, মানব জাতির পরীক্ষার জন্য শয়তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শয়তান যখন তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন সে (খোদা প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহারে উহা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করিয়া শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে এবং) এমন এমন গোনাহ বা এই পরিমাণ গোনাহ করিয়াছে যদ্দরুন তাহার নেক আমল সমূহ বিনষ্ট বা গোনাহের আধিক্যে নিমজ্জিত, নির্ব্বাপিত এবং বেষ্টিত ও আবৃত হইয়া গিয়াছে। (ফলে কেয়ামতের নিদারুণ কঠিন দিনে—যখন মানুষ একমাত্র নেক আমলের প্রতি জীবন ধারণ ও জীবন রক্ষার স্তরে সর্ব্বাধিক প্রত্যাশী হইবে, তখন সে তাহার কৃত নেক আমলের যথার্থ ফলাফল হইতে বঞ্চিত থাকিবে—ইহা যে কত বড় দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ ও অনুতাপের বিষয় তাহা বুঝাইবার জন্যই বাহ্যিক জগতের হাল-অবস্থার সমবায়ে গঠিত একটি দৃষ্টান্ত উক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।)

ব্যাখ্যাঃ—ছুরা বাক্বারাহ তৃতীয় পারা চতুর্থ রুকূর আরম্ভ হইতে আল্লাহ তায়ালা ছদক্বাহ্ বা দান-খয়রাতের ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণনা করিয়াছেন, সঙ্গে

সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ছওয়াব লাভ করিতে হইলে দান-খয়রাতকে দুইটি জিনিষ হইতে অবশ্যই পাক পবিত্র রাখিতে হইবে—(১) "মন্ন্" উপকার ও দান-খয়রাতকে উপলক্ষ করিয়া দান-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করা, (২) "আজা"—দান-খয়রাত করিয়া উহার ঔদ্ধত্যবশে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে কষ্ট ও ব্যথাদায়ক ব্যবহার করা।

তারপর আল্লাহ তায়ালা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যদি দান-খয়রাতকে উক্ত বস্তুদ্বয় হইতে পাক পবিত্র না রাখ, তবে তোমাদের দান-খয়রাত বাতেল—নিষ্ফল ও অকেজো হইয়া যাইবে। যেরূপ রিয়াকার বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যকারী ঈমানহীন অমোসলেম মোনাফেক ব্যক্তির দান-খয়য়াত বাতেল—নিষ্ফল ও অকেজো হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কাফের অমোসলেমদের দান-খয়রাত বাতেল ও ফলহীন হওয়ার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি অতি মসৃণ পাথরের উপর ধূলা-বালু জমিয়াছে, (যাহার মধ্যে কোন বীজ পতিত হইলে উহা হইতে চারা জন্মা সম্ভব ছিল, কিন্তু) উহার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায় ঐ মসৃণ পাথরের উপর ধূলা-বালুর চিহ্নও থাকিতে পারে নাই। (তদ্রূপ কাফেররা দান-খয়রাত ইত্যাদি যে সব সৎকাজ করিয়া থাকে যাহার সুফল কেয়ামতের দিন পাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহাদের কুফুরী ও ঈমান-হীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহাদের সৎকার্য্যাবলী সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হইবে।) ফলে তাহারা তাহাদের কৃত সৎকার্য্যাবলীর কোন ফলই লাভ করিতে পারিবে না। সৎকার্য্য দ্বারা মানুষ যে বেহেশ্ত লাভ করিবে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদিগকে সেই বেহেশ্তের খোঁজও দিবেন না।

রিয়াকারী—লোক দেখানো উদ্দেশ্য এবং কুফুরীর কারণে যে দান-খয়রাত আল্লার দরবারে মকবুল ও গৃহীত হয় নাই তাহার উল্লেখিত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার পর উহার বিপরীত আল্লার দরবারে মকবুল ও গৃহীত দান-খয়রাতেরও একটা দৃষ্টান্ত আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করিয়াছেন—পার্ব্বত্য এলাকায় অতি উর্ব্বর উঁচু টিলার উপর যদি একটি বাগান থাকে এবং সময় মত পূর্ণ বৃষ্টির পানিও ঐ বাগানে বর্ষিত হয়, সেই বাগান দ্বিগুণ ফল জন্মাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ মোমেন ব্যক্তি এখলাছের সহিত আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে দান-খয়রাত করিবে এবং "মন্ন্" ও "আজা" ইত্যাদির ন্যায় দান-খয়রাত ও পরোপকার বিধ্বংসী পাপ হইতে উহাকে পাক পবিত্র রাখিবে। উহার ফলও কেয়ামতের দিন সে বহুগুণে লাভ করিবে। পক্ষান্তরে মোমেন হইয়া, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাছের সহিত দান-খয়রাত করিয়া তারপর "মন্ন্" ও "আজা" ইত্যাদি দান-খয়রাত বিধ্বংসী পাপের দ্বারা সেই দান-খয়রাতকে

নিষ্ফল ও বিনষ্ট করিয়া দিলে তাহা যে কত বড় দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হইবে তাহা বুঝাইবার জন্যও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন—

ايود احدكم ان تكون له جنة .. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت

অর্থাৎ—এক ব্যক্তির একটি বাগান আছে, বাগানটি অতি বড় এবং উহাতে প্রবাহিত নদী-নালা রহিয়াছে। যদ্দারা উহাতে প্রচুর পরিমাণ সেচকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। উহাতে খেজুর গাছ আছে, আঙ্গুর গাছ আছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সব ফলেরই গাছ উহাতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। (বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন মউসুম, তাই প্রায় সারা বৎসরই সে বাগান হইতে উৎপন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে।) বাগানটির মালিক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছে (যদ্দরুন সে রোজী-রোজগার করিতে অক্ষম,) অথচ তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে অনেক, (তাই তাহার উপর ব্যয়ের বোঝা অধিক, কিন্তু আয়ের অছিলা তাহার জন্য ঐ বাগানটি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং ঐ বাগানটি তাহার জন্য কি পরিমাণ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়—) এমন অবস্থায় সেই বাগানটির উপর এক অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হইয়া উহাকে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। এইরূপ দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ অনুতাপের ঘটনার সম্মুখীন হওয়াকে কেহ নিজের জন্য পছন্দ করিতে পারে কি? কখনও নহে।

মোমেন ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাছের সহিত দান-খয়রাত করিলে সেই দান-খয়রাত উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন ফল-ফুল শোভিত বাগানের ন্যায়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট মোমেন ব্যক্তি তাহার সেই দান-খয়রাতের প্রচুর পরিমাণ ছওয়াব ও চিরস্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু "মন্ন" ও "আজা" ইত্যাদির ন্যায় দান-খয়রাত বিধ্বংসী পাপের দ্বারা সে তাহার দান-খয়রাতকে ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকিলে কেয়ামতের দিন—যে দিন মানুষের পক্ষে বাঁচিবার ও নাজাত পাইবার জন্য নেক কার্য্যাবলীর ছওয়াব ভিন্ন অন্য কোন উপায়-অছিলা থাকিবে না এবং মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগী অপেক্ষা সেই দিন দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কার্য্যাবলীর ছওয়াবের প্রতি সর্ব্বাধিক মোহতাজ ও প্রত্যাশী হইবে—সেই কঠিন দুর্য্যোগের দিনে সে দেখিতে পাইবে যে, পাপের অগ্নি-বায়ু তাহার দান-খয়রাতের সুজলা সুফলা বাগানটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। যেই বাগান হইতে তাহার প্রচুর পরিমাণ ছওয়াবের চিরস্থায়ী ফল লাভের সুযোগ ছিল উহা হইতে আজ সর্ব্বাধিক আবশ্যকের সময় এক কড়ি ফল লাভের সুযোগও তাহার নাই। এইরূপ বেদনাদায়ক দুঃখ জনক অনুতাপের

সম্মুখীন হইতে কেহই পছন্দ করিতে পারে না। সুতরং দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কার্য্য করিয়া সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন উহা ধ্বংসকারী পাপ অনুষ্ঠিত না হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলোচ্য আয়াতটির পূর্ব্বাপর আয়াত সমূহ এবং ঐ সবের মূল বিষয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, উক্ত আয়াতে ছদ্‌কাহ্ বা দান-খয়রাত-বিশেষের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহা ধ্বংসকারী অগ্নি-বায়ূ সমতুল্য পাপ দ্বারা "মন্ন্" ও "আজা" পাপ-বিশেষকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—কোরআন পাকের আয়াত সমূহ শানে-নুজুল বা পূর্ব্বাপর আয়াত ও বিষয় বস্তুর বিন্যস্ততা দৃষ্টে বস্তু বিশেষ বা ক্ষেত্রবিশেষের জন্য আবদ্ধ মনে হইলেও অনেক স্থানে আয়াতের নিজস্ব মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য থাকে যাহা উক্ত আবদ্ধতামুক্ত। কোরআন পাকের মধ্যে এই শ্রেণীর আয়াতের বহু নজীর রহিয়াছে। আলোচ্য আয়াতটিও ঐ শ্রেণী ভুক্তই। বহু গুণাবলী বিশিষ্ট বাগানের দৃষ্টান্তে শুধু ছাদ্‌কাহ্ বা দান-খয়রাতই উদ্দেশ্য নহে, বরং সকল প্রকার নেক আমলই উদ্দেশ্য। ইহার ছওয়াব ও চিরস্থায়ী ফল মানুষ কেয়ামতের দুর্য্যোগময় দিনে লাভ করিবে। আর উহা ধ্বংসকারী অগ্নি-বায়ুর দৃষ্টান্তে শুধু "মন্ন্" ও "আজা'ই উদ্দেশ্য নহে' বরং সকল প্রকার গোনাহ ও পাপই উদ্দেশ্য যদ্দ্বারা নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত, বরং লুপ্তও হইয়া যায়। বক্ষ্যমান হাদীছটির তাৎপর্য্য ইহাই।

গোনাহের দ্বারা নেক আমলের ক্ষতি বিভিন্ন পর্য্যায়ে হইতে পারে—প্রথমতঃ এক শ্রেণীর বিশেষ গোনাহ আছে, যদ্দ্বারা বিশেষ নেক আমল ধ্বংস হইয়া থাকে। যেমন—"মন্ন্" ও "আজা" দ্বারা ছদ্‌কাহ্ ও দান-খয়রাতের ছওয়াব ধ্বংস হয়। "রিয়া—লোক-দেখানো উদ্দেশ্য" দ্বারাও ছদ্‌কাহ্, খয়রাত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাৎ ইত্যাদি নেক আমল সমূহের ছওয়াব ধ্বংস হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর গোনাহ বা পাপ আছে, যদ্দ্বারা সারা জীবনের সকল প্রকার নেক আমলই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। উহা হইল কুফুরী ও শেরেক জনিত গোনাহ। এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কার্য্যেও যাবতীয় নেক আমলের ছওয়াব ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া পবিত্র কোরআন ছুরা "হুজুরাতে" ইঙ্গিত রহিয়াছে। (বয়ানুল কোরআন দ্রষ্টব্যঃ)।

তৃতীয়তঃ অখাদ্য-কুখাদ্য দ্বারা যেমন মানুষের স্বাস্থ্য, দেহ ও বল শক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে এবং সেই ক্ষতি অনেক সময় এত অধিক হয় যে, উহাকে তাহার ধ্বংস বলিয়াও আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে! তদ্রূপ সব রমক গোনাহ ও পাপের দ্বারাই সকল প্রকার নেক আমলই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে—নেক আমলের বল-শক্তি

বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। যাহার ফলে নেক আমলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ অধিক নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা—আগ্রহ বৰ্দ্ধিত করা, দেলের মধ্যে বিশেষ নূর ও আলোর সঞ্চার করা যাহার সাহায্যে অন্যান্য নেক আমলের দ্বার উন্মুক্ত হয়—সত্যকে দেখিবার ও বুঝিবার পথ প্রশস্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। গোনাহ ও পাপের দরুন নেক আমলের উক্ত ক্রিয়া ভয়ানকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এমনকি নেক কার্য্যের বাহ্যিক ও সাধারণ খোলসটি মুর্দ্দা লাশের ন্যায় বাকি থাকিলেও তাহার বল-শক্তি এতই ক্ষীণ হইয়া যায় যে, উহাকে তাহার জন্য ধ্বংস বলা যায়।

চতুর্থতঃ নেক আমল করার পর গোনাহ করিতে থাকিলে এবং নিয়মিত তওবার দ্বারা উহার প্রতিকার না করিলে স্বভাবতঃই গোনাহের আধিক্যে তাহার নেক আমল আবৃত ও নিমজ্জিত হইয়া যাইবে, ফলে আল্লাহ তায়ালার নিকট সে পাপীদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য হইবে এবং নেক আমলের সুফল তথা দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ বিলম্বিত ও বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার নেক আমল তাহার পরিত্রাণের প্রথম পর্য্যায়ে নিষ্ফল দেখা যাইবে।

১৮৯২। হাদীছঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله "তোমাদের অন্তরে যে সব খেয়াল বা ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে উহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ—আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের হইতে লইবেন।" এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী আয়াত দ্বারা ইহা মনছুখ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—তৃতীয় পারা ছুরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহের একটি আয়াত—

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ—তোমাদের অন্তরে ও মনে যে সব কু-খেয়াল, কু-ধারণা, কু-কথা বা খারাব ইচ্ছা জন্মে তোমরা মুখে ও কার্য্যে উহা প্রকাশ কর বা অন্তরের মধ্যেই গোপন রাখ—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিকে ঐ সবের হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন করিবেন।

মানুষের অন্তরে স্বভাবতঃই নানাপ্রকার কল্পনা, ধারণা, খেয়াল ও ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে এমন এমন খেয়ালও থাকে যাহা মুখে প্রকাশ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায় বা গোনাহগার হয়। এমন এমন ইচ্ছাও থাকে যাহা কার্য্যে পরিণত করিলে গোনাহগার হইতে হয়। এমন এমন কুৎসিত কল্পনাও থাকে যাহা অতি জঘন্য ও গোনার কাজ—এই শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনা মানুষের অন্তরে তাহার

ইচ্ছাকৃত জন্মানো বা দীর্ঘ সময় অন্তরে স্থান প্রদত্তরূপেও হয় আবার কোন কোনটা তাহার ইচ্ছা, বা জন্মদান ও স্থান দান ব্যতিরেকেই তাহার অন্তরে স্বাভাবিক বুদবুদ (bubble) রকমে উদিত হইয়া থাকে। এমনকি এই ধরণের বুদবুদ শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনার সঞ্চার হইতে সর্ব্বদা সারা জীবন মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকা মানবের পক্ষে তাহার স্বভাবের বিপরীত ও অসম্ভব। এই সবকেও যদি গোনাহ গণ্য করা হয় এবং উহা হইতে মুক্ত থাকার আদেশ করা হয়, তবে বলিতে হইবে, মানবকে তাহার শক্তির বাহিরে অসম্ভব কাজের আদেশ করা হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে "ما فى انفسكم......يحاسبكم به الله" যত "কিছু খেয়াল, ধারণা বা কল্পনা ও ইচ্ছা তোমাদের অন্তরে আছে আল্লাহ তায়ালা সবগুলির হিসাব তোমাদের নিকট হইতে লইবেন"—এই ঘোষণার ব্যাপকতায় ঐ অনিচ্ছাকৃত বুদবুদ শ্রেণীর কল্পনাসমূহও বিচারাধীন বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তাই ছাহাবীগণ এই আয়াত নাযেল হইলে পর ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা স্বীয় ভয়-ভীতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকাশে প্রকাশ করেন।

উল্লেখিত আয়াতের শব্দার্থের ব্যাপকতা দৃষ্টে ছাহাবীগণের উপস্থিত ভয়-ভীতি অমূলক ছিল না, তাই হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে ভয়-ভীতি হইতে নিবৃত্ত না করিয়া মূল বিষয়ের সুরাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে লাভ করার ব্যবস্থা স্বরূপ তাঁহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ তাহাই করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা স্বরূপ ছাহাবীগণের পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের ভয়-ভীতি নিরসনের জন্য উল্লেখিত আয়াতের মূল উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দান কল্পে এই আয়াত নাযেল করিলে—لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "মানুষকে আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ঐ শ্রেণীর কার্য্যেই বাধ্য করেন যাহা তাহার শক্তি ও সামর্থ্যের গণ্ডীভুক্ত। অর্থাৎ একমাত্র এই শ্রেণীর কার্য্যেই মানুষের হিসাব ও বিচার হইবে।"

এই আয়াতের দ্বারা পূর্ব্ব আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া গেলে যে, অনিচ্ছাকৃত বুদবুদ শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনা সমূহ হিসাব ও বিচারাধীন হইবে না।

আলোচ্য হাদীছে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আয়াতকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন, পূর্ব্ব বর্ণিত আয়াতটি এই আয়াত দ্বারা মনছুখ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ উহার মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য ব্যাপক নহে; বরং ইচ্ছাকৃত জন্মানো বা দীর্ঘ সময় অন্তরে স্থান প্রদত্ত খেয়াল ও পাকা পোক্তা ইচ্ছা যাহা কোন প্রতিবন্ধক না হইলে কার্য্যে পরিণত হইত—একমাত্র ইহাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এবং উহাই হিসাব ও বিচারাধীন হইবে।

১৮৯৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করিলেন—

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ - فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ

مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ -

অর্থাৎ কোরআন পাকে এক শ্রেণীর আয়াত আছে যাহার অর্থ ও মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন—এই শ্রেণীর আয়াতসমূহই পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যস্থল। পক্ষান্তরে আর কিছু আয়াত আছে যাহার অর্থ বা মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন নহে। যাহাদের অন্তঃকরণ ও বিবেক-বুদ্ধি বক্র তাহারা লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ঐরূপ আয়াতগুলির কোন একটা অর্থ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ঐ শ্রেণীর আয়াত কয়টির পিছনেই পড়িয়া থাকে। (ছুরা আলে-এম্‌রান—৩পাঃ ৯রুঃ)

এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়া হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহাদিগকে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াতের পিছনে লাগিয়া থাকিতে দেখ তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখ—তাহাদিগকেই আল্লাহ তায়ালা বক্র বুদ্ধি-বিবেকধারী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে এক শ্রেণীর আয়াত আছে যাহার অর্থ, মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপে বা আল্লাহ ও আল্লার রস্থলের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্ট ও স্থিরকৃত হইয়া আছে। মানবের জীবন-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন যাহা পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্য তাহা এই শ্রেণীর আয়াত সমূহের মধ্যে রহিয়াছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ কোরআন এই শ্রেণীরই। অবশ্য গুটি কয়েক আয়াত এই শ্রেণীরও রহিয়াছে (১) যাহার সঠিক অর্থ আল্লাহ বা আল্লার রস্থল ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই। যেমন, কোন কোন ছুরার আরম্ভে বিচ্ছিন্ন হরফ সমূহ যথা—আলিফ-লাম-মীম। (২) অথবা শব্দার্থ জানা থাকিলেও নির্দ্ধারিতরূপে উহার তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহ বা আল্লার রস্থল কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয় নাই, মানব জ্ঞানেও উহা স্থির করা সম্ভব নহে। যথা, আল্লাহ তায়ালার জন্য يد—ইয়াদ, যাহার শাব্দিক অর্থ "হাত" استوا على العرش শাব্দিক অর্থ "আরশের উপর উপবিষ্ট" ইত্যাদি বিষয়-বস্তু পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে এবং ঈসা (আঃ) সম্পর্কে كلمة الله—কলেমাতুল্লাহ, শাব্দিক অর্থ "আল্লার কলেমা" উল্লেখ আছে। এই ধরণের কতিপয় বিষয়-বস্তু কোন কোন আয়াতে উল্লেখ আছে

যাহার একটা সাধারণ শব্দার্থ জানা গেলেও সঠিক তাৎপর্য্য স্থিরকৃত নাই। এই শ্রেণীর আয়াত কয়টির সঙ্গে মানবের জীবন-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন মোটেই বিজড়িত নহে। ইহার সংখ্যাও অতি সামান্য, এতদসত্ত্বেও বক্র বুদ্ধি-বিবেকীরা এই শ্রেণীর আয়াত কয়টির পিছনে লাগিয়া থাকে; প্রথম শ্রেণীর আয়াত সমূহ যাহা পবিত্র কোরআনের প্রায় সমগ্র অংশ এবং মানবের জীবন-ব্যবস্থা ও তাহার কল্যাণ ও পরিত্রাণ উহারই সঙ্গে বিজড়িত, তাহারা উহার আমল ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে না—ইহাই তাহাদের পরিচয় ও প্রমাণ যে, তাহাদের উদ্দেশ্য পবিত্র কোরআনকে আয়ত্ত করা নয়, বরং তাহাদের উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং অনধিকার চর্চ্চারূপে ঐ আয়াতের কোন একটা অর্থ দাঁড় করান, অথচ উহার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন।

আলোচ্য হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মৎকে ঐ ধরণের লোক হইতেই সতর্ক করিয়াছেন—যেন তাহাদের কথা-বার্ত্তা ও যুক্তি-তর্কের প্রতি কর্ণপাত না করা হয়, তাহাদের ফাঁদে পা না রাখা হয়;

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করা বিধেয় তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া দিয়াছেন।

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ - وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

"এই শ্রেণীর আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন। পাকা পোক্তা আলেম ও জ্ঞানীগণ (প্রথম শ্রেণীর আয়াত সমূহের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া শুধু সম্ভবরূপে কোন অর্থ ও তাৎপর্য্যের দৃষ্টান্ত দাঁড় করিতে সক্ষম হইলে তাহা করিয়াও এবং ঐরূপ সক্ষম না হইলে অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহারা) এই ঘোষণা দিয়া থাকেন যে, ইহা আল্লার কালাম। যে অর্থে ও উদ্দেশে আল্লাহ ইহা নাযেল করিয়াছেন আমরা উহার উপর পূর্ণরূপে ঈমান আনিলাম—কোরআনের সমুদয় অংশই আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নাযেল হইয়াছে।"

১৮৯৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আবী মোলায়কাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোন এক গৃহে দুইটি নারী মালা গাঁথিতেছিল। হাঠৎ তাহাদের একজন চিৎকার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতের মধ্যে সূচ বিদ্ধ ছিল এবং সে তাহার অপর সঙ্গিঁনীর উপর দাবি করিতে ছিল (যে, সে-ই এই কাজ করিয়াছে। তথায় অন্য কোন লোক উপস্থিত না থাকায় সাক্ষী ছিল না।)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাহাবীর সম্মুখে এই ঘটনার বিচার পেশ করা হইলে তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, লোকদের দাবি-দাওয়া যদি শুধু তাহাদের মুখের কথার উপর মানিয়া লওয়া হয়, তবে তাহারা পরস্পর একে অন্যের জান-মাল বিনা বাধায় হরণ করিতে সক্ষম হইবে, (সুতরাং দাবীর সঙ্গে সাক্ষী অবশ্যই হইতে হইবে, সাক্ষী না থাকিলে বিবাদীকে কসম খাইয়া দাবী খণ্ডন করার সুযোগ দিতে হইবে। এই ঘটনায় যেহেতু সাক্ষী নাই, তাই বিবাদিনীকে কসম দেওয়া হইবে। সে যাহাতে মিথ্যা কসম না করে সেজন্য) তাহাকে মহান আল্লাহ তায়ালার (যাঁহার নামে কসম খাইতে হইবে) আজাবের ভয় স্মরণ করাও এবং মিথ্যা কসমের ভয়াবহ পারিণতির যে সতর্কবাণী পবিত্র কোরআনে আছে তাহাও তাহাকে পড়িয়া শুনাও—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ

فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"নিশ্চয় যাহারা আল্লার নামের শপথ ও আ'হ্দ করিয়া (মিথ্যা দাবির মাধ্যমে) হীন মূল্যের দুনিয়ার কোন স্বার্থ সিদ্ধি করিবে আখেরাতে তাহারা কোন মঙ্গলেরই ভাগী হইবে না এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সঙ্গে কোন কথাই বলিবেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না এবং (তাহাদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া) তাহাদিগকে পরিচ্ছন্নও করিবেন না, ফলে তাহারা ভয়ানক কষ্টদায়ক আজাব ভোগ করিতে থাকিবে।" (৩ পারা ১৬ রুকূ)

উপস্থিত লোকগণ বিবাদীনীকে আল্লার ভয় স্মরণ করাইয়া এবং উক্ত আয়াত পড়িয়া শুনাইয়া কসম খাইতে বলিলে সে মিথ্যা কসম পরিহার করিয়া বাদিনীর দাবি স্বীকার করিয়া নিল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, সাক্ষ্যের সুযোগ না হইলে কসমের সাহায্যেও সত্য প্রকাশ হইয়া যায়; এই জন্যই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাদীর পক্ষে সাক্ষী না থাকিলে) বিবাদীর উপর কসম প্রবর্ত্তিত হইবে।

১৮৯৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"(হে মোহাম্মদের (দঃ) উম্মৎ বা দল !) তোমরা সর্ব্বোত্তম দল ; বিশ্বমানবের পক্ষেও তোমরা উত্তম ; তোমরা মানব সমাজকে ভাল পথে পরিচালিত করিয়া থাক এবং মন্দ পথে বাধা দিয়া থাক।" (৪র্থ পারা ৩ রুকু)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, ইসলামের কর্ম্ম-সূচী জেহাদ ফীছাবিলিল্লাহ্ মোহাম্মদী উম্মৎ বা দলের উত্তমতারই অন্তর্ভুক্ত। এই জেহাদের মাধ্যমে মোসলমানগণ (কাফের জাহান্নামী) লোকদেরে গলায় শিকল দিয়া আনে, অতঃপর ঐ লোকগণই স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করিয়া নেয় (এবং বেহেশতের অধিকারী হয়।)

ব্যাখ্যা—জেহাদ সম্পর্কে বহু সমালোচনা হইয়া থাকে, কিন্তু আবু হোরায়রা (রাঃ) যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই কর্ম্ম-সূচীটিও অতি উত্তম। যেমন ভাঙ্গা হাত-পা নির্ম্মমভাবে প্লাষ্টার করিয়া উহাতে আবদ্ধ রাখা হয়—এই প্লাষ্টার কর্ম্ম-সূচী যে, একটি উত্তম কর্ম্ম-সূচী তাহাতে সন্দেহ আছে কি ? তদ্রূপ ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততিগণকে যে, নামায-রোযা ইত্যাদি ভাল কার্য্যের জন্য তাম্বিহ-তাকিদ করিতে হয় তাহাও উত্তম কর্ম্ম-সূচীরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা শাস্তি মূলক আইন বলে মোসলমানদিগকে শরীয়তের পাবন্দী করান—ইহাও উত্তম কর্ম্ম-সূচীরই অন্তর্ভুক্ত।

১৮৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, حسبنا الله ونعم الوكيل হাছ্‌বু-নাল্লাহু ওয়া-নে'মাল্ ওয়াকীল—"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্ব্বোত্তম কার্য্য-সমাধাকারী" এই মহান বাক্যটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডুলিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ বিপদকালে বলিয়াছিবেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) (এবং তাঁহার ছাহাবীগণ) ওহোদের ভয়াবহ বিপদ কালে বলিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ এই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে ঃ—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের খোদা-ভক্ততার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করিয়া আলাহ তায়ালা বলিতেছেন—"যখন প্রোপাগাণ্ডাকারী দল মোসলমানগণকে এই বলিয়া ভয় দেখাইল যে, মক্কাবাসী লোকগণ-(যাহারা তোমাদিগকে ওহোদ রণাঙ্গনে ভয়ানকরূপে ঘায়েল করিয়া গিয়াছে সেই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালীরা তোমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার পরিকল্পনা লইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিয়া চল।

(এই হুম্‌কি মোসলমানদের ভীতির কারণ হইল না, বরং) তখন মোসলমানগণের ঈমানী বল অধিক বাড়িয়া গেল। তাঁহারা এই বলিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন যে, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কার্য্য-সমাধাকারী।"

ব্যাখ্যা ঃ— বিপদের সময় এই মহান বাক্যটির জপনা উত্তম। মুখে জপার সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তার ধ্যানকে সুদৃঢ় করিবে এবং কার্য্যেও খোদা-ভীরুতা খোদা-ভক্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপে উল্লেখিত বাক্যের পূর্ণ সাধনা করিতে হইবে।

১৮৯৭। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদল মোনাফেক লোক এই ধরনের ছিল যে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোথাও জেহাদে বাহির হইলে তাহারা টালবাহানা করিয়া পিছনে থাকিয়া যাইত। এবং চাতুরী করিয়া পিছনে রহিয়া গেল, তদ্দরুণ তাহারা খুব স্ফুর্ত্তি করিত। অতঃপর নবী (দঃ) জেহাদ হইতে বাড়ী ফিরিলে তাহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের মিথ্যা বাধা-বিঘ্নের ফিরিস্তি পেশ করিত এবং মিথ্যা কসম করিত (যে, এই সব বাধা-বিঘ্নের দরুনই আমরা যাইতে পারি নাই, নতুবা আপনার সঙ্গে যাইবার জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিতেছিল ;) এইরূপ মিথ্যা ভান করিয়া তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রশংসা লাভের আশা করিত।

সেই মোনাফেকদের গোপন অবস্থা ও তাহাদের পরিণতি ব্যক্ত করিয়া এই আয়াত নাযেল হইল—

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"যাহারা নিজেদের চাতুরী জনিত কার্য্যের উপর আনন্দিত হইয়া থাকে এবং মিথ্যা ভান করিয়া উহার উপর প্রশংসা লাভের আশা করে। মনে করিও না, তাহারা (তাহাদের গোপন অপকর্ম্মের) আজাব হইতে রেহায়ী পাইবে। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ— আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাহারও কোন চালাকি বজ্জাতি গোপন হের-ফের খাটিবে না। উহার পরিণতি হইতে রেহায়ী পাওয়া যাইবে না ; আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরের অবস্থাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত আছেন। উল্লেখিত হাদীছের তথ্যটি উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

১৮৯৮। হাদীছ ঃ— ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً -

আর যদি তোমাদের কাহারও ভয় হয়, এতীম মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে না, সে ক্ষেত্রে (এতীমকে অব্যাহতি দিয়া) অন্য মেয়ে বিবাহ কর—দুইজন, তিনজন এবং চারজন পর্য্যন্ত করিতে পার, কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া আশঙ্কা কর তবে শুধু একজনের উপর ক্ষান্ত হও।" (৪ পারা ১২ রুকু)

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন এতীম মেয়ে কোন মুরব্বির লালন-পালনে থাকে, মেয়েটি (উত্তরাধিকার সূত্রে) ঐ মুরব্বির ধন-সম্পত্তির মধ্যে অংশীদার এবং সুশ্রী ও রূপবতী, তাই সেই মুরব্বি নিজেই (বা তাহার ছেলের সঙ্গে বা অন্য কোন নিজের লোকের সঙ্গে) মেয়েটিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চায়, কিন্তু অন্য লোক তাহাকে যে পরিমাণ মহর দিবে সেই পরিমাণ মহর সে তাহাকে দিতে চায় না।

এইরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযেল করিয়া আল্লাহ তায়ালা সেই মুরব্বিকে নিষেধ করিয়াছেন—ঐ মেয়েকে পূর্ণ মহর না দিয়া এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মেয়েদের সমপরিমাণ মহর না দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। বরং এই অবস্থায় তাহাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, সে ঐ এতিম মেয়ে ভিন্ন অন্যত্র নিজের খাহেশ মোতাবেক কোন মেয়েকে বিবাহ করিবে।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এতিম মেয়েদের সম্পর্কে উক্ত নিষেধাজ্ঞা নাযেল হওয়ার কিছু দিন পর পুনরায় কতিপয় লোক উক্ত কড়াকড়ির কিছুটা শিথিলতার আশায় রসুলুল্লার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (ঐ শ্রেণীর) মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ব কড়াকড়ি বহাল থাকার ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযেল হইল—

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى

الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ

وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ -

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, "তাহারা আপনার নিকট (এতীম) মেয়েদের সম্পর্কে মছ্‌আলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ঐ মেয়েদের (মহর মিরাস ইত্যাদি) সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দেশই এখনও দিতেছেন (যে, তাহাদের মিরাস পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে হইলে অন্যের ন্যায় তোমাকেও পূর্ণ মহর দিতে হইবে)। এতদ্ভিন্ন কোরআনের কতিপয় আয়াত যাহা সর্ব্বদা তোমাদের পড়া-শুনার মধ্যে আসিতেছে সেই আয়াত সমূহও তোমাদিগকে (পূর্ণ মিরাস ও মহর আদায় করার) মছ্‌আলাহ শুনাইয়া আসিতেছে—ঐ এতীম মেয়েদের সম্পর্কে যাহাদিগকে সাধারণতঃ তোমরা (ধন-সম্পদ ও রূপশ্রীর দিক দিয়া পছন্দ হইলে বিবাহ করিয়া থাক, (কিন্তু তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হক তাহাদেরে দেওনা (এই যুক্তিতে যে, তাহারা ও আমরা ত পরস্পর আপন জন।) অথচ (ধন ও রূপে কম হইলে) তাহাকে বিবাহ করা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখ, (তখন তোমাদের মনে এই সহানুভূতি জাগেনা যে, তাহারা ত আমাদেরই আপন জন ; আমরাই তাহাকে রাখিয়া নেই।) (৫ পারা ১৫ রুকু)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতীম মেয়েগণ ধনে ও রূপে কম হইলে তাহাদিগকে নিজ বিবাহে রাখা হয় না এবং তাহাদের প্রতি আপন বলিয়া দরদ দেখানো হয় না। সুতরাং যখন তাহারা ধনে ও রূপে পরিপূর্ণ হয় তখন আপন হওয়ার দোহাই দিয়া মহর পুরাপুরি না দিয়া বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

১৮৯৯। হাদীছ ঃ- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত—

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ

مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا -

"মিরাসের ধন-সম্পদ ভাগ-বণ্টন করাকালে আত্মীয়-স্বজন ও এতীম-মিছকিনগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে উহার কিছু অংশ দান কর এবং কটূক্তি না করিয়া নরমভাবে তাহাদিগকে কথা বল।" (ছুরা নেছা—৪ পারা ১২ রুকু)

এই আয়াতের আদেশটি মনছুখ বা রহিত হয় নাই, এখনও উহা বলবৎ আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—বাগানের ফল সংগ্রহ করা পুকুরের মাছ ধরা ইত্যাদি উপলক্ষে দেশপ্রথারূপেও পাড়াপ্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে কিছু অংশ দেওয়ার রীতি আছে। কিছু কাল পূর্ব্বেও ইহা বেশ প্রচলিত ছিল, অবশ্য বর্ত্তমান অমঙ্গলের যুগে ইহা শিথিল হইয়া চলিয়াছে। আলোচ্য আয়াতের আদেশটি ঐ শ্রেণীর

সহানুভূতিসূচক প্রথারই অন্তর্ভুক্ত। জগতে সহানুভূতির দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে উক্ত আয়াতের আদেশটিকে মনছুখ বলা হইল; উহার প্রতিবাদেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করিয়াছিলেন। অবশ্য মিরাসের মালিক নাবালেগ উত্তরাধিকারীগণের অংশ হইতে ঐরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনের অধিকার কাহারও নাই; সে ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর উপস্থিতবর্গকে নরমভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবে।

১৯০০। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ) সমভিব্যাহারে পায়ে হাটিয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। ঐ সময় আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম; হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং অজু করিয়া আমার উপর অজুর পানির ছিটা দিলেন। তাহাতে আমার হুস ফিরিয়া আসিল। (তখনও মিরাসের বিধান প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাই) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে কি করিব? তখন মিরাস বন্টনের আয়াত নাযেল হইল। (৪ পারা ১৩ রুকু)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ......

১৯০১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অন্ধকার যুগে এই নীতি ছিল যে, কোন মানুষ মারা গেলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার স্ত্রীরও অধিকারী হইত। সেই স্ত্রী বা তাহার মুরব্বিগণের মতামত ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকারীগণের কেহ তাহাকে বিবাহ করিয়া রাখিত বা কাহারও নিকট বিবাহ দিয়া দিত বা বিবাহহীন অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া দিত। সেই কুনীতি রদ করার জন্য পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জায়েয নহে, নারীদের উপর জবরদস্তি মূলক উত্তরাধিকার স্বত্ব স্থাপন করা। আর তাহাদিগকে প্রদত্ত মালের কিছু অংশ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।" (৪ পারা ১৩ রুকু)

১৯০২। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমাকে কোরআন পাক পড়িয়া শুনাও ত! আমি আরজ করিলাম, আমি আপনাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইব? অথচ আপনার উপরই কোরআন নাযেল হইয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার মনে চায় অন্যের মুখে কোরআন শুনিতে। সেমতে আমি

ছুরা নেছা পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি তেলাওয়াত করিলে হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, থাম। তখন আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাঁহার দুই চোখ হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতেছে। সেই আয়াতটি এই—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا -

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ

وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا -

"কি উপায় হইবে তখন! যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের সম্মুখে (তাহাদের আল্লাহ-দ্রোহিতার উপর তাহাদের নবীগণকে) সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব এবং আপনাকে (আপনার যুগের) এই নাফরমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। (রাজ-সাক্ষী—নবীগণের বিবৃতি দ্বারা খোদাদ্রোহীগণের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা তখন শাস্তি ভোগে বাধ্য হইয়া পড়িবে।) যাহারা খোদাদ্রোহী ও রসুলের নাফরমান ছিল তাহারা সেই সময় এই আকাঙ্খা করিবে—তাহাদিগকে যদি মাটির সহিত বিলীন করিয়া দেওয়া হইত! (আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্মুখে ঐ দিন এমনভাবে সাক্ষী-সাবুদ পেশ করিবেন যে,) তাহারা কোন একটি কথাও গোপন রাখিতে পারিবে না। (ছুরা নেছা—৫ পারা ৩ রুকু

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত আয়াতে হাশর-ময়দানের একটি বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অপরাধী লোকদের নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং হযরতের অপরাধী উম্মতগণের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাঁহাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। এই সব বিবরণে নবী নিজকে সামলাইতে পারেন নাই, তাই কাঁদিয়া উঠিয়াছেন।

১৯০৩। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا -

"যে ব্যক্তি কোন মোসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম। তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও লা'নৎ হইবে। তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা অতি বড় আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াত সম্পর্কে লোকদের মতভেদ হইল (যে, মোসলমানকে হত্যাকারী মোসলমান হইলেও চিরকালের জন্য দোযখী হইবে—এই মর্ম্মে উক্ত আয়াতের বিবরণ মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে, না—বহাল রহিয়াছে?) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে এই আয়াতই শরীয়তের সর্ব্ব শেষ সিদ্ধান্ত, অতঃপর ইহার পরিবর্ত্তনকারী অন্য কোন আয়াত নাযেল হয় নাই।

১৭০৪। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দারুল-হরব তথা শত্রুদেশের কোন অঞ্চলে এক ব্যক্তি এক দল বকরি নিয়া যাইতেছিল। তথায় উপস্থিত মোসলমান সৈনিকগণ তাহাকে পাকড়াও করিতে গেলে সে (তাহার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশার্থে) তাহাদিগকে "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিল। মোসলমান সৈনিকগণ (তাহার সালাম করাকে জান-মাল বাঁচাইবার বাহানা মনে করতঃ তাহাকে কাফের ভাবিয়া) হত্যা করিল এবং তাহার বকরি দল হস্তগত করিল। এই ঘটনা সম্পর্কেই এই আয়াত নাযেল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا - وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ - كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا - إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا -

"হে মোমেনগণ! তোমরা জেহাদের পথেও (অর্থাৎ যুদ্ধাঞ্চল এলাকায়ও কোন কাজ করিতে) খুব সতর্কতা অবলম্বন করিও। কোন ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে (যে কোন আকারে) আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহা এই বলিয়া উড়াইয়া দিও না যে, (তুমি জান বাঁচাইবার জন্য ইহা করিয়াছ,) তুমি মোসলমান নও। (মনে হয় যেন) তোমরা ক্ষণস্থায়ী জেন্দেগীর সম্পদ (বকরি দল) হস্তগত করিতে তাড়াহুড়া করিয়াছ। তোমাদের বুঝা উচিৎ, আল্লাহ তায়ালার বিধান মোতাবেকই বহু গণিমত ও ধন-সম্পদ লাভ করার সুযোগ তোমাদের জন্য রহিয়াছে। ইসলামের পূর্ব্বে অন্ধকার যুগে অবশ্য তোমরা এরূপই ছিলে (যে, জাগতিক ধন-সম্পদের জন্য বিনা দ্বিধায় মানুষ খুন করিয়া ফেলিতে,) কিন্তু (ন্যায় ও শান্তির বাহক ইসলাম তোমাদিগকে দান করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করিয়াছেন। অতএব এখন (আর তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় উশৃঙ্খলরূপে চলিও না,) সতর্কতা

অবলম্বন করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কার্য্যের খবর রাখেন। (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—কাহাকেও হত্যা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তাহার বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর বিচার একমাত্র আল্লাহই করিবেন। কারণ, তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন, অন্য কেহ সঠিকরূপে তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং প্রাণে বধ করিয়া ফেলার ন্যায় এত বড় কাজের ফয়ছালা উহার উপর অন্য কেহ করিতে পারে না।

১৯০৫। হাদীছ ঃ—জায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে সদ্য অবতারিত এই আয়াতটি লেখাইলেন—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"যে সমস্ত মোমেন ঘরে বসিয়া জীবন কাটায় তাহারা এবং যাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদ করে তাহারা—উভয়ে সমপর্য্যায় গণ্য হইবে না।"

যখন হযরত (দঃ) আমাকে এই আয়াতটি লেখাইতে ছিলেন, সেই সময় (অন্ধ ছাহাবী) আবদুল্লা ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! (এই আয়াতে জেহাদে আত্মনিয়োগকারী নয়—এমন ব্যক্তির সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহার মর্য্যাদা কম বলা হইয়াছে। আমিও ত গৃহে বসিয়া থাকি, অন্ধ হওয়ার কারণে জেহাদে যাইতে পারি না।) কসম খোদার—যদি আমি জেহাদে যাইতে সক্ষম হইতাম (—আমার চক্ষু ভাল থাকিত) তবে নিশ্চয় আমি জেহাদে আত্মনিয়োগ করিতাম। তিনি অন্ধ ছিলেন, তাই এই আক্ষেপ ও অনুতাপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালা অহী নাযেল করিলেন। অহী নাযেল হওয়া অবস্থায় হযরতের উরু আমার উরুর উপর ছিল। উহা এত অধিক ভারী মনে হইতে ছিল যেন আমার উরু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কিছু সময় পরেই সেই অবস্থা দূর হইয়া গেল। এইবার উক্ত আয়াতটি এইরূপে নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"মোমেনগণের মধ্যে যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে, অথচ কোন অক্ষমতার কারণে নহে এবং যাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগ করে তাহারা উভয়ে সমপর্য্যায় গণ্য হইবে না। (ছুরা নেছা—১৩ পারা ৫ রুকু)

এইবার "غير اولى الضرر—অক্ষমতার কারণে নহে" বাক্যটি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল ; অন্ধ-খঞ্জ ইত্যাদি অক্ষমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া।

১৯০৬। হাদীছ ঃ— মোহাম্মদ ইবনে আবছুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (সিরিয়ার অধিপতির বিরুদ্ধে যখন ছাহাবী আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কায় স্বীয় খেলাফৎ কায়েম করিলেন তখন তিনি সিরিয়াস্থ শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সেই উপলক্ষে) মদীনাবাসীদের মধ্য হইতে এক দল যোদ্ধা—নির্ব্বাচন করা হইল। তাহাদের মধ্যে আমার নাম লেখা হইল। (সিরিয়ার মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে মনে দ্বিধাবোধ হইতেছিল,) আমি আবছুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশিষ্ট শাগের্দ ও খাদেম একরেমাহ্ (রঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে ঘটনা বলিলাম। তিনি আমাকে এই যুদ্ধে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিলেন এবং (যুদ্ধ না করিয়া শুধু দলের সঙ্গে থাকিবার উদ্দেশ্যে যাওয়াও নিষিদ্ধ—তাহা বুঝাইবার জন্য) তিনি আবছুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। হাদীছটি এই—

কিছু সংখ্যক লোক মক্কায় ইসলামাবলম্বী ছিল, তাহারা (হিজরত করে নাই,) মোশরেকদের সঙ্গেই থাকিত। এমনকি, মোশরেকগণ হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোকাবিলায় যুদ্ধে আসিলে বাধ্য হইয়া ঐ গোপন ইসলামাবলম্বীগণও মোশরেকদের দলভুক্ত হইয়া আসিত। (মোসলমানদের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু) তাহাদের দ্বারা মোশরেকদের দল ভারী দেখাইত। এমতাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে আকস্মিক তীর বা তরবারির আঘাতে ঐ শ্রেণীর কোন ইসলামাবলম্বী নিহত হইত। তাহাদের সম্পর্কে এই সুদীর্ঘ আয়াতটি নাযেল হইল—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ - قَالُوا

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الْأَرْضِ - قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً

فَتُهَاجِرُوا فِيهَا - فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَسَاءَتْ مَصِيرًا...

অর্থ—নিশ্চয় জানিও, যে সমস্ত লোকদের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতার উপস্থিতি এমন অবস্থায় হয় যে, তাহারা (হিজরত না করিয়া) নিজেদেরকে গোনাহগার সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাদিগকে ঐ ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তাহারা তদুত্তরে বলে, আমরা

স্বীয় দেশে পরাভূত দুর্ব্বল ছিলাম (তাই দ্বীনের অনেক কাজই আমরা করিতে সুযোগ পাই নাই)। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, খোদার সৃষ্ট জগৎ কি প্রশস্ত ছিল না? (ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া) তুমি অন্যত্র (যথায় তুমি আল্লার দ্বীন অনুযায়ী চলিতে সক্ষম হইতে) চলিয়া যাইতে? (তখন তাহারা নিরুত্তর হয় এবং তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়)। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে যাহা অতিশয় নিকৃষ্ট স্থান। অবশ্য বালক, নারী, অক্ষম পুরুষ—এই শ্রেণীর দুর্ব্বল লোকগণ যাহারা উপায়হীন এবং হিজরতের পথ অবলম্বনে অক্ষম তাহাদের সম্পর্কে আশা করা যায়, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল। যে কেহ আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করিবে নিশ্চয় সে সৃষ্ট জগতে অনুকুল পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা অনেকই পাইবে। (৫ পারা ১১ রুকু)

ব্যাখ্যা—কোন কোন হাদীছে এই বিষয়ের আরও একটু বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মক্কায় এক দল লোক গোপনে গোপনে ইসলাম কবুল করিয়াছিল, (কিন্তু প্রকাশ্যে কাফেরদের সঙ্গেই থাকিত)। বদরের যুদ্ধের দিন কাফেররা তাহাদিগকে মোসলমানদের বিরুদ্ধে দলভুক্ত করিয়া নিয়া আসিল এবং তাহাদের কেহ কেহ তথায় নিহত হইল। সেই নিহতদের পক্ষে ছাহাবীগণ বলিলেন, উহারা ত মোসলমানই ছিল; জবরদস্তিমূলক তাহাদিগকে মোসলমানদের বিরুদ্ধে বাহির করা হইয়াছিল—এই বলিয়া তাঁহারা তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযেল হইল।

মোসলমানগণ এই আয়াতটি লিখিয়া ঐ শ্রেণীর অবশিষ্ট লোকদের নিকট মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে না। এই সংবাদ পাইয়া ঐ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক মক্কা ত্যাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কাফেরগণ তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং নির্য্যাতন করিল। তাহারা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গেল, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযেল হইল—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ

النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ -

"কোন কোন লোক দাবি করিয়া থাকে, আমরা আল্লার উপর ঈমান আনিয়াছি। অতঃপর যখন আল্লার রাস্তায় তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন লোকদের দ্বারা প্রাপ্ত কষ্টকে আল্লার আজাবের সমান দেখে। (আল্লার আজাবের পরওয়া না করিয়া মানুষের দেওয়া কষ্ট-যাতনায় ইসলাম ত্যাগ করে। নতুবা আল্লার আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য চরম নির্য্যাতনেও ইসলামকে আঁকড়াইয়া থাকিত)।" (২০ পাঃ ১ রুঃ)

মোসলমানগণ এই আয়াতটিও লিখিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, ইহাতে ঐ শ্রেণীর লোকগণ খুবই চিন্তিত ও অনুতপ্ত হইল। অতঃপর এই আয়াত নাযেল হইল—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

“অবশ্য যাহারা নির্য্যাতনের পর হিজরত করিবে, তারপর সেই পথে সকল প্রকার বাধা-বিঘ্নের মোকাবিলা করিয়া চলিবে এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে—এই সব কার্য্য করিলে তোমাদের পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে ক্ষমাশীল দয়াবান হইবেন।” (১৪ পারা—২০ রুকু)

মোসলমানগণ এই আয়াতটিও মক্কায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে তাহারা আশার আলো পাইয়া হিজরত করিল। এইবারও কাফেররা তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে আসিলে, তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হইল। কেহ কেহ শহীদ হইলেন, কেহ কেহ বাঁচিয়া চলিয়া আসিলেন। (ফৎহুলবারী ৮—২১২)

এই উপলক্ষে আরও একটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে—(ইসলামী জেন্দেগী মোতাবেক চলা যায় না এমন পরিবেশ ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া না আসার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে) উল্লেখিত আয়াত নাযেল হইলে পর এক বৃদ্ধ যিনি ইসলাম কবুল করিয়া মক্কায়ই রহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি উক্ত আয়াতের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিলেন, যথা সত্বর খাটিয়ার উপর বিছানা কর। আমি উহার উপর শুইব এবং তোমরা আমাকে কাঁধে উঠাইয়া (মদীনায়) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া দিবা। তাহাই করা হইল এবং মক্কা হইতে যাত্রা করা হইল। মক্কা হইতে আড়াই মাইল দুরে তান্‌য়ী'ম নামক স্থানে পৌছিলে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেল। তাঁহারই ঘটনা বিবরণ দানে আলোচ্য আয়াত সংলগ্ন এই আয়াতটি নাযেল হইল—

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি হিজরত করতঃ নিজ ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তারপর মৃত্যু আসিয়া যায়, তাহার পূর্ণ ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে; আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।”

১৯০৭। হাদীছ ঃ— আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের নিকট বসিয়াছিলাম, তথায় বিশিষ্ট ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ) পৌঁছিলেন এবং সালাম করিলেন। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, এমন লোকদের মধ্যেও মোনাফেকী সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর লোক পরিগণিত ছিলেন।

এই কথার উপর আসওয়াদ (রঃ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ— إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "নিশ্চয় মোনাফেকরা দোযখের সর্ব্বাধিক গভীরতার তলদেশে থাকিবে।" (অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর লোকদের যদি ঐরূপ অবস্থা হয় তবে আমাদের কি হইবে?

অতঃপর হোজায়ফা (রাঃ) স্বয়ং তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিল (এই দিক দিয়া যে, তাঁহারা নিজ চোখে স্বয়ং আল্লার রসুলকে দেখিয়াছিলেন, রসুলের কথা শুনিয়াছিলেন, রসুলের ছোহবৎ ও সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন) এই ধরণের কোন কোন লোককেও মোনাফেকী স্পর্শ করিয়াছিল। অবশ্য তাহারা সতর্ক হইয়া তওবা করিলে পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের তওবা কবুল করিয়া পূর্ব্বের মর্ত্তবার অধিকারী করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে স্বীয় দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের উপর অভয় হওয়া চাই না। সর্ব্বদা সতর্ক থাকা চাই যেন মোনাফেকী ইত্যাদির ন্যায় কোন রোগ তাহাকে স্পর্শ করিয়া না বসে।

১৯০৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ যদি বলে যে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত প্রচারের কোন বিষয় গোপন রাখিয়াছেন তবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ - وَاِنْ لَّمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ -

"হে রসুল! আপনার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারের জন্য যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার সবটুকুই আপনি প্রচার ও প্রকাশ করিয়া দিবেন। যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি পরওয়ারদেগারের পয়গাম পরিবেশনকারী —রসুল হওয়ার কর্ত্তব্য পালনকারী সাব্যস্ত হইবেন না।" (৬ পারা ১৪ রুকু)

অর্থাৎ এই কড়া আদেশ থাকিতে কি হযরত (দঃ) কোন বিষয় গোপন রাখিবেন?

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ - فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও—মদ, জুয়া আর পূজার মূর্ত্তি এবং লটারী—এই সবই অপবিত্র এবং শয়তানী কার্য্যের বস্তু, তোমরা এই সব বর্জ্জন করিয়া চল। ইহাতেই তোমাদের সাফল্য। শয়তান চায় যে, তোমাদিগকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করিয়া তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে; (যদ্দারা সে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটির ন্যায় বড় বড় পাপ সহজেই করাইতে সক্ষম হইবে।) আর আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামায হইতে বিরত রাখে। (আল্লাহকে ভুলিয়া গেলে সংযত জীবন যাপনের মূল চাবি-কাটিই নষ্ট হইয়া গেল। নামায ছুটিয়া গেলে কুকর্ম্ম ও অপকর্ম্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার লাগামই ছিন্ন হইয়া গেল। এইভাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে গোটা জীবনই ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। অতএব, এখন মদ ও জুয়ার ধ্বংসাত্মক অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছ এবং আমার স্পষ্ট নিষেধ শুনিয়া নিয়াছ?) এখন ত তোমরা অবশ্যই এই সব হইতে বিরত থাকিবে?" (৭ পারা ২ রুকু)

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কেই নিম্নে বর্ণিত হাদীছ খানা—

১৯০৭ হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, শরাব বা মদ হারাম বলিয়া যেই সময় কোরআনের ঘোষনা নাযেল হইয়াছে তখন মদীনা এলাকায় পাঁচ প্রকার পানীয় মাদক দ্রব্য প্রচলিত ছিল। উহার কোন একটিও আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে বর্ণিত "خمر—খাম্‌র" শব্দটির অর্থ যাহারা আঙ্গুরের রশে তৈরী মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চায় তাহারা কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী এবং স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যাঁহার উপর কোরআন নাযেল হইয়াছিল ও আরবী ভাষা-ভাষী ছাহাবীগণ—যাঁহাদের সম্মুখে কোরআন নাযেল হইয়াছিল—তাঁহাদের সকলের ব্যাখ্যার বিরোধী ব্যাখ্যাকারী।

কারণ, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা خمر—খাম্‌র শব্দের মাধ্যমে নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ও ছাহাবীগণ উক্ত বিধান মদীনা এলাকায় প্রচলিত পানীয় মাদক দ্রব্যসমূহের উপর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঢোল-শোহরতের মাধ্যমে উহার ব্যবহার এবং লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছিলেন। ঐ সব পানীয় তৈরীর পাত্র সমূহকেও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিলেন। এমনকি ঐ সব পাত্রের সাধারণ ব্যবহারও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত হারাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকদের মালিকানায় পূর্ব্ব হইতে ঐ সব পানীয়ের যে ষ্টক মৌজুদ ছিল, ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে উহা ফেলিয়া দিয়া মদীনা এলাকার রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি সমূহকে প্রবাহিত মদের নালায় পরিণত করা হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আয়াতে মদ বা শরাবকে নিষিদ্ধ হারাম, নাপাক, অপবিত্র ও শয়তানী বস্তু ঘোষনা করিয়া এবং উহা বর্জ্জন করার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ—তোমরা উহা বর্জ্জন করিবে ত?" প্রশ্ন করা হইলে মদীনার ছাহাবীগণ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—انْتَهَيْنَا رَبَّنَا انْتَهَيْنَا رَبَّنَا

"হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা চিরতরে উহা বর্জ্জন করিলাম—হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা চির তরে উহা বর্জ্জন করিলাম।"

خمر—খাম্‌র শব্দের মাধ্যমে মদ বা শরাব হারাম হওয়ার বিধান কোরআনে নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হযরত (দঃ) এবং উপস্থিত ছাহাবীগণ এই সব করিয়াছিলেন। অথচ মোসলমানদের এলাকা মদীনা অঞ্চলে তখন যত প্রকার পানীয় মদ ছিল উহার মধ্যে কোনটিই আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না। সুতরাং যে কোন বস্তুতেই তৈরী হউক সকল প্রকার মদই হারাম।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়েও ঐ তথ্যেরই আরও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

১৯১০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের মদীনা অঞ্চলে পানীয় মদ একমাত্র উহাই ছিল যাহাকে "ফজীখ্‌" বলা হইয়া থাকে (যাহা কাঁচা খেজুরের পচাই দ্বারা তৈরী হয়।)

আনাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমি (আমার মাতার দ্বিতীয় স্বামী—ছাহাবী) আবু তাল্‌হার গৃহে তাঁহার সঙ্গে কতিপয় ছাহাবীকে ঐ মদ পান করাইতে ছিলাম। এমতাবস্থায় তথায় এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং বলিল, আপনারা খবর পান নাই কি? সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ খবর? সে বলিল, শরাব হারাম হওয়ার ঘোষণা হইয়াগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলে আমাকে মদের কলসগুলি ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন। ঐ একজন মাত্র লোকের সংবাদেই তাঁহারা উহা করিলেন। এ সম্পর্কে আর অধিক যোগ-জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

১৯১১। হাদীছ :—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি খলীফা ওমর (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই ভাষণ দিতে শুনিয়াছি :—

হে লোক সকল! খাম্‌র—মদ বা শরাবকে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তোমরা জানিয়া রাখিও, উহা (শুধু আঙ্গুরের রশে তৈরী বস্তুতে সীমাবদ্ধ নহে। রবং উহা) সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার বস্তুতে তৈরী হইয়া থাকে, যথা—আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম ও যব। এতদ্ভিন্ন যে কোন বস্তুর মাদকাতায় হুস্-জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, উহাই খাম্‌র বা মদ ও শরাবের শ্রেণীভুক্ত।

১৯১২। হাদীছ :-ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর (মোনাফেক) লোক ছিল যাহারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে হাসি-ঠাট্টা ও রং-তামাসারূপে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকিত। (তাহাদের দেখাদেখি কোন কোন সাদা-সিধা মোসলমান ঠাট্টা ও তামাসারূপে নয়, কিন্তু অসংগত ধরণের প্রশ্ন করিল, যেমন—) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? আর এক ব্যক্তি যাহার উট হারাইয়া গিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উটটি কোথায়? এই শ্রেণীর প্রশ্নকারীদেরকে হুশিয়ার করিয়া এই আয়াত নাযেল হয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না (যাহার মধ্যে এমন উত্তরের সম্ভাবনা থাকে) যাহা প্রকাশে তোমাদের পক্ষে খারাবী হইবে।"

(ছুরা মায়েদাহ্—৭ পারা ৪ রুকু)

ব্যাখ্যা :—বিভিন্ন ধরণের লোকগণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে নানা প্রকার অনাবশ্যক, বরং অসংগত প্রশ্নাবলী করিয়া বিরক্ত করিয়া থাকিত। এমনকি একদা তিনি ঐ শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর আধিক্যে উত্যক্ত হইয়া মিম্বারে আরোহণ করতঃ রাগের সহিত বলিলেন, তোমরা প্রশ্ন কর। যত প্রশ্নই করিবা আমি উত্তর দিব। বিশিষ্ট ছাহাবীগণ হযরতের রাগ বুঝিতে পারিলেন। এমনকি তাঁহারা মাথা গোঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সাদা-সিধা রকমের কতিপয় ছাহাবী তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহারা হযরতের উক্তিকে প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করিয়া ঐ অসংগত শ্রেণীর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

(১) আবছুল্লাহ-ইবনে-হোযাফাহ (রাঃ) নামক এক ছাহাবী ছিলেন, তাঁহার আকৃতি স্বীয় পিতা হোযাফাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্য ছিল বিধায় ঝগড়া-বিবাদের সময় লোকগণ তাঁহাকে পিতা সম্পর্কে বিদ্রূপোক্তি করিত। বহু দিন হইতে তিনি এই ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন। আজ

তিনি সুযোগ মনে করিয়া হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞালা করিলেন, আমার পিতা কে? তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হযরত (দঃ) আমার পিতার নাম হোযাফাহ বলিয়া দিলে আর কাহারও কিছু বলিবার অবকাশ থাকিবে না।

(২) আর এক ব্যক্তি (তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াহিল সে) জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কোথায় স্থান পাইয়াছে?

এই শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর উত্তরে এমন একটা দিকের সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহার প্রকাশ মানুষ অবশ্যই খারাব মনে করিবে। যেমন প্রথম প্রশ্নকারীকে হযরত (দঃ) তাহার পিতার নাম হোযায়ফাহই বলিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার বুদ্ধিমতী মাতা তাহাকে তাহার ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, খোদা-নাখাস্তা যদি তোমার মাতার দ্বারা কোন খারাব কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিত যাহা এত দিন গোপন ছিল তবে হযরত (দঃ) ত তোমার প্রশ্নের উত্তরে অন্য ব্যক্তির নাম বলিয়া দিতেন এবং চিরকালের জন্য সর্ব্বসমক্ষে মান-ইজ্জতের সমাধি-রচিত হইত।

দ্বিতীয় প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন—, فى النار অর্থাৎ তোমার পিতার বাসস্থান দোযখে। এই বিষয়টি প্রকাশ হওয়া তাহার জন্য খারাব হইল।

আরও একবারের ঘটনা:—হযরত (দঃ) এলান করিলেন, সামর্থ্যবান লোকদের উপর হজ্জ ফরজ। প্রশ্ন করা হইল, প্রতি বৎসর? হযরত (দঃ) কিছু সময় চুপ থাকিবার পর বলিলেন, না—অর্থাৎ মাত্র একবার ফরজ। এই প্রশ্নটিও অবান্তর ছিল এবং সম্ভাবনা ছিল, "হাঁ" বলিয়া দেন—তা হইলে ব্যাপারটা কত কঠিন হইয়া পড়িত! হযরতও এই বিষয়ের ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, لو قلت نعم لوجبت "যদি আমি "হাঁ" বলিয়াদিতাম তবে প্রত্যেক বৎসরের জন্যই হজ্জ ফরজ হইয়া যাইত।"

অসংগত প্রশ্ন সম্পর্কে খারাব উত্তরের সম্ভাবনা অন্ততঃ এতটুকু ত অবশ্যই থাকে যে, তিরস্কার বা রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ হইবে। যেমন এক ব্যক্তির উট হারাইয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তিও পূর্ব্বোল্লেখিত হযরতের ক্রোধজনিত সুযোগদানের কথায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমার উটটি কোথায় হারাইয়াছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিরস্কার ও রাগ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহা অবশ্যই খারাব মনে করা হইবে। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রশ্ন করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে!

বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়, নায়েবে-নবী—আলেমগণের নিকট পরীক্ষামূলক হাসি-তামাসা মূলক বা বিব্রত করার উদ্দেশ্যক অসংগত ও অনাবশ্যক প্রশ্নাবলী করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রশ্ন মোটেই করা চাইনা। আলেমগণের নিকট শরীয়তের বিধান ও আখেরাতের উন্নতির পথ পাইবার উদ্দেশ্যজনক প্রশ্নই করা যাইতে পারে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ -

তফছীর :—অন্ধকার যুগে দুইটি কুপ্রথা ছিল—(১) দেব-দেবীদের নামে জানোয়ার ছাড়িয়া দেওয়া হইত। (২) বিশেষ বিশেষ জানোয়ার দেব-দেবীদের নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইত ও তাহাদের জন্য নিয়্যত করিয়া রাখা হইত এবং এই সূত্রে ঐ জানোয়ারকে সম্মান করা হইত। "বাহীরাহ্" "ছায়েবাহ্ "অছীলাহ্" "হাম"—এই সব বিভিন্ন নামে ঐ শ্রেণীর জানোয়ারের নাম করণ হইয়া থাকিত।

উল্লেখিত আয়াতে ঐ শ্রেণীর কুপ্রথা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ঐ ধরণের প্রথা আল্লাহ তায়ালা কখনও প্রবর্ত্তন করেন নাই, বরং উহা কাফের-মোশরেকদের গর্হিত কাজ। অবশ্য উহা দ্বারা তাহারা মিছামিছি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দাবি ও আশা করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পচিচয়। (৭ পারা ৪ রুকু)

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত প্রথাগুলির মূল দোষ হইল এই যে, উহা শেরেকী কাজ; আর শেরেকী কাজ দেব-দেবীর নামে হইলেও যেরূপ পীর-পয়গাম্বর ওলী-দরবেশের নামে হইলেও তদ্রূপই। সুতরাং মোসলমান নামধারী এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে---পীর, ওলী, দরবেশ বা তাহাদের মাজারের ও ওরোসের নামে কোন জানোয়ার ছাড়া হয় কিম্বা কোন জানোয়ারকে ঐ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ঐ নামে নিয়্যত করিয়া উহার তাজিম ও সম্মান করা হয়। এমনকি উহাকে কেন্দ্র করিয়া খানা-পিনার বা গান-বাদ্যের ধুমধাম করা হয়, উহার জুলুস ও মিছিল করা হয় এই সবই শেরেকী কাজ। যেরূপ দেব-দেবীর নামে বা পীর-পয়গাম্বর, ওলী-দরবেশেয় নামে কোন জানোয়ার জবেহ করিলে তাহাও শেরেকী কাজ।

মছ আলাহ :—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামে জানোয়ার জবেহ করিলে যেরূপ উহা মৃত গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলে—নিয়্যত করিয়া রাখিলে, এই অবস্থায় উহাকে আল্লার নামে জবেহ করিলেও উহা হারাম গণ্য হইবে। ঐ জানোয়ারকে হালাল করিতে হইলে উহা জবেহ করার পূর্ব্বে অন্যের নামে নিয়্যত ও নির্দ্দিষ্ট করার কার্য্য হইতে খাঁটী তওবা করিতে হইবে। তারপরে উহাকে আল্লার নামে জবাহ করা হইলে উহা হালালহইবে। (তফছীর বয়ানুল-কোরআন দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে জানোয়ার ছাড়া বা নির্দ্ধারিত করা যে, ইসলামের বা কোন মোসলমানের কার্য্য নহে, বরং উহা জাহান্নামী কাফেরদের প্রবর্ত্তিত প্রথা—নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উহার একটি বিশেষ তথ্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১৯১৩। **হাদীছঃ**— আয়েশা (রাঃ) (এক হাদীছে সূর্য্যগ্রহণের নামাযের বিবরণ দান পূর্ব্বক) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায শেষ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ উভয়টিই আল্লাহ তায়ালার (অসীম ও সর্ব্বময় কুদরতের অসংখ্য) নিদর্শন সমূহের দুইটি নিদর্শন। উহা যখন তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায় তখন তোমরা (আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়ার উদ্দেশ্য) নামাযে মশগুল থাক যাবৎনা উহা অপসারিত হইয়া যায়।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, আমার এই নামায পড়াকালে আমাকে পরকালের সব কিছু দেখান হইয়াছে যাহার সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি (আমাকে বেহেশত এত নিকটবর্ত্তী দেখানো হইয়াছে যে,) আমি বেহেশত হইতে আঙ্গুরের একটি ছড়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া ছিলাম; যখন তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, আমি সম্মুখ দিকে আগাইয়া ছিলাম। ঐ সময় আমি দোযখও দেখিয়াছি, উহার অগ্নিশিখাগুলি কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল; তখনই তোমরা দেখিয়াছ, আমি পিছনের দিকে হটিয়া ছিলাম। তখন দোযখের মধ্যে আমর-ইবনে (লুহা'ই) খোযায়ীকে দেখিয়াছি—তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সে ঐগুলিকে হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। সে-ই সর্ব্ব প্রথম দেব-দেবীর (তথা গায়রুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন অন্যের) নামে জীব-জন্তু ছাড়ার প্রথা চালু করিয়াছিল।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:—

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا - وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

পাপীদের কোন পাপই আল্লাহ তায়ালার অগোচরে থাকিতে পারে না—তাহা উপলক্ষ্য করিয়া উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও অবগতির অসীম ব্যাপকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। মানুষের কার্য্য-কলাপ ত একটা সাধারণ জিনিষ— "আল্লার এলম তথা তাঁহার অসীম জ্ঞান ও অবগতির আয়াত্তে রহিয়াছে—সমুদয় গায়েব তথা ভূতভবিষ্যতের অগোচর, অদৃশ্য, গোপন কার্য্য কলাপ ও রহস্যাদির ভাণ্ডারসমূহ এবং উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সেই ভাণ্ডার সমূহ বা উহার চাবিকাঠি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও অনুভূতির আয়াত্তে নাই। জলে-স্থলে—যথায় যাহা কিছু ঘটে, ঘটিয়াছে বা ঘটিবে সবই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। (নিবিড় জঙ্গলে গভীর অন্ধকারে ছোট্ট হইতে ছোট্ট) একটি পাতাও যদি ঝরে

তাহাও আল্লার অজ্ঞাতে হইতে পারে না। তাহাও আল্লাহ তায়ালা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকেন। কোন একটি ক্ষুদ্রতম দানা বা বীজ যাহা ভূগর্ভে অন্ধকারের অন্তরালে রহিয়াছে তাহা এবং যত প্রকার তাজা বা শুষ্ক বস্তু রহিয়াছে (সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জানা রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বরং) সব কিছু লওহে-মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে।" (ছুরা আন্‌য়া'ম—৭ পারা ১৩ রূকু)

মহান আল্লার গুণাবলীর অসীমতা সম্পর্কে মানুষ এতটুকুই ভাবিতে পারে—

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم - و از ہرچہ گفتہ ایم و شنیدہ ایم

হে খোদা! তুমি সব কিছুরই উর্দ্ধে, সব কিছুরই নাগালের বাহিরে—আমাদের অনুমানের, আমাদের কল্পনার, আমাদের ধারণার, আমাদের চিন্তার এবং যতদুর আমরা বলিতে পারি, যতদুর আমরা গবেষণা করিতে পারি।

উল্লেখিত আয়াতে গায়েবের ভাণ্ডারসমূহ বা গায়েবের চাবিকাঠি সমূহ এক মাত্র আল্লাহ তায়ালারই আয়ত্তে বলা হইয়াছে; অর্থাৎ অন্য কেহই সামগ্রিকভাবে গায়েবের সকল বিষয় জানে না। তাহা বুঝাইবার জন্য নমুনা বা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে যাহা সচরাচর সকলের সম্মুখেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐগুলি যে পর্য্যন্ত গায়েব তথা অদৃশ্যের অন্তারালে থাকে সে পর্য্যন্ত কেহই উহাকে নির্দ্দিষ্ট ও সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ঐ অবস্থায়ও ঐগুলিকে পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত থাকেন।

১৯১৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (পবিত্র কোরআনে যে,) গায়েবের ভাণ্ডারসমূহ বা চাবিকাঠি সমূহ (বলা হইয়াছে উহার উদাহরণমালা কোরআনেই অন্যত্র বর্ণিত আছে, তাহা) পাঁচটি। য়থা—(১) আগামী কাল কি হইবে, কে কি করিবে তাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ সম্যকরূপে জ্ঞাত নহে। (২) নারীদের গর্ভাশয় যাহা খালাস করিয়া থাকে (খালাস হওয়ার পূর্ব্বে) উহার পূর্ণ অবস্থা সম্যকরূপে আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত নহে। (৩) বৃষ্টি কবে এবং ঠিক কোন সময় বর্ষিবে তাহার পূর্ণ ও সঠিক তথ্য অটল, অনড় ও নির্ভুলভাবে আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত নহে। (৪) কেহই তাহার মৃত্যু কোথায় হইবে তাহা জানে না (আল্লাহ তায়ালা তাহা জানেন)। (৫) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে হইবে তাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না।

(এই প্রসঙ্গে হযরত (দঃ) এই আয়াতটি তেলয়াত করিলেন—)

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ -

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ

تَمُوْتُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

আল্লাই জানেন কেয়ামত সম্পর্কে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন। এবং মাতৃগর্ভে যাহা আছে তাহার পূর্ণ হাল অবস্থাও তিনিই জানেন। আর কোন ব্যক্তি নিজেও জানে না, সে আগামী কাল কি করিবে এবং কোন ব্যক্তি নিজেও জ্ঞাত নহে, তাহার মৃত্যু কোন স্থানে হইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (২১ পাঃ—ছুরা লোকমান সমাপ্তে)

ব্যাখ্যা—উল্লেখিত আয়াতে খাজানায়ে-গায়েব তথা গায়েব বা অদৃশ্য বস্তু সমূহের ও গোপন রহস্যাবলীর ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য হাদীছে مفاتح الغيب—মাফাতেহুল গায়েব তথা খাজানায়ে-গায়েবের উদাহরণ রূপে উক্ত পাঁচটি বিষয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ; গায়েব সম্পর্কে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আর কাহারও নাই, তাহা চাক্ষুস প্রামাণিকরূপে বুঝাইবার জন্য উক্ত পাঁচটি বিষয়ের উদাহরণ অত্যন্ত উপযোগী।

(১) কেয়ামত কবে হইবে?

সমস্ত লোকই এই ধরাপৃষ্ঠে বসাবস করিতেছে, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক রাজা-বাদশা, নবী-রসুল, পীর-আওলিয়া সকলেই এই বসুন্ধরার অধিবাসী, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না ও পারে নাই—ইহার বিলুপ্তি ও পরিসমাপ্তির দিন কোন্‌টি। নিজ গৃহের খবরই যাহার নাই সে খাজানায়ে-গায়েবের অগণিত রহস্যাবলীর জ্ঞান আয়াত্তকারী কিরূপে হইতে পারে?

(২) বৃষ্টি সম্পর্কীয় সম্যক জ্ঞান:

মানুষের এই আবাসগৃহ ভুমণ্ডলের জীবনী শক্তি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর এবং মানুষের জীবনধারণের উপকরণগুলির অস্তিত্বও সেই বৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল। এমন একটি আবশ্যকীয় বস্তু উহা এবং সকলের সম্মুখেই উহার গমণামন হইতেছে, এতদসত্বেও মানুষ উহার গোপন রহস্যগুলির সম্যক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষ নির্ভুলরূপে এতটুকুও জানে না, ঠিক কোন সময়, কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিবে *। সেই মানুষ খাজানায়ে-গায়েবকে তাহার আওতায় কিরূপে আনিতে

---

* বিজ্ঞানের এই সর্ব্বাত্মক উন্নতির যুগেও যান্ত্রিক সাহায্য যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা পূর্ব্বাভাস মাত্র। নির্ভুল সঠিক সংবাদ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা সম্ভব

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পারে ? অবশ্য আল্লাহ তায়ালা উহা এবং উহার সমুদয় সৃষ্টি রহস্যও সম্যকরূপে জ্ঞাত আছেন। কেননা, তিনিই বৃষ্টির এবং উহার বর্ষণ তাঁহারই ক্ষমতা ও আদেশাধীন।

(৩) গর্ভাশয়ের সন্তান সম্পর্কীয় জ্ঞান ঃ

গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কীয় জ্ঞান যে, উহা নর, না—নারী এবং গর্ভ খালাসে সময় বেশী যাইবে না কম তাহাও মানুষ সম্যক, সঠিক ও নির্ভুলরূপে নির্ণয় করিতে অক্ষম। বিজ্ঞানের এই জয়জয়কারের যুগেও তাহা সম্ভব হয় নই। মাতা দীর্ঘ দিন উহা বহন করিয়া থাকে সেও উহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। এত নিকটস্থ এবং এত আঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত একটি বস্তু সম্পর্কে যে মানুষ এত অজ্ঞ সেই মানুষ খাজানায়ে-গায়েবকে কিরূপে জয় করিতে পারিবে ?

(৪) আগামী কল্য কি করিবে ?

অপরের ত দূরের কথা নিজে আগামী দিন কি করিবে এবং আগামী দিন তাহার পক্ষে কি ঘটিবে সে সম্পর্কেও প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে মানুষ নিজের সম্পর্কেই এত অজ্ঞ সে খাজানায়ে-গায়েবকে কিরূপে জানিতে পারে ?

(৫) কোথায় মৃত্যু হইবে ?

প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কেই এত অজ্ঞ যে, তাহার ইহজগতের সর্ব্বশেষ অবস্থা যে মৃত্যু সেই মৃত্যু কোন্ সময় কোথায় আসিবে তাহাও সে জানে না। সেই মানুষ অসীম অসংখ্য খাজানায়ে-গায়েবের জ্ঞান জয়কারী কিরূপে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমুদয় গায়েব তথা গুণী-জ্ঞানী, বিজ্ঞানী সমগ্র মানব-দানবেরও দৃষ্টির আগোচরে ও সমগ্র সৃষ্টির অনুভূতির অন্তরালে যে রহস্যমালার অসীম ময়দান ও কূলহীন সমুদ্র আছে তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে বলিয়া পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানেই বিঘোষিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা মানব সমাজকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে—

পবিত্র কোরআন বা প্রেরিত রসুল মারফৎ আল্লাহ তায়ালা যে আদর্শ দান করিয়াছেন এবং উহাতে যে, বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যে আদেশ নিষেধ প্রদান করিয়াছেন, যে যে ভাগ-বন্টন বা সীমা রেখা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন,

---

হয় নাই, হইবেও না। এতদ্ভিন্ন এই পূর্ব্বাভাসও এলমে-গায়েব মোটেই নহে, বরং কোন বস্তুর লক্ষণ দেখিয়া উহার আগমণের ধারণা করা মাত্র, যাহা একটি অতি সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়। যেরূপ আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া বৃষ্টির আগমণ সাধারণ ভাবেই অনুভব করা হইয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে মোটা জিনিষই ধরা পড়ে। তাই এখানেও মোটা নিদর্শনের উপরই নির্ভর করা হয়। যান্ত্রিক সাহায্যে সূক্ষ্ম নিদর্শনও দেখা যায় যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তাই যন্ত্রধারীগণ সাধারণ লোকদের একটু পূর্ব্বে সংবাদ দিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়েই লক্ষণ দেখিয়া বস্তুর আগমণ অনুভবকারী।

উহার (Revise, reform) পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অবকাশ কোন সৃষ্টের জন্য থাকিতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ কোন হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত বিলয়া দৃষ্ট হইলে তাহা সৃষ্টির দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতার কারণেই হইবে। তাই উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আলেমুল-গায়েব সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশকেই মানিয়া চলিতে হইবে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ -

মানুষকে বিপদ-আপদ হইতে আল্লাহ তায়ালাই সুরক্ষিত রাখেন। মানুষ সুখে থাকিয়া আল্লাহ তায়ালাকে যেন ভুলিয়া না যায়, সেই উদ্দেশ্যে মানুষকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেরূপ রক্ষা করিতে পারেন তদ্রূপ তাঁহার নাফরমানী করিলে "তিনি ইহাও করিতে পারেন যে, তোমাদেরে ধ্বংসকারী আজাব পাঠাইয়া দেন উপরের দিক হইতে, (যেমন উপর হইতে শিলা-পাথর বর্ষণ, অগ্নিময় বজ্রপাত, অগ্নিময় বা হিম বায়ু প্রবাহণ, ঝড়, তুফান ইত্যাদি।) বা নীচের দিক হইতে, (যেমন দেশময় প্রলয়কর ভূকম্পন ও ভূধসন ইত্যাদি।) কিম্বা তোমাদের মধ্যে দলাদলী সৃষ্টি করিয়া পরস্পর ঝগরা-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত করিয়া দিতে পারেন।" (ছুরা আন্‌য়া'ম—৭ পারা ১৪ রুকু)

নাফরমানদিগকে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে পূর্ণ শাস্তি দিবেন, ছুনিয়াতেও তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য এবং পরবর্ত্তী যুগকে শিক্ষা দান ও সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আজাব পাঠাইবার ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে সেই সব আজাবেরই বর্ণনা দান করা হইয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদের উম্মৎগণ নাফরমানীতে লিপ্ত হইলে তাহাদের উপর উল্লেখিত আজাব সমূহ আসিয়াছে এবং তাহারা উহাতে ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের ধ্বংসের বহু ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে পবিত্র কোরআন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) স্বীয় উম্মতের স্নেহ-মমতা তাহাদের সুখ সুবিধার আকাঙ্খা কোন ক্ষেত্রেই ভুলেন নাই। তিনি ভাবিলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রথম ছুই প্রকারের আজাব আসিলে অপরাধীগণ তওবা করার ও সংশোধিত হওয়ার সুযোগ খুব কমই পায় এবং সহসা ধ্বংস হইয়া যায়—যেরূপে পুর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎগণ হইয়াছে। অবশ্য তৃতীয় প্রকারের আজাবটি এরূপ যে, ঐ ক্ষেত্রে

দীর্ঘ দিনের সুযোগ পাওয়া যায় এবং অপরাধীগণ সহসা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় না। তাহারা তওবার ও সংশোধনের সুযোগ পাইতে পারে।

নাফরমান অপরাধীগণকে সতর্ক করিয়া যখন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আজাবত্রয়ের বিবরণ দান করিলেন, তখন অপরাধীগণের পক্ষেও দয়াল নবীর স্নেহ মমতার ঢেউ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন—হে পরওারদেগার! আমার উম্মৎ যদি শাস্তির উপযুক্ত হইয়া পড়ে তবুও তাহাদের উপর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার আজাব পাঠাইওনা। তোমার প্রতি ধাবিত করার উদ্দেশ্যে শায়েস্তা ও সতর্ক করার প্রয়োজনে তাহাদিগকে তৃতীয় প্রকারের আজাব দ্বারা হুশিয়ার করিও, যেন তাহারা তওবা করার এবং সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরতের এই দোয়ারই বর্ণনা হইয়াছে এবং হযরতের এই দোয়া আল্লার দরবারে কবুল হইয়াছে।

১৯১৫। হাদীছ ঃ—ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত নাযেল হওয়া-কালের বর্ণনা করিয়াছেন, "عذابا من فوقكم উপরের দিক হইতে আগত আজাব" এর উল্লেখ হইলে সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে পরওয়ার-দেগার! আমি করজোড়ে তোমার নিকট এই শ্রেণীর আজাব হইতে পানাহ্ চাই এবং "او من تحت ارجلكم—নীচের দিক হইতে আগত আজাব"-এর উল্লেখ হইলে হযরত (দঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট এই শ্রেণীর আজাব হইতেও পানাহ্ চাই। অতঃপর —او يلبسكم شيعا— তোমাদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলী সৃষ্টি করিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত করিতে পারেন" এর উল্লেখ হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহা পূর্ব্বের দুইটি অপেক্ষা সহজ ও নরম আজাব, (যেহেতু ইহার ক্ষেত্রে তওবা ও সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।)

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল—জাতীয় অনৈক্য, বিভেদ ও দলাদলি তুচ্ছ ও অবহেলার বস্তু নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লার আজাব। জাতিগতভাবে আল্লার নারফরমানী করা হইলে আল্লাহ তায়ালা জাতিকে এই আজাবে লিপ্ত করিয়া থাকেন, তাই ইহা হইতে বাঁচিতে হইলে সম্মিলিতভাবে আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

স্মরণ রাখিবেন—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আজাব ব্যাপক আকারে সমুদয় জাতিকে সহসা ধ্বংস করিয়া দেয়। যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎদের অবস্থা হইয়াছে—তাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মৎকে রেহায়ী দিয়াছেন। কিন্তু এক জনের দ্বারা দশ জনকে সতর্ক করার জন্য স্থান বিশেষে ঐরূপ আজাব এই উম্মতের মধ্যেও আসিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি বা স্থান বিশেষে আসে; ব্যাপকরূপে আসে না।

১৯১৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্যই একদিন সূর্য্য তাহার অস্ত যাওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে এবং সকলেই তাহা দেখিতে পাইবে। তৎকালীন বিশ্ববাসী উহা দেখিয়া (বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তাই তখন) সকলেই ঈমান আনিবে, কিন্তু (যাহারা পূর্ব্ব হইতে ঈমানদার ছিল না, শুধু তখন ঈমান আনিয়াছে—তাহাদের ঈমান গৃহিত হইবে না। কারণ,) তখনকার সময়টিই ঐ সময় যখন ঈমান গ্রহণীয় নহে বলিয়া কোরআনের ঘোষণা রহিয়াছে—

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লার কালাম কোরআন এবং আল্লার রসুল ও তাঁহার বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া বা সৃষ্টিগত সত্য-উপলব্ধি শক্তির প্রভাবে আল্লার প্রতি ইমান আনা, আখেরাতের প্রতি ইমান আনা এবং আল্লার ভয়ে ও আখেরাতের ভয়ে পাপ হইতে তওবা করা—এই ঈমান ও তওবাই হইল যথার্থ ও ফলদায়ক এবং সেই ঈমান ও তওবাই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে আখেরাতে সকলেই ঈমান প্রকাশ করিবে। কিন্তু সেই ঈমানের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহজগৎ ত্যাগের মুহূর্ত্ত উপনীত হইলে— যখন ফেরেশতা ইত্যাদি দেখার স্বাভাবিক চক্ষু খুলিয়া যায়, তখনকার ঈমান এবং তওবাও গ্রহণীয় নহে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামত অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার কতিপয় বিশেষ নিদর্শন আছে উহা প্রকাশিত হইয়া কেয়ামতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষের পর্য্যায়ে প্রমাণিত হইয়া গেলে তখনকার ঈমান এবং তওবাও গৃহিত হইবে না এই বিষয়টিই এই আযাতে বর্ণিত হইয়াছে—

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا -

"যে দিন তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে (কেয়ামতের বড় বড় নিদর্শগুলির) বিশেষ নিদর্শনটি প্রকাশ হইয়া যাইবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান ফল-প্রদ হইবে না যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঈমান আনিয়াছিল না। কিম্বা (পূর্ব্ব হইতে ঈমান ছিল, কিন্তু ঈমান অবস্থায় কোন নেক আমল করে নাই—সারা জীবন গোণার কাজে নিমগ্ন ছিল, তওবা করে নাই ; সেই দিন ঐ অবস্থা দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইয়াছে এবং তওবা করিয়াছে,) তাহার তওবাও কোন ফল-প্রদ হইবে না।"

(৮ পারা—ছুরা আন্‌য়াম শেষ)

এই আয়াতে যে বিশেষ নিদর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে উহারই ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীছে করা হইয়াছে—উহা হইল সূর্য্য অস্ত যাওয়ার দিক হইতে উদিত হওয়া। কেয়ামত অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাধিক ব্যাপক নিদর্শন এই যে--একদিন সূর্য্য উদিত হওয়ার দিক হইতে উদিত না হইয়া অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ঐদিক হইতে চলিয়া মধ্য আকাশে পৌঁছিবে, পুণরায় ঐ দিকে ফিরিয়া যাইবে এবং স্বাভাবিকরূপে অস্তমিত হইবে। অবশ্য অতঃপর যে কয়দিন দুনিয়া বাকি থাকিবে স্বাভাবিকরূপেই উদিত ও অস্তমিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অস্ত যাওয়ার দিক হইতে সূর্য্য উদয় হওয়া সম্পর্কে ছুরা ইয়াছীনের একটি আয়াতের তফছীরে বর্ণিত একটি হাদীছে কিছু তথ্য রহিয়াছে। নিম্নে ঐ হাদীছটি ৪৫৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

১৯১৭। হাদীছ ঃ—আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্‌দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে! কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজ্‌দা করিবে, কিন্তু তাহার সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে—যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই এই আয়াতের—

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

"(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সূর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।"

ব্যাখ্যা ঃ—সারা সৃষ্টি জগতের পক্ষে কল্যাণময় এই বিশাল সূর্য্য যাহা এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়, যাহার গুণাগুণ বা বিশালতা দৃষ্টে উহাকে এক শ্রেণীর লোক পূজনীয়রূপে বরণ করিয়াছে। আবহমান কাল হইতে সর্ব্ব সমক্ষে সুশৃঙ্খলতার সহিত সূর্য্যের গতিবিধি পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু সূর্য্য তাহার

গতিবিধিতে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাধীন নহে। তাহার জন্য নির্দ্ধারিত নিয়মের চুল পরিমাণ ব্যতিক্রমও সে করিতে পারে না। সুতরাং ইহা বাস্তবিকই মহান আল্লার একত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই বিষয়টিই আলোচ্য হাদীছে সুস্পষ্ট ভাষায় খুলিয়া বলা হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্য ও উহাদের কক্ষগুলি সহ সমুদয় সৌর-জগৎই আরশের নীচে রহিয়াছে। আরশ ত এই সবের সমষ্টি হইতে বহু বহু গুণে সুপ্রশস্ত। সুতরাং সূর্য্য প্রত্যেক অবস্থায় এবং প্রত্যেক স্থানে সদা সর্ব্বদাই আরশের নীচে রহিয়াছে। অতএব, আলোচ্য হাদীছে সূর্য আরশের নীচে যাওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, যে মহাশক্তির পরিচালন-ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে আরশ হইতে* সেই শক্তির করায়ত্ত, অধীনস্থ ও অনুগতরূপে সূর্য্য ঐ ঐ স্থানের দিকে চলিতে থাকে যে যে স্থানকে বিভিন্ন ভূখণ্ডের জন্য সেই মহাশক্তি সূর্য্যের কেন্দ্ররূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, তথায় যাইয়া সূর্য্যকে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে।

আল্লার রসুল বুঝাইতে চাহিতেছেন, আবহমান কাল হইতে যে দেখা যায়, সূর্য্য একদিক হইতে উদিত হইয়া অপর দিকে অস্তমিত হইতেছে। তাহার এই বিরাম-হীন গমনাগমন নিছক স্বেচ্ছাক্রমের ও স্বক্রিয় ভাবের নহে, বরং উহার মূলে রহিয়াছে মহান আল্লার তরফ হইতে তাহার জন্য নির্দ্ধারিত বিভিন্ন কেন্দ্র ও ষ্টেশন অতিক্রম করার আদেশ ও অনুমতি। সুতরাং প্রতীয়মান হইল যে, সূর্য্যও সেই মহাশক্তি তথা মহান আল্লার সম্মুখে একটি নগণ্য অনুগত দাসই বটে। অতএব সূর্য্যকে পূজা না করিয়া মহান আল্লাহকেই একমাত্র পূজণীয় রূপে গ্রহণ করিবে।

সূর্য্যের সেজদা-রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটা সংবাদ স্মরণ করা বিশেষ ফলদায়ক হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তুই নিজ নিজ কায়দায় সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার তছবীহ পাঠ (তথা গুণ-গান ও পবিত্রতা বর্ণনা) করিয়া থাকে। অবশ্য তোমরা উহাদের তছবীহ পাঠ বুঝিতে ও অনুধাবন করিতে সক্ষম নও।" (১৫ পারা —৫ রুকু)

দার্শনিক কবি মাওলানা রুমীর আর একটি তথ্যও পেশ করা হইল—

خاک وباد وآب و آتش بندہ اند - با من وتو مردہ باحق زندہ اند

আগুন, পানি, বায়ু, মাটি সবই আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা ; আমার ও তোমার পক্ষে ঐ শ্রেণীর বস্তুগুলি নির্জ্জীব দেখাইলেও সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে ঐ সবগুলিই জীবন্ত !

---

* যেমন একটি লোক লাহোর হইতে খুলনা বা ফরিদপুরের দিকে যাত্রা করিলে বলা যাইতে পারে যে, সে ঢাকার আণ্ডারে যাইতেছে, যেহেতু খুলনা ফরিদপুর এক একটি কেন্দ্র যাহা রাজধানী ঢাকার পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ... ... ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

"আর তোমরা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য—সর্ব্ব প্রকারের নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলী হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিও ঐ সবের ধারে-কাছেও যাইও না।......এই সব আদেশ-উপদেশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যেন তোমাদের কার্য্যকলাপে বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (৮ পারা ৬ রুকু)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ......

"আপনি জগৎবাসীকে জানাইয়া দিন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলীকে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। (ছুরা আ'রাফ—৮ পারা ১১ রুকু)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলী হারাম ও নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে সে সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

১৯১৮। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাল (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শালীনতা বিবর্জ্জিত নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপকে আল্লাহ তায়ালা সকলের চেয়ে অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ফাহেসাকে হারাম করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসাকে সর্ব্বাধিক ভাল বাসিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বর্ত্তমান জগতে শালীনতাহীন নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপই হইল শিক্ষা ও সভ্যতার নিদর্শন এবং উহাই হইল বিভিন্ন মহল ও জল্সা-জুলুসের উৎকর্ষ সৌন্দর্য্য ও উজ্জলতা বদ্ধর্নকারী। এমনকি আর্ট ও শিল্প ইত্যাদি নামের অঙ্গভঙ্গী, নৃত্য-গীত ও ফাহেসাবাজীকে জাতীয় উন্নতির উৎস বলা হইয়া থাকে। সরকারী বাজেটে মোটা মোটা অঙ্ক উহার জন্য বরাদ্দ করা হইয়া থাকে।

আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া যাহারা করে না—যাহারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী অমোসলেম তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভব বটে, এবং সাধারণতঃ আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের পক্ষে ইহজগতে উহা বরদাশ্‌ত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা মোসলমান তথা আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া করার বন্দনে আবদ্ধ তাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার ঐরূপ ঘৃণিত ফাহেসা কার্য্যাবলী অবশ্যই কলঙ্কময়! তিনি তাহাদের পক্ষে অনেক সময় উহা বরদাশত করেন না। ফলে তাহারা আল্লার গজবে নিপতিত হয়।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরা খোদা-ভক্ত মোত্তাকী পরহেজগার। কিন্তু তাহাদের ছেলে-মেয়েরা তাহাদেরই খরচায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই শিক্ষা ও পরিবেশে প্রতিপালীত হইতেছে যাহা ঐ নির্লজ্জ ফাহেসা আদৎ-অভ্যাসের মূল উৎস ও সূত্র। নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় ছেলে-মেয়েদিগকে আল্লাহ তায়ালার ঘৃণিত কার্য্যাবলী—নির্লজ্জ ফাহেসা আদৎ-অভ্যাসের আলয়ে প্রতি পালন করিয়া আল্লাহ-ভক্ত কিরূপে হওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই বিবেচ্য বিষয়।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"ক্ষমাগুণ ধারণ কর, সৎ কাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞ লোকদের (বিরক্তিজনক ব্যবহার) হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চল।"

১৯১৯। হাদীছ ঃ—আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে আদেশ করিয়াছেন—লোকদের অসদাচরণ ক্ষমা করার জন্য। মানবকে এই চারিত্রিক গুণ অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযেল করিয়াছেন।

১৯২০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে নামায পড়িতেছিলাম, এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট দিয়া যাইবার কালে আমাকে ডাকিলেন। (আমি যেহেতু নামাযে ছিলাম, তাই) আমি তাঁহার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইলাম না। নামায শেষ করিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কেন আস নাই ? আমি আরজ করিলাম ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি নামায পড়িতে ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার লক্ষ্য নাই যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يا يها الذين امنوا استجيبو لله وللرسول اذا دعاكم

"হে মোমেনগণ। আল্লাহ এবং রসুল তোমাদিগকে ডাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিও" (আবু সায়ীদ বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইন্‌শা আল্লাহ্ এই ত্রুটি পুনরায় কখনও করিব না।)

তারপর হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে কোরআন শরীফের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছুরা কোনটি তাহা বাতলাইয়া দিব। অতঃপর নবী (দঃ) আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। মসজিদ হইতে বাহির হইবার নিকটবর্ত্তী

হইলে আমি তাঁহার ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই ছুরাটি হইল "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল-আলামীন"। যাহা বিশেষরূপে আমাকেই দান করা হইয়াছে, (অন্য কোন আসমানী কেতাবে এই ছুরা ছিল না।) এই ছুরাকেই কোরআনে-আজীম (কোরআনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অংশ) এবং সাব্‌য়েঃ মাছানী (সপ্ত আয়াতবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ পঠিত) নামে (১৪ পারা—ছুরা হেজর ৬ রুকুতে) আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

অর্থাৎ ঃ—হে মোমেনগণ! আল্লাহ এবং আল্লার রসুল যে সব বিধানাবলী ও কার্য্যাবলীর প্রতি আহ্বান করেন, বস্তুতঃ উহা তোমাদের ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে শান্তি ও সাফল্য আনয়নকারী। অতএব আল্লাহ এবং রসুল যখন তোমাদিগকে চিরস্থায়ী শান্তির জিন্দেগী দানকারী কার্য্যের প্রতি আহ্বান করেন তোমরা সেই ডাকে সাড়া দাও। (ছুরা আন্‌ফাল—৯ পারা ১৭ রুকু)

পুর্ব্বাপর বিষয়-বস্তু দৃষ্টে এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ-নিষেধকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা। সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং কোন কাজ কঠিন বোধ হইলেও বিনা দ্বিধায় উহাতে আত্মনিয়োগ করা।

আলোচ্য হাদীছে দেখানো হইয়াছে, উক্ত আয়াতের আদেশটি কত কঠোর এবং ব্যাপক! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে ডাকিলেও সেই ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল এবং উহাও এই আয়াতের বিধানভুক্ত ছিল। এমনকি নামাযরত থাকিলেও নামায ছাড়িয়া রসুলের ডাকে অবিলম্বে সাড়া দেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।

১৯ ১। হাদীছ ঃ—(৯ পাঃ ১৮ রুঃ ছূরা আনফাল ৩২নং আয়াত যাহার অর্থ) "একটি স্মরণীয় কথা—কাফেররা বলিল, আয় আল্লাহ! এই ইসলাম ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তোমার পক্ষ হইতে হয় তবে (ইহার বিরোধিতার শাস্তি দানে) আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর বা অন্য কোন প্রকার ভীষণ আজাব পতিত কর।"

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই উক্তিকারক মূলতঃ আবুজহল ছিল (অন্যান্যরা উহাতে সায় দানকারী ছিল।)

উহার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা পরবর্ত্তী ৩৩নং আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যাহার অর্থ—"(হে হাবীব!) আপনি তাহাদের মধ্যে থাকাবস্থায় আল্লাহ তাহাদেরে এই শ্রেণীর আজাব দিবেন না। এবং তাহাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোক

(যথা—মোমেনগণ) ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকাবস্থায়ও তাহাদের উপর এই শ্রেণীর আজাব আসিবে না।

পরবর্ত্তী ৩৪নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে বস্তুতঃ তাহারা ঐরূপ আজাবেরই যোগ্য ছিল। উক্ত আয়াতের অর্থ এই "তাহাদেরে আল্লাহ আজাব কেন দিবেন না ? তাহারা ত হরম শরীফের মসজিদ হইতে (মুসলমানদিগকে) বাধা দিয়া থাকে, (যেরূপ ষষ্ঠ হিঃ সনে হোদায়বিয়ার ঘটনায় করিয়াছে ; তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।) অথচ তাহারা ঐ মসজিদের বন্ধু নহে। ঐ মসজিদের বন্ধু ত একমাত্র মোত্তাকী—মোমেনগণ। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বোকা।

১৯২২। **হাদীছ ঃ**—ছায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট তশরীফ আনিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ফেৎনা-ফাছাদ দূরীভূত করার জন্য আবশ্যক হইলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে আপনি কিরূপ মনে করেন—সঙ্গত কি না ?

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি ফেৎনার অর্থ বুঝ কি ? অতঃপর তিনি নিজেই উহার বর্ণনা দিলেন—ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে বা করিতে চাহিলে কাফেররা তাহাকে মারপিট করিত, আবদ্ধ করিয়া রাখিত, এইরূপে ইসলাম গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইত। পবিত্র কোরআনে ঐ অবস্থাকে "ফেৎনা" বলা হইয়াছে। উহা বন্ধ করার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ করিতেন। তোমরা বর্ত্তমানে ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হও এবং উহাতে ফাছাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। (পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত) "ফেৎনা" শব্দ দ্বারা উহা মোটেই উদ্দেশ্য নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলমানদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হইল এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত ঘটিতে লাগিল তখন ছাহাবীদের মধ্যে অনেকেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেন ; তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। আর এক দল লোক ঐ অবস্থায় নিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের মতে কোন একটি দলকে সমর্থন করিয়া উহার বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের মতের সমর্থনে এই আয়াত পেশ করিতেন—وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাও যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ দুরীভূত হইয়া যায়।

উক্ত দলেরই এক ব্যক্তি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাই তিনি এই আয়াতের "ফেৎনা" শব্দের ব্যাখ্যা দান করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা এই আয়াতের

উদ্দেশ্য মোটেই নহে। এই আয়াতের তাৎপর্য্য হইল কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া যাবৎ না ইসলামে বাধা দানের ক্ষমতা লোপ পাইয়া আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৩। হাদীছঃ—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে (মোসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, আপনি এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেন না?

আল্লাহ বলিতেছেন........ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

"মোসলমানদেরই দুইটি দল পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও। (মীমাংসার বা মীমাংসা-প্রচেষ্টার পরও) যদি এক দল আর এক দলের উপর অন্যায় চালাইতে চায় তবে উক্ত দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।" (ছুরা হুজুরাত—২৪ পারা ১৪ রুকু)। অর্থাৎ মীমাংসা করিতে না পারিলে এক দলে যোগদান করিয়া অপর দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হউন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, দেখ ভাই! কোরআন শরীফে আরও একটি আয়াত আছে—...... وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

"যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার শাস্তি হইবে জাহান্নাম, তথায় সে অনির্দিষ্টকাল থাকিবে এবং আল্লার গজব ও লা'নৎ তাহার উপর পতিত হইবে এবং আল্লাহ তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (৫ পা ১০ রুঃ)

আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহাও বলিলেন, প্রথম আয়াতটি বুঝিতে কোন রকম ভুল করিয়া দ্বিতীয় আয়াতটির দরুন মোসলমানের বিরুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি হইতে বিরত থাকা আমার মতে দ্বিতীয় আয়াতটিতে ভুল করিয়া প্রথম আয়াতের দরুন ঐরূপ কাটাকাটিতে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি আর একটি আয়াত তাঁহার সামনে পেশ করিল—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "সংগ্রাম চালাইয়া যাও যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ দূরীভূত হয়।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতের আদেশ মোতাবেক ত আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে কাজ করিয়াছি—যখন ইসলামের শক্তি কম ছিল। লোকদিগকে দ্বীন-ইসলামের কারণে নিপীড়িত হইতে হইত। কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে কাফেররা তাহাকে প্রাণে বধ করিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার নির্য্যাতন চালাইত। ইসলাম গ্রহণে এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকেই উক্ত আয়াতে "ফেৎনা" বলা হইয়াছে। আমরা

উক্ত আয়াতের নির্দ্দেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, যাহাতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে ইসলামে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা যেই পথ অবলম্বন করিয়াছ উহাতে ত পুনরায় ফেৎনার উৎপত্তি হইবে। (কারণ, পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে মোসলমানদের শক্তি খর্ব্ব হইয়া তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ফলে কাফেরেরা পুনরায় ইসলামে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিতে প্রবল হইয়া পড়িবে।

ঐ ব্যক্তি উক্ত বিতর্কে ব্যর্থ হইয়া অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে, আপনি ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন ? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহারা উভয়েই যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মর্য্যাদাশীল তাহা ব্যক্ত করিলেন।

১৯২৪। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযেল হইল ঃ—

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

“(হে মোসলমানগণ ! কাফেরদের মোকাবিলায়) তোমাদের বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে, দুই শত কাফেরের উপর জয়ী হইতে পারিবে, (১০ পারা ৫ রুকু)। এই আয়াতের ইঙ্গিত ছিল, মোসলমান তাহাদের দশ গুণ বেশী কাফের তথা দশজনের মোকাবিলায় একজন হইলেও স্থিরপদ থাকা ফরজ হইবে পলায়ন করিতে পারিবে না। মোসলমানগণ এই বিধানটি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কঠিন বোধ করিলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা উহার পরবর্ত্তী আয়াত নাযেল করিলেন—

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا - فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ -

“এখন হইতে আল্লাহ তায়ালা (পূর্ব্বের বিধান) তোমাদের পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে সাহসের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন তোমাদের এক শত জন ধৈর্য্যশীল থাকিলে দুই শতের উপর জয়ী হইবে।” অর্থাৎ দ্বিগুণের মোকাবিলা হইতে পশ্চাদপসারণ জায়েয হইবে না। তার অধিক হইলে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করা জায়েয হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন, দশগুণ হইতে কম করিয়া দ্বিগুণ করতঃ সহজ করায় সেই পরিমাণে ধৈর্য্যশক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে মোসলমানদের যে ধৈর্য্যশক্তি ছিল এখন উহার দশ ভাগের আট ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

১৯২৫। হাদীছ ঃ—খালেদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পথ চলিতে ছিলাম, এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আমাকে এই আয়াতটির তাৎপর্য্য বলিয়া দিবেন কি ?

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ

وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"যে সমস্ত লোক সোনা-চান্দি (তথা ধন-সম্পদ) জমা করিয়া রাখে, উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করেনা তাহাদিগকে ভীষণ আজাবের সংবাদ জ্ঞাত করিয়া রাখুন। তাহাদের সোনা-চান্দি (বা ধন-সম্পদের মূল্য পরিমাণ সোনা-চান্দিকে পাতরূপে রূপান্তরিত করিয়া ঐগুলিকে) জাহান্নামের আগুনে গরম করা হইবে। অতঃপর উহা দ্বারা ঐ ধন-সম্পদের মালিকদিগকে দাগ লাগান হইবে—তাহাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, এই সব ধন-সম্পদ যাহা তোমরা (আল্লার রাস্তায় খরচ না করিয়া) নিজের জন্য জমা করিয়া রাখিয়া ছিলে। সুতরাং যাহা নিজের জন্য জমা করিয়াছিলে উহার মজা ভোগ কর।"

(ছুরা তওবাহ্—১০ পারা ১১ রুকূ)

এই আয়াত-মর্ম্মে বুঝা যায় নিজ ব্যয়ের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ সবটুকুই আল্লার রাস্তায় ব্যয় করিতে হইবে, নতুবা আজাব হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখে—উহার যাকাতও দেয় না, আজাব তাহারই হইবে।

আলোচ্য আয়াত নাযেল হওয়ার পরে যাকাতের (তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বাধ্যতামূলক আল্লার রাস্তায় খরচ করার) বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া ঐ যাকাতকে আল্লাহ তায়ালা অবশিষ্ট মালের পবিত্রকারী করিয়া দিয়াছেন।

১৯২৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোমেনদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটা বিশেষ গোপন আলাপ-অনুষ্ঠান হইবে। উহার বিবরণ আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (আহ্বানে তাঁহার) দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের বেষ্টনীর আড়ালে রাখিয়া তাহার গোনাহ সমূহের স্বীকারোক্তির পরীক্ষা লইবেন—আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, অমুক গোনাহ

তোমার স্মরণ আছে কি? অমূক গোনাহ তোমার স্মরণ আছে কি? ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলিতে থাকিবে, হাঁ—প্রভু! আমার এই অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবেন। ঐ ব্যক্তি মনে মনে তাহার বিপদ গণিবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছিলাম। আজিকার দিনেও আমি তোমার সব গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর (থাকিবে শুধু তাহার নেকের আমল-নামা,) তাহার নেকের আমল নামা ভাঁজ করিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইবে। (এইভাবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতে হিসাবের দিন মোমেনদের সম্পর্কে গোপনতা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে অপমান হইতে রক্ষা করিবেন)। পক্ষান্তরে অপর দল তথা আল্লাদ্রোহীদেরে সকলের সম্মুখে দেখাইয়া দিয়া (নেক-বদের) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া বেড়াইবেন—

هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ - اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

"এই লোকগুলি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে মিথ্যা ও ভুল পথের পথিক ছিল। সকলে শুনিয়া রাখ, এই অনাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের উপর আল্লার লা'নত পতিত হইবে।" (ছুরা হুদ—১২ পারা ২ রুকু)

১৯২৭। হাদীছঃ—আবু মুছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা জালেম—অন্যায়কারীকে (পরীক্ষার স্থল দুনিয়াতে) অবকাশ দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন ধরেন এবং পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ...

"(হযরত নূহের জাতি, হযরত হুদের জাতি, হযরত ছালেহের জাতি, হযরত লুতের জাতি, হযরত শোয়ায়েবের জাতি, হযরত মুছার জাতি—এই সব জাতির ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন,) এইভাবেই তোমার প্রভু পাকড়াও করিয়া থাকেন যখন তিনি কোন স্বেচ্ছাচারী অনাচারী অঞ্চলবাসীকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁহার পাকড়াও অতিশয় ভয়ঙ্কর ও কঠোর। ইহাতে নছিহত ও শিক্ষা রহিয়াছে। ঐ লোকদের জন্য যাহারা আখেরাতের আজাবকে ভয় করে।" (ছুরা হুদ—১০ পারা ৯ রুকু)

১৯২৮। হাদীছঃ- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মক্কায় লুকাইয়া জেন্দেগী কাটিতে ছিলেন তখন তিনি ছাহাবীগণকে লইয়া জামাতে নামায পড়া কালে সজোরে ক্বেরাত পড়িয়া থাকিতেন। মোশরেকগণ উহা শুনিয়া কোরআনকে কোরআনের অবতরণকারীকে এবং কোরআনের বাহককে গালি দিত, তাই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিলেন—

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا -

"নামাযের ক্বেরাত অতি জোরেও পড়িবেন না, (যাহাতে কাফেরগণ উহা শুনিয়া কোরআনকে গালি দেয়।) একেবারে আস্তেও পড়িবেন না, (যাহাতে ছাহাবীগণ শুনিতে না পারে।) উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পন্থায় পড়িবেন।

১৯২৯। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا—দোয়া করার নিয়ম এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৩০। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই শ্রেণীর অনেক লোক উপস্থিত হইবে যাহারা পার্থিব জীবনে মোটা মোটা দেহবিশিষ্ট বড় বড় পদবীধারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের ওজন (ও মর্য্যাদা) মাছির ডানা সমতুল্যও হইবে না।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীছের আয়াতটি ছুরা কাহাফের শেষ দিকের আয়াত। আয়াতের বর্ণনা হইল, পারলৌকিক জীবনে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাহারা যাহাদের ইহকালীন উদ্দম ও ভাল কাজসমূহ যদ্দ্বারা তাহারা আত্মতুষ্টিও লাভ করিয়া থাকিত—আখেরাতের সঙ্কটময় জীবনে তাহাদের ঐ সব কাজ ও আমল নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে। সেই লোকদের পরিচয় ও পরিণতি বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا
نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا
وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا -

"ঐ লোকগণ তাহারা—যাহারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শন সমূহ তথা রসুল ও কোরআনকে অস্বীকার করে এবং পরওয়ারদেগারের নিকট হাজেরী তথা হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতিকে অস্বীকার করে, ফলে তাহাদের সমুদয় আমল নিষ্ফল সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাহাদের এবং তাহাদের আমলের কোন ওজনই আমি দিব না। তাহাদের পরিণতি হইবে জাহান্নাম। এই কারণে যে, তাহারা আমার (কালামের) আয়াত সমূহকে এবং আমার রসুলগণকে উপেক্ষা ও উপহাস করিত।"

১৯৩১। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (চিরস্থায়ীরূপে) বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং দোযখীগণ দোযখে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি সাদা-কালো চিত্রাঙ্গ ভেড়ার আকৃতিতে (বেহেশত-দোযখের মধ্যস্থলে) উপস্থিত করা হইবে এবং একজন ফেরেশতা ডাকিবেন – হে বেহেশতবাসীগণ! তখন সকল বেহেশতবাসী সেই দিকে তাকাইবেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, ইহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা সকলেই বলিবেন, হাঁ—ইহা মৃত্যু। এইরূপে দোযখীদেরকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাহারাও ঐ উত্তরই দিবে। অতঃপর সকলের চোখের সামনে উহাকে জবাহ্ করা হইবে এবং ঘোষণা করা হইবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা অনন্তকাল বেহেশতের সুখ ভোগ করিতে থাকিবে, মৃত্যু আসিবে না। হে দোযখবাসী! তোমরা চিরকাল দোযখে আজাব ভোগ করিতে থাকিবে আর মৃত্যু আসিবে না। এই ঘোষনায় বেহেশতীদের আনন্দ উল্লাস বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে দোযখীদের দুঃখ-ভাবনা ও আক্ষেপ-অনুতাপ অধিক বাড়িয়া যাইবে। এই বিবরণ দান উপলক্ষে হযরত (দঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুণ—আক্ষেপ ও অনুতাপের দিন সম্পর্কে যে দিন চিরস্থায়ী শেষ ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা (আজ এই কার্য্য ক্ষেত্রে) অবহেলায় বিভোর রহিয়াছে এবং ঈমান গ্রহণ করিতেছে না। (সেই দিন ইহার পরিণাম ভোগ করিবে।") (ছুরা মরয়াম—১৬ পারা)

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত দোযখীদের অসীম আক্ষেপ-অনুতাপের ঘটনা সম্বলিত কেয়ামতের দিনকেই উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

১৯৩২। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন মানুষ এরূপ ছিল যে, (ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ)

নিকট) মদীনায় আসিয়া পড়িত। অতঃপর যদি দেখিত, তাহার স্ত্রী ছেলে সন্তান জন্ম দিয়াছে, ঘোড়া (ইত্যাদি পশু) বাচ্চা দিয়াছে (অর্থাৎ যদি জাগতিক উন্নতি দেখিত) তবে বলিত, ইসলাম ধর্ম্ম খুব ভাল ধর্ম্ম। আর যদি ঐ সব না দেখিত তবে বলিত ইসলাম ধর্ম্ম ভাল ধর্ম্ম নয়। তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দান করিয়াই এই আয়াত নাযেল হয়—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ - فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِاطْمَانَ
بِهٖ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ - خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةَ - ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

"এক শ্রেণীর লোক এরূপ যে, তাহারা আল্লার বন্দেগী (যথা ইসলাম অবলম্বন) করে এইরূপে যেন সে (নৌকা ইত্যাদিতে আরোহণ করিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় উহাতে অবস্থানের নিয়্যতে আসে নাই বলিয়া ভিতরে বসে না,) কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে (—যে কোন মুহূর্ত্তে উহা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে)। যদি উহাতে সুযোগ-সুবিধা ও লাভ দেখিতে পায় তবে (সেই স্বার্থের জন্য) উহাতে অবিচল থাকিবে। আর কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে (তথা কোন ক্ষয়-ক্ষতি বা দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিলেই) উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। এই শ্রেণীর লোকগণ দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই হারায় এবং ইহা হইতেছে পূর্ণ ক্ষতি।" (১৭ পারা ৯ রুকু)

১৯৩৩। হাদীছঃ— ছফিয়া-বিন্‌তে-শায়বাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, পবিত্র কোরআনে আছে—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"স্ত্রী লোকদের অবশ্য কর্ত্তব্য, (গায়ের জামা দ্বারা বুক ঢাকা থাকা সত্ত্বেও ঐ অংশের বিশেষ পর্দ্দার জন্য) মাথার ওড়্‌না দ্বারা বুক দোহ্‌রারূপে ঢাকিয়া রাখিবে, (যেন উহার আকার আকৃতিও ভাসিয়া না থাকে।) (১৮ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াতটি নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান রমণীগণের মধ্যে—যাহাদের ওড়্‌নার সুব্যবস্থা ছিল না তাহারা তাহাদের চাদরের এক পার্শ ছিড়িয়া-ফাড়িয়া ওড়্‌না তৈরী করতঃ উহা দ্বারা মাথা ঢাকিল এবং বুকের উপর দোহ্‌রা পর্দ্দাও করিল।

১৯৩৪। হাদীছঃ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত— اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ -

"(কেয়ামতের দিন ঈমানহীন লোকদের অবস্থা এই হইবে যে,) তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করা হইবে তাহাদের মুখের উপর।" (১৯ পারা ১ রুঃ)

এক ব্যক্তি উক্ত আয়াতের মর্ম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল—হে আল্লার নবী! কাফেরকে কেয়ামতের দিন মুখের উপর তাড়াইয়া নেওয়া হইবে কিরূপে? হযরত নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে দুই পায়ের উপর চালাইতেছেন। তিনি কি কেয়ামতের দিন মুখের উপর চালাইতে সক্ষম হইবেন না? ঐ ব্যক্তি বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমাদের প্রভুর শক্তিমত্তার শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি, নিশ্চয় পারিবেন।

১৯৩৫। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্র যায়েদ-ইবনে-হারেসা (রাঃ)কে আমরা সকলেই যায়েদ-ইবনে-মোহাম্মদ—মোহাম্মদের পুত্র বলিয়া থাকিতাম, যাবৎ না এই আয়াত নাযেল হইল ...... ادعوهم لآبائهم

ব্যাখ্যা:—আরব দেশে পালক পুত্রকে পালনকারী পিতার পুত্র নামে আখ্যায়িত করা হইত। এই আখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি কুপ্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রতিপালিত হইত—পালনকারীর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ঐ পালক পুত্রের সমুদয় আচার ব্যবহার পুরাপুরিভাবে প্রকৃত মা ও ভাই-বোনদের ন্যায় হইয়া থাকিত। তাহাকে কোন স্তরেই বেগানা পুরুষ গণ্য করা হইত না। উত্তরাধীকার সম্পর্কেও তাহারা প্রকৃত পিতা-পুত্ররূপে গণ্য করিত। পালক পুত্র-বধূকে পালনকারী পিতার পক্ষে সম্পুর্ণরূপে পুত্র-বধূ গণ্য করা হইত। ফলে এক দিকে পুত্র-বধূর জন্য ঐ পিতাকে বেগানা পুরুষ গণ্য করা হইত না। অপর দিকে ঐ পুত্র-বধূকে পালনকারী পিতার জন্য প্রকৃত পুত্র-বধূর ন্যায় চির-হারাম গণ্য করা হইত—পুত্রের বিবাহ মুক্ত হওয়ার পরও ঐ পিতার সঙ্গে বিবাহ অবৈধ মনে করা হইত। উল্লেখিত কুপ্রথাসমূহ ইসলামে রহিত করার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে এবং ঐরূপ কঠোর ভাবে প্রতিপালিত ও প্রচলিত প্রথা কার্য্যতঃ ভঙ্গ করিয়া না দেখাইলে শুধু কথায় ভঙ্গ হইবে না।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে একটা সুযোগ আসিল—তাঁহার পালক পুত্র যায়েদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী ছিলেন জয়নব (রাঃ)। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিল। এই উপলক্ষে স্বয়ং হযরত (দঃ) পালক পুত্র-বধূ জয়নবকে বিবাহ করিয়া ঐ সব কুপ্রথার মূল উচ্ছেদের একটা সুযোগ দেখিলেন এবং সেই বিবাহ করা মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি লোক-মুখে কুৎসা রটনার ভয় করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উক্ত বিবাহ

কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলার ইঙ্গিত আসিল। এমনকি, কাহারও মতে অহি মারফৎ আল্লাহ তায়ালাই বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। পরিণামে তাহাই ঘটল যাহার আশঙ্কা হযরত (দঃ) করিতে ছিলেন। পুত্র-বধূ বিবাহ করার বদনামীর ঝড় বহিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, বরং নানারকম অমূলক নোংরা আকথা কুকথাও মনগড়ারূপে জড়িত হইয়া গেল। যাহা আজও শক্রদের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব ঝড়-তুফান প্রতিরোধ কল্পে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল। প্রথমতঃ যুক্তি দেখান হইল— مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

"তোমাদের মুখ-বলা পুত্রগণকে ত সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা পুত্র বানান নাই। সুতরাং বিধি-বিধানে সে পুত্র বলিয়া কেন গণ্য হইবে? অতঃপর ঐ সব কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ কল্পে ঘোষনা দিলেন—

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"মুখ-বলা পালক পুত্রগণকে তাহাদের প্রকৃত পিতার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া ডাক, বস্তুতঃ ইহাই সত্য কথা। যদি প্রকৃত পিতার সন্ধান না করিতে পার (তবুও পালনকারী পিতার সম্বন্ধ জড়াইয়া ডাকিও না, কারণ) ঐ পুত্র ত পালনকারীর জন্য বস্তুতঃ একজন মোসলমান ভাই বা ক্রীতদাস (ইত্যাদি)।"

মছ্আলাহ ঃ শুধু মুখে মুখে কাহাকেও ছেলে বলা হইলে তাহা গোনার কাজ হইবে না বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ঐ ডাকের অছিলায় বেপর্দ্দা ও বেগানার সঙ্গে মেলামেশার গোড়া-পত্তন যেন না হইয়া বসে। যদি এইরূপ আশঙ্কা বা প্রচলন থাকে তবে ঐরূপ ডাকই নিষিদ্ধ হইবে।

১৯৩৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে হারেছার পরিত্যক্ত স্ত্রী জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সম্পর্কেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া এই আয়াত নাযেল হইয়াছে— تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

"(অনৈসলামিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্যে জয়নবকে বিবাহ করার) সেই পরিকল্পনা আপনি গোপন ভাবে মনে মনে পোষন করিতে ছিলেন, যাহার বিকাশ আল্লাহ তায়ালাই স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন।" (ছুরা আহজাব—২২ পারা ২ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—জয়নব (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লার (দঃ) ফুফুজাদ ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)-এর সঙ্গে। তিনি হযরতেরই

পালক পুত্র ছিলেন। এই বিবাহে হযরত (দঃ) মস্ত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা কাঁধে লইয়াছিলেন। জয়নব (রাঃ) ছিলন কোরায়েশ বংশীয়া এবং যায়েদ (রাঃ) তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ক্রীতদাস ছিলেন। তাই বংশের সকল লোকই এই বিবাহে অসম্মত ছিল। একা হযরত (দঃ) এই বিবাহে উদ্যোগী ছিলেন। আর সকলেই এই ব্যাপারে তাঁহার বিরোধী ছিল। কিন্তু মোসলমানদের উপর রসূলের যে মর্য্যাদা ও হক সুরক্ষিত আছে উহার দ্বারা এই বিরোধও কোরআনের স্পষ্ট ঘোষনায় অবৈধ বলিয়া বিঘোষিত হইল—

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"আল্লাহ এবং আল্লার রসূল কোন বিষয়ে আদেশ প্রয়োগ করিলে অতঃপর কোন ঈমানদার পুরুষ বা নারীর পক্ষে ঐ বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ করিবার কোন অবকাশই থাকে না। যে কেহ আল্লাহ এবং আল্লার রসূলের নাফরমানী করিবে অবশ্যই সে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্টতায় পতিত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।" (২২ পারা ২ রুকু)

এই ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিত সকলেই বিরোধিতা ত্যাগ করিলেন এবং হযরত (দঃ) বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভাগ্যের পরিহাস—যায়েদ (রাঃ) এবং জয়নব (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে মিল-মহব্বৎ মোটেই হইল না। বাধ্য হইয়া যায়েদ (রাঃ) অচিরেই জয়নব (রাঃ)কে ত্যাগ করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু হযরত (দঃ) তাহাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া স্ত্রীকে বহাল রাখার পরামর্শ দিতে ছিলেন। উপস্থিত অবস্থা দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী দখিলেন। তিনি এই বিবাহের গোড়ার ঘটনা স্মরণ করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বের দরুণ জয়নব (রাঃ) এবং তাঁহার সহোদরগণের মনঃদুঃখের প্রতিকার করার ভাবনা তাঁহার (হযরত) সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে হযরত (দঃ) মনে মনে একটা খেয়াল করিলেন—বিবাহ বিচ্ছেদ যখন হইয়াই যাইবে তখন জয়নবকে স্বয়ং হযরত (দঃ) নিজ বিবাহ বন্ধনে আনিয়া তাঁহাকে উম্মুল-মোমেনীন পদে ভূষিত করিবেন। এই অসাধারণ সম্মান লাভে জয়নব (রাঃ) এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের যাবতীয় মনঃদুঃখ বিদূরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) যেহেতু হযরতের পালক পুত্র ছিলেন। তাই এই ব্যবস্থা গ্রহণে হযরত (দঃ) লোকদের কুৎসার ভয় করিতে ছিলেন যে, তাহারা বলিবে, মোহাম্মদ (দঃ) পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়াছে।

এদিকে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্য আর একটি দিক দিয়া হযরতেরও অভিপ্রেত ছিল, আল্লাহ তায়ালার নিকটও বিশেষ পছন্দনীয় ছিল। আরবের কুসংস্কার—

পালক পুত্রের বধূকে আপন পুত্রের বধূ গণ্য করা ; ইসলামে ঐরূপ গর্হিত নীতির স্থান নাই। তাই উহাকে কঠোর হস্তে চুরমার করিতে হইবে। ইহার জন্য স্বয়ং রসুল মারফৎ কার্য্যতঃ ঐ কুসংস্কার ধ্বংসের আরম্ভ অত্যন্ত সমীচীন ও বিশেষ পছন্দনীয় ছিল, তাই আল্লার তরফ হইতে হযরতের প্রতি আদেশ হইল জয়নবকে বিবাহ করিয়া স্বীয় গোপন মনোভাবকে কার্য্যে পরিণত করার। এমনকি, যায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজ ব্যবস্থাপনায় হযরতের সঙ্গে জয়নবের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অহী মারফৎ বিবাহের খবর দিয়া দিলেন। হাদীছে বর্ণিত আছে—জয়নব (রাঃ) হযরতের অন্যান্য বিবিগণের উপর এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, তোমাদের বিবাহ-কার্য্য তোমাদের অলী-ওয়ারিস মুরুব্বিগণ সম্পন্ন করিয়াছেন, আর আমার বিবাহ আল্লাহ তায়ালা আসমানের উপরে (ফেরেশতাদের মহফিলে) সম্পন্ন করিয়াছেন।

উল্লেখিত ঘটনা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণে পবিত্র কোরআনের আয়াতও বিদ্যমান রহিয়াছে, বক্ষ্যমান হাদীছের আয়াতটি উহারই অন্তর্গত—

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ......وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا -

অর্থাৎ—"আপনি আপনার উপকারে ও সাহায্য-সহায়তায় প্রতি পালিত যায়েদকে পরামর্শ দিতে ছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে বহাল রাখ, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ অবস্থায় আপনি মনের ভিতরে একটা বিষয় গোপন রাখিতে ছিলেন যাহা আল্লাহ পাক প্রকাশ করিয়া দিবেন। আপনি লোকদের ভয় করিতেছিলেন, অথচ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করাই শ্রেয়ঃ। তারপর জয়নব হইতে যায়েদের সম্পর্ক সমাপ্তি হইয়া গেলে আমি জয়নবকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলাম—এই উদ্দেশ্য যে, মুখ-বলা ছেলেদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর ঐ ছেলেদের পালনকারী কর্ত্তৃক বিবাহ করার ব্যাপারে অন্ধকার যুগের প্রথার যে, প্রতিবন্ধক রহিয়াছে মোমেনদের পক্ষে যেন সেই প্রতিবন্ধক আর না থাকে। এবং ঐ বধূকে মাহ্‌রাম গণ্য করার যে সব হারাম ও নাজায়েয ফল ফলিয়া থাকে ঐ সবের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আল্লাহ কর্ত্তৃক এই বিধান জারী হওয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত আয়াতে যে বলা হইয়াছে—"আপনি দিলের মধ্যে একটা বিষয় গোপন রাখিতে ছিলেন, ইহার প্রকৃত তফছীর পাঠকবর্গের সমক্ষে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল। বিশিষ্ট তফছীরকারকগণও এই তফছীরই লিখিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তথাকথিত তফছীরকারের লেখায় কতকগুলি অবাঞ্ছিত কথারও সমাবেশ দৃষ্টি গোচর হয় ;

বস্তুতঃ উহা ইসলামের শত্রুদের গড়ান কাহিনী মাত্র, যাহা কোন কোন মোসলমানও নকল করিয়াছে। ঐ গুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আপবাদ মাত্র।

১৯৩৭। হাদীছ ঃ— * সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (রঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই আয়াত দুইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর—

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ... (١)

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ......

"আখেরাতে নাজাত পাইবার শর্ত স্বরূপ কতিপয় গুণের উল্লেখ করতঃ বলা হইয়াছে—) এবং যাহারা এমন কোন নরহত্যা করে না যাহা না-হক্ক এবং আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা হইয়াছে। (অতঃপর বলা হইয়াছে—) অবশ্য যাহারা তওবাকরিবে, ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পূর্ব্ব কৃত গোনাহ্‌গুলি মাফ করিয়া দিয়া উহার স্থলে (নামায়ে-আমলের মধ্যে) নেক আমল সমূহ লিখিয়া দিবেন ; আল্লাহ অতিশয় দয়ালু ক্ষমাশীল।„ (১৯ পারা ৪ রুকু)

এই আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, অবৈধ খুন বা নরহত্যাকারীর জন্যও তওবা করার এবং তওবা দ্বারা ঐ গোনাহ্ মাফ হওয়ার সুযোগ আছে।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا......[২]

"যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার মোসলমান মানুষকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল ইহাই হইবে—সে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আজাব ভোগ করিবে এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিশাপ পতিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন!" (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, মোমেন মোসলমানকে হত্যাকারীর জন্য তওবা করিয়া গোনাহ মাফ করাইবার সুযোগ নাই। নতুবা চিরকাল দোযখ বাসের শাস্তি নির্দ্ধারিত হইবে কেন?

সায়ীদ (রঃ) বলেন, আমি উক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আয়াত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। ছুরা ফোরকানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের নাজাতের জন্য

---

* এই হাদীছটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় এবং ৭১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হইয়াছে, উভয় স্থানের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তরজমা করা হইল।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, নরহত্যা না করা ইত্যাদির শর্ত আরোপ করিলে মক্কাবাসী কতিপয় মোশরেক কাফের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি যেই দ্বীন ও ধর্ম্মের প্রতি আহ্বান করেন তাহা খুবই ভাল। কিন্তু উহা দ্বারা আমরা ত নাজাত পাইতে পারিব না। যেহেতু আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজা করিয়াছি, ব্যভিচার করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি। এই শ্রেণীর লোকদের কথার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা উক্ত ছুরা ফোরকানের মূল বিষয়-বস্তুটির সহিত এই কথাটি সংযোগ করিয়া দিলেন যে—"অবশ্য যাহারা তওবা করিবে………"। সুতরাং এই ছুরা ফোরকানের আয়াত ঐ লোকদের পক্ষে যাহারা অমোসলেম থাকাবস্থায় নরহত্যা ইত্যাদি করিয়াছিল পরে তাহারা তওবা করতঃ ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদের পূর্ব্বকৃত নরহত্যা ইত্যাদি গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর লোকদেরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণার্থে তাহাদের জন্য উদারতা ঘোষণা পূর্ব্বক আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ...

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি লোকদিগকে জানাইয়া দিন, আমি ঘোষণা দিতেছি—হে আমার ঐ সকল বান্দাগণ! যাহারা গোনাহ করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ—তোমরা আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; (তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিলে). নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (পূর্ব্বকৃত) সমূদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (ছুরা যুমার—২৪ পারা ৩ রুকু)

পক্ষান্তরে ছুরা নেছার আয়াত তথা নরহত্যার দায়ে চিরকাল দোযখ বাসের শাস্তি ঐ লোকদের পক্ষে যাহারা মোসলমান এবং ইসলামের বিধান অবগত হওয়া সত্বেও নরহত্যা করিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে ছুরা নেছার আয়াতের ঘোষনা যে—"তাহারা চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন ছুরা নেছায় বর্ণিত শাস্তি মোসলমান-হত্যা অপরাধের সমূচিত শাস্তির মূল ধারারূপে উল্লেখ হইয়াছে—শুধুমাত্র অপরাধটির কঠোরতা প্রকাশ করার জন্য। নতুবা এ স্থলে আর একটি উপধারাও আছে যাহার ফলে শরিয়ত নির্দ্ধারিত বিশেষ নিয়মে খাঁটী তওবা করিলে এই ক্ষেত্রেও দোযখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তির পথ রহিয়াছে।

১৯৩৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইহুদীদের এক বড় পণ্ডিৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে

আসিয়া বলিল, আমরা তৌরাত কেতাবে দেখিতে পাই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমুদয় আসমানগুলিকে এক আঙ্গুলের উপর, ভূমণ্ডলের স্থল ভাগকে এক আঙ্গুলের উপর, পাহাড়-পর্ব্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলের উপর, পানি ও কাঁদা তথা ভূমণ্ডলের জল ভাগকে এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্য সব সৃষ্টকে এক আঙ্গুলের উপর রাখিবেন ; অতঃপর (এই সবগুলির সমষ্টিও যে আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার সম্মুখে অতি নগণ্য তাহা প্রকাশকরণার্থে ঐ বহনকারী) আঙ্গুল সমূহকে নাড়াচাড়া ও আন্দোলিত করতঃ বলিতে থাকিবেন, আমিই সর্ব্বাধিপতি আমিই সর্ব্বাধিপতি। *

ইহুদী পণ্ডিতের উক্তি সমর্থন করার ভঙ্গিতে হযরত (দঃ) হাসিয়া উঠিলেন এবং (ইহুদীগণ আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও আল্লাহ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত উক্তি করিয়া থাকে—তাহারা ওযায়েরে নবীকে আল্লার পুত্র বলিয়া থাকে। আল্লার রসুলকে অমান্য করিয়া চলে ইত্যাদি ইত্যাদি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সবের উপর তাহাদের প্রতি তিরস্কার স্বরূপ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

"আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের যেরূপ মূল্য দান করা আবশ্যক কাফেরগণ ও মোশরেকগণ সেইরূপ মূল্য দিয়া চলে না।"

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার জিন্দেগীতে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ শক্তি বা বিরাটত্ব ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আল্লাহকে ছাড়িয়া সেই সব বস্তুর পূজায় লিপ্ত হয়। কেয়ামতের দিন—যে দিন দুনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষ এক ময়দানে একত্রিত থাকিবে সেই দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ সব বস্তু-পূজারীদের অন্যায়টা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার ও ধরাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিবেন যে, ছোট, বড়, ও বৃহত্তম—যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তাঁহার অধীনে ও সর্ব্বাধিপত্বে হওয়ার দৃশ্য সর্ব্ব সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রকটিত ও রূপায়িত করিবেন এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, আজ চাক্ষুসরূপে দেখিয়া নেও সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বশক্তির অধিকারী, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমহান একমাত্র আমি। কিন্তু তোমরা আমাকে ছাড়িয়া আমার নিম্নস্থ, আমার অধীকারস্থ, আমার আধিপত্যের বস্তুকে পূজা করিয়াছিলে ; তাহার শাস্তি আজ তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

* হাদীছটি বোখারী শরীফে তিন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ফৎহুলবারী ১৩—৩৩৮×৩৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্যাদি দৃষ্টে তরজমা করা হইল।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই তাহার অন্যায় অপরাধ ধরাইয়া দিয়া শাস্তি দান করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার ইহার প্রতি অটল অনড় বিশ্বাস ও আক্বিদা সর্ব্বদার জন্য অন্তরে নিবদ্ধ রাখিয়া বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখিত হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি সম্পর্কে এই ধারণা রাখিবে যে, আমাদের স্থূল ও সাকারে সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির খাতিরে এই সব শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সবের উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্ট ও অনুভূত অঙ্গ সমূহ কখনও নহে। এই সব অঙ্গ ত সাকার ও স্থূল দেহের বৈশিষ্ট্য ; আল্লাহ তায়ালা ত নিরাকার। সুতরাং সেই অনুপাতেই এই সব শব্দের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য উহা আমাদের জ্ঞানের ও অনুভূতির এবং ধারণার ও অনুমানের উর্দ্ধে, কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি।

১৯৩৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বর্ণনা দিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র ভূমণ্ডলকে স্বীয় মুষ্ঠীতে লইবেন। আসমান সমূহকে স্বীয় ডান হাতে জড়াইবেন (—এইভাবে সমুদয় সৃষ্টের উপর স্বীয় সর্ব্বাধিপত্য রূপায়িত করিয়া) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার সর্ব্বাধিপত্য বাস্তবায়িত রূপে চাক্ষুস দেখিয়া নেও। দুনিয়াতে যাহারা ক্ষমতা ও আধিপত্যের দাবী করিত বা যাহাদিগকে ঐরূপ স্বীকার করা হইত তাহারা কোথায়?

ব্যাখ্যা ঃ—দুনিয়ার জিন্দেগীতে ক্ষমতা-মদে মত্ত এবং তাহাদের চেলাদিগকে কটাক্ষ করিয়া তাহাদের অন্যায় অপরাধ ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা করিবেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তথ্যটি পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে—

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূমণ্ডল আল্লাহ তায়ালার মুঠে হইবে এবং আসমান সমূহ তাঁহার হাতে জড়ান থাকিবে (ইহা দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া দেখাইবেন—তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, কেহ হইতে পারে না,) তিনি অদ্বিতীয়, পাক-পবিত্র এবং কাফের মোশরেকরা যত কিছুকেই তাঁহার শরীক ঠাওরাইতেছে তিনি সে সব হইতে অতি মহান, অতি উর্দ্ধে।" (ছুরা যুমার—২৪ পারা ৪ রুকু)

১৯৪০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইস্রাফিল ফেরেশতার দ্বিতীয় শিঙ্গা-ফুঁকের পর সর্ব্ব প্রথম আমি সচেতন হইয়া মাথা উঠাইব এবং দেখিতে পাইব, মূছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় আরশের পায়া ধরিয়া আছেন। ইহা আমি বলিতে পারি না, তিনি সচেতন অবস্থায় বহাল ছিলেন বা অচেতন হওয়ার পর (আমার পূর্ব্বেই) সচেতন হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার দুইবার শিঙ্গা-ফুঁকের উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ
اللّٰهُ - ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

"শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে আসমান-জমিনের সকলেই অচেতন হইয়া পড়িবে (—জীবিতগণ মরিয়া যাইবে এবং মৃতগণের রূহ্ চৈতন্যহীন থাকিবে ;) অবশ্য যাঁহাদের হুশ থাকা আল্লাহই ইচ্ছা করিবেন (তাঁহাদের হুশ বহাল থাকিবে।) তৎপর দ্বিতীয়বার সেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তৎক্ষণাৎ সকলেই (জীবিত হইয়া) চৈতন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাইবে।" (২৪ পারা ৪ রুকু)

ঐ সময় যাঁহাদের হুশ থাকিবে তাঁহারা হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ। এতদ্ভিন্ন মূছা (আঃ)ও ঐ শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিনা—তাহাই আলোচ্য হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

১৯৪১। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শিঙ্গায় উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হইবে। লোকগণ-জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা! চল্লিশ বৎসর? তিনি বলিলেন, তাহা আমি শুনি নাই ; তাহারা বলিল, চল্লিশ মাস? তিনি বলিলেন, তাহা আমি জানি না। তাহারা বলিল, চল্লিশ দিন? তিনি বলিলেন, আমি তাহাও বলিতে পারি না।

তিনি আরও বলিলেন, মানব-দেহের সর্ব্বংশই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্ন অস্থি খণ্ডটা অক্ষয় থাকিবে এবং উহা হইতেই তাহার দেহের পুনঃ নির্মান হইবে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে প্রকৃত প্রস্তাবেই চল্লিশের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত ছিল না। তাই আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে উহা নির্দ্ধারিত করিতে

অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য অন্য এক হাদীছ মারফৎ উহা নির্দ্ধারিত হয় যে, চল্লিশের উদ্দেশ্য চল্লিশ বৎসর। (ফৎহুল বারী—৮ × ৪৪৮)

১৯৪২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কাবা শরীফের নিকটবর্ত্তী "ছক্বিফ" ও "কোরায়েশ" উভয় গোত্রের তিনজন লোক একত্রিত হইল। তাহারা মেদবহুল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ছিল অতি কম। তাহাদের একজন প্রশ্ন উত্থাপন করিল, আমাদের কথাবার্ত্তা কি আল্লাহ তায়ালা শুনিয়া থাকেন? অপর একজন উত্তর করিল, সশব্দে কথা বলিলে তাহা শুনিয়া থাকেন, আর বিনা শব্দে বলিলে তাহা শুনেন না। তৃতীয় জন মন্তব্য করিল, যদি সশব্দে বলিলে শুনেন তবে নিঃশব্দে বলিলেও শুনিবেন। (অর্থাৎ কোন প্রকার কথাই শুনেন না।) তাহাদের এই শ্রেণীর আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ - وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ

الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ -

"দুনিয়াতে পাপ করা কালে নিজ নিজ কান, চক্ষু, চর্ম্ম ইত্যাদি অঙ্গ সমূহের সাক্ষী থাকা হইতে লুকাইবার ও বাঁচিবার শক্তি তোমাদের ছিল না। (কারণ কোন কাজ উহাদের অসাক্ষাতে করার উপায় নাই। আর আল্লাহ ত সর্ব্ব শক্তিমান তিনি উহাদেরকে বাকশক্তি দান করিবেন। ফলে তোমাদের কার্য্যাবলীর সাক্ষী সংগ্রহ কোন কঠিন ব্যাপার নহে। এতদৃষ্টে পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকাই তোমাদের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল,) কিন্তু মনে হয় তোমাদের ধারণা এই ছিল যে, তোমাদের কার্য্যবলীর খোজ-খবর আল্লাহ তায়ালার নাই। (সুতরাং তিনি কোন কিছুকে সাক্ষী বানাইবেন কিরূপে?) এই ধারণাই তোমাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে (যে, তোমরা বেপরওয়া ভাবে পাপ করিয়াছ। মানুষকে লজ্জা বা ভয় করিয়া পাপ করিবার সময় তাহাদের হইতে লুকাইয়াছ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হইতে লুকাইতে পার না, তাঁহার সাক্ষীদের হইতে লুকাইতে পারিতেছ না; তাহা লক্ষ্য করতঃ আল্লাহকে লজ্জা ও ভয় করিয়া পাপ হইতে বিরত থাক নাই।) ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ।" (২৪ পারা ১৭ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—এই আয়াতের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দানের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে—

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ - حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - وَقَالُوا
لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

"বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার দিক দিয়া একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন আল্লার দুশমনগণকে দোযখের পথে (হিসাব নিকাশের মাঠ—হাশর-ময়দানের দিকে) হাঁকাইয়া আনা হইবে, সকলকে একত্রিত ও সমবেতভাবে চালিত করা হইবে। যখন তাহারা তথায় পৌঁছিবে তখন তাহাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম্ম তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কার্য্যাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তাহারা নিজেদের চর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তাহারা বলিবে, আজ আল্লাহ আমাদিগকে বাকশক্তি দিয়াছেন। যিনি অন্যান্য বহু জিনিষকে বাকশক্তি দিয়া ছিলেন এবং তিনি তোমাদিগকে প্রথমেও সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং পুনরায় তাঁহার প্রতি তোমাদিগকে আসিতে হইয়াছে।" (২৪ পারা ১৭ রুকু)

উল্লেখিত বিষয়টি ছুরা ইয়াছীনের মধ্যে এইরূপে বর্ণিত আছে—

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ -

"কেয়ামতের দিন আমি তাহাদের মুখের বাকশক্তি কিছু সময়ের জন্য রহিত করিয়া দিব এবং তাহাদের হাত আমার সম্মুখে কথা বলিবে, তাহাদের পা তাহাদের কার্য্যবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিবে।" ১৮ পাঃ—ছুরা নূর ৩ রুকুতে বর্ণিত আছে—

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - يَوْمَئِذٍ
يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ -

"যে দিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের মুখ, তাহাদের হাত, তাহাদের পা—তাহাদের কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে। ঐ দিন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত কর্ম্মফল পূর্ণরূপে ভোগ করাইবেন এবং ঐ দিন সকলেই উপলব্ধি করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ সঠিক বিচারক এবং প্রতিটি বিষয়ের বাস্তবরূপ প্রকাশকারী।"

উল্লেখিত তিনটি আয়াতের সমষ্টি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বদকার মানুষের বিরুদ্ধে তাহার হাত, পা, চোখ, কান, চামড়া সাক্ষ্য দিবে। এতদ্ভিন্ন এক হাদীছে বর্ণিত আছে—সর্ব্ব প্রথম সাক্ষ্য হইবে বাম পার্শ্বের উরুর।

অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাক্ষ্যদান সম্পর্কে মোছলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা (লোকদের হিসাব-নিকাশের ও ছওয়াল-জওয়াবের সময়) এক ব্যক্তিকে ডাকিবেন এবং তাঁহার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ স্মরণ ও স্বীকার করাইয়া প্রশ্ন করিবেন, তোর কি এরূপ আকিদা ও বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইয়া হিসাবের জন্য আমার সম্মুখে আসিতে হইবে? তখন সে বলিবে, না—আমার এরূপ আকিদা ছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, قد انساك كما نسيتنى "যেমন তুই আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছিলি, আমিও তোকে ভুলিয়া থাকিব (তোকে রহমত দান করিব না।) তারপর অন্য একজনকে ডাকিয়া আল্লাহ পাক ঐরূপ প্রশ্নই করিবেন ; সেও ঐরূপ উত্তর দিবে। আল্লাহ পাক তাহাকেও ঐরূপ বলিবেন। তারপর তৃতীয় আর একজনকে ডাকিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে সে দাবী করিয়া বসিবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর, তোমার কিতাবের উপর, তোমার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, ছদকা-খয়রাত করিয়াছিলাম—এরূপ ভাবে সে যতদূর পারে নেক আমলের দাবী করিবে। (অর্থাৎ তোমার নিকট হিসাবের জন্য হাজির হইতে হইবে এই বিশ্বাস আমার ছিল, তাই আমি এই সব করিয়াছি।) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে মোনাফেক, তাহার সব দাবী মিথ্যা। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, আচ্ছা। তুমি দাঁড়াও, তোমার মিথ্যা দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াইতেছি। সে ভাবিতে থাকিবে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দিবে? এমন সময় তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে, তোমরা সাক্ষ্য দাও। (আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন তাহা সত্বেও এরূপ করা হইবে) যেন তাহার জন্য ওজর-আপত্তির কোন পথ না থাকে (সম্পূর্ণরূপে দূষী সাব্যস্ত হইয়া মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে মোছলেম শরীফের অন্য আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কেয়ামতের দিন পাপী ব্যক্তিগণ এরূপ দাবীও করিবে যে, হে আল্লাহ! তুমিই বলিয়াছ—আমাদের উপর জুলুম করিবা না ; কাজেই আমার বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হইতে দিব না। সে মনে করিবে এইরূপ হইলে আমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবই না এবং আমার গোনাহ্ খাতার সাক্ষীও পাওয়া যাইবে না।) তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—

كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا

অর্থাৎ কেরামুন-কা'তেবীন ফেরেশতাদ্বয়ের সাক্ষ্য ত আছেই ইহা ছাড়া আজ তোর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হইবে। এই বলিয়া তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দিবার জন্য হুকুম করা হইবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার ভাবে প্রত্যেকটি কাজের সাক্ষ্য দিবে। তারপর যখন পুনরায় তাহার বাকশক্তি খুলিয়া দেওয়া হইবে তখন সে ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, তোরা ছাই-ভস্ম হইয়া যা; তোদের মত নিমক-হারামদের জন্য আমি দুনিয়াতে কত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া তোদেরকে রক্ষা করিয়াছিলাম, পরিপুষ্ট করিয়াছিলাম।

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; কারণ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যেন মিথ্যা প্রতিবাদ ও ঝগড়া-বিবাদ করার সুযোগ না থাকে। যেমন দুনিয়াতে সাধারণতঃ হইয়া থাকে এবং আখেরাতেও কাফেরগণ প্রথমে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিবে। যেমন এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর কাফের বা মোনাফেককে যখন ডাকিয়া হিসাব লওয়া হইবে তখন সে দাবী করিয়া বসিবে, আমি যে সকল গোনার কাজ করি নাই তাহাও ফেরেশতা আমার নামে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তখন ঐ ফেরেশতা বলিবে, ওহে! তুমি অমুক দিন অমুক জায়গায় এই গোনাহ করিয়াছিলে না? সে বলিবে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কস্মিনকালেও এই গোনাহ আমি করি নাই। তখন তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। (রুহুল মায়ানী)

১৯৪৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কাবাসীগণকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহার কথা অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছিল। তখন হযরত (দঃ) তাহাদিগকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য এই বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ "আয় আল্লাহ! আমাকে তাহাদের মোকাবেলায় সাহায্য কর তাহাদিগকে সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষে নিপতিত করিয়া—যেরূপ দুর্ভিক্ষ ইউসুফ নবীর যুগে হইয়াছিল।" ফলে তাহাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আসিল যে, উহাতে সমুদয় চিজ-বস্তু নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অস্থি, চর্ম্ম, মৃতদেহ ইত্যাদি খাইতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা চোখে ধুঁয়া দেখিতে লাগিল। পবিত্র কোরআনে ইহারই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল—

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"আপনি অপেক্ষা করুণ ঐ দিনের যে দিন উপরের দিকে তাহাদের নজরে ধুঁয়া দৃষ্ট হইবে, সেই ধুঁয়া (দেখার কারণ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ) তাহাদের সকলকে ঘিরিয়া ধরিবে যাহা তাহাদের উপর এক কঠিন আজাব হইবে।" (২৫ পারা ১৪ রুকু)

দুর্ভিক্ষে পতিত মক্কাবাসীদের তৎকালীন সর্দ্দার আবু সুফিয়ান হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনার বংশধর মক্কাবাসী মোজার গোত্রীয় লোকগণ ধ্বংসের সম্মুখীন। অতএব আপনি আল্লার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন—আল্লাহ যেন বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া দুর্ভিক্ষের আজাব দূরীভূত করিয়া দেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে মোজার বংশীয় লোকদের জন্য দোয়া করিতে বল (যাহারা আল্লার দুশমন) ? তুমি ত বড়ই দুঃসাহসী! শেষ পর্য্যন্ত হযরত (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন। ফলে তাহাদের অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল। এই সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ -

"আমি আজাবকে তোমাদের হইতে কিছু দিনের জন্য দূরীভূত করিয়া দিব, কিন্তু (আজাব দূরীভূত হওয়ার পর) নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের দুষ্কৃতির প্রতি) পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।"

অবস্থা তাহাই হইল। তাহারা যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ পাইল পুনরায় খোদাদ্রোহিতার ময়দানে উন্মাদ হইয়া ছুটিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পুনঃ পাকড়াও করিলেন—প্রতিশোধ গ্রহণের পাকড়ানো, তাই উহা হইতে আর তাহারা রক্ষা পাইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে এই বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে—

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

"যে দিন আমি তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে পাকড়াও করিব, সে দিন অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।" এই পাকড়াও হইয়াছিল বদরের জেহাদের দিন। (সেই দিন তাহাদের বড় বড় সর্দ্দারগণ নিহত হইয়া চির জাহান্নামী হইয়াছিল।)

১৭৪৪। **হাদীছঃ** -আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি কখনও পূর্ণমুখ খুলিয়া হাসিতে দেখিনাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল মুচকি হাসি দেওয়া। তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল যে, ঘনঘটা ও মেঘপুঞ্জ বা ঝড় দেখিলে তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর মলিনতা আসিয়া যাইত।

একদা আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! মেঘ দেখিলে মানুষ বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। আপনাকে দেখি—আপনি মেঘ দেখিলে চিন্তিত হইয়া পড়েন! নবী (দঃ) বলিলেন, মেঘপুঞ্জে আজাবের আশঙ্কা হইতে আমি নিশ্চিত থাকিতে পারি না। পূর্ব্ব যুগের এক জাতি আজাব বাহক মেঘপুঞ্জ দেখিয়া আনন্দে বলিয়াছিল, "এই ত মেঘমালা আসিতেছে আমাদিগকে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ—ঘটনাটি আদ জাতির ; তাহারা দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষে ভুগিতেছিল। একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে কাল মেঘপুঞ্জ আসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল—"এই ত মেঘমালা আসিতেছে ; আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে"। বস্তুতঃ উহা দ্বারা প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিবাত সৃষ্টি হইল এবং সাত রাত আটদিন পর্য্যন্ত ঝঞ্ঝা বহিয়া তাহাদেরে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। পবিত্র কোরআন ২৭ পাঃ ৮ রুকুতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। নবী (দঃ) এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এক হাদীছে আছে—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী (দঃ) আকাশে মেঘপুঞ্জের সঞ্চার দেখিলেই কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া উহার প্রতি তাকাইতেন এবং এই দোয়া করিতেন—اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ আয় আল্লাহ! ইহার মধ্যে যাহা কিছু অনিষ্ট আছে উহা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতঃপর পর সেই মেঘপুঞ্জ দূরীভূত হইয়া গেলে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিতেন। আর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইলে এই দোয়া পড়িতেন—اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا "হে আল্লাহ উপকারী বৃষ্টি দান করুন।" (মেশকাত শরীফ ১৩৩)

এতদ্ভিন্ন তৃতীয় খণ্ডে ১৫৮৫ নং হাদীছ খানাও এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ আছে—মেঘপুঞ্জ দেখিলে নবীজী (দঃ) বিচলিত হইয়া উঠিতেন। এবং বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তাঁহার বিচলন দুর হইত।

১৯৪৫। হাদীছ ঃ—ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ) (আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিদ্বয়—আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের কণ্ঠ-স্বর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উচ্চ হইয়া যাওয়ার কারণে।

ঘটনা এই ছিল—একদা বনী-তামীম গোত্রের এক দল লোক হযরতের খেদমতে পৌঁছিল। তাহাদের অভিপ্রায়ে হযরত (দঃ) সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আবুবকর (রাঃ) কা'-কা'-ইবনে মা'বাদ (রাঃ) নামক

ছাহাবীর নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না—বরং আক্‌রা-ইবনে হাবেস (রাঃ) নামক ছাহাবীকে প্রেরণ করা হউক। এতচ্ছ্রবণে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আপনার ইচ্ছাই হইল আমার বিরোধিতা করা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার বিরোধিতার প্রতি আমার মোটেও লক্ষ্য নাই। এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক বাঁধিল এবং (হযরতের সম্মুখেই) তাঁহাদের উভয়ের কণ্ঠ-স্বর উচ্চ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এই আয়াত নাযেল হইল ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا

لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ -

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ

اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى - لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! নবীর (সম্মুখে পরস্পর কথা-বার্ত্তার মধ্যেও তাঁহার) আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিতে পারিবে না। এবং নবীর সঙ্গে কথা বলিতে পরস্পর কথা বলার ন্যায় সম স্বরেও কথা বলিতে পারিবে না। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এই সব আদব-তমীযের নিয়মাধীন না চলিলে) আশঙ্কা আছে—তোমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের সারা জীবনের নেক আমল নষ্ট ও বরবাদ হইয়া যাইতে পারে। নিশ্চয় যাহারা আল্লার রসুলের সম্মুখে (এমন আদব-তমীযের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলে, এমনকি তাহাদের কণ্ঠ-স্বর অত্যন্ত মোলায়েম ও সংযত রাখে, আল্লার রহমতে তাহাদের অন্তর খাঁটী তাক্বওয়া-পরহেজগারীতে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের জন্য মাগফেরাত ও অতি বড় প্রতিদান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (ছুরা হুজরাত—২৬ পারা ১৩ রুকু)

এই ঘটনার ও এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর বিশেষভাবে ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কথা বলিতে এত দূর সংযত ও ছোট আওয়াজে কথা বলিতেন যে, অনেক সময় পুনঃ না বলিলে তাঁহার কথা ধরা যাইত না।

১৯৪৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মজলিসে ছাবেত ইবনে ক্বায়স (রাঃ) নামক ছাহাবীকে খোঁজ করিয়া পাইলেন না। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাহার সংবাদ নিয়া আসিব।

সেমতে ঐ ব্যক্তি ছাবেত ইবনে কায়সের নিকট আসিল এবং দেখিতে পাইল, তিনি ভীষণ অনুতপ্ত ও আতঙ্কগ্রস্তরূপে অবনত মস্তকে ঘরে বসিয়া আছেন ; ঘর হইতে বাহিরই হন না। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, এই নরাধমের অবস্থা খুবই খারাপ। এই নরাধমের আওয়াজ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আওয়াজ হইতে উচ্চ হইয়া থাকিত। (সৃষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক রূপেই ঐ ছাহাবীর স্বর উচ্চ ছিল।) অতএব (পবিত্র কোরআনের আয়াত অনুসারে) এই নরাধমের সমুদয় আমল নষ্ট ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

এতচ্ছ্রবণে ঐ ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সেই ছাহাবীর সমুদয় উক্তি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। (হযরত (দঃ) তাহাকে পুনঃ ঐ ছাহাবীর নিকট পাঠাইলেন)। সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট এক মহান সুসংবাদ বহন করিয়া আসেন—হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন ঃ—

اِذْهَبْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

"তুমি তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে সুসংবাদ দাও—নিশ্চয় আপনি দোযখী হইবেন না, বরং আপনি হইবেন বেহেশতী।"*

---

* তথা কথিত মাওলানা আকরম খাঁর "মোস্তফা চরিত" দেখার দুর্ভাগ্য হইতে আল্লাহ তায়ালা বাঁচাইয়া ছিলেন এবং ঐ পবিত্র নামের অপবিত্র বই খানা পঁচা গুদামে পরিত্যক্ত হইয়া ছিল। ইদানিং দৈনিক পত্রিকা আজাদ মারফৎ উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

উহার ভূমিকায়ই ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী জঘন্যতম মিথ্যা ও ভুল উক্তি রহিয়াছে। তাহারই বাক্যে সেই কুখ্যাত উক্তিটা শুনুন—"সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ্য ছহি-বোখারী ও ছহি-মোছলেম হইতে কতকগুলি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই হাদীছ গুলির ছনদ ছহীহ হওয়া সম্বন্ধে কোন তর্কই নাই—কারণ এগুলি বোখারী ও মোসলেমের হাদীছ। ঐ হাদীছ গুলি প্রকৃত ও সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহিত হইতে পারে না।"

কি জঘন্য উক্তি! যে, বোখারী-মোছলেম শরীফেও এমন হাদীছ আছে যাহা সত্য বলিয়া গৃহিত হইতেই পারে না, অর্থাৎ ঐ হাদীছের মিথ্যা হওয়া অবধারিত।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন কি পাগলামী! আকরম খাঁ সাহেব জীবিত থাকা কালে বক্ষমান গ্রন্থেই তাহার এই শ্রেণীর অনেক উক্তির সমালোচনাই আমরা করিয়াছি, এখন তিনি তাহার কর্ম্মফল ভোগের জায়গায় পৌঁছিয়াছেন আমাদের সমালোচনার প্রয়োজন আর নাই। তবুও পাঠকদের ঈমান রক্ষার্থে তাহার পাগলামীটা ধরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

বোখারী শরীফে মিথ্যা হাদীছ আছে বলিয়া আকরম খাঁ যে সব নমুনা পেশ করিয়াছেন উহার প্রথমটিই হইল আলোচ্য হাদীছটি। এই হাদীছটি সম্পর্কে তাহার কি নির্লজ্জ উক্তি যে—"এই হাদীছটি কখনই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহিত হইতে পারে না। তাঁহার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডের অবতরণিকায় বর্ণিত রহিয়াছে।

১৯৪৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের হিসাব-নিকাশান্তে অসংখ্য ও অগণিত) দোযখীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, কিন্তু (তবুও দোযখ পরিপূর্ণ হইবে না এবং তাহার স্পৃহা কমিবে না।) সে বলিতে থাকিবে, আরও অধিক আছে কি? এমনকি অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর স্বীয় কুদরতের এমন প্রভাব প্রয়োগ করিবেন যাহাতে দোযখের গভীরতা এবং প্রশস্ততা সংকোচিত হইয়া যাইবে। তখন সে বলিবে, যথেষ্ট হইয়াছে—যথেষ্ট হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে জাহান্নামের গভীরতা ও প্রশস্ততার বিবরণে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার পেট পুরিয়াছে কি? সে বলিবে, আরও অধিক আছি কি?" (ছুরা ক্বাফ—২৬ পারা)

উল্লেখিত হাদীছখানা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য্যেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৯৪৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত ও দোযখের মধ্যে বিতর্ক হইল—দোযখ বলিল, বড় বড় মানুষ যাহারা ফখর ও গর্ব্বকারী তাহারা আমার ভাগে আসিবে। তখন বেহেশত আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিল, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভাগে শুধু দুর্ব্বল ও নিম্নস্তরের বিবেচিত লোকগণ কেন হইবে? তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতকে বলিয়াছেন, তুমি আমার রহমতের স্থান। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদেরকে রহমত দান করিব যাহাকে ইচ্ছা করিব। (আমার রহমতের ক্ষেত্রে কাহারও আত্মম্ভরিতা ও গর্ব্ব-ফখর কাজে আসিবে না, নম্রতার দ্বারাই উহা লাভ হইতে পারিবে।) আর দোযখকে বলিয়াছেন, তুমি আমার আজাব ও শাস্তিদানের স্থান; তোমার দ্বারা আমি শাস্তি দান করিব যাহাকে ইচ্ছা করিব, (কাহারও প্রভাব প্রতিপত্তি উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।)

আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উভয়কে ইহাও বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেককেই এই পরিমাণ অধিবাসী প্রদান করা হইবে যে, তোমরা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অবশ্য দোযখ পরিপূর্ণ না হওয়ার দরুণ আল্লাহ তায়ালা উহার উপর স্বীয় বিশেষ কুদরত প্রয়োগ করিবেন। যদ্দরুণ সে বলিতে বাধ্য হইবে যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে—বস্তুতঃ তখন দোযখের গভীরতা ও প্রশস্ততা কমিয়া গিয়া সে ভরিয়া যাইবে। (দোযখ পূর্ণ করিবার জন্য কোন নূতন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইবে না, কারণ) আল্লাহ তায়ালা কোন জীবকে বিনা অপরাধে দোযখে

ফেলিবেন না। পক্ষান্তরে বেহেশতকে পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নূতন মখলুক পয়দা করিবেন। (তাঁহারা বেহেশতবাসী মানুষের অধীনস্থ হইবেন।)

১৯৪৯। **হাদীছ ঃ**—আল্লাহ তায়ালা যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

الْغُرُوبِ - وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ -

"আপনি বিরোধীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা-ভৎ র্সনার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া চলুন এবং (তাহাদের ব্যথাদায়ক কথাবার্ত্তা ভুলিয়া থাকার সহায়করূপে আল্লার সঙ্গে সম্পর্কে দৃঢ় করার জন্য) সকাল-বিকাল স্বীয় প্রভুর গুণগানে (—নামায ও জিক্‌র-আজ্‌কারে) মশগুল হউন, বিশেষরূপে রাত্রেরও কিছু অংশে এবং প্রত্যেক নামাযের পরে প্রভুর তছবীহ—পবিত্রতার জিক্‌র করুন।" (ছুরা কাফ—২৬ পাঃ)

উক্ত আয়াতের শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে প্রত্যেক নামাযের পরে তছবীহ পড়ার আদেশ করিয়াছেন।

১৯৫০। **হাদীছ ঃ**—মসরুক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান! হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কি তাঁহার প্রভু পরওয়ার-দেগারকে দেখিয়াছিলেন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তোমার কথায় আমার শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। তুমি তিনটি বিষয় জ্ঞাত নও কি? যে তিনটি বিষয় ঘটিয়াছে বলিয়া উক্তি করিলে তাহা মিথ্যা ও অবাস্তব হইবে। (১) যে বলিবে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন তাহার কথা অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ—

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

"কোন মানুষের দৃষ্টি আল্লাহ তায়ালাকে আয়ত্ব করিতে পারে না, কিন্তু (সব কিছু, এমনকি) সকলের দৃষ্টিও তাঁহার আয়ত্বে।" আরও একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ—

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ -

"কোন মানুষের জন্য (ইহজগতে) এই সুযোগ নাই যে, আল্লাহ তাহার সঙ্গে কালাম করেন তিন পন্থার কোন পন্থা ব্যতিরেকে—[ক] কাশফ ও এলহামরূপে

বাণী পৌঁছাইয়া। [খ] (মানবের দৃষ্টির) অন্তরাল হইতে। [গ] ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া—যে ফেরেশতা বাণী পৌঁছাইয়া থাকেন।" * (ছুরা শূরা—২৫ পাঃ)

(২) আর যে ব্যক্তি বলিবে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আগামী দিনের অগ্রিম খবর জানিতেন তাহার উক্তিও অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এই দাবীর সমর্থনেও আয়াত তেলাওয়াত করিলেন— وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا "কোন মানুষ জানে না, সে আগামী কাল কি করিবে।

(৩) আর যে ব্যক্তি বলিবে যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) (উম্মৎগণকে পৌঁছাইবার মত) কোন বস্তু গোপন রাখিয়া ছিলেন, তাহার উক্তিও মিথ্যা এবং অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) এই দাবীর সমর্থনেও এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ - وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রসুল (দঃ)! আপনার নিকট যত কিছু নাযেল ও অবতীর্ণ করা হইয়াছে সবটুকুই আপনি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিন ; অন্যথায় আপনি আপনার রসুল হওয়ার পদের দায়িত্ব পালনকারী গণ্য হইবেন না।"

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) হযরত (দঃ) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালাকে দেখিবার প্রমাণ রূপে কথিত পবিত্র কোরআন ছুরা নজমের আয়াত— مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى "হযরত (দঃ) যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা দেখিবার সময় তাঁহার জ্ঞানশক্তি একটুও বিভ্রান্ত হইয়াছিল না।" এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرَى "হযরত (দঃ) তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন ছিদরাতুল-মোন্‌তাহার নিকট।" এই ধরণের আয়াত সমূহের বিষয় বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, উক্ত আয়াত সমূহে যাঁহাকে দেখিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)। ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিলেও হযরত (দঃ) তাঁহাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে শুধুমাত্র দুইবার দেখিয়াছিলেন। উহারই বর্ণনা ছুরা নজমের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন কি—না সে সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যেই মতভেদ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবীর মতে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন ; যেহেতু তাহা এই জগতের সীমার বাহিরের ঘটনা, তাই উহা সম্ভব হইয়াছিল।

* আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য এই যে, সামনা-সামনি দেখারূপে কথা বলা ও শুনা যেরূপ অসাধ্য যাহা উক্ত আয়াতের মর্ম্ম তদ্রূপ দেখা-সাক্ষাৎও অসাধ্য।

আয়েশা (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবীর মতে দর্শন লাভ করেন নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতও ইহাই ছিল। সেই জন্যই তিনিও ছুরা নজমের আয়াত সমূহ জিব্রাইল ফেরেশতাকে দেখা প্রসঙ্গে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯৫১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছুরা নজমের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জিব্রাইল ফেরেশতাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন—তখন জিব্রাইল ফেরেশতা ছয় শত ডানা বিশিষ্ট ছিলেন।

১৯৫২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছুরা নজমের এক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহাও বলিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) সম্মুখ দিকে আকাশের উর্দ্ধ কিনারায় সবুজ বর্ণের মখমল দেখিতে পাইয়া ছিলেন, যাহা এত বড় আকারের ছিল যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ মখমল হয়ত গালিচা-বিশিষ্ট ছিল যাহার উপর জিব্রাইল (আঃ) কুরছি বা আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিম্বা জিব্রাইল আলাইহেচ্ছালামের গায়ের পোষাক ছিল ঐ মখমল বা তাঁহার ডানাগুলির সৌন্দর্য্য সবুজ মখমলের ন্যায় ছিল।

১৯৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (এক শ্রেণীর মোমেনের জন্য বেহেশতের মধ্যে ফল-ফুলাদির আরাম-আয়েশ পূর্ণ মনোরম) দুই দুইটি বাগান থাকিবে। যাহার বাংলো, কুঠি ও পাত্র (ইত্যাদি ফার্ণিচার সমূহ এবং) সমুদয় জিনিষ রৌপ্যের তৈরী হইবে। অপর (এক শ্রেণীর মোমেনের জন্য) দুই দুইটি বাগান থাকিবে যাহার পাত্র সমূহ এবং সমুদয় জিনিষ স্বর্ণের তৈরী হইবে। আর বেহেশতীগণ চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে তাঁহাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের দীদার ও সাক্ষাৎ লাভ করিবেন—এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যে, প্রভু পরওয়ারদেগারের মহত্ত্বের প্রভাবময় আভা ব্যতীত মধ্যস্থলে কোন প্রকার আবরণ থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআন ছুরা রহমানের মধ্যে উক্ত দুই শ্রেণীর বাগানের উল্লেখ রহিয়াছে……وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের সম্মুখে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য দুইটি বিশেষ বাগান প্রস্তুত রহিয়াছে।…… وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ "উক্ত বাগানদ্বয় অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরও দুইটি বাগান আছে………।"

উক্ত ছুরায় উল্লেখিত দুই শ্রেণীর বাগানের তুলনা মূলক তফসীল ও ব্যবধানও ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য হাদীছে আর একটি তফসীল এবং ব্যবধান

বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর বাগানের সমুদয় চিজ-বস্তু স্বর্ণ নির্ম্মিত হইবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগানের সমুদয় চিজ-বস্তু রৌপ্য নির্ম্মিত হইবে।

প্রথম শ্রেণীর বাগানগুলি হইবে বিশিষ্ট মোমেনদের জন্য—তাঁহারা প্রত্যেকে উহার দুইটি করিয়া বাগান লাভ করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগানগুলি হইবে সর্ব্ব সাধারণ মোমেনদের জন্য, তাঁহারা প্রত্যেকে উহার দুই দুইটি বাগান লাভ করিবেন।

১৯৫৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একদা বলিলেন, আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ ঐ সব নারীদের উপর যাহারা শরীরে চিত্র বা নাম ইত্যাদি খোদাই করিয়া অঙ্কিত করার প্রতি সমাজকে প্রলুব্ধ করে বা নিজ শরীরে উহা গ্রহণ করে এবং যাহারা ললাট বা কপালের উর্দ্ধাংশ মাথার চুল উপড়াইয়া কপাল প্রশস্ত করে বা ভ্রুর লোম উপড়াইয়া উহাকে সরু করে এবং যাহারা রেতি ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত ঘর্ষণ ও ক্ষয় করিয়া দাঁতকে সরু করে এবং দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর নারীগণ রূপ-সজ্জার প্রবণতায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ও গঠনের প্রাকৃতিক ও সৃষ্টিগত আকৃতি পরিবর্ত্তন ও বিকৃত করিয়া ফেলে। (রূপ সজ্জার এই অবাঞ্ছিত চাক-চিক্যের সাহায্যে তাহারা নিশ্চয়ই বেগানাদের চোখে ফুটিয়া উঠিতে চায়, সুতরাং তাহারা লা'নৎ ও অভিশাপের পাত্র।)

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি শুনিতে পাইয়া উম্মে-ইয়াকুব নাম্নী এক মহিলা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—আপনি এই ক্ষেত্রে লা'নৎ করিয়া থাকেন ? তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহাকে লা'নৎ করিয়াছেন, আল্লার কেতাব কোরআনে যাহার প্রতি লা'নৎ করা হইয়াছে তাহার প্রতি আমি লা'নৎ করিব না কেন ? এতচ্ছ্রবণে মহিলাটি বলিল, আমি কোরআন শরীফ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি, কোথাও আমি এই শ্রেণীর লা'নৎ ও অভিশাপ পাই নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি লক্ষ্য করিয়া পড়িতে তবে নিশ্চয় (দেখিতে) পাইতে। তুমি কি এই আয়াত কোরআন শরীফে পড় নাই ঃ—

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রসুল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তোমরা উহাকে মজবুতরূপে গ্রহণ ও অবলম্বন কর। আর যাহা হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক।"

মহিলা বলিলেন, এই আয়াত ত কোরআন শরীফে তেলাওয়াত করিয়াছি। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতে রসুলের নিষেধাজ্ঞা হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হইয়াছে। আর উল্লেখিত কার্য্যাবলীকে রসুল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর মহিলা বলিলেন, আপনার স্ত্রীও ত ঐ কাজ করিয়া থাকে! আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এখনই তুমি আমার গৃহে যাও এবং ভালরূপে খুঁজিয়া দেখ। মহিলা তাহাই করিলেন, কিন্তু তাঁহার দাবীর সত্যতা তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আমার স্ত্রী ঐরূপ কাজ করিলে কখনও আমার গৃহে তাহার ঠাই হইত না।

ব্যাখ্যা ঃ—বিশিষ্ট ছাহাবীগণের অন্যতম ছাহাবী আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এস্থলে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান যুগের একটি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক। অধুনা অনেক কৃত্রিম মোসলেম নামধারীকে দেখা যায়, কোরআনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ঠিকঠিক দেখাইয়া সুন্নাহ্‌কে অস্বীকার করিতে চায়। ঈমান ও ইসলামের মূল কর্ত্তনকারী এই ব্যাধি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ও কঠোর সতর্কবাণী স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও অনেক করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ছাহাবী আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, রসুলের আদেশ-নিষেধ তথা সুন্নার বরখেলাফকারী বস্তুতঃ কোরআনেরও বরখেলাফকারী।

এক্ষেত্রে আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একটি অতি মূল্যবান আদর্শও দেখাইয়াছেন। অনেক লোককে দেখা যায় তাহারা অপরকে পরহেজগারীর নছিহত করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনকে পরহেজগার বানাইবার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না। আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কটাক্ষকারিনীকে তাঁহার গৃহে যাইয়া তল্লাসী লওয়ার অনুমতি দিলেন। অধিকন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন—لو كانت كذلك ما جامعتها "আমার স্ত্রী ঐ শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকিলে, আমার নিকট তাহার ঠাই হইত না।"

১৯৫৫। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং সে অতিশয় ক্ষুধার্ত বলিয়া প্রকাশ করিল। তখন হযরত (দঃ) প্রথমতঃ নিজ গৃহে স্বীয় স্ত্রীগণের নিকট (তাহার জন্য খাদ্য চাহিয়া) সংবাদ পাঠাইলেন। নবী-পত্নিগণ সকলেই উত্তর পাঠাইলেন, আমাদের নিকট একমাত্র পানি ভিন্ন কিছুই নাই। তখন হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন, কেহ আছে কি! এই ব্যক্তিকে অদ্য রাত্রে মেহমানরূপে গ্রহণ করিয়া লয়? মদীনাবাসী এক ছাহাবী দাঁড়াইয়া বলিলেন, হাঁ—আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রসুলুল্লাহ! এই বলিয়া তিনি মেহমানকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

মেহমান নিয়া আসিয়াছি। পুরাপুরীভাবে রস্থলুল্লার মেহমানের খাতির-তাওয়াজু কর। মেহমানকে না দিয়া কোন বস্তু গৃহে জমা রাখিও না। স্ত্রী বলিল, গৃহে শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েদের কিছু আহার রহিয়াছে। উহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তখন ঐ ছাহাবী স্ত্রীকে বলিলেন, ঐ খাদ্যটুকুই মেহমানের জন্য প্রস্তুত কর এবং ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া দাও। আর (আমাদের ছাড়া মেহমান খাদ্য গ্রহণ করিতে চাহিবে না, কিন্তু খাদ্য অল্প—আমরা খাইলে মেহমানের পেট ভরিবে না, তাই) খাওয়ার সময় বাতি নিভাইয়া দিও।

স্ত্রী তাহাই করিল—ছেলে-মেয়েদেরকে ঘুম পাড়াইয়া দিল এবং ঐ খাদ্য মেহমানের জন্য প্রস্তুত করিয়া বাতি জ্বালাইয়া দিল। অতঃপর গৃহস্বামী মেহমানকে লইয়া খাইতে বসিলেন, তখন স্ত্রী বাতির সলিতা ঠিক করার ভান করিয়া বাতি নিভাইয়া দিল এবং অন্ধকারের মধ্যে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী হাত নাড়াচাড়া করিয়া মেহমানকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহারাও তাহার সঙ্গে খাইতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা কিছুই খান নাই। সব খাদ্যটুকু মেহমানকে খাইবার স্থযোগ দিয়াছেন। এই ভাবে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী উভয়ে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর বেলা ঐ ছাহাবী হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, অমুক স্বামী ও অমুক স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রশংসায় কোরআনের এই আয়াত নাযেল করিয়াছেন :—

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - وَمَنْ يُّوْقَ

شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়াও নিজে না খাইয়া অপরকে খাওয়ায়; যে ব্যক্তি নিজের দেলকে বখিলী ও কৃপণতা হইতে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছে সে সফলকাম হইবেই।" (ছুরা হাশর—২৮ পারা)

১৯৫৬। হাদীছ : যায়েদ ইবনে আরক্কাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদ উপলক্ষে আমরা হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার বাহিরে গেলাম। ঐ সময় লোকদের মধ্যে খাদ্যের খুব অভাব পড়িল; সেই স্থযোগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক সর্দ্দারকে (দুরভিসন্ধি মূলক ভাবে) এই প্রচারণা চালাইতে শুনিলাম যে, সে মদীনাবাসী আনছারগণকে পরামর্শ দিয়া বলিতেছে, "তোমরা রস্থলুল্লার সঙ্গী (—মোহাজের)-গণকে কোন প্রকার সাহায্য করিও না। তোমরা তাহাদের উপর কোন খাদ্যদ্রব্য খরচ করিও না যেন তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।"

এতদ্ভিন্ন (ঐ সময় একজন মোহাজের এবং একজন আনছারী ছাহাবীর মধ্যে কিছুটা ঝগড়ার সৃষ্টি হইল * সেই সুযোগে মোনাফেক-প্রধান) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির উস্কানী দান স্বরূপ) এই দম্ভোক্তিও করিতে শুনিলাম—"এইবার মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া সবল সংখ্যাগুরু তথা দেশবাসীগণ দুর্ব্বল সংখ্যালঘু বিদেশীগণকে মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে।"

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের এই সব দুরভিসন্ধি মূলক কথাগুলি আমি আমার চাচার নিকট বলিলাম, আমার চাচা ঐগুলি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরীভূত করিলেন। সেমতে নবী (দঃ) আমাকে ডাকিলেন, আমি হযরত (দঃ)কে সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিলাম।

হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার সাঙ্গো-পাঙ্গগণকে ডাকাইলেন। তাহারা হযরতের নিদট কসম করতঃ সম্পূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করিল। (যেহেতু আমার সাক্ষী ছিল না। আর তাহারা কসম করিয়াছে, তাই আইনতঃ) আমি হযরতের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম এবং তাহারা সত্যবাদী গণ্য হইল। ইহাতে আমি এত অধিক চিন্তিত ও ব্যাথিত হইলাম যে, সারা জীবনে কখনও এইরূপ হই নাই। এমনকি, আমি বাহিরে চলা-ফেরা ছাড়িয়া দিয়া গৃহভ্যন্তরে বসিয়া গেলাম। আমার চাচা আমাকে মালামত করিয়া বলিলেন, এমন ঘটনায় কেন পতিত হইয়াছিলেন যদ্দরুণ তুমি হযরতের নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়াছ এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?

অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকগণকে মিথ্যাবাদী ঘোষনা করিয়া এবং তাহাদের ঐ সব দুরভিসন্ধির এবং উস্কানীমূলক কথার স্পষ্ট বিবরণ দান করিয়া إذا جاءك المنفقون—পূর্ণ ছুরা "মোনাফেকূন" নাযেল করিলেন তৎক্ষণাৎ হযরত নবী (দঃ) আমাকে সংবাদ দিয়া আনিলেন এবং উক্ত ছুরা আমার সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, হে যায়েদ! আল্লাহ তায়ালা তোমার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য ও ঘোষনা দিয়াছেন।

১৯৫৭। হাদীছঃ - জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক জেহাদের ছফরে ছিলাম। তখন এই ঘটনা ঘটিল—এক মোহাজের কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া একজন আনছারী তথা মদীনাবাসী মোসলমানকে তাহার নিতম্বের উপর আঘাত করিল, ফলে আনছারী ব্যক্তি "হে আনছার ভাইগণ!" বলিয়া তাহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিল। অপর দিকে মোহাজের ব্যক্তি "হে মোহাজেরগণ!" বলিয়া তাহার সাহায্যের প্রতি আহ্বান করিল এবং তাহা হযরত (দঃ)ও শুনিলেন।

* পরবর্ত্তী হাদীছে সেই ঝগড়ার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে।

এইরূপে দলীয় ভিত্তিতে সাহায্যের প্রার্থী হইয়া মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রতি রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় ঘৃণা ভরে বলিলেন, জাহেলিয়ত বা অন্ধকার যুগের রীতি-নীতির ডাকা-ডাকি কেন? লোকগণ হযরতের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিল যে, এক মোহাজের এক আনছারীকে তাহার নিতম্বে আঘাত করিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ধরণের ডাকা-ডাকি পরিত্যাগ করা আবশ্যক, ইহা বড়ই ঘৃণার বস্তু।

উক্ত ঝগড়ার ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকেরও গোচরীভূত হইল (এবং ইহার দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে) সে বলিল, তাহাদের তথা মোহাজেরগণের এতই সাহস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা এই কাজ করিয়াছে? খোদার কসম—এইবার মদীনায় ফিরিয়া যাওয়ার পর সবল সংখ্যাগুরু (তথা মদীনাবাসীগণ) দুর্ব্বল সংখ্যালঘু (তথা বিদেশী মোহাজের)গণকে তাড়াইয়া দিবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদীনায় আসার প্রথম দিকে মদীনাবাসী মোসলমানদের সংখ্যাই অনেক অধিক ছিল, অবশ্য পরে মোহাজেরগণেরও সংখ্যাধিক্য হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের এই উক্তি জ্ঞাত হইয়া ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি আমাকে বাধা দিবেন না। আমি এই মোনাফেকের শিরচ্ছেদ করিয়া দেই। হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, সহ্য করিয়া থাক; কেহ যেন এই কথা বলার সুযোগ না পায় যে, মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দলভুক্তকেও মারিয়া ফেলে। (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই "মোনাফেক" তথা প্রকাশ্যে মোসলমান ছিল। তাই হযরত (দঃ) তাহাকে মারিয়া ফেলার বিপক্ষে এই কথা বলিয়াছেন।)

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ দান ও মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনায় ২৮ পারার ছুরা মোনাফেকুন নাযেল হইয়াছিল, যাহার তরজমা এই—

মোনাফেকরা আপনার সন্মুখে আসিলে বলে, আমরা শপথ করিয়া বলি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিশ্চয় আল্লার রসুল। আল্লাহ ত জানেনই, আপনি নিশ্চয় তাঁহার রসুল, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী, (তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বিশ্বাস ও স্বীকার করে না যে, আপনি রসুল।) তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে থাকিয়া লোকদিগকে আল্লার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে। তাহাদের এই কুকর্ম্ম বড়ই জঘন্য। এরূপ জঘন্য কাজে তাহারা লিপ্ত রহিয়াছে এই কারণে যে, তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করিয়া (অন্তরে সর্ব্বদা কুফরী পোষণ করে এবং সুযোগ প্রাপ্তে) আবার মুখেও কুফরী প্রকাশ করে, ফলে তাহাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর সুবুদ্ধির উদয় হইবে না।

আপনি তাহাদিগকে দেখিলে তাহাদের দৈহিক আকার-আকৃতি আপনার দৃষ্টিতেও ভাল লাগিবে, তাহারা কথা বলিলে আপনিও তাহাদের কথা শুনিবেন। (তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি এবং মিঠা মিঠা কথা খুবই ভাল দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ ইসলামের ভিতর তাহারা মোটেই ঢুকে নাই—) তাহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেন কতগুলি থাম বা খুঁটি যাহার কোন অংশই মাটির ভিতরে ঢুকে নাই—কোন কিছুতে হেলান লাগান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। (এরূপ খুঁটিগুলি মোটা মোটা দেখাইলেও দাঁড়ানোর মধ্যে উহাদের কোনই শক্তি নাই, যে কোন মামুলী কারণে উহা পড়িয়া যায়। তদ্রূপ মোনাফেকদের বাহ্যিক অবস্থা ভাল দেখাইলে কি হইবে ঈমান ও ইসলামে স্থিতিশীলতার লেশ মাত্র তাহাদের নাই ; যে কোন সুযোগে ইসলামদ্রোহী কথা ও ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার কারণে তাহারা সর্ব্বদা আতঙ্কিত ও ভীত থাকে;) কোন শব্দ শুনিলে মনে করে তাহাদের বুঝি বিপদ আসিল ! (তাই তখন মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কসমের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।)

তাহারা (আপনার মিশনের) চিরশত্রু, তাহাদের হইতে আপনি সতর্ক থাকিবেন। আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করুন ; তাহাদের বুঝ কতই না উল্টা ! যখন তাহাদিগকে বলা হয় আস—দিলে-মুখে ইসলাম ও ঈমানকে গ্রহণ করিয়া আস ! আল্লার রসুল তোমাদের পূর্ব্ব ত্রুটির জন্য আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন তখন তাহারা মাথা নাড়াইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং দেখিবেন তাহারা আত্মম্ভরিতা পূর্ব্বক ঘাড় ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা সমান ; আল্লাহ তায়ালা কস্মিনকালেও তাহাদেরে ক্ষমা করিবেন না। এরূপ নাফরমানদেরকে আল্লাহ হেদায়েতেরও তৌফিক দেন না !

ইহারাই বলিয়াছে, রসুলের দলে যাহারা আছে তাহাদের জন্য এক পয়সাও খরচ করিও না ; তবেই তাহারা দল ছাড়িয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও—আসমান জমিনের সমুদয় ভাণ্ডার আল্লার হাতে, কিন্তু মোনাফেকদের সেই বুঝ নাই।

ইহারাই বলিয়াছে, এইবারে মদীনায় পৌঁছিয়া শক্তিশালীগণ (তথা মদীনার অধিবাসী সংখ্যাগুরুগণ) দুর্ব্বলগণকে (তথা সংখ্যালঘু বিদেশী মোহাজেরদিগকে) মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে। স্মরণ রাখিও—প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিশালী হইলেন আল্লাহ, আল্লার রসুল এবং মোমেন দল, কিন্তু মোনাফেকদের সেই জ্ঞান নাই।

হে মোমেনগণ ! তোমাদের ধন-জন যেন তোমাদিগকে আল্লার ইয়াদ হইতে গাফেল—উদাসীন করিতে না পারে। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাফেল হইবে তাহার জন্য ধ্বংস অনিবার্য্য। আর তোমরা আমার প্রদত্ত ধন-সম্পদ হইতে আমার পথে ব্যয় কর ইহার পূর্ব্বে যে, কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, আর তখন সে বলিতে থাকে, প্রভু হে !

আমাকে কিছু সময়ের সুযোগ দেন না কেন যেন আমি দান-খয়রাত করিতে পারি এবং নেককারদের দলভুক্ত হইতে পারি।

আল্লাহ কখনও অবকাশ দেন না কোন জীবকে তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্য্য-কলাপের খবর রাখেন।

১৯৫৮। হাদীছ :—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বিবরণ শুনিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার "সাক" তথা তাঁহার এক বিশেষ ছিফত বিকশিত করিবেন। ইহার প্রভাবে সকল মোসলমান নারী-পুরুষ তাঁহার দরবারে সেজদাবনতঃ হইয়া পড়িবে। অবশ্য যাহারা দুনিয়াতে রিয়া তথা শুধু লোক-দেখান এবং শুধু প্রচার ও নাম-রটান উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়া থাকিত (আর যাহারা কাফের ছিল—যাহারা খোদা ভিন্ন অন্যকে সেজদা করিয়াছে) তাহারা ঐ সময় সেজদা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। তাহারা সেজদার জন্য প্রস্তুত হইবে বটে, কিন্তু তখন তাহাদের পিঠ ও কোমর আস্ত কাঠের ন্যায় হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা :—ছুরা কলম ২৯ পারায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ - خَاشِعَةً

أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন "সাক" বিকশিত হইবে। যাহার প্রভাবে সকল মানুষ সেজদার প্রতি ধাবমান হইবে। কিন্তু (আল্লাহ-ত্যাগী নাফরমান যাহারা) তাহারা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকিবে, সব দিক দিয়াই অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে। (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) তাহাদিগকে (এক আল্লার জন্য) সেজদা করার প্রতি কত ভাবে ডাকা হইত এবং তখন তাহাদের অঙ্গ সমূহ সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। (ইচ্ছা করিলেই সেজদা করিতে সক্ষম হইত, কিন্তু তখন তাহারা সেজদা করে নাই। তাই আজ তাহাদের ইচ্ছা হইবে, কিন্তু সেজদা করার শক্তি পাইবে না, পিঠ ও কোমর কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া থাকিবে।)

১৯৫৯। হাদীছ :—(ছুরা কলম ২৯ পারায় হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের জাতির কুফরীর বিবরণ দান উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কতিপয় দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—) ওয়াদ্দ্, সুয়া', ইয়াগূছ্, ইয়াউক্, নস্র্। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব নাম নূহ আলাইহেচ্ছালামের জাতির বিশিষ্ট নেককার লোকদের নাম ছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাঁহাদের সমাজের লোকগণকে এই উস্কানী দিল যে, তাঁহাদের

স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহাদের খানকায় তাঁহাদের নামে তাঁহাদের আকৃতির স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করা হউক। লোকগণ তাহাই করিল। তখন ঐ সব স্মৃতিফলকের কোন প্রকার পূজা-পাঠ করা হইত না, কিন্তু ঐ সব স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠাকারী—যাহারা উহার মূল তথ্য জ্ঞাত ছিল তাহাদের মৃত্যু হইলে পর পরবর্ত্তী অজ্ঞ লোকগণ ঐ সব স্মৃতিফলকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল এবং উহা দেব-দেবীতে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আ'বহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দেখাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান যুগেও আরবের বিভিন্ন গোত্রে ঐ সব দেব-দেবীর প্রচলন রহিয়াছে যথা—দৌমাতুল্-জন্দল নামক স্থানে কাল্ব্ গোত্রে "ওয়াদ্দ্", হোজায়েল গোত্রে "সুয়া", জুর্ফ নামক স্থানে মোরাদ গোত্রে "ইয়াগূছ্" হাম্দান গোত্রে "ইয়াউক্", হিম্ইয়ার গোত্রে "নছ্র" নামীয় দেবতার প্রচলন এখনও রহিয়াছে।

● ৩০ পারা ছূরা "আবাছা" ১৩—১৬ আয়াত সমূহে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের পবিত্রতা ও উচ্চ সম্মান সম্পর্কে বলিয়াছেন—"(এই কোরআন লৌহে মাহফুজের) অতি সম্মানিত, উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন পাক-পবিত্র পত্রসমূহে লিপিবদ্ধ; অতি মহৎ ও মহান ফেরেশ্তা লিখকগণের হস্তে সুরক্ষিত।"

১৯৬০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং সে কোরআনের সুসংরক্ষক ও সুদক্ষ; কেয়ামতের দিন সে মহৎ ও মহান ফেরেশতা লিখকগণের তুল্য বিশেষ মর্য্যাদা লাভকারী হইবে।

আর যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং উহা তাহার পক্ষে কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে বার বার উহাকে আওড়াইতে থাকে তাহার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

১৯৬১। হাদীছ ঃ—জুন্দুব ইবনে ছুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসুস্থতা বোধ করিলেন। তাই তিনি দুই বা তিন রাত্র তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন না। (তাহাজ্জুদের মধ্যে যে, তিনি সুদীর্ঘ কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকিতেন এই দুই-তিন রাত্র তাহাও শ্রুত হইল না।) এতদ্ভিন্ন এই দুই তিন দিন ওহীবাহক জিব্রাইল ফেরেশতার আগমনও বন্ধ ছিল; (নূতন কোন ওহী-বাণী প্রচারিত হইয়া ছিল না।) এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া হযরতের প্রতিবেশিনী একটি নারী হযরতের সম্মুখে আসিয়া বলিল, হে মোহাম্মদ! আমার মনে হয়—তোমার নিকট যে ভূতটি আসিয়া থাকিত সে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুই-তিন রাত্র যাবৎ তোমার নিকট তাহার আগমনের কোন খোঁজ পাই না।

(এইরূপ কটুক্তি ও কটাক্ষ হযরতের মনে যেন আঘাত হানিতে না পারে,) তাই আল্লাহ তায়ালা স্নেহপূর্ণ ভাষায় এই ছুরাটি নাযেল করিলেন—

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ - وَمَا قَلٰى

"দিনের আলো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর শপথ—আপনার প্রভু আপনাকে ভুলেন নাই, ছাড়েন নাই এবং আপনার প্রতি বিরাগী হন নাই……।"

ব্যাখ্যা ঃ—এই নাপাক কটুক্তিকারিণী নারীটি ছিল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সর্ব্বাধিক বিদ্বেষ পোষণকারিণী হযরতের যাতায়াত পথে কাঁটা নিক্ষেপকারিণী সর্ব্ব পরিচিতা—আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে-জমীল। যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা রহিয়াছে যে, গলায় কাছি বাঁধিয়া তাহাকে ভয়ঙ্কর শিখাযুক্ত দোযখের আগুনে নিঃক্ষেপ করা হইবে। এহেন খবিস ঐরূপ বলিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

কটাক্ষের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা যে শপথ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওহী বাহক জিব্রাইলের আগমন দিবালোকের আগমন স্বরূপ এবং তাঁহার অনাগমন দিবালোকের অনাগমন তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী স্বরূপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী দৃষ্টে কেহ বলিতে পারে না, বিশ্ববাসী বিরাগভাজন হইয়া গিয়াছে, বরং দিবালোক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী উভয়টিই মানুষের পক্ষে মঙ্গল জনক।

১৯৬২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "লাম্‌ইয়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু" ছুরা তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য।

উবাই (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ। উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি রব্বুল আলামীনের দরবারে আলোচিত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি (আনন্দে) কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে পবিত্র কোরআনের বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। সম্মুখেও নং হাদীছে উল্লেখ হইবে চারজন ছাহাবী হইতে কোরআন শিক্ষা করার পরামর্শ নবী (দঃ) দিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)।

১৯৬৩। হাদীছ ঃ—পবিত্র কোরআনের আয়াত—اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ আমি আপনাকে "কাওছার" দান করিয়াছি। এই "কাওছার" সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল সমুদয় (মঙ্গল ও কল্যাণ ইত্যাদির) সুসম্পদ-ভাণ্ডার যাহা আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দান করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই বিবরণ বর্ণনাকারী সায়ীদ ইবনে জোবায়েরকে তাঁহার শাগেদ বলিল, সর্ব্বসাধারণ তো বলিয়া থাকে কাওছার হইল একটি নহর বা হাওজের নাম যাহা বেহেশতের মধ্যে আছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, ঐ হাওজটিও উক্ত সুসম্পদ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত যাহা আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে দান করিয়াছেন। (অর্থাৎ কাওছার বলিতে অনেক কিছু সম্পদই উদ্দেশ্যে; সুপ্রসিদ্ধ হাওজে-কাওছার উহারই একটি।)

১৯৬৪। **হাদীছঃ**—জির্‌র্ ইবনে আবী লুবাবাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিশিষ্ট ছাহাবী উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)কে ছুরা ক্বুল্ আউ'জু বে-রাব্বিন্নাছ ও ছুরা ক্বুল্ আউ'জু বে-রাব্বিল্ ফালাক্ব্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই প্রশ্ন আমিও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে করিয়া ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, এই দুইটি ছুরার মধ্যে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আমি যেন এই ভাবে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করি—তাহা আমি করিয়াছি।

উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) বলেন, আমরাও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মারফৎ ঐ শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারই ন্যায় আশ্রয় প্রার্থনা করিব।

ব্যাখ্যাঃ—এই হাদীছে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। অনেকে মনে করিয়া থাকে এই ছুরা দুইটির বিষয়-বস্তুর আরম্ভেই বলা হইয়াছে, "হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি প্রভু পরওয়ারদেগারের........", অতএব ইহা হযরতের ব্যক্তিগত সম্পর্কীয় বিষয়বস্তু, অন্যদের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কেন হইবে? অথচ কোরআন পাক ত সারা বিশ্ব মানবের জন্য।

এই প্রশ্নের উত্তরই আলোচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে যে, এস্থলে আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে উপস্থিত লক্ষ্যস্থল স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন এবং হযরত (দঃ) সে অনুযায়ী আশ্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐরূপ আমল করিব। যেমন উপরস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন আদেশ করা হয়, কিন্তু সেই আদেশ তাহার উপরই নিবদ্ধ থাকে না, তাহার নিম্নস্থগণও উহার আওতাভুক্ত হইয়া থাকে। এই ধরণের ভুরি ভূরি নজির কোরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোরআন শরীফের অবতরণ ও সংরক্ষণ বৃত্তান্ত

১৯৬৫। **হাদীছঃ**—আবু ওসমান (রঃ) উছামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতার আগমন

হইল* এবং তিনি হযরতের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে বলিতে পার কি ? উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বলিলেন, এই লোকটি হইল দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ছাহাবী।

উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) ঐ স্থান ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত খোদার কসম আমি ঐ আগন্তুককে দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলাম। ইত্যবসরে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ শুনিতে পাইলাম। তিনি জিব্রাইল ফেরেশতার আগমন এবং তাঁহার সংবাদ বর্ণনা করিতেছেন। তখন আমি উপলদ্ধি করিতে পারিলাম ; ঐ আগন্তুক (দেহ্ইয়া-কাল্‌বীর আকৃতিতে হইলেও তিনি) জিব্রাইল ফেরেশতা ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ফেরেশতাগণ বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিতে পারেন। অবশ্য তাঁহারা পাক পবিত্র উত্তম ও সুশ্রী আকারই ধাধণ করিয়া থাকেন। জিব্রাইল ফেরেশতা অনেক সময় ওহী নিয়া হযরতের নিকট মানুষ আকৃতিতে আসিতেন। কোন কোন সময় অপরিচিত মানুষের বেশে আসিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ছাহাবীর আকৃতিতে সর্ব্ব সমক্ষে আসিয়া ওহী পৌঁছাইয়া থাকিতেন। দেহ্ইয়া-কাল্‌বী (রাঃ) অতিশয় সুশ্রী ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

১৯৬৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের নিকটবর্ত্তী আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি বেশী ওহী পাঠাইতে ছিলেন, (এই ভাবে পবিত্র কোরআন সহ দ্বীনের সমুদয় প্রয়োজন পূর্ণ করা হইয়াছে) তারপরই রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৯৬৭। হাদীছ ঃ— পবিত্র কোরআন কোরায়েশ বংশীয় আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবুবকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোছায়লেমা-কাজ্জাবের দল—ইয়ামানস্থিত ইয়ামামাহ্ দেশবাসীর সঙ্গে মোসলমানদের জেহাদ হইয়াছিল। সেই জেহাদ সমাপ্তে খলীফা আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তথায় গিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, ওমর (রাঃ)ও সেখানে উপস্থিত আছেন। আবুবকর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওমর (রাঃ) আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, ইয়ামামার জেহাদে কোরআন রক্ষক বা কোরআনের হাফেজ বহু সংখ্যায় শহীদ হইয়া, গিয়াছেন। আমার ভয় হয়, অন্যান্য জেহাদেও কোরআনের হাফেজ এই হারে শহীদ হইলে কোরআনের অনেক অংশ আমাদের হইতে ছুটিয়া

* ঘটনাটি পর্দার বিধান প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ছিল, কিম্বা উম্মে-ছালামাহ্ (রাঃ) একই গৃহে পর্দার আড়ালে ছিলেন।

যাইতে পারে। (কারণ তখনও সাধারণতঃ কোরআন শরীফ বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত হইয়া হাফেজদের কণ্ঠস্থরূপেই রক্ষিত ছিল। একত্রিত ভাবে লিপিবদ্ধ আকারে রক্ষিত হওয়ার আবশ্যক দেখা দিয়া ছিল না।) অতএব আমার (ওমর রাঃ) পরামর্শ এই—আপনি খলীফা হিসাবে কোরআন শরীফকে লিপিবদ্ধ আকারে একত্রিত করার নির্দ্দেশ দান করুন। আমি (আবুবকর) ওমরকে বলিয়াছি, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই কাজ করিয়া যান নাই সেই কাজ কিরূপে করা যাইতে পারে? তদুত্তরে ওমর বলিলেন, কসম খোদার এই ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম হইবে—এইভাবে ওমর আমাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া আমিও চিন্তা করিলে পর আল্লাহ তায়ালা আমারও সিনা খুলিয়া দিলেন। আমিও ওমরের ন্যায় ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করিলাম।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আপনি বুদ্ধিমান যুবক, আপনার প্রতি কাহারও কোন খারাব ধারণাও নাই এবং আপনি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব আপনি পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত খুঁজিয়া বাহির করতঃ একত্রিত করুন।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—আমাকে যদি তাঁহারা একটি পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করার আদেশ করিতেন সেই আদেশও আমার নিকট অত কঠিন মনে হইত না পবিত্র কোরআন একত্রিত করার আদেশ আমার নিকট যত কঠিন মনে হইতে ছিল। আমি বলিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যে কাজ করেন নাই আপনারা সেই কাজ কিরূপে করিতে পারেন? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) পুনঃ পুনঃ বলিলেন "এই ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম" আবুবকর (রাঃ) এই কথাটি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছিলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় আমার অন্তর-দ্বারকেও খুলিয়া দিলেন ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করার জন্য। সেমতে কোরআনের আয়াত সমূহ তালাশ করিয়া একত্রিত করিতে লাগিলাম—(প্রতিটি আয়াত বহু সংখ্যক লোকের কণ্ঠস্থরূপে প্রাপ্তির সঙ্গে লিখিত আকারে পাইবার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া, বিভিন্ন লোকদের নিকট বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত—) খেজুর ডালের বাকলে, প্রস্থর খণ্ডে (চর্ম্ম খণ্ডে, অস্থি খণ্ডে, কাষ্ঠ খণ্ডে) লেখা হইতে সংগ্রহ করিলে লাগিলাম। এইভাবে সমুদয় কোরআন চয়ন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলাম। অবশ্য ছুরা তওবার শেষ অংশ—لقد جائكم رسول হইতে رب العرش العظيم পর্য্যন্ত (যাহা মৌখিকরূপে ত বহু লোকেরই স্মরণ ছিল।* কিন্তু অধিক সতর্কতা মূলক ভাবে

---

* মৌখিক কণ্ঠস্থরূপে এই আয়াত সম্পর্কে ওমর (রাঃ) ওসমান (রাঃ) এবং স্বয়ং যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ)ও সাক্ষী ছিলেন। ফতহুলবারী ৯—১২ দ্রষ্টব্য

লিখিত আকারেও পাইবার শর্ত অনুসরণ করা হইতে ছিল তাহা এই অংশে পুরা হইতে ছিল না। অবশেষে ইহাও লিখিত আকারে) পাইলাম আবু খোযায়মা আনছারী ছাহাবী নিকট। অন্য কাহারও নিকট ইহা (লিখিত আকারে) পাই নাই।

এইভাবে পবিত্র কোরআনের সমুদয় আয়াত লিপিবদ্ধ হইয়া গেল এবং ঐ লিখিত পবিত্র পাতা-পত্রগুলি তৎকালীন খলীফা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হেফাজতে ও রক্ষনাবেক্ষনে রহিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হেফাজতে রহিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার কন্যা উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়াল. আনহার হেফাজতে রহিয়াছিল।

১৯৬৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট ছাহাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) তখন ইরাক ও সিরিয়া বাসীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী "আরমিনিয়া" ও "আজারবাইজান" এলাকা অধিকার করার কাজে নিয়োগ করিয়া ছিলেন। ছাহাবী হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও সেই বাহিনীতে ছিলেন। (সেই বাহিনীর সিরিয়াবাসীগণ পবিত্র কোরআন এক ধরণের শব্দ ও উচ্চারণে পড়িত। ইরাকবাসীগণ এই অর্থেই, কিন্তু ভিন্ন শব্দ ও উচ্চারণে পড়িত। এই শাব্দিক ও উচ্চারণের বিভিন্নতায় তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত—একে অন্যের পঠনকে কোরআন বলিয়া স্বীকার করিত না। ফলে একে অন্যকে কাফের পর্য্যন্ত বলিত। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় দলের পঠিতই কোরআন ছিল এবং যে বিভিন্নতা ছিল তাহা অতি সামান্য ও স্বাভাবিক বিভিন্নতা ছিল—একই অর্থে শুধু শাব্দিক ও উচ্চারণের আঞ্চলিক বিভিন্নতা + ।) এই বিভিন্নতা লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের দরুন হোযায়ফা (রাঃ) অতিশয় বিচলিত হইলেন। মদীনায় আসিয়া প্রথমই খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! মোসলেম জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় তাহারা যেন নিজেদের আসমানী কেতাব সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হইয়া না পড়ে*।

+ ইসলামের প্রথম যুগে একই আরবী ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতার মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রসূলুল্লাহ (দঃ) লাভ করিয়া ছিলেন যাহার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

* অর্থাৎ এই বিবাদের মূল সূত্র—আরবী ভাষার গোত্রীয় বিভিন্নতায় কোরআন তেলাওয়াত যাহার অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেওয়া হইয়া ছিল; নবাগত মোসলমানদের সহজ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে। এখন সেই সুযোগের ততটা আবশ্যক নাই, অথচ উহার দ্বারা মস্ত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেছে। অতএব এখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক ধরণের আরবী ভাষা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হউক।

তাঁহার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ খলীফা ওসমান (রাঃ) (ওমর কন্যা—উম্মুল মোমেনীন) হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক সুরক্ষিত একত্রিত কোরআান পাকের পবিত্র পাতা-পত্রগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমরা উহার কতিপয় নকল বা প্রতিলিপি তৈরী করিয়া পুনরায় উহা আপনার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিব। সেমতে হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) উহা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত কার্য্য সমাধা করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে ছিলেন (পূর্ব্ব পরিচিত) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ), সায়ীদ ইবনুল আ'ছ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারেছ (রাঃ)। তাঁহারা সেই প্রথম খলীফা আবুবকরের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত পবিত্র কোরআানের কতিপয় নকল ও প্রতিলিপি তৈরী সম্পন্ন করিলেন।

(উল্লেখিত পরিষদের মধ্যে শুধু যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) মদীনাবাসী ছিলেন। অপর তিন জনই মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় ছিলেন।) খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দিলেন, একই ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতা সূত্রে কোরআানের কোন শব্দ সম্পর্কে আপনাদের মতবিরোধ হইলে উহাকে কোরায়েশদের ভাষার অনুকরণে লিখিবেন**। কারণ পবিত্র কোরআানের মূল অবতরণ কোরায়েশদের ভাষার উপরই ছিল। (পরে অন্যান্য আঞ্চলিক শাখা-ভাষায়ও পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইয়া ছিল মাত্র।)

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিলিপি তৈরী সম্পন্ন হইলে পর (ওসমান (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংগৃহীত মূল লিপি হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজ সংগৃহীত প্রতিলিপির এক এক খানা এক এক অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন+ এবং বাধ্যতামূলকভাবে একমাত্র উহার অনুকরণে পবিত্র

** ছাহাবী হোযায়ফাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযোগ দূর করনার্থে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি অমর কৃতি এই ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ কোরআানকে এক রকমের তথা কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া দিয়া ছিলেন এবং তাঁহার গঠিত পরিষদের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য ইহাই ছিল। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল না। যে স্থানে আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল সে সব স্থানে শুধু মাত্র কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষার অনুকরণ করা হইয়াছে। এইভাবে সম্পূর্ণ কোরআান কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষায় একত্রিত হইয়াছে—যাহা পবিত্র কোরআানের আসল রূপ ছিল। ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় আজ আমাদের হাতে পবিত্র কোরআানের সেই আসল রূপই সুরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবে।

+ বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় একত্রিত ভাবে সম্পূর্ণ কোরআান শরীফের সাত খানা প্রতিলিপি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং উহার একখানা রাজধানী মদিনায় রাখিয়া ছয় খানা যথাক্রমে মক্কা, সিরিয়া, বাহ্‌রাইন, বছ্‌রা এবং কুফায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কোরআন তেলাওয়াতের নির্দ্দেশ দান করিলেন। তৎসঙ্গে এই নির্দ্দেশও দিলেন যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা-ভাষায় লিখিত কোরআন যাহার নিকট যাহা আছে (উহা রহিত হইয়া যাওয়ায় উহার অমর্যাদা যেন না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা স্বরূপ) উহা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলা হউক।*

(পবিত্র কোরআন একত্রিতরূপে সংগ্রহের এই দ্বিতীয় অভিযানে প্রথম খলীফার সঙ্কলিত প্রতিলিপিকে আসল ও মূল হিসাবে সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। ঐ সঙ্কলনে প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের উপর অধিক সতর্কতা হিসাবে লিখিত সাক্ষ্যের শর্ত্তও অনুসরণ করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই দ্বিতীয় অভিযানেও প্রথম সঙ্কলনের প্রতিলিপির উপর পুনরায় প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষী সহ লিখিত সাক্ষ্যের শর্ত্ত অনুসরণ করা হইল। এই সম্পর্কেই) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এইবার ছুরা আহ্‌যাবের একটি আয়াত (লিখিত রূপে) কাহারও নিকট পাইতে ছিলাম না :—رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

এই আয়াতটি স্বয়ং আমারই স্পষ্টরূপে স্মরণ ছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে ইহা তেলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু উপস্থিত (লিখিত আকারে) কাহারও নিকট পাইতে ছিলাম না। অবশেষে এই আয়াতটিও খোজায়মা ইবনে ছাবেত+ আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর নিকট (লিখিত) পাইলাম।

---

* আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রতিলিপিটি তখনও মদীনায় উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট রক্ষিত ছিল। পরে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসনকালে মদীনার শাসনকর্ত্তা মারওয়ান ঐ প্রতিলিপি হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) উহা তাহাকে দেন নাই। হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট উহা ছিল। শাসনকর্ত্তা মারওয়ান পুনরায় তাঁহার নিকটও চাহিলেন। সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ প্রতিলিপিখানা মারওয়ানের হাতে অর্পণ করিলেন। মারওয়ান উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, পরবর্ত্তীকালে যেন ইহার দ্বারা কোন বিবাদের সৃষ্টি না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইল। (ফতহুলবারী ৯×১৬)

\+ এই ছাহাবী "দুই সাক্ষী" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশেষ একটি ঘটনার উপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্যের ঘোষণা দিয়া ছিলেন যে, "কোন ব্যক্তির পক্ষে খোজায়মা সাক্ষ্য দিলে তাহা যথেষ্ট গণ্য হইবে।" অর্থাৎ দুইজন সাক্ষী ব্যতীত কোন দাবী প্রমাণিত হইতে পারে না। এই হইল শরীয়তের আইন ও বিধান, কিন্তু খোজায়মা (রাঃ) যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিবে সেখানে তাহার একার সাক্ষ্যই দুইজনের সাক্ষ্যের ন্যায় পরিগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—পবিত্র কোরআান নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ব্যবস্থাবলে অলৌকিকভাবে অবিস্মৃতরূপে উহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়া যাইত—মুখস্থ হইয়া যাইত যাহার ঘোষনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের দুই স্থানে প্রদান করিয়াছেন—

(১) ২৯ পারা ছুরা কেয়ামাহ্—إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ...... "নিশ্চয় আমার জিম্মায় রহিয়াছে এই কোরআান আপনার হৃদয়ে সমাবেশ করিয়া দেওয়া এবং উহাকে আপনার মুখে পড়াইয়া দেওয়া। অতএব আমি (অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে জিব্রাইল) যখন উহা আপনাকে পড়িয়া শুনাই, তখন আপনি শুধু শুনিয়া থাকিবেন।" এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ৩০ পারা ছুরা আ'লা—سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ "আমি আপনাকে কোরআান এমন ভাবে পড়াইয়া দিব যে, আপনি আর উহা ভুলিবেন না।"

কোরআান নাযেলকারী স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পর আর কোন প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শত শত হাজার হাজার মোসলমান কোরআনের আয়াত সমূহ মুখস্থ করিয়া লইতেন। পবিত্র কোরআানের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে এইভাবে শত শত হাজার হাজার সাক্ষী তৈয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রতিটি আয়াত লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও সুসম্পন্ন ছিল। কোরআান নাযেল হওয়ার প্রথম দিক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ওহী লেখার জন্য সুদক্ষ লেখক ছাহাবীগণ নিয়োজিত ছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী এস্থলেই একটি পরিচ্ছেদও উল্লেখ করিয়াছেন এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত ছাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হিজরতের পর তিনিই অধিকাংশ সময় এই কাজ সমাধা করিয়া থাকিতেন। তাই তাঁহার নাম ওহীলেখকরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। ফতহুলবারী ৯—১৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে ওহীলেখক বারজনের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। আবু দাউদ ও নাছায়ী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, একই সঙ্গে একাধিক ছুরার আয়াত সমূহ নাযেল হইতে থাকায় কোন আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন একজন ওহী লেখককে ডাকিয়া উক্ত আয়াত লিখিবার জন্য ছুরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক পবিত্র কোরআান লিপিবদ্ধ রাখা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত ছিল। সে মতে হযরত (দঃ) ঐ সময় কোরআান ভিন্ন অন্য কিছু, এমনকি তাঁহার হাদীছ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করিয়া ছিলেন যেন কোরআনের সঙ্গে অন্য কিছু মিশ্রিত হইয়া না যায়। এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফেও একটি হাদীছ উল্লেখ আছে।

এইভাবে বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণ কোরআনই স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু উহা একত্রিত বিন্যস্ত ছিল না। খেজুর ডালার বাকলে, প্রস্থর খণ্ডে, চর্ম্ম খণ্ডে এবং হাড় ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নরূপে লিখিত ছিল, উহা হইতেই মুখস্থ ও কণ্ঠস্থরূপে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পবিত্র কোরআন সুরক্ষিত ছিল। পবিত্র কোরআনের লিপিবদ্ধ আকারের মধ্যে একটু মাত্র অসম্পূর্ণতা ছিল যে, উহা বিচ্ছিন্ন আকারে ছিল—একত্রিত ছিল না। সেই অসম্পূর্ণতাটুকু দুর করার জন্যই ছিল প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযান। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর হযরতেরই জমানায় লিখিত বিচ্ছিন্ন খণ্ড সমূহকে মূল-ধন করিয়া প্রথমে খলীফা আবুবকর (রাঃ) এবং পুনরায় খলীফা ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্ব্বাধিকারী স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বা খলীফাতুল মোছলেমীনের বিশেষ তত্ত্বাবধানে একে একে—দুইবার শত শত হাজার হাজার মৌখিক সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সাক্ষ্যের সহিত প্রমাণিতরূপে যে ভাবে পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াতকে সংগ্রহ করা হইয়াছে ইহার নজীর বিশ্বের কোন জাতি তাহাদের কোন কেতাব সম্পর্কে পেশ করিতে পারিবে না। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালার যে ওয়াদা ছিল—إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমিই নাযেল করিয়াছি এই নছীহত নামা কোরআনকে এবং অবশ্য অবশ্য আমি ইহা সুরক্ষনের ব্যবস্থা করিবই।" আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁহার সেই পবিত্র ওয়াদাকেই প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং আজও সেই ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহা বহাল থাকিবে।

পবিত্র কোরআন সঙ্কলন ও সংগ্রহের দুইটি অভিযানে কতিপয় বিষয়ের পার্থক্য ছিল—প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ কোরআনকে একত্রে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত করিয়া নেওয়া; কালক্রমে যেন উহার একটি অক্ষরও বিস্মৃত হইয়া যাওয়ার অবকাশ না থাকে। তাই উহার পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সঙ্কলনে প্রতিটি ছুরাকে সুবিন্যস্ত আকারে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন লেখা হইয়াছিল, কিন্তু পরস্পর ছুরাসমূহের তরতীব ও বিন্যাসন—যে, কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল না। এতদ্ভিন্ন আরবী ভাষায় আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতার দিক দিয়াও নির্দ্দিষ্টরূপে শুধু কোরায়েশ গোত্রীয় শাখা-ভাষার অনুসরণ করা হইয়া ছিল না। উপস্থিত ক্ষেত্রে যেই আয়াত যেই শব্দ ও উচ্চারণে সম্মুখে আসিয়াছে ঐ আকারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্যও নিজ

নিজ কায়দা ও উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি বহাল ছিল, তাই ঐ সঙ্কলনের প্রতিলিপি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের আবশ্যকও দেখা দিয়া ছিল না। কারণ সে কালে সকল মানুষই কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়ায় অভ্যস্ত ছিল।

তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানতমঃ বিষয় ছিল—সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ একমাত্র কোরায়েশ গোত্রীয় আরবী ভাষার উপর স্থাপিত করা। পবিত্র কোরআন একমাত্র মক্কাবাসী কোরায়েশ গোত্রীয় আরবী ভাষায় নাযেল হইয়াছিল বটে, কিন্তু আরবী ভাষার মধ্যেই কোন কোন শব্দ উচ্চারণের বা কোন কোন অর্থের জন্য শব্দের বা কোন কোন বিষয় বুঝাইবার কায়দায় আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতা ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবাগত মোসলমানদের সুযোগ দানার্থে কোরআন তেলাওয়াত করার মধ্যে সেই বিভিন্নতা বজায় রাখার অনুমতি ছিল। এমনকি জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে কোরআন লিপিবদ্ধ করিলে, সেই বিভিন্নতার উপরই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিত।

শুধু মাত্র সুযোগ-সুবিধা জনিত উক্ত অনুমতির আবশ্যকতা পরে শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তদুপরি কালক্রমে উহার দ্বারা নানা রকম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার দ্বার প্রশস্ত হইতে ছিল যাহা দৃষ্টে প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী হোযায়ফাহ্ (রাঃ) উহা প্রতিরোধের প্রতি তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। সেই মতে খলীফা হিসাবে ওসমান (রাঃ) উহার জন্য অভিযান চালাইলেন এবং এই ব্যাপারে লক্ষাধিক ছাহাবীর মধ্যে কেহই দ্বিমত প্রকাশ করেন নাই। এই অভিযানের ফলে পবিত্র কোরআন তাহার আসল রূপ তথা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় ভাষায় নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং শুধুমাত্র একজন ব্যতীত সমস্ত ছাহাবী বরং তৎকালীন সমস্ত মোসলমানের ঐক্যমতে তৃতীয় খলীফার আদেশক্রমে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তেলাওয়াতের সুযোগ রহিত হইয়া গেল।+

+ এস্থলে বর্ত্তমানে প্রচলিত কেরাতে-সাব্‌য়া বা সাত কেরাত, বরং ততোধিক বিভিন্ন কেরাত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এই বিভিন্নতার সূত্র কি? যদি আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতা বলা হয়, তবে ত উহা তৃতীয় খলীফার যুগেই রহিত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় উহা আসিল কোথা হইতে? উত্তর এই যে, সাত বা ততোধিক কেরাতের বিভিন্নতা মূলতঃ আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতারই এক অবশিষ্টাংশ।

পবিত্র কোরআনকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার রূপ দান খলীফা ওসমানের যুগে রহিত হইয়া গেলেও শুধু উচ্চারণ শ্রেণীর বিভিন্নতা যাহা সাধারণতঃ লেখারমধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে না, যেমন পানিকে এক অঞ্চলের লোকগণ "হানি" বলিয়া থাকে, কিন্তু লেখায় তাহারাও "পানি" লেখে। ঐ ধরণের মামুলী বিভিন্নতা তখন এবং তৎপরেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। তাহাই বিভিন্ন কেরাত নামে প্রচলিত হইয়াছে।

এই অভিযানে দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল ছুরা সমূহের তরতীব বা বিন্যাসন। পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়া কালে উহার মূল বিন্যাসনের উপর নাযেল হইয়াছিল না, বরং আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক আয়াত ও ছুরা নাযেল হইতে থাকিত। লোকদের মধ্যেও পবিত্র কোরআন ঐ বিচ্ছিন্নরূপেই প্রচলিত ছিল। পরস্পর ছুরা সমূহের বিন্যাসনের বাধ্য-বাধকতা ছিল না। খলীফা ওসমান (রাঃ) দলীল-প্রমাণ, আকার-ইঙ্গিত দ্বারা মূল বিন্যাসনের যতটুকু খোঁজ লাগাইতে পারিয়া ছিলেন সেই মতে ছুরা সমূহকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত দুইটি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া সকল মোসলমানগণকে একমাত্র উহারই অনুসরণকারী বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন। সেমতে তিনি পবিত্র কোরআনের এই সঙ্কলনের প্রতিলিপি দেশে দেশে পাঠাইবারও ব্যবস্থা করিলেন।

ছুরাসমূহের বিন্যস্ততার সহিত এক রকম ভাষার উপর সমগ্র কোরআনকে একত্রিত—এক কেতাব আকারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার প্রচেষ্টা প্রথম খলীফা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে ছিল না। তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে ছিল। তাই তিনিই সর্ব্বসাধারণ্যে জামেউল-কোরআন—কোরআন একত্রকারী আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১৯৬৯। হাদীছ ঃ– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) আমাকে কোরআন পড়াইয়াছেন একই রকম ভাষার উপর। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি, (আল্লার তরফ হইতে) অধিক সুযোগ প্রদানের ; তাহা তিনি করিয়াছেন। এমনকি (আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতায় আরবী ভাষার সংখ্যাগুরু) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাত প্রকার শাখা-ভাষার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দিয়াছেন।

১৯৭০। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশারই ঘটনা। একদা আমি হেশাম নামক এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে ছুরা ফোরকান পড়িতে শুনিলাম এবং লক্ষ্য করিলাম, সে উহার কতিপয় শব্দ এমন উচ্চারণে পড়িতেছে যাহা ভিন্ন ধরণের। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে যেরূপ পড়াইয়াছেন উহার ব্যতিক্রম। তাই আমার ভিতরে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি হইল যে, তাহার নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিবার ইচ্ছা আমার হইল। কিন্তু অতি কষ্টে আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম। যখন সে নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইল তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে বক্ষস্থলের চাদরে জড়াইয়া ধরিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছুরা তোমাকে কে পড়াইয়াছে ? সে বলিল, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পড়াইয়াছেন। আমি বলিলাম, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ছুরা আমাকে পড়াইয়াছেন তোমার পড়া ত সেইরূপ নহে। অতঃপর আমি তাহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ধরিয়া লইয়া গেলাম এবং হযরত (দঃ)কে ঘটনা জানাইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে বলিলেন, তুমি ছুরা ফোরকান পড় ত দেখি! সে তখনও ঐরূপই পড়িল যেরূপ পড়িতে আমি শুনিয়াছিলাম। তাহার পড়া শ্রবণান্তে হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ভাবেও নাযেল হইয়াছে। অত.পর হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে ওমর! তুমি পড় ত দেখি! তখন আমি ঐরূপ পড়িলাম যেরূপ হযরত (দঃ) আমাকে পড়াইয়া ছিলেন। হযরত (দঃ) এইবারও বলিলেন, কোরআন এই ভাবেও নাযেল হইয়াছে। নিশ্চয় কোরআন সাত প্রকার ভাষায় (পাঠ করার সুযোগের সহিত) নাযেল হইয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ সহজ পন্থায় পড়িতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ— ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) কোরআন শরীফ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যেই আকারে পৌঁছাইয়া ছিলেন তাহা একমাত্র মক্কাবাসী কোরায়েশ গোত্রীর ভাষাই ছিল। কিন্তু ঐ সময় হযরত (দঃ) আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন কায়দার আরবী ভাষায় তেলাওয়াত করার অনুমতিও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতেই জিব্রাইলেরই মাধ্যমে লাভ করিয়া ছিলেন। এমনকি প্রসিদ্ধ ও সংখ্যাগুরু হিসাবে সাতের অঙ্ক উল্লেখ হইয়া থাকিলেও উক্ত সুযোগ ও অনুমতি সাতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। মূল কোরআন নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার সেই অনুমতিকে নাযেল হওয়া বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআনের মূলভাষা কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষা বাধ্যতা মূলক করিয়া দিয়া ছিলেন। সমস্ত ছাহাবীগণ তাঁহার এই ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন; সুতরাং ছাহাবীগণের এজমা' অনুযায়ী আরবী ভাষারই অন্য গোত্রীয় কায়দায় পাঠ করা মনছুখ বা রহিত হইয়া উহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য একই ভাষায় গোত্রীয় বিভিন্নতা দুই রকম হয়—মূল শব্দের বিভিন্নতা, যথা—একই ব্যঞ্জনকে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে "ডাটা" "ডেঙ্গা" ও "মাইরা" বলা হয়। আর এক হয় শুধু উচ্চারণের বিভিন্নতা; যথা—পানি, পান ইত্যাদিকে অঞ্চল বিশেষে হানি, হান বলা হয়। আরবী ভাষায়ও উভয় প্রকারের বিভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ছাহাবীগণের এজমা দ্বারা প্রথম প্রকারের বিভিন্নতা কোরআন শরীফে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বিভিন্নতার অবকাশ থাকিয়া যায়। কারণ, উহা লেখায় আসে না। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় প্রকার বিভিন্নতাই "সাত কেরাৎ" রূপে প্রচলিত আছে!

১৯৭১। হাদীছ ঃ—ইউসুফ ইবনে মাহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় ইরাকবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হে উম্মুল-মোমেনীন! আপনার কোরআন শরীফখানা আমাকে একটু দেখাইবেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্য? সে বলিল উহার তরতীব বা বিন্যাসন অনুযায়ী আমার কোরআনখানা বিন্যস্ত করিব। লোকেরা কোরআনের মধ্যে কোনরূপ বিন্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য করে না। আয়েশা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, কোরআনের ছুরা সমূহ তোমার ইচ্ছা মত আগে পিছে পড়িতে পার—ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

প্রথম দিকে কোরআনের ঐ শ্রেণীর ছুরা সমূহ নাযেল হইয়াছিল যাহাতে বেহেশত-দোযখের বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ সব বর্ণনায় লোকগণ অভিভূত হইয়া ইসলামের ছায়াতলে দৌড়িয়া আসিয়াছে। তারপর হালাল-হারামের বিধি-বিধান সমূহ নাযেল হইয়াছে। প্রথমেই যদি এই বিধান নাযেল হইত যে, মদ পান করিতে পারিবে না তবে লোকগণ বলিত, আমরা ত মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি নাযেল হইত, জেনা করিতে পারিবে না, তবে লোকগণ বলিত, আমরা জেনার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিব না (—এইভাবে লোকগণ ইসলাম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইত। তাই উল্লেখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বেহেশত-দোযখের বিবরণপূর্ণ ছুরা সমূহ প্রথমে নাযেল করা হইয়াছিল।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি যখন খেলা-ধূলায় অভ্যস্ত কম বয়স্কা মেয়ে, তখন মক্কা নগরীতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

“(কাফের দলকে সমুচিত শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া হয় না, বরং তাহাদের সমুচিত শাস্তির জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল পরকাল এবং পরকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ভীতিপূর্ণ দৃশ্য হইবে”) (২৭ পারা ছুরা ক্বামার)। অতঃপর হালাল-হারাম ইত্যাদি বিধি-বিধান সম্বলিত ছুরা বাক্বারাহ ও ছুরা নেছা ইত্যাদি নাযেল হইয়াছে যখন মদীনায় আমি হযরতের গৃহিণী হইয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) ঐ কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কোরআন শরীফের ছুরা সমূহের অবতরণ তরতীব ও বিন্যাসনের সহিত ছিল না, উপস্থিত প্রয়োজন অনুপাতে নাযেল হইত। সুতরাং অবতরণের মধ্যে যখন কোন নির্দ্দিষ্ট তরতীব ছিল না, তখন তেলাওয়াতের মধ্যেও তরতীবের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

প্রথম দিক দিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার এই মতামত ছিল। কিন্তু ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফৎকালে যথা সাধ্য দলীল প্রমাণ ও আকার-ইঙ্গিত দ্বারা

পবিত্র কোরআনের মূল তরতীবের খোঁজ করা হইয়াছে এবং সে অনুপাতে ছুরা সমূহের তরতীব নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অতএব উহার অনুসরণ করা উচিত।

ছাহাবীগণের মধ্যে বিশিষ্ট ক্বারী

১৯৭২। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) একদা আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, তাঁহাকে ঐ দিন হইতে আমি অত্যধিক ভাল বাসি, যে দিন নবী (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, "চার জনের নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা করিতে তৎপর হও—(১) আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (২) সালেম (৩) মোয়াজ ইবনে জাবাল (৪) উবাই ইবনে কা'য়াব।"

১৯৭৩। হাদীছ ঃ—একদা আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁহার ভাষণে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সত্তরের অধিক সংখ্যক ছুরা স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছি।

১৯৭৪। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ—যিনি একমাত্র মাবুদ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, পবিত্র কোরআনের প্রতিটি ছুরা সম্পর্কে আমি অবগত আছি যে, উহা কোথায় নাযেল হইয়াছে, কি বিষয়ে নাযেল হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও এখনও যদি আমি জানিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কোন বিষয় আমার চেয়ে বেশী জানেন এবং তাঁহার নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট পৌঁছিব।

১৯৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় চার জান ছাহাবী পূর্ণ কোরআন সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মদীনাবাসী—(১) উবাই ইবনে কায়া'ব (২) মোয়াজ ইবনে জাবাল (৩) যায়েদ ইবনে ছাবেত (৪) আবু যায়েদ।

কতিপয় বিশেষ আয়াতের ফজিলত

১৯৭৬। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত রাত্রি বেলা তেলাওয়াত করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আখেরাতের দিক দিয়া এইরূপ যথেষ্ট হইবে যে, রাত্রি বেলা অন্য কোন এবাদৎ না করিলেও সে প্রভু-ভোলা ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইবে না। দুনিয়ার দিক দিয়া এইরূপ যে, ঐ রাত্রে সে বালা-মছিবৎ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে।

১৯৭৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারে রমজান শরীফের দান-খয়রাত ও ছদকায়ে-ফেৎর ইত্যাদির খুরমা-খেজুর যাহা জমা হইয়াছিল উহা পাহারা দেওয়ার কাজে হযরত

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে নিয়োগ করিলেন। একদা রাত্রি বেলা এক আগন্তুক আসিয়া উহা হইতে তাহার বস্তা ভর্ত্তি করা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে আমাকে অনুনয় বিনয় ভাবে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি বড় দরিদ্র। অথচ পরিবার পরিজনের খরচ ও বিভিন্ন প্রয়োজনাদি অনেক বেশী। তাহার কাতরতা দেখিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রে যে তুমি আসামী ধরিয়াছিলে তাহার ব্যাপার কি হইল ? আমি বলিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ ! তাহার সন্তান-সন্ততি ও ক্ষয়-খরচ অনেক বেশী, অথচ দরিদ্র—এই কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাহার প্রতি দয়া হইয়াছে। সে বলিয়াছে, আর আসিবে না, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, সে পুনরায় আসিবে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম, নিশ্চয় সে পুনরায় আসিবে। কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) সংবাদ দিয়াছেন যে, সে পুনঃ আসিবে। সেমতে আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। রাত্রিবেলা সে আসিয়া ঐরূপেই তাহার বস্তা ভর্ত্তি করা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। আজও সে ঐরূপ কাতরতার সহিত অনুরোধ করিল এবং বলিল, আমাকে আজ ছাড়িয়া দিন, আমি আর আসিব না। তাহার কথায় আমার অন্তরে তাহার প্রতি দয়া আসিল ; আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ভোর হইলে পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে পূর্ব্বরূপ কথোপকথন হইল। আজও হযরত (দঃ) বলিলেন, সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, পুনরায় সে আসিবে। এই বারও আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। বাস্তবিকই সে রাত্রিবেলা আসিয়া বস্তা ভর্ত্তি আরম্ভ করিল। এইবার আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব ; তুমি প্রত্যেকবারই অঙ্গিকার কর আসিবে না ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ আস। এইবার সে বলিল, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন ; আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিব যাহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উপকৃত করিবেন। আমি উহা জানিতে চাহিলে সে বলিল, যখন বিছানার উপর শয়ন করিবেন তখন "আয়াতুল-কুরছী" প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবেন। তা হইলে সারা রাত্র আপনার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন পাহারাদার নিযুক্ত থাকিবে এবং কোন জ্বিন-ভূত আপনার কাছেও আসিতে পারিবে না। এইবারও আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ছাহাবীগণ ছিলেনই এইরূপ যে, ভাল কথার প্রতি তাঁহারা অতিশয় আগ্রহশীল ও শ্রদ্ধাবান হইতেন।

এবারের বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণান্তে নবী (দঃ) বলিলেন, সে তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত সে মিথ্যুক। হে আবু হোরায়রা! তুমি জান কি তিন দিন যাবৎ কাহার সঙ্গে তোমার ঘটনা ঘটিতেছে? আবু হোরায়রা বলিলেন না। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ছিল শয়তান (শ্রেণীর একটি জ্বিন।)

১৯৭৮। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি ছুরা কাহাফ তেলাওয়াত করিতে ছিল। তাঁহার অদূরেই একটি উত্তম ঘোড়া উহার লাগামের দুই দিকে দুইটি দড়ি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমতাবস্থায় বড় মেঘ খণ্ডের ন্যায় একটি বস্তু তাহার মাথার উপর আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; তাহাতে তাহার ঘোড়াটি লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। ঐ ব্যক্তি (ঘাবড়াইয়া) বিপদ মুক্তির দোয়া-দরূদ পড়িল। সকালবেলা সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে উৎসাহ প্রদান করতঃ বলিলেন, উহা ত শান্তিবাহক ফেরেশতাদের দল ছিল যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াতের দরুণ তোমার নিকটে আসিয়া ছিলেন।

১৯৭৯। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে তাহাজ্জুদের সময় ক্কুলহু-আল্লাহ ছুরা বারংবার পাঠ করিতে শুনিল। ভোর বেলা সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ ঘটনা শুনাইল; সে যেন ক্কুলহু-আল্লাহ ছুরাটিকে সামান্য বস্তু মনে করিতে ছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ছুরাটি পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ (সমতুল্য)।

১৯৮০। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ছাহাবীগণকে বলিলেন, প্রতি রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করার সামর্থ্য তোমাদের আছে কি? সকলেই উহাকে কঠিন মনে করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে যে, এই কাজ করিতে পারিবে? হযরত (দঃ) তখন বলিলেন, ছুরা ক্কুলহু-আল্লাহু তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান।

১৯৮১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি শয়নের পূর্ব্বক্ষণে বিছানায় বসিয়া ছুরা ক্কুলহু-আল্লাহ, ক্কুল-আউজু বে-রাব্বিল-ফালাক্ ও ক্কুল-আউজু বে-রাব্বিন-নাছ পাঠ করতঃ হস্তদ্বয়কে (মোনাজাত করার ন্যায়) একত্রিত করিয়া উহাতে ফুঁক দিতেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা যথা সম্ভব সর্ব্ব শরীর মুছিতেন—মাথা এবং মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখ দিক প্রথমে মুছিতেন। এইভাবে তিন বার করিতেন।

১৯৮২। হাদীছ :—উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাত্রি বেলা তিনি ছুরা বাকারাহ তেলাওয়াত করিতে ছিলেন, তাঁহার

ঘোড়াটি নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাঁধা ছিল, হঠাৎ উহা লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। তিনি কিছু সময় তেলাওয়াত বন্ধ রাখিলেন, ঘোড়াটিও ক্ষান্ত রহিল। অতঃপর তিনি পুনরায় তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন, ঘোড়াটিও পুনরায় ঐরূপ করা আরম্ভ করিল, আবার তিনি তেলাওয়াত ক্ষান্ত করিলেন ঘোড়াটিও ক্ষান্ত রহিল, পুনরায় তিনি তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন ঘোড়াটিও ঐরূপ করা আরম্ভ করিল। এইবার তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করতঃ তথা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কারণ ঘোড়াটির অনতিদূরেই তাঁহার শিশু পুত্র ইয়াহ্ইয়া শায়িত ছিল। তাঁহার আশঙ্কা হইল, ঘোড়াটি লাফাইয়া তাহার উপর পতিত হয় নাকি! তাই ছেলেটিকে তথা হইতে সরাইয়া নিয়া আসিলেন। তখন তিনি উর্দ্ধ দিকে তাকাইয়া একটি মেঘ খণ্ডের ন্যায় দেখিতে পাইলেন যাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপের ন্যায় অনেকগুলি আলো ঝলমল করিতেছে এবং উহা উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে, এমনকি কিছু সময়ের মধ্যে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ভোর বেলা তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কলিলেন, তুমি জান উহা কি ছিল? তিনি বলিলেন, না। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ছিল ফেরেশতাগণের একটি জামাত যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিবার জন্য উহার নিকটে আসিয়া ছিলেন। তুমি যদি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকিতে তবে তাঁহারাও ভোর পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। এমনকি জন সাধারণও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত।

১৯৮৩। হাদীছঃ— শাদ্দাদ ইবনে মা'ক্কেল (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রচলিত কোরআন শরীফে যতটুকু আল্লার কালাম রহিয়াছে হযরত নবী (দঃ) উহা ভিন্ন আল্লার কালাম আরও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন কি? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন না—প্রচলিত কোরআন শরীফ ব্যতীত আল্লার কালামরূপে আর কিছু রাখিয়া যান নাই।

(আলী রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এক পুত্র-) মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকটও উক্ত প্রশ্ন করা হইলে তিনিও বলিলেন, না—প্রচলিত কোরআন শরীফ ব্যতীত আর কোন আল্লার কালাম হযরত (দঃ) রাখিয়া যান নাই।

ব্যাখ্যাঃ—এক দিকে শিয়া সম্প্রদায়, অপর দিকে ভণ্ড ফকির দল গুজব রটাইয়া থাকে, নব্বই হাজার কালাম হইতে অল্প সংখ্যাক কোরআনরূপে প্রচলিত হইয়াছে যাহা যাহেরী আলেমগণ পাইয়াছেন। অবশিষ্ট কালামগুলি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মারফৎ ছিনা-ব-ছিনা বাতেনী ভাবে ফকিরদের বা শিয়াদের নিকট পৌঁছিয়াছে। উল্লেখিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীর গুজবের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ।

কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

১৯৮৪। হাদীছ ঃ— আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মোমেন ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআন অনুযায়ী আমল করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল কমলা লেবু যাহার স্বাদও ভাল গন্ধও ভাল। আর যে মোমেন কোরআন তেলাওয়াত করে না, অবশ্য তদনুযায়ী আমল করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল খুরমা-খেজুর যাহার স্বাদ ভাল, কিন্তু উহার কোন সুগন্ধি নাই। আর যে (ঈমানহীন) মোনাফেক বা (আমলহীন) ফাছেক-ফাজের কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত হইল "রাইহানাহ্" * যাহার সুগন্ধি আছে, কিন্তু স্বাদে তিক্ত। আর যেই মোনাফেক বা ফাছেক-ফাজের কোরআন তেলাওয়াত করে না তাহার দৃষ্টান্ত মাকাল ফল যাহা দুর্গন্ধময়, তিক্ত এবং বিস্বাদও বটে।

১৯৮৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নবী প্রকাশ্য স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করিলে আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতি যত দুর আকৃষ্ট হন অন্য কোন বস্তুর প্রতি তত দূর আকৃষ্ট হন না।

১৯৮৬। হাদীছ ঃ— عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلَى اِثْنَتَيْنِ
رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالًا
فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ-

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আকাঙ্খা করার মত গুণ দুনিয়াতে দুইটিই আছে। একটি হইল—ঐ ব্যক্তির গুণ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শিক্ষার সুযোগ দিয়াছেন, সে কোরআন শিক্ষা করিয়াছেন এবং নিশিথে সে (মাবুদের দরবারে) দাঁড়াইয়া (নামাযে) কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়। দ্বিতীয়টি হইল—ঐ ব্যক্তির গুণ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে দিবা-রাত্র উহা দান-খয়রাত করিয়া থাকে।

---

* "রাইহানাহ্" এক প্রকার তিক্ত ঘাস যাহার সুগন্ধি আছে, কিন্তু তিক্ত। যেমন, আতর সুগন্ধময় বটে, কিন্তু তিক্ত।

১৯৮৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ

عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَّهُ

فَقَالَ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ

اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهٗ فِى الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ

مَا اُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াতে আকাঙ্খা করার মত বস্তু একমাত্র দুইটিই। একটি হইল—আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে কোরআন শিক্ষা করার সুযোগ দিয়াছেন এবং সে দিবা-রাত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকে। তাহার প্রতিবেশী তাহার আমল দেখিয়া বাসনা ও আগ্রহ করিয়া থাকে যে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় কোরআন দৌলত আমারও লাভ হয় এবং আমিও তাহার ন্যায় আমল করি। দ্বিতীয়টি হইল—আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে ধন-দৌলত দান করিয়াছেন এবং সে উহা সৎপথে নেক কাজে অকাতরে খরচ করিয়া থাকে। তাহাকে দেখিয়া অন্য লোক আকাঙ্খা ও আগ্রহ করে যে, তাহার ন্যায় ধন-দৌলত আমারও লাভ হয় আমিও ঐরূপ আমল করি।

সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়

১৯৮৮। হাদীছ :— عن عثمان رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ -

অর্থ—ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে কোরআন শিক্ষা দেয়।

কোরআন স্মরণ রাখায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা

১৯৮৯। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ

صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَ ۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআনকে স্বীয় হৃদয়পটে আবদ্ধ রাখিতে চায় তাহার অবস্থা ঐ উটের মালিকের ন্যায় যে স্বীয় উটকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চায়। উটের মালিক যদি সর্ব্বদা উহার বন্ধনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবেই উহাকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে। আর যদি সে উহার প্রতি দৃষ্টি না রাখে, তবে (যে কোন সময় উট বন্ধন ছিন্ন করিয়া) চলিয়া যাইবে।

(তদ্রূপ কোরআন শিক্ষা করিয়া যদি সর্ব্বদা উহার চর্চ্চা করতঃ উহাকে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলে তবেই কোরআন তাহার আয়ত্তে থাকিবে অন্যথায় সে কোরআনকে হারাইয়া বসিবে।)

১৯৯০। হাদীছঃ— عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يَّقُوْلَ نَسِيْتُ

اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّىَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ اَشَدُّ تَفَصِّيًا

مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ ۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে ইহা বড়ই জঘন্য কথা যে, সে (তাহার নিজ ক্রটিতে কোরআন ভুলিয়া যায় এবং) বলে—আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য তাহার নিজ ক্রটিতে নয়, বরং অন্য কোন কিছু (ওজর বা প্রতিবন্ধক—যেমন দীর্ঘ দিনের রোগ বা অতিশয় বার্দ্ধক্য ইত্যাদি) যদি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে বাধ্য করে তবে তাহা সতন্ত্র কথা। সুতরাং কোরআনকে স্মরণ রাখার প্রতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক, (অন্যথায় তোমাকে উল্লেখিত অশুভ জঘন্য উক্তিকারী—হইতে হইবে;) কারণ (অবহেলার দরুণ) কোরআন মানুষের হৃদয় পট হইতে এত দ্রুত ছুটিয়া যায় যে, জঙ্গলী পশুও এত দ্রুত মানুষের হাত হইতে পলায়ন করে না।

১৯৯১। হাদীছঃ— عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ

نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْاِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا ۔

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোরআন চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ রাখিও। খোদার কসম—উট উহার বন্ধন মুক্ত হইলে যত দ্রুত সরিয়া পড়ে, কোরআন তদপেক্ষা দ্রুত হাত-ছাড়া হইয়া যায় (যদি উহা আবদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাকে।)

শিশুদিগকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া

১৯৯২। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় আমি দশ বৎসর বয়সেই পবিত্র কোরআনের শেষ দিকের যে অংশকে "মোফাচ্ছাল" বলে—সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করিয়া ছিলাম।

কোরআন শরীফ ভুলিয়া যাওয়া

অনেক আলেমের মতে কোরআন শরীফ ভুলিয়া থাকা কবিরা গোনাহ। (ফতহুল বারী)

কোরআন শরীফের কোন অংশ ভুলিয়া গিয়া থাকিলে উহা অবশ্যই স্মরণ করিতে তৎপর হইবে।

১৯৯৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রি বেলা (তাহাজ্জোদ নামাযের সময়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তির কোরআন শরীফ পড়া শুনিলেন। হযরত (দঃ) তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিয়া বলিলেন, অমুক ছুরার এই এই আয়াত আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; এই ব্যক্তি তাহা আমার স্মরণে আনিয়া দিয়াছে।

পরিষ্কাররূপে খোশ-লেহানে কোরআন পড়া

১৯৯৪। হাদীছ ঃ—কাতাদাহ্ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্বেরাত কি ধরণের ছিল ? তিনি বলিলেন, হযরতের ক্বেরাত (স্থানে স্থানে) লম্বা টান্ যুক্ত ছিল (—যে স্থানে লম্বা টানের অক্ষর থাকিত সেখানে তিনি উহার যথাযথ নিয়ম রক্ষা করিয়া পাঠ করিতেন।) অতঃপর আনাছ (রাঃ) হযরতের ক্বেরাতের নমুনা স্বরূপ বিস্‌মিল্লা···হির্‌-রাহ্‌মা···নির-রাহী···ম্ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন (এবং তিনি মিল্লা···রাহমা···ও রাহী···কে টানিয়া লম্বা করিয়া পড়িলেন।)

১৯৯৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার উটের উপর বসিয়া ভ্রমন করিতে ছিলেন এবং ছুরা "ফাতাহ্" তেলাওয়াত করিতে ছিলেন—ধীরে ধীরে তরঙ্গিত স্বরে তেলাওয়াত করিতে ছিলেন।

১৯৯৬। ছাদীছ ঃ— আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহার খোশ-লেহানের প্রশংসা করিয়া) বলিতেন, আল্লাহ তোমাকে দাউদ আলাইহেচ্ছালামের সুরের ন্যায় সুর দান করিয়াছেন।

১৯৯৭। ছাদীছ ঃ- (১১২৬পৃঃ) বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ছূরা "ওয়াত্তীন" এশার নামযে পড়িতে শুনিলাম। এত সুন্দর আওয়াজ ও এত সুন্দর পড়া আর কাহারও আমি শুনি নাই।

কত দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত হইবে ?

১৯৯৮। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী বিবাহ করাইয়া ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সেই বধূর খোঁজ-খবর লইতেন। সেমতে তিনি বধূকে তাহার স্বামী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেন, তদুত্তরে বধূ তাঁহাকে বলিত, আমার স্বামী লোক হিসাবে অতি উত্তম ব্যক্তি, অবশ্য যাবৎ আমি তাহার বিবাহে আসিয়াছি তিনি কোন সময় আমার বিছানায় পা রাখেন না এবং আমার হাল-অবস্থার কোন খোঁজ-খবর নেন না। (তিনি সর্ব্বদা এবাদৎ-বন্দেগীতেই মশগুল থাকেন।)

দীর্ঘ কাল আমার পিতা এই অভিযোগ শুনিয়া এক দিন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, পুত্রকে সঙ্গে নিয়া এক দিন আমার নিকট আসিও। সেমতে আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নফল রোজা কিরূপ রাখিয়া থাক ? আমি আরজ করিলাম, প্রতি দিনই রোযা রাখিয়া থাকি। হযরত (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন-খতম কিরূপ করিয়া থাক ? আমি আরজ করিলাম প্রতি রাত্রে এক খতম পড়িয়া থাকি।

হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, প্রতি মাসে শুধু মাত্র তিন দিন রোজা রাখিবে এবং (তাহাজ্জুদের নামাযে) প্রতি এক মাসে এক খতম কোরআন পড়িবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সামর্থ্য আরও অধিক আছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে প্রতি সপ্তাহে তিন রোযা রাখিবে। আমি আরজ করিলাম, আমার শক্তি আরও অধিক আছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দিন রোজাহীন থাকিয়া এক দিন রোজা রাখিবে। আমি আরজ করিলাম, আরও অধিক সামর্থ্য আমার রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তা হইলে তুমি সর্বোত্তম রোজা—একমাত্র দাউদ আলাইহেচ্ছালামের রোযা রাখ—এক দিন রোযাহীন থাক এক দিন রোযা রাখ। আর (তাহাজ্জুদের নামাযে) কোরআন তেলাওয়াত সাত দিনে এক খতম পড়। (এস্থলেও শেষ পর্য্যন্ত তিন দিনে খতমের অনুমতি দিয়াছিলেন।)

আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপের সহিত বলিতেন, আমি যদি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরামর্শ মোতাবেক সহজ পথ অবলম্বন করিতাম তবে আমার পক্ষে উত্তম ছিল। কারণ এখন আমি বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি! (বার্দ্ধক্যের দরুণ কোরআন শরীফ পূর্ব্বের ন্যায় পাকা পোক্তা ভাবে মুখস্থ ছিল না,) তাই তিনি প্রতি দিন দিনের বেলা সপ্তমাংশ কোরআন প্রথমে ভালরূপে মুখস্থ করিয়া লইতেন এবং নিজ পরিজনের কাহাকেও শুনাইতেন। অতঃপর রাত্রি বেলায় ঐ অংশই তেলাওয়াত করিতেন; ইহাতে তাঁহার রাত্রি বেলার পড়ার মধ্যে কিছুটা কষ্টের লাঘব হইত।

রোযা সম্পর্কেও তিনি হযরতের পরামর্শানুযায়ী এক দিন রোযায় এক দিন রোযাহীন কাটাইতেন। যদি কোন সময় বিশেষ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেন তবে এক সঙ্গে কতেক দিন রোযাহীন কাটাইতেন। কিন্তু এক দিন পর এক দিন হিসাবে যতটা রোযা হয় উহা পরে রাখিয়া লইতেন। (উক্ত রোযা ও তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত নফল এবাদৎ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহার পরিমাণ ও সংখ্যা পুরণে এত তৎপর ছিলেন) এই কারণে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখে যে পরিমাণ এবাদৎ করা হইত হযরতের অবর্ত্তমানে উহা কম করিয়া দেওয়াকে অপছন্দ ও অশুভ মনে করিতেন।

লোক-দেখানো বা গর্ব্ব উদ্দেশ্যে কিম্বা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য কোরআন পাঠ করার পরিণতি

১৯৯৯। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি আখেরী জনানায় এক শ্রেণীর যুবক দল সৃষ্টি হইবে যাহাদের প্রকৃত জ্ঞান কম হইবে। মুখে তাহারা ভাল ভাল কথা, এমনকি কোরআন-হাদীছের বাণীই আবৃত্তি করিবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত হইবে। তাহাদের অভ্যন্তরে ইসলাম থাকিবে না। তাহারা ইসলামকে আঘাতকারী ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত দল হইবে; যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্য জীবকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায় তদ্রূপ তাহারাও ইসলামকে আঘাতকারী, ইসলাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তাহাদের ঈমান শুধু মুখেই থাকিবে, উহার কোন আছর বা প্রতিক্রিয়া তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম কয়িয়া অন্তরে পৌছিবে না। এই শ্রেণীর লোক যেখানে পাও হত্যা কর। যাহারা তাহাদেরে হত্যা করিবে তাহারা কেয়ামতের দিন ছওয়াব লাভ করিবে।

২০০০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যেই

এমন এক শ্রেণীর লোকের অবির্ভাব হইবে যাহাদের (বাহ্যিক অবস্থা এত ভাল হইবে যে, তাহাদের) নামাযের সম্মুখে তোমাদের নামায, রোযার সম্মুখে তোমাদের রোযা, আমলের সম্মুখে তোমাদের আমল, নগণ্য বলিয়া মনে হইবে। তাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ ঐ তেলাওয়াত তাহাদের মুখে মুখেই থাকিবে—অন্তরে উহার কোন আছর প্রতিক্রিয়া হইবে না এবং আল্লার দরবারে উহা কবুল হইবে না। সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর যেরূপ লক্ষণীয় জীবকে দ্রুত ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; তীরের কোন অংশে উহার রক্ত-মাংসের কোন নিদর্শনও দেখা যায় না তদ্রূপ ঐ শ্রেণীর লোকগণও দ্বীন-ইসলামকে ভীষণ আঘাতকারী উহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

ব্যাখ্যা:—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের উদ্দেশ্য হইল মোসলমানগণকে সতর্ক করা, কাহারও শুধু মুখের কথা শুনিয়া বা শুধু বাহ্যিক আবরণ দেখিয়া তাহার ফাঁদে পা দিবে না। বর্তমান যুগে উল্লেখিত বিবরণীর সাদৃশ্য কাদিয়ানী শ্রেণীর লোকদিগকে দেখা যায়। তাহাদের কথায় ও লেখায় কোরআন-হাদীছের উল্লেখ দেখা যায়, নামায রোযা কোরআন তেলাওয়াতে তাহাদিগকে মশগুল দেখা যায়, কিন্তু তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী ইসলাম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কাফের।

একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করিবে

২০০১। হাদীছ:—জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মন ও দেলের পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করিও। (দীর্ঘ সময় তেলাওয়াতে মশগুল থাকার দরুণ বা অন্য কোন কারণে) মন ছুটাছুটি করিতে থাকিলে তখন ক্ষান্ত হও।

ব্যাখ্যা: দীর্ঘ সময় কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে বা অন্য কোন সাময়িক কারণে মনের একাগ্রতা না থাকিলে এবং মন ছুটাছুটি করিতে থাকিলে তখন পুনরায় মনের একাগ্রতা হাসিলের উদ্দেশ্য কোরআন তেলাওয়াত ক্ষান্ত করিবে। কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত না হওয়ায় মন না বসিলে কোরআন তেলাওয়াতে অবশ্যই মশগুল থাকিবে এবং বলপূর্ব্বক মনকে কোরআন তেলাওয়াতে বসাইতে পুনঃ পুনঃ অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবে, ক্ষান্ত হইবে না।

মছআলহ—(৭৫৬পৃঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় কান্না আসিলে উহাতে দোষ নাই। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনিবার সময় নয়ন যুগলে অশ্রু প্রবাহিত করিয়াছেন। ………নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

——(*)——

বিংশতিতম অধ্যায়

বিবাহ ও তালাক সম্পর্কীয় বিবরণ

——(●)——

বিবাহ করা উত্তম

২০০২। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবীদের মধ্যে হইতে তিন ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের নিকটে আসিয়া হযরতের এবাদৎ বন্দেগী সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে সে সম্পর্কে জ্ঞাত করা হইলে তাহারা হযরতের এবাদৎ বন্দেগীর পরিমাণকে কম মনে করিল। অবশ্য তাহারা এরূপও বলাবলি করিল যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ত পূর্ব্বাপর সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; (তাঁহার পক্ষে কম এবাদৎই যথেষ্ট।) আমাদের অবস্থা ত তদ্রূপ নয় (—আমাদের জন্য বেশী মাত্রায় এবাদৎ করা আবশ্যক।)

তাহাদের একজন বলিল, আমি সর্ব্বদা সারা রাত্রি নামায পড়িয়া কাটাইব, রাত্রিবেলা নিদ্রা যাইব না। আর একজন বলিল, সারা জীবন রোযা রাখিব এক দিনও রোযা ছাড়িব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি চিরকুমার থাকিব বিবাহ করিব না। ইতি মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এই এই কথা বলাবলি করিয়াছ! তোমরা স্মরণ রাখিও, খোদার কসম—আমি আল্লাহ তায়ালাকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকি। আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করিয়া চলি। এতদসত্ত্বেও আমি রোযাও রাখি—রোযাবিহীনও থাকি, রাত্রে তাহাজ্জুদও পড়ি—নিদ্রাও যাই এবং বিবাহ করতঃ বিবিদের সঙ্গে বসবাসও করিয়া থাকি। ইহাই হইল আমার সুন্নত তরিকা ; যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরিকা ছাড়িয়া চলিবে সে আমার দলভুক্ত গণ্য হইবে না।

২০০৩। হাদীছঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অবশ্যই বিবাহ করিয়া নেও ; এই উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম গণ্য হইবে যে, অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

অবিবাহিত থাকা বা খাসি হইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ

২০০৪। হাদীছঃ--আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইয়া থাকিতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকিত না; (এরূপ ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনায় আল্লাহ নাফরমানী যেন না করিয়া বসি সেই উদ্দেশ্যে) আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, ছিন্নমুক—খাসী হইয়া গেলে ভাল হয় নাকি? তদুত্তরে হযরত (দঃ) আমাদিগকে ঐরূপ কার্য্য হইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিলেন।

২০০৫। হাদীছঃ— সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওসমান ইবনে মজ্‌উন (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিয়া ছিলেন সংসার ত্যাগী—সন্ন্যাস-জীবন-যাপন করার। কিন্তু তিনি সেই অনুমতি লাভ করিতে পারেন নাই। হযরত (দঃ) যদি তাঁহাকে উহার অনুমতি দিতেন তবে আমরা (ঐরূপ জীবন অবলম্বন করার জন্য) খাসী হইয়া যাইতাম।

২০০৬। হাদীছঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (বিভিন্ন দেশে) জেহাদ করিতে যাইয়া থাকিতাম আমাদের (অনেকের) স্ত্রী ছিল না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা খাসি হইয়া গেলে ভাল হয় না কি? নবী (দঃ) আমাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

২০০৭। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার যৌন উত্তেজনার আশঙ্কা হয়, অথচ বিবাহ করার সামর্থ্য আমার নাই। আমি ত নিঃসম্বল নিঃস্ব। হযরত (দঃ) আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না, চুপ থাকিলেন। আমি আমার কথা পর পর তিন বার বলিলাম। হযরত (দঃ) চুপই থাকিলেন। চতুর্থবার আবার বলিলে হযরত (দঃ) (আমার মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী উত্তর দিলেন এবং) বলিলেন, তোমার কার্য্যক্রম সবই তোমার অদৃষ্টে লিখিত রহিয়াছে; ইহা জানিবার পর এখন খাসী হইয়া যাওয়া অবলম্বন করা বা না করা তুমিই ভাবিয়া দেখ।

ব্যাখ্যাঃ—তক্‌দীর—নিয়তি বা অদৃষ্ট বাস্তব সত্য এবং উহার বাস্তবতাকে অটল অনঢ়রূপে বিশ্বাস করা ইসলাম ও ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু ইহার বাস্তবতা মানুষকে জ্ঞাত করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, কতিপয় ক্ষেত্রে সে ইহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুটা উপকৃত হয়। যেমন—কাহারও কোন

মহব্বতের বস্তু তাহার হাত-ছাড়া হইয়া গেলে স্বাভাবিক ভাবে একটা অধীরতা ও অস্থিরতার ঢেউ তাহার উপর আসিবে; সেই ঢেউ-এর তলায় নিমজ্জিত হইয়া যেন সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করে, সে যেন তার তক্দীর ও নিয়তির উপর নির্ভর পূর্ব্বক শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িবার সুযোগ পাইয়া জীবন বাঁচাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন দীন বা দুনিয়ার কোন আশঙ্কা বা ক্ষতির ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলে তখন নানা রকম রক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক; সেই অবস্থায় কোন শরীয়ত বিরোধী-রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইলে তখন ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আশঙ্কা সম্পর্কে তক্দীর ও নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত শরীয়ত বিরোধী কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

বলাবাহুল্য—তক্দীর বা নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে পালাইয়া থাকা বা স্বেচ্ছাচারিতার ময়দানে অগ্রসর হওয়া তক্দীর ও নিয়তির মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধিক স্ত্রী গ্রহণ

২০০৮। হাদীছ :—আতা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী পত্নী উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জানাযায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, দেখ—তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্নী, অতএব তাঁহাকে বহন করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। হেলাইয়া দোলাইয়া আন্দোলিত করিয়া বহন করিবে না। নেহাৎ মোলায়েমভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত বহন করিবে।

(জিবদ্দশায় নবী (দঃ) তাঁহাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নয় পত্নী ছিলেন; সকলের প্রতি তিনি সমভাবে যত্নবান থাকিতেন। এমনকি সকলের গৃহ-নিবাসে পর্য্যন্ত সমতা বজায় রাখিতেন; অবশ্য একজন (—তিনি নিজের হক্ আয়েশার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা :—এক সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নয় পত্নী ছিল—ইহা নবীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল; অন্য কেহ এক সঙ্গে চার স্ত্রীর অধিক রাখিতে পারে না—তাহা হারাম।

একাধিক স্ত্রী রাখা শরীয়তে জায়েয বটে, কিন্তু উহার দায়িত্ব অনেক বেশী।

হাদীছ—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল এবং সে তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলে নাই সে কেয়ামতের দিন অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশর-ময়দানে আসিবে। (মেশকাত শরীফ ২৭৯)

বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা

২০০৯। **হাদীছ** :—আবু হোযায়ফা (রাঃ) যিনি বদর জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন—তিনি সালেম (রাঃ) নামক একজন ক্রীতদাসকে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেমন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশিষ্ট ছাহাবী যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে পালক পুত্র বানাইয়াছিলেন।

আবু হোযায়ফা (রাঃ) সালেমকে বিবাহ করাইলেন আপন ভাইঝি হিন্দাকে। অথচ সালেম মদিনাবাসীনী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন।

অন্ধকার যুগের রীতি ছিল পালক পুত্রকে আপন পুত্রই গণ্য করা হইত। পালনকারীকেই পিতা বলা হইত (এবং তাহার স্ত্রীকে প্রকৃত মাতা গণ্য করা হইত-- মাতা ও পুত্রের ন্যায়ই পরস্পর আচার-ব্যবহার চলিত।) এমনকি পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারও লাভ হইত।

যখন (২১ পাঃ ছুরা আহযাবের ৫ নং) আয়াত (যাহার আলোচনা ১৯৩৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় হইয়াছে) নাযেল হইল যে—"পালক পুত্রদিগকে তাহাদের জন্মদাতা পিতার সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাখিতে হইবে ; পালনকারীর সঙ্গে শুধু ধর্ম্মীয় ভ্রাতৃত্ব বা ক্রীতদাসের সম্পর্ক থাকিবে। (অতএব পালকপুত্র পালনকারীর স্ত্রী-কন্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে বেগানা পুরুষ পরিগণিত হইবে।)

তখন আবু হোযায়ফার স্ত্রী সাহ্‌লা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমরা ত সালেমকে আপন পুত্রই গণ্য করিতাম। (এমনকি সে আমার এবং আবু হোযায়ফার সঙ্গে একই গৃহে বসবাস করিয়া আসিতেছে। পুত্র মাতাকে যেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পারে সে আমাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া থাকে।) এখন ত পবিত্র কোরআনে (পালক পুত্র সম্পর্কে) যে আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন।

এই হাদীছের আরও ঘটনা আছে।

ব্যাখ্যা—ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছটির অবশিষ্ট অংশের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করিয়াছেন ; উল্লেখ করেন নাই। আবু দাউদ শরীফে ঐ অংশ উল্লেখ আছে— "সাহলা (রাঃ) নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সমস্যার কি সমাধান আপনি দান করেন ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি তোমার স্তনের দুধ তাহাকে পান করাইবার ব্যবস্থা কর। সেমতে তিনি সালেম (রাঃ)কে পাঁচবার দুধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে সালেম (রাঃ) তাঁহার দুধ-পুত্র গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা হইল।"

দুই বৎসরের উর্দ্ধ বয়সে সাধারণতঃ স্তনের দুধ পান করানো জায়েযও নহে এবং উহা দ্বারা দুগ্ধপান সম্পর্কীয় মাতা-পুত্রের সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আলোচ্য ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদিক দিয়া স্বতন্ত্র ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ প্রদত্ত

বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি ঐ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন স্বরূপ এই সুযোগ প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা অন্য কোন ক্ষেত্রেই প্রযোয্য হইবে না।

● বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা দ্বীন ও ধর্ম্মের দিক দিয়া ত অপরিহার্য্য। অমোসলেমের সহিত মোসলমানের বিবাহ হইতে পারিবে না—ইহা সকল ইমামগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

হানাফী মজহাব মতে বংশের সমতাও প্রয়োজন। অবশ্য ওলী—মুরব্বীগণ যদি সমতার দাবী ত্যাগ করিয়া নীচ বংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয় তবে তাহা বৈধ গণ্য হইবে। আলোচ্য ঘটনায় সেইরূপই হইয়াছে।

সালেম (রাঃ) ক্রীতদাস ছিলেন যাহার মান অতি নিম্নে ; তাঁহার সঙ্গে হিন্দার বিবাহ হইয়াছিল--তিনি ছিলেন কোরায়েশ বংশীয়া কন্যা ; তাঁহার ওলী-মুরব্বিগণ ইহাতে সম্মত না হইলে এই বিবাহ বাধ্যতামুলক সুদৃঢ় হইত না।

নারীদের জন্য ভাল গুণ

২০১০। ছাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আরববাসীদের মধ্যে কোরায়েশ বংশীয়া নারীগণ উত্তম, কারণ তাহারা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহশীলা এবং স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অধিক যত্নবান হইয়া থাকে।

২০১১। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها

ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে (সাধারণতঃ) চার প্রকার গুণের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে—তাহার ধন-সম্পত্তির প্রতি, তাহার বংশের প্রতি, তাহার রূপের প্রতি এবং তাহার দ্বীনদারীর প্রতি। তুমি কিন্তু দ্বীনদার রমণী লাভে সচেষ্ট হইও, নতুবা তুমি কপাল পোড়া।

অনিষ্ট ও ধ্বংস আনয়নকারীণী নারী

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

يايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم

"হে মোমেনগণ! তোমাদের এক শ্রেণীর স্ত্রী-পুত্র তোমাদের পক্ষে শত্রু স্বরূপ; তোমরা তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিও"। (২৮ পারা—ছুরা তাগাবুন)

যে সব স্ত্রী-পুত্র আল্লাহ তায়ালার নাফরমান সেই সব স্ত্রীপুত্র শুধু শত্রু তুল্যই নহে, বরং বস্তুতঃ তাহারা মহা শত্রু; তাহাদের মায়াজাল, তাহাদের আকর্ষণ, তাহাদের পরিবেশ পরকাল বিনষ্টকারী হয়, আল্লাহ তায়ালার গজব আনয়নকারী হয়; এত বড় ক্ষতিসাধনকারী শত্রুই পরম শত্রু ও মহা শত্রু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়াছেন। তাই স্ত্রী গ্রহণে এবং ছেলে-মেয়ের প্রতিপালন ও শিক্ষা দীক্ষায় এবং তাহাদের জীবন ধারা গড়িয়া তোলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

২০১২। হাদীছ ঃ— عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ ঃ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে (দ্বীন বিনষ্টকারী এবং মানুষকে বিপথগামী করার বহু সূত্রই সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর ক্ষতিসাধনকারী বস্তুর মধ্যে) পুরুষদের জন্য নারীগণই হইবে সর্ব্বাধিক ক্ষতিকারিণী—পুরুষদের জন্য নারীদের সমতুল্য পথভ্রষ্টকারী ক্ষতিকারক আর কোন কিছু হইবে না।

এক সঙ্গে চার বিবাহের অধিক নিষিদ্ধ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ

"পছন্দ মোতাবেক হালাল রমণী বিবাহ করিতে পার—এক হইতে চার জন।" আল্লাহ তায়ালা একত্রে স্ত্রী গ্রহণের সীমা চার সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের তফছীরে ইমাম জয়নুল আবেদীন বলিয়াছেন, একজন পুরুষের পক্ষে দুই বা তিন বা চার জন পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ বৈধ।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন,

ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته "মা যেরূপ ছেলের জন্য হারাম, মেয়ে যেরূপ পিতার জন্য হারাম, ভগ্নী যেরূপ ভ্রাতার জন্য হারাম—চার-এর অধিক গৃহীত স্ত্রীও স্বামীর জন্য তদ্রূপ হারাম।" (৭৬৬ পৃষ্ঠা)

দুধ-মাতা ও তাহার আত্মীয়

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"তোমাদের দুধমাতাগণ যাহারা তোমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে তোমাদের জন্য হারাম এবং দুগ্ধপান সম্পর্কীয় ভগ্নীগণও তোমাদের জন্য হারাম।"

২০১৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে ছিলেন এমতাবস্থায় আয়েশা (রাঃ) একজন লোকের শব্দ শুনিতে পাইলেন সে উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি হযরত (দঃ)কে বলিলাম, ঐ দেখুন। আপনার গৃহে প্রবেশের জন্য একজন বেগানা পুরুষ অনুমতি চাহিতেছে। তদুত্তরে হযরত (দঃ) হাফ্ছাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক দুধ-চাচার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মনে হয়—সেই ব্যক্তি হইবে। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এক মৃত দুধ-চাচার নাম উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে সে আমার নিকট আসিতে পারিত কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ আসিতে পারিত, কারণ জন্মগত সম্পর্কের দরুণ যে সব আত্মীয় মাহ্রম গণ্য হয় দুধপান সম্পর্কের দরুণও ঐ শ্রেণীর আত্মীয়গণ মাহ্রম গণ্য হইবে।

২০১৪। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে প্রস্তাব পেশ করা হইল, আপনি স্বীয় চাচা হাম্যার মেয়েকে বিবাহ করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ত আমার দুধ-ভ্রাতার মেয়ে। (হাম্যা (রাঃ) হযরতের দুধ-ভ্রাতা ছিলেন।)

২০১৫। হাদীছ :—(হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-হাবীবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আপনি আমার ভগ্নীকে বিবাহ করুন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে পরিহাস স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, (আমি আরও বিবাহ করি) ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট? তিনি বলিলেন, সন্তুষ্ট ত আছিই। কারণ, আমি আপনার স্ত্রী-পদে একা নহি, আরও স্ত্রী আছে। অতএব সৌভাগ্য লাভে অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে আমার ভগ্নী শামিল হউক তাহা আমার অবশ্যই কাম্য।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা আমার জন্য জায়েয নহে। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলিলেন, আমরা ত এরূপ আলোচনা শুনিতেছি, আপনি আবু ছালামার মেয়েকে বিবাহ করিবেন। তখন হযরত (দঃ) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মে-ছালামার উরসজাত মেয়েটি ? উম্মে-হাবিবা বলিলেন, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমতঃ ঐ মেয়েটি আমার স্ত্রী উম্মে-ছালামার উরসজাত (—তাহার প্রথম স্বামীর পক্ষের মেয়ে—সুতরাং সে আমার পক্ষে হারাম।) এতদ্ভিন্ন সে আমার দুধ-ভ্রাতার মেয়ে। ঐ মেয়েটির পিতা আবু ছালামাকে এবং আমাকে—আমাদের উভয়কে ছুওয়ায়বাহ্ দুগ্ধপান করাইয়া ছিলেন।

হযরত (দঃ) স্বীয় স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন, তোমরা কখনও উরসজাত মেয়েদেরকে বা তোমাদের ভগ্নীদেরকে আমার বিবাহের জন্য পেশ করিও না।

দুগ্ধপান দুই বৎসর বয়সের পরে হইলে ?

২০১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন। তথায় এক জন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে তথায় দেখিলে পর হযরতের চেহারার উপর কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। আয়েশা (রাঃ) তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, এই লোকটি আমার দুধ-ভাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুধ-ভাই (ইত্যাদি) বলিতে বিশেষ চিন্তা ও সতর্কতার সহিত বলিতে হইবে। দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য শর্ত হইল—মায়ের দুগ্ধ খাদ্য ও আহাররূপে গৃহীত হওয়ার (বয়সে তথা দুই বৎসর) বয়সের মধ্যে দুগ্ধ পান করা। (অন্যথায় দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না।)

২০১৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নারীদের পক্ষে বেগানা পুরুষ হইতে পর্দ্দা করার হুকুম প্রবর্ত্তীত হওয়ার পরের ঘটনা ঃ—একদা আবুল কোয়ায়েসের ভ্রাতা আফ্‌লাহ নামক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিবার অনুমতি চাহিল ; আমি তাহাকে অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলাম। সে বলিল, আপনি আমার সঙ্গে পর্দ্দা করেন ? আমি ত আপনার চাচা ! আমি বলিলাম, তাহা কিরূপে ? সে বলিল, আমার ভ্রাতা-বধূ আমার ভ্রাতার সংস্পর্শে সৃষ্ট দুগ্ধ আপনাকে পান করাইয়াছিল। আমি বলিলাম, হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে আমি অনুমতি দিব না। কারণ তাহার ভ্রাতা-বধূ আমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভ্রাতা ত আমাকে দুগ্ধ পান করায় নাই ; (সে আমার চাচা হইবে কেন ?)

অতঃপর হযরত নবী (দঃ) গৃহে তশরীফ আনিলে পর আমি তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, আমি তাহাকে অনুমতি দেই নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার চাচাকে সম্মুখে আসিবার অনুমতি দানে বাধা কি ছিল ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমাকে পুরুষ—আবুল কোয়ায়েশ ত দুগ্ধ পান করায় নাই, তাহার স্ত্রী

আমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে। হযরত (দঃ) পুনঃ বলিলেন "আফ্লাহ" তোমার চাচা তাহাকে তুমি অনুমতি দিও। এই জন্যই আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, এসব সম্পর্কের দরুণ যে সব আত্মীয় মাহ্‌রম গণ্য হয় দুগ্ধ পানের সম্পর্কেও ঐ শ্রেণীর আত্মীয়কে মাহ্‌রম গণ্য করিও।

নিষিদ্ধ বিবাহ

২০১৮। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—বংশ সম্পর্কের দরুণ সাত প্রকার মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম। (মা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি) আর বিবাহ-সূত্রের কারণে (ও দুধ-সম্পর্কের দরুণ) সাত প্রকার মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হয়। (দুধ-মা, দুধ-ভগ্নি, নিজের স্ত্রীর মা, ব্যবহৃত স্ত্রীর কন্যা, প্রকৃত ছেলের বিবাহিতা, নিজ স্ত্রী থাকাবস্থায় তাহার ভগ্নি, পিতা-দাদা-নানার বিবাহিতা।)

এই সব মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়া ৫ পারা ছুরা নেছার ২৩নং আয়াতে উল্লেখ আছে। সর্বশেষটি ২২নং আয়াতে আছে।

মছ্‌আলাহ : শ্বাশুড়ীর সহিত ব্যভিচার করিলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়—ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইমরান ইবনে হোছায়ন (রাঃ) এবং জাবের ইবনে যায়েদ (রঃ) ও হাসান বছরী (রঃ) তাঁহারা সকলেই এই মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন।

এমনকি হানফী মজহাব মতে কামভাবের সহিত শ্বাশুড়ীর গায়ে হাত লাগাইলেই স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়।

২০১৯। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরস্পর খালা এবং বোনঝি, ফুফু এবং ভাইঝি একত্রে বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

২০২০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মেয়েকে তাহার ফুফুর সঙ্গে বা তাহার খালার সঙ্গে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান স্ত্রীর ফুফু বা ভাইঝিকে কিম্বা সেই স্ত্রীর খালা বা বোনঝিকে বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে সেই বিবাহ বাতেল সাব্যস্ত হইবে। অতএব তাহার সঙ্গে মেলামেশা বেগানা নারীর সঙ্গে মেলামেশার ন্যায় হারাম হইবে।

২০২১। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, আমরা একে অপরের নিকট স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিব এবং প্রত্যেকের নিজ কন্যা তাহার বিবাহের মহর দেওয়া হইবে না।

মোতা-নেকাহ নিষিদ্ধ

২০২২। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের সময় কোন এক উপলক্ষে পোষিত গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মোতা-নেকাহ—অস্থায়ী বিবাহকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম বোখারী (রঃ) মোতা-নেকাহের স্বপক্ষের হাদীছ বর্ণনা করিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) হইতে আলী (রাঃ) সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন যে, মোতা-নেকাহের অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল বটে, কিন্তু পরে স্বয়ং নবী (দঃ)ই উহা মনছুখ বা রহিত ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছখানা অতি চমৎকার ; হাদীছখানা আলী (রাঃ) কর্তৃক বিশেষ-ভাবে বর্ণিত। শিয়া সম্প্রদায় আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভক্ত বলিয়া দাবী করে ; অথচ তাহারা মোতা-নেকাহের পক্ষপাতি।

নেক্‌কার ব্যক্তির নিকট নারী স্বয়ং স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে

২০২৩। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তাঁহার এক কন্যা উপস্থিত ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক মহিলা উপস্থিত হইল এবং হযরতের সঙ্গে তাহার বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে আরজ করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমাকে গ্রহণ করার আবশ্যক আপনার আছে কি ?

ঘটনা শুনিয়া আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা বলিয়া উঠিল, কি খারাপ কথা ! কি খারাপ কথা !! মেয়ে লোকটি কি বেশরম ছিল। আনাছ (রাঃ) তাঁহার মেয়েকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ঐ মেয়ে লোকটি তোর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি খায়েশ করিয়া নিজেকে তাঁহার চরণে পেশ করিয়াছিল।

২০২৪। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট একটি মহিলা উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি আমাকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের হাওয়ালা করিলাম—আপনাকে আমায় প্রদান করার উদ্দেশ্যেই আমি হাজির হইয়াছি। হযরত নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, অধিক স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা ও আবশ্যক বর্ত্তমানে

আমার নাই। তখন ছাহাবীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না থাকিলে আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দেন। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট মহরের জন্য কোন বস্তু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট কিছুই নাই। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ী যাইয়া দেখ, কোন বস্তু পাও কি না? সে বাড়ী গেল অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোন কিছুই পাইলাম না। হযরত (দঃ) বলিলেন, পুনঃ যাইয়া তালাশ কর এবং একটি লোহার অঙ্গুরী হইলেও উহা নিয়া আস। সে পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোহার অঙ্গুরীও জুটিল না, অবশ্য আমার পরিধেয় এই লুঙ্গিটি আছে। ইহার অর্দ্ধাংশের মালিক আমি স্ত্রীকে বানাইতে পারি। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, ঐ লুঙ্গি ব্যতীত গা ঢাকিবার মত দ্বিতীয় আর একখানা কাপড়ও তাহার ছিল না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই লুঙ্গির মালিক হইয়া তাহার লাভ কি হইবে? ইহা তুমি পরিধান করিলে তাহার ভাগে কিছু থাকিবে না। আর সে পরিধান করিলে তোমার ভাগে কিছু থাকিবে না।

অতঃপর ঐ ছাহাবী হযরতের মজলিশে বসিয়া রহিল। অনেক সময় বসিয়া থাকার পর লোকটি তথা হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন হযরত (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন শরীফ কতটুকু তোমার স্মরণ আছে? সে ব্যক্তি কতিপয় ছুরার নাম গণনা করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব ছুরা মুখস্থ পড়িতে পার কি? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—যাও; তোমার নিকট পবিত্র কোরআনের যে দৌলত রহিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া (নগদ মহর ব্যতীরেকেই) এই রমণীটিকে তোমার বিবাহ-বন্ধনে দিয়া দিলাম।

নিজ কন্যা বা ভগ্নীর জন্য নেক লোকের নিকট নিজেই বিবাহ প্রস্তাব পেশ করা

২০২৫। হাদীছঃ - আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতা বিশিষ্ট ছাহাবী খোনায়েছ ইবনে হোজাফাহ্ (রাঃ) মদীনায় ইহকাল ত্যাগ করিলে ওমর কন্যা হাফ্ছাহ্ (রাঃ) বিধবা হন। সেই সময়ের ঘটনা স্বয়ং ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ওসমান (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া আমার বিধবা মেয়ে হাফ্ছার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, এই সম্পর্কে চিন্তা করিব। কতেক দিন পর বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার বিবাহ না করারই ইচ্ছা। ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর সিদ্দিকের

নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বিধবা মেয়ে হাফ্‌ছাহ্‌কে আপনার বিবাহে দিয়া দিব। আবু বকর চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তরই দিলেন না। আমি ওসমানের প্রতি যতটুকু মন-ক্ষুন্ন হইয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক মন-ক্ষুন্ন হইলাম আবু বকরের প্রতি। কিছু দিন গত হইলে পর হযরত রসুলুল্লাহ (দ.) স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে হাফ্‌ছার বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আমি হযরতের সঙ্গে হাফ্‌ছার বিবাহ দিয়া দিলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, বোধ হয় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন আমি আপনার কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে কোন উত্তর দেই নাই। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম হাঁ—অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর দেওয়ার মধ্যে বাধা ছিল। ঐ সময় আমি জানিতে পারিয়া ছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফ্‌ছাহ্‌ সম্পর্কে আলাপ করিয়াছেন। কিন্তু আমি হযরতের গোপন কথা তখন প্রকাশ করা ভাল মনে করি নাই। যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফ্‌ছাহ্‌কে বিবাহ করার ইচ্ছা ত্যাগ করিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিতাম।

ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিধবা নারীর বিবাহ প্রস্তাব নিষিদ্ধ, হাঁ—ইঙ্গিত ইশারা করা যায়

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ .... وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۔

“বিধবা নারীদের বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলিলে বা (ইদ্দৎ শেষে বিবাহ করা সম্পর্কে) মনের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করিলে তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা ঐ নারীদের আলোচনা অবশ্যই করিবে। (তাই তিনি এই ব্যাপারে কিছু অবকাশ দিয়াছেন।) কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিবাহের পাকা পোক্তা কথা বলিও না, এবং ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ করার ইচ্ছাও করিও না; স্মরণ ও একিন রাখিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের ইচ্ছাও অবগত থাকেন। অতএব, (শরীয়ত বিরোধী ইচ্ছা পোষণ করিতে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা দয়ালু এবং সহনশীল (তাই সব ক্ষেত্রে যখন তখন ধর-পাকাড় হয় না; ইহাতে তোমরা ভুল পথে পরিচালিত হইও না। ২ পারা—১৪ রুকু)

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ইশারা ইঙ্গিতের তফছীর করতঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যেমন এরূপ বলা, আমি বিবাহ করার ইচ্ছা রাখি। আমি এক জন নেককার মহিলা লাভ করার খাহেশ রাখি!

কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ) উক্ত ইশারা ইঙ্গিতের তফছীরে বলিয়াছেন, যেমন ঐ বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা যে, আমার নজরে তোমার মর্য্যাদা আছে, তোমার প্রতি আমার মনের টান আছে, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, এতটুকু বলিতে পার যে, আমার একজন স্ত্রীর আবশ্যক আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আল্লার রহমতে তুমি অচল নও—এই ধরণের কথা পুরুষের পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে। আর নারীর পক্ষ হইতেও স্বয়ং নারী বা তাহার কোন মুরব্বি ইদ্দতের মধ্যে স্পষ্টরূপে বিবাহের প্রস্তাব বা আলাপ আলোচনা করিবে না।' অবশ্য কোন পুরুষের ইশারা ইঙ্গিতের উত্তরে এতটুকু বলিতে পারে যে, আপনার কথা আমি শুনিয়া রাখিলাম।

নাবালেগ মেয়ের বিবাহ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ......وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ

"যে সব নারী ঋতু আসার সম্ভাবনার বয়স অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত রমণীর এখনও ঋতু আসে নাই—উভয়ের (তালাকের) ইদ্দৎ তিন মাস। (২৮ পারা—ছুরা তালাক)

এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ রমণীর তালাকের ইদ্দৎ বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, তাহার বিবাহেরও অবকাশ রহিয়াছে, নতুবা তালাক ও উহার ইদ্দৎ কোথা হইতে আসিবে ?

২০২৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল এবং তাঁহার রোখ্ছতী তথা দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে নয় বৎসর বয়সে, আর হযরতের সঙ্গে তিনি নয় বৎসর কাল অবস্থান করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। (যেমতে তাঁহার আঠার বৎসর বয়সে হযরত (দঃ) ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বে-আইনী সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বে-আইনী বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারই নাম তাহ্‌রীফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন যাহা ইহুদী নাছারাগণ করিয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু আদি হইতেই জানেন। তাঁহার প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের নামই হইল শরীয়ত। কোন প্রকার যুক্তি বা উপকার

অপকার ইত্যাদির বুলি আওড়াইয়া শরীয়তের তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করার শামিল।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কোরআন ও হাদীছ দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমানিত করিয়াছেন। ইহাকে বে-আইনী করা বস্তুতঃ শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁহার বান্দাদের জীবন-ব্যবস্থারূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা। যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমল করিয়াছিলেন, অতএব, এই অনুমোদনকে দুষণীয় সাব্যস্ত করা রসুলের কার্য্যকে দুষণীয় সাব্যস্ত করারই শামিল!

কুমারী ও বিবাহিতা উভয়ের বিবাহে তাহাদের সম্মতি আবশ্যক

২০২৭। হাদীছ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه حدثهم

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَامَرَ

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ

اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার বিবাহ হইয়াছে এরূপ নারীকে (দ্বিতীয়বার) বিবাহ দানে তাহার স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেই এবং কুমারীকে বিবাহ দানেও তাহার সম্মতি লইতে হইবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, কুমারীর (মুখে সম্মতি প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিবে, অতএব তাহার) সম্মতি লাভের উপায় কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর তাহার চুপ থাকাই তাহার পক্ষে সম্মতি দান গণ্য হইবে।

২০২৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলিলেন, কুমারী মেয়ে বিবাহের সম্মতি মুখে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে। হযরত (দঃ) বলিলেন, (বিবাহের কথা পেশ করার উপর) তাহার চুপ থাকাই তাহার সম্মতি দান গণ্য হইবে।

২০২৯। হাদীছঃ—খান্‌ছা বিন্‌তে খেজাম (রাঃ) মদীনাবাসীনী নারী ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বিবাহিতা ছিলেন, পরবর্ত্তী বিবাহকালে তাঁহার

পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিয়া দেন, অথচ তিনি সেই বিবাহে মোটেই সম্মত ছিলেন না। তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। হযরত (দঃ) সেই বিবাহ বাতিল সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

একজনের বিবাহ প্রস্তাবের উপর অপরজন সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাব রাখিবে না

২০৩০। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—একজন ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চালাইতেছে সেই ক্ষেত্রে অপর কেহ ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিবেনা। একজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে সেই ক্ষেত্রে অপর কেহ প্রস্তাব রাখিবে না। যাবৎ না প্রথম জন নিজের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া যায় অথবা সে অপর জনকে প্রস্তাব রাখার অনুমতি দেয়।

নগদ টাকা ভিন্ন অন্য বস্তুও মহর হইতে পারে

২০৩১। **হাদীছঃ**—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন—একটি লোহার অঙ্গুরী (মহররূপে) দিয়া হইলেও তুমি বিবাহ কর।

বিবাহ উপলক্ষে "দুফ"* বাজান

২০৩২। **হাদীছঃ**—মোয়া'ওয়েজের কন্যা রুবাইয়ে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার বাসর-রাত উপলক্ষে হযরত নবী (দঃ) আমাদের গৃহে আমার সন্নিকটে আসিয়া বসিলেন, তখন কতিপয় ছোট ছোট মেয়ে দুফ বাজাইতেছিল এবং বদরের জেহাদে আমার পুর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের শোকগাথা পাঠ করিতেছিল। তন্মধ্যে একটি মেয়ে অন্য একটি পংক্তি পড়িল যাহার অর্থ ছিল—"আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি অগ্রিম খবর জানিয়া থাকেন।" হযরত (দঃ) তাহার এই উক্তিতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা পূর্ব্ব হইতে যে শোকগাথা পাঠ করিতেছিলে তাহাই কর এই উক্তি ছাড়।

বিবাহের শর্তাবলী পূরণ করা

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, মোসলমানদের কর্ত্তব্য, স্বীয় হক্ বুঝিয়া পাইলে শর্ত্ত পূরণ করা।

---

* দুফ্—এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ঢোল যাহার এক দিকে চামড়া থাকে অপর দিক খোলা থাকে।

২০৩৩। হাদীছ ঃ— عن عقبة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال احق ما اوفيتم من الشروط

ان توفوا ما استحللتم به الفروج

অর্থ—ওক্‌বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন রমণীকে হালাল করা উপলক্ষে যে শর্ত করা হয় সেই শ্রেণীর শর্ত্তগুলি পূর্ণ করা সর্ব্বাধিক অগ্রগণ্য।

ব্যাখ্যা ঃ—বিবাহের সময় কন্যার পক্ষ হইতে বরের উপর যে সব শর্ত্ত আরোপ করা হইয়া থাকে ঐগুলি পূর্ণ করার প্রতিই নবী (দঃ) অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ ঐ শ্রেণীর শর্ত্তগুলি কাবিননামারূপে লিখিত হওয়া এবং ওয়াদা অঙ্গীকাররূপে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সবের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নতেরই বরখেলাফ নহে শুধু; বরং তাঁহার নির্দ্দেশেরও বরখেলাফ।

এই শ্রেণীর শর্ত্ত যদি দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপন্থী বা শরীয়ত নিষিদ্ধ না হয়, তবে তাহা পূর্ণ করিবেই। হাঁ—যদি ঐরূপ হয় তবে তাহা পূরণ করা আবশ্যকীয় নহে বা জায়েযই নহে, কিন্তু ঐরূপ শর্ত্তের স্বীকৃতি প্রদান দোষ বা গোনাহ মুক্ত হইবে না।

২০৩৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق

اختها لتستفرغ صحفتها فانما لها ما قدر لها

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নারীর পক্ষে ইহা জায়েয ও হালাল নহে যে, সে তাহার মোছলমান ভগ্নীর তালাকের দাবী করে; নিজে একা সর্ব্বাধিকারীনী হওয়ার জন্য। তাহার লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, প্রত্যেকে নিজ তক্‌দীর পরিমাণ সুখই ভোগ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পরবর্ত্তী বিবাহ উপলক্ষে যে পূর্ব্ব স্ত্রীর তালাকের দাবী বা শর্ত্ত করা হয় সে সম্পর্কেই হযরত নবী (দঃ) এই কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বামী কর্ত্তৃক তালাক দেওয়া হইলে সেই তালাক হইয়া যাইবে অবশ্যই, কিন্তু যাহাদের দাবী ও শর্ত্তে উহা হইয়াছে তাহারা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিঘোষিত হালাল নয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার দোষে দূষী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তালাক দেওয়ার শুধু শর্ত্ত করা হইয়া থাকে তবে সেই শর্ত্ত পুরা করিবে না।

ফরাশ—বিছানার চাদর ইত্যাদি সজ্জার বস্তু মহিলাদের জন্য

২০৩৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের গৃহে ফরাশের চাদর আছে কি ? আমি আরজ করিলাম, আমাদের সেইরূপ সংস্থা-সুযোগ কোথায়!

নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিলেন, তোমাদের সেইরূপ অবকাশ হইবে এবং তোমরা ফরাশের চাদর (ইত্যাদি সাজ-সজ্জার আসবাব) সংগ্রহ করিবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, বাস্তবিকই—আমারেই গৃহে আমার স্ত্রী ফরাশের চাদর সংগ্রহ করিয়াছে! আমি স্ত্রীকে বলিয়া থাকি, তোমার ফরাশের চাদরগুলি আমার সম্মুখ হইতে দুর কর। সে উত্তরে বলে, নবী (দঃ) ত ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন-ইহা তোমাদের হইবে। এই উত্তরে আমি চুপ থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ—অনাড়ম্বর সরলতা প্রিয় জীবন-ব্যবস্থাই ইসলামের নীতি। নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণের জিন্দেগী অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কালের আবর্ত্তনে মোসলমানদের মধ্যে সেই সরলতা থাকিবে না—নবী (দঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন এবং উহাকে তিনি নাপছন্দরূপেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাহাবী জাবের (রাঃ) তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন, তাই নিজ গৃহে ফরাশের চাদরের প্রতি অনীহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু উহা যেহেতু প্রয়োজনের সীমাভুক্ত ছিল এবং স্ত্রী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার বাহ্যিক সূত্র ধরিয়া এক গুঁয়েমী করায় জাবের (রাঃ) ক্ষান্ত রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ধনী লোকেরা গৃহে যেরূপ আড়ম্বর পুর্ণ এবং অযথা ব্যয়ের সাজ-সজ্জা করিয়া থাকেন তাহা দেখিলে ভীতি সৃষ্টি হয় যে, এই অপব্যয়ের হিসাব তাঁহারা কেয়ামতের কঠিন দিনে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বরাবরে কিরূপে দিবেন?

আল্লাহ তায়ালা ত পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন—"নিশ্চয় অপব্যয়-কারীরা শয়তানের ভাই।"

আলোচ্য হাদীছে যে সামান্য ফরাশের অবকাশ বুঝা যায় উহাকেও ইমাম বোখারী (রঃ) মেয়েলী স্বভাব-সুলভের মন রক্ষার উপর সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ—"দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য্য দৃষ্টে ফিরিয়া আসা" পরিচ্ছেদে আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘটনা বিশেষ আদর্শ মূলক দৃষ্টান্ত।

কনেকে বর সমীপে সমর্পণ

২০৩৬। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা এক বিবাহে কনেকে মদীনাবাসী বর সমীপে সমর্পণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সেই

উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তোমাদের নিকট আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা ছিল না কি ? মদিনাবাসীরা আমোদ-প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ— বিবাহে বর-কনের আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা করাকে ইসলাম অবকাশ দেয়। উহা যে, কি পরিমাণে হইবে তাহা ছাহাবীগণের জিন্দেগীর ইতিহাসেই পরিমিত হয়।

অধুনা বিশেষতঃ শহর-বন্দরে ধনী লোকদের বিবাহে যে সব হারাম ও অপব্যেয়ের আমোদ-আনন্দ করা হয় উহা জায়েয করার জন্য আলোচ্য হাদীছকে উপস্থিত করা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের অবমাননা বই নহে। এরূপ করিলে তাহা ভিন্ন গোনাহ এবং বড় গোনাহ হইবে।

নব বিবাহিতকে উপলক্ষ করিয়া খাদ্য সামগ্রী উপঢৌকন দেওয়া

২০৩৭। হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সহিত নব বিবাহিত হইলেন। সেই উপলক্ষে (আমার মাতা) উম্মে-ছোলায়েম আমাকে বলিলেন, এই সময় আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য কিছু হাদিয়া পাঠাইলে ভাল হইত। আমিও বলিলাম, তাহাই করুন। সে মতে তিনি খুরমা, ঘি ও পনীর একত্রিত করিয়া একটি পাত্রে (ফিরনীর ন্যায়) 'পায়েস' তৈরী করিলেন এবং আমাকে দিয়া উহা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উহা লইয়া আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা রাখিয়া দাও, তারপর হযরত (দঃ) কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহাদিকে এবং এতদ্ভিন্ন যাহার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয় সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, হযরতের গৃহ আগন্তুকদের দ্বারা পরিপুর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হযরত (দঃ)কে দেখিলাম, উক্ত ফিরনীর মধ্যে স্বীয় হাত রাখিয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং দশ দশজন করিয়া আন্দরে ডাকিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) সকলকে বলিয়া দিতেন বিছমিল্লাহ বলিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাইবে। এইভাবে উপস্থিত সকলেই তৃপ্ত হইয়া খাইতে পারিল।

স্ত্রীসহবাস কালের দোয়া

২০৩৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে উদ্যত হইয়া যদি এই দোয়াটি পড়িয়া নেয়—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নেব্‌নিশ্‌-শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্‌-শায়তানা মা-রাযাক্‌তানা।

"আল্লার নামের বরকৎ লইয়া আরম্ভ ; হে আল্লাহ্‌ ! শয়তান যেন আমার নিকট আসিতে না পারে এবং আমাদেরকে তুমি যে সন্তান দান করিবা তাহাকে শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।"

যদি এই দোয়াটি (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পড়িয়া নেয় তারপর তাহাদের এই মিলনে কোন সন্তানের জন্ম লাভ হয় তবে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

'ওলিমা' বা শাদী উপলক্ষে বরের পক্ষ কর্তৃক খানার ব্যবস্থা করা

২০৩৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বর-জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে খায়বর ও মদীনার মধ্য পথে একস্থানে তিন দিন অবস্থান করিলেন। তথায় ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে তাঁহার অনুষ্ঠিত বিবাহের রুছুমাত সম্পন্ন করা হইতে ছিল। সেই উপলক্ষে (হযরতের পক্ষ হইতে) আমি মোসলমান জমাতের সকলকে ওলিমার দাওয়াত করিয়াছিলাম। সেই দাওয়াতের মধ্যে রুটি-গোশ্‌ত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। হযরত (দঃ) দস্তরখান বিছাইবার আদেশ করিয়াছিলেন ; উহাতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের তরফ হইতে খুরমা, পনীর ও মাখন রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা একত্র করিয়া খাওয়া হইয়াছিল উহাই ছিল সেই ওলিমার খানা।

ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা

২০৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওলিমার দাওয়াত দেওয়া হইলে সেই দাওয়াত গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হওয়া চাই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বিবাহের দাওয়াত এবং অন্যান্য দাওয়াতে রোযা অবস্থায়ও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন।

২০৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান ভাই-এর তরফ হইতে দাওয়াত করা হইলে তাহা গ্রহণ করিও।

২০৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়া থাকিতেন, যেই ওলিমার মধ্যে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয়, গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওলিমার খানা সর্ব্ব নিকৃষ্ট খানা।

(আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিতেন, বিনা কারণে কোন মোসলমান ভাই-এর) দাওয়াত অগ্রাহ্য করা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের তরিকার পরিপন্থি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— ওলিমার দাওয়াত কত দিন পর্য্যন্ত চালানো যায় এসম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাত দিন এবং উহার কম-বেশও করা যায়। কারণ ওলিমা সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে যে সব হাদীছ বর্ণিত আছে উহাতে এক দিন বা দুই দিন ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং নিজ অভিরুচি অনুযায়ী করার অবকাশ আছে।

এসম্পর্কে আবুদাউদ শঃ, নেছায়ী শঃ তিরমিজি শঃ ইবনে-মাজাহ শঃ এবং আরও কেতাবে কতিপয় হাদীছ এই মর্ম্মে বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ওলিমার ব্যবস্থা এক দিন কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় দিন ভাল এবং উত্তম ও সুন্নত, তৃতীয় দিন রিয়া—লোক-দেখানো এবং ছোম্‌আ—সুখ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি এইরূপ হীন উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

ইমাম বোখারীর উপরোল্লেখিত মতামত এই সব হাদীছের পরিপন্থি নহে। এই সব হাদীছের উদ্দেশ্য—যে ব্যক্তি লোক-দেখানো বা খ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য বেশী দিন ওলিমার আড়ম্বর করে তাহার নিন্দা করা এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে সতর্ক করা।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলিতে চাহেন যে, ঐরূপ অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য যদি না থাকে, বরং আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদের প্রতি উদারতা বশে কিম্বা খানা খাওয়াইবার অভিরুচিতে যদি কেহ বেশী দিন ওলিমা করে তবে তাহাতে দোষ নাই।

ওলিমার খানা কোন বিবাহে বেশী কোন বিবাহে কম করা যায়*

২০৪৩। **হাদীছ** :—ছাবেৎ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সম্মুখে উম্মুল-মোমেনীন জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার আলোচনা হইল। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, হযরত নবী (দঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে ওলিমার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অন্য কোন স্ত্রীর বিবাহে হযরত (দঃ)কে সেইরূপ ওলিমার ব্যবস্থা করিতে দেখি নাই। হযরত (দঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে একটি বকরি জবেহ করিয়া ওলিমা করিয়াছিলেন।

২০৪৪। **হাদীছ** :—ছফিয়া বিন্‌তে শায়বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার একজন স্ত্রীর বিবাহে শুধু মাত্র দুই মুদ্‌— দুই সের প্রায় যবের ছাতু দ্বারা ওলিমা করিয়াছিলেন।

---

* অর্থাৎ একাধিক বিবাহ করিলে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব, কিন্তু ওলিমা খাওয়াইবার মধ্যে ঐরূপ সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নহে।

দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য্য দেখিলে ফিরিয়া আসিবে

● বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এক দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া গৃহে ছবি দেখিতে পাইলেন। তদ্দরুণ তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

● ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র সালেমের বিবাহ উপলক্ষে অনেক লোককে দাওয়াত করিলেন, তন্মধ্যে অন্যান্য ছাহাবীগণের সঙ্গে ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ)ও ছিলেন। মেহমানগণকে বসাইবার জন্য একটি গৃহে উহার ভিতরের দেওয়াল পর্দা দ্বারা আবৃত করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। দাওয়াতের লোক-জন, এমনকি ছাহাবীগণও একে একে তথায় আসিয়া বসিলেন। ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ)ও তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঘরের ভিতরের দেওয়াল পর্দায় সুসজ্জিত দেখিয়া প্রবেশ করিলেন না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে মেয়ে মহলের চাপ আমাদেরকে বাধ্য করিয়াছিল। আবু আইউব (রাঃ) বলিলেন, মেয়ে মহলের চাপে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কা অন্য কাহার হইলেও আপনার সম্পর্কে ত কখনও তাহা হয় নাই; খোদার কসম—আপনাদের এখানে আমি খানা খাইব না। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ÷

ব্যাখ্যা ঃ—ঘরের ভিতরে কোন আবশ্যক ব্যতিরেকে দেওয়াল বা বেড়ায় পর্দা লটকাইয়া সুসজ্জিত করা হারাম নয় বটে, যদ্দরুণ তথায় উপস্থিত অন্যান্য ছাহাবীগণ চুপ রহিয়া ছিলেন, কিন্তু উহা অনাবশ্যক আড়ম্বর হওয়ায় শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় মক্রূহ্। এই শ্রেণীর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ধারার ছয়লাব ও স্রোতে ভাষিয়াই জাতির পতন ঘটে; তাই কোন জাতির উত্থান ও উন্নতির সময় উহার কর্ণধারগণ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মোসলেম জাতির উত্থানের গোড়া-পত্তন হয় ছাহাবীগণের দ্বারা, তাই ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ) এই শ্রেণীর মক্রূহ্ বিষয়কেও বরদাশত করেন নাই। এবং এই সামান্য ব্যাপারেও মেয়ে মহলের চাপে পুরুষের প্রাবল্য বিনষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়ায় তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং দাওয়াত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

আবু আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় জাতির কর্ণধারগণের এইরূপ কঠোরতা অবলম্বনের কারণেই মোসলেম জাতির উত্থান দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যখনই মোসলমানদের মধ্যে ঐ বিষয়ের শিথিলতা আসিয়া গিয়াছে এবং তাহারা পরানুকরেণে ঐ শ্রেণীর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ধারায় লিপ্ত হইয়া চলিয়াছে তখনই তাহাদের অধঃপতন আসিয়াছে।

÷ ঘটনার মূল বয়ানটি অতি সংক্ষেপে ইমাম বোখারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তরজমায় বিস্তারিত বিবরণ ফতহুলবারী কেতাব হইতে উদ্ধৃত।

নারীদের সহিত সহ ধৈর্য্য অবলম্বন করা

২০৪৫। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ

خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ

كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ -

অর্থ—অবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নারীদের (সঙ্গে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার অবলম্বন করা) সম্পর্কে আমার অছিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ ও নির্দ্দেশ তোমরা রক্ষা করিয়া চলিও। নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম নারী—আদি মাতা-হাওয়া) পাঁজরের (ঊর্দ্ধতম) হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড় সমূহের মধ্যে ঊর্দ্ধতম হাড় খানাই সর্ব্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে তৎপর হও যে, তুমি তোমার মন মত পূর্ণ সোজা না করিয়া ছাড়িবে না) তবে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি উহাকে তোমার মন মত পূর্ণ সোজা করায় তৎপর না হও, তবে অবশ্য উহার মধ্যে একটু বক্রতা থাকিবে, (কিন্তু ভাঙ্গিবে না—আস্ত থাকিবে, তুমি উহার দ্বারা সাহায্য, সহায়তা লাভ করিয়া নিজের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।) সুতরাং পুনঃ বলিতেছি, নারীদের (সহিত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার) সম্পর্কে আমার অছিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ ও আদেশ তোমরা রক্ষা করিয়া চলিও।

মোসলেম শরীফে বর্ণিত দুইটি হাদীছ আলোচ্য বিষয়ে অধিক স্পষ্ট, তাই উহা এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ

وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا -

"নারী তোমার মন মোতাবেক পূর্ণ সোজা হইয়া চলিবে না, অতএব উহার দ্বারা লাভবান হইতে চাহিলে উহার (স্বভাবের) বক্রতাবস্থায়ই তুমি তাহা হইতে নিজের উপকার উদ্ধার করিও। যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে চেষ্টা কর তবে তুমি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। স্ত্রীকে তালাক দেওয়াই উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ।"

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ

"ঈমানদার স্বামী ঈমানদার স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী হইবে না। কারণ, স্ত্রীর কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট আসিলেও পুনঃ তাহার দ্বারাই এমন ব্যবহার পাইবে যাহাতে সন্তুষ্টি লাভ হইবে।"

ব্যাখ্যা ঃ—ফল হইতে উহার বীজ বাহির করিয়া অতঃপর ঐ বীজ হইতেই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের পাঁজরের হাড় হইতে কোন প্রকার বীজ ও মূল পদার্থ বাহির করিয়া উহা হইতে আল্লাহ তায়ালা মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছে উহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের এই তথ্য প্রকাশ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে একটি বিষয়ের প্রবোধ দিতেছেন যে, যেহেতু আদি মাতার সৃষ্টি বাঁকা বস্তু হইতে, তাই মাতৃজাতি—নারীদের মধ্যে কম-বেশী বক্রতা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। যেরূপ একটি টক ফল হইতে গৃহীত বীজের বৃক্ষে এবং ঐ বৃক্ষের ফল হইতে গৃহীত বীজের বৃক্ষের ফলের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত অম্লত্ব থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

নারীজাতি পুরুষের চিরসঙ্গীনি এবং পার্থিব জীবনে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের দরুন শুধু তাহাদেরই জীবন নরকে পরিণত হয় না, বরং গোটা পরিবারের জীবনই অশান্তিময় হইয়া পড়ে। তাই এই সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং স্বামীকেই বুঝ প্রবোধ দান করতঃ তাহার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। কারণ, দাম্পত্য জীবনে অধিক ক্ষমতার অধিকারী স্বামী; যাহার হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহার ঘাড়েই দায়িত্বের বোঝাও থাকিবে। সুতরাং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বামীকে অধিক ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে চাপ দিয়াছেন এবং স্বামীর সম্মুখে এই তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

স্ত্রীর সহিত খোশ গল্প

২০৪৬। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি গল্প শুনাইলেন। কোন এক অঞ্চলের) এগারজন মহিলা একত্রিত বসিয়া পরস্পর অঙ্গিকারে আবদ্ধা হইল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করিবে—তাহাতে কোন কিছু গোপন রাখিবে না।

প্রথমে একজন তাহার স্বামীর কুৎসা করিয়া বলিল— আমার স্বামী জীর্ণ শীর্ণ উটের গোশতের ন্যায়, (অর্থাৎ তাহার মধ্যে কোন প্রকার কোমলতা ও মাধুর্য্য মোটেই নাই,) তদুপরি তাহার হইতে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পর্ব্বৎ

শৃঙ্গ অতিক্রম করা তুল্য কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হয়। সহজ সুলভতার অভাবে অল্পে-তুষ্টিও জুটে না এবং মাধুর্য্যের অভাবে কষ্ট ভোগ করিতেও মনে চায় না।

দ্বিতীয় জনও তাহার স্বামীর কুৎসাই করিল যে—আমি আমার স্বামীর কোন আলোচনাই করিতে চাই না; আমার ভয় হয়, আমি তাহার সকল প্রকার দোষগুলি ব্যক্ত করা শুরু করিলে ক্ষান্ত হইতে পারিব না।

তৃতীয় জনও কুৎসাই করিল যে—আমার স্বামী অত্যন্ত বদ-মেযাজ, বদ খাছ্‌লত। আমি কিছু বলিলে তালাক দিয়া দিবে, আর চুপ থাকিলে অভাব অভিযোগে আবদ্ধ জীবন-যাপন করিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ জন বলিল, আমার স্বামী খুব শান্ত মেযাজের—গরমও নয় চেতনাহীনও নয়। তাহার জন্য ভীতও থাকিতে হয় না এবং বিষন্ন হতাশও হইতে হয় না।

পঞ্চম জন বলিল, আমার স্বামী বাহিরে ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জনশীল, কিন্তু ঘরের ভিতরে নেকড়ের ন্যায় অলস। বিশেষ চেতনাও নাই কৈফিয়ত তলবও নাই।

যষ্ঠ জন বলিল, আমার স্বামী পানাহারে রাক্ষস স্বভাবের—খাওয়ার সময় সব কিছুই খাইয়া ফেলে, পান করার সময় সবটুকুই নিঃশেষ করিয়া ফেলে। আর বিছানায় শুইলে পর হাত-পা আবদ্ধের ন্যায় জড় হইয়া পড়িয়া থাকে—প্রানাগ্নি নিরসনে হাতও ছোঁয়ায় না।

সপ্তম জন বলিল, আমার স্বামী সব দিক দিয়াই অজ্ঞ, নিষ্কর্ম্মা, নির্ব্বোধ, সর্ব্ব রোগের রোগী। এমন গোয়ার যে, মাথা ফাটাইয়া ফেলে বা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে; অনেক সময় উভয় রকমে জখমী করিয়া দেয়।

অষ্টম জন বলিল, আমার স্বামী অত্যন্ত কোমল—যেন খরগোশ এবং অত্যন্ত সুগন্ধময়—যেন জাফরান।

নবম জন বলিল, আমার স্বামী—আলীশান তাহার ইমারত, সুদীর্ঘ তাহার কায়া, দান-ছাখাওত তাহার অধিক, গৃহ তাহার সকলের মজলিস-ঘর।

দশম জন বলিল, আমার স্বামীর নাম মালেক। তাহার প্রশংসা কি শুনাইব? সে হইল সকলের উর্দ্ধে। তাহার উটগুলি গোশালার মধ্যে সংখ্যায় বেশী, কিন্তু মাঠে-ময়দানে সংখ্যায় কম, (অর্থাৎ মুসাফিরগণকে জবেহ করিয়া করিয়া খাওয়াইবার জন্য বেশীর ভাগ উটই ঘরে বাঁধিয়া রাখে।) আমোদ-স্ফুর্ত্তীর বাদ্য-বাজনা শুনিলেই উটগুলি মনে করে যে, তাহাদের আয়ু শেষ হইয়াছে।

একাদশ রমণীটি বলিল, আমার (প্রথম) স্বামীর নাম ছিল আবু জরা' তাহার প্রশংসার শেষ নাই। সে আমার কান (পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ) অলঙ্কারে বোঝাই করিয়া দিয়া ছিল এবং সুখাদ্যের আধিক্য দ্বারা আমাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিল।

সর্ব্ব দিক দিয়া সে আমার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া ছিল, এমনকি সন্তুষ্টিতে আমি তৃপ্ত হইয়া গিয়াছিলাম। আমাকে সে মরু প্রান্তের মেষপালক দরিদ্র পরিবার হইতে আনিয়া এমন ধনাঢ্য পরিবারে স্থান দিয়া ছিল যাহাদের ঘোড়া আছে উট আছে এবং শস্য-ফসল ইত্যাদির প্রাচুর্য্য। উহা আহরণের সব শ্রেণীর চাকর-মজুরও তাহাদের সর্ব্বদা বিদ্যমান। আমার প্রতিটি কথাই তাহার নিকট গৃহিত ছিল। দিনের আলো আসা পর্য্যন্ত আমি শুইয়া থাকিলেও কোন বাধা ছিল না।

আমার যে শ্বাশুরী ছিলেন তাঁহার গুণের অন্ত নাই। তাঁহার গাঁটুরী ভরা কাপড়, বস্তা ভরা খাদ্য শস্য। গৃহ তাহার অতিশয় সুপ্রশস্ত।

আমার স্বামীর অপর স্ত্রীর পক্ষে একটি ছেলে ছিল, তাহার গুণাবলীও অপরিসীম। আহার নিদ্রায় সে অতিশয় অল্পে তুষ্ট।

তাহার একটি মেয়েও ছিল, তাহার গুণাবলীও অতুলনীয়। মাতা-পিতার অতিশয় বাধ্য। ঘাগরায় আঁটেনা এমন হৃষ্টপুষ্ট। তাহার গুণাগুণ প্রতিবেশীনীদের জন্য অসহনীয়।

তাহার একটি দাসী ছিল, তাহার প্রশংসাও অনেক—সে ঘরের কথা বাহিরে নেয় না, (চুরি-ছোছামী ইত্যাদি দ্বারা) খাদ্য চিজ-বস্তুর কোন ক্ষতি করে না, ঘরে কোন আবর্জ্জনা থাকিতে দেয় না।

এই একাদশতমা রমণীটি তাহার স্বামী আবু-জরা'র প্রশংসা বর্ণনা করিয়া অতঃপর বলিল, এক সময় আবু-জরা' বিদেশ ভ্রমনে বাহির হইল, অথচ তখন দেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, (কিন্তু আমার ভাগ্য-বিড়ম্বন—) ঐ সুযোগে অন্য একটি নারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। নারীটির পূর্ব্ব স্বামীর পক্ষে দুইটি ছেলে ছিল নেকড়ে বাঘের ন্যায়, তাহারা তাহাদের মাতার সহিত খেলা করিতে ছিল। ঐ সময় আমার স্বামী আবু-জরা' তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া আমাকে তালাক দিয়া দিল।

ঐ স্বামীর পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছি। সেও সর্দ্দার শ্রেণীর, অতিশয় বাহাদুর, সে বহু রকম পশু পালের মালিক, আমাকেও সব রকমের এক এক জোড়ার মালিক বানাইয়া দিয়াছে এবং আমাকে অবাধে খাওয়া-পরার সুযোগ দিয়া রাখিয়াছে। এমনকি খাদ্য সামগ্রী আমার বাপের বাড়ীতে পাঠাইবারও অনুমতি দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রদত্ত সমুদয় সম্পদ-সামগ্রী একত্রিত করিলে তাহা প্রথম স্বামীর প্রদত্ত সম্পদের ছোট এক অংশের সমতুল্যও হইবে না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই খোশ-গল্পটি শুনাইয়া আমাকে বলিলেন, (উল্লেখিত স্বামীদের মধ্যে তুলনা মূলকভাবে একাদশ-তমা রমণীটির প্রথম স্বামী আবু-জরা' তাহার জন্য যেরূপ ছিল (আদর যত্নে) আমিও তোমার

পক্ষে তদ্রূপ। (আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক উত্তম। হযরত (দঃ) আয়েশার উক্তির সমর্থনে রশিকতাময় একটা দিকের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উভয়ের পার্থক্য এই যে, আবু-জরা' তাহার ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়া ছিল, আমি তোমাকে তালাক দিব না। ফতহুল-বারী ৯—২৩৫ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—সতী নারীদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহারা মানবীয় সমুদয় মনোবৃত্তি ও মনের স্বাদ মিটাইবার জন্য একমাত্র স্বামীকেই অবলম্বনরূপে ব্যবহার করে। সতীত্বহারা নারীরা মানবীয় মনোবৃত্তি ও স্বাদ মিটাইবার জন্য বেগানাদের সঙ্গে রং-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা ও খোশ-গল্প ইত্যাদিতে মাতোয়ারা হইয়া থাকে। সতীত্বাবলম্বীনী নারীগণ মানবীয় মনোবৃত্তি ও স্বাদকে একেবারে মুলোচ্ছেদও করিয়া দিতে পারে না আবার বেগানার সঙ্গেও যাইতে পারে না। সুতরাং স্বামীদের কর্ত্তব্য জায়েযের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া স্ত্রীদের মানবীয় মনোবৃত্তির আগ্রহ পুরণের ব্যবস্থা ও সুযোগ প্রদান করা। উল্লেখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিবি আয়েশার সহিত খোশ-গল্প করিয়া সেই ছুন্নতই দেখাইয়াছেন।

হযরত(দঃ) যে গল্পটি শুনাইয়াছেন উহার মধ্যে মস্ত বড় শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে। নারী সমাজের মানবীয় পীপাসা কি ধরণের, স্বামীর তরফ হইতে তাহারা কিরূপ ব্যবহার পাইতে চায় তাহা তাহাদেরই মুখে এই গল্পের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার হইতে পৃথক থাকা

এসম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন ক্ষেত্রবিশেষে স্বামী স্ত্রী হইতে পৃথকভাবে ভিন্ন ঘরে থাকিতে পারে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একবার স্বীয় বিবিগণের প্রতি রাগ হইয়া ভিন্ন গৃহে দ্বিতল কক্ষে দীর্ঘ একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৭৫নং হাদীছ দ্রঃ)।

এই ব্যাপারে বোখারী (রঃ) আর একটি হাদীছের ইঙ্গিত দিয়াছেন—ঐ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রীর প্রতি রাগ হইয়া পৃথক থাকিতে হইলে একই গৃহে পৃথক বিছানায় থাকিবে; (পৃথক গৃহে চলিয়া যাইবে না।) পবিত্র কোরআনেও এই ব্যবস্থারই ইঙ্গিত আছে। ৫ পাঃ ছুরা নেছা ৩৪ আয়াতে আছে—"স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখিলে তাহাকে নছিহৎ ও উপদেশ দান কর এবং বিছানায় তাহাকে পৃথক রাখ।"

ইমাম বোখারীর মতামত এই হাদীছ ও আয়াতের ইঙ্গিতের পরিপন্থি নহে। কারণ, অবস্থা ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা আছে। যে ক্ষেত্রে এরূপ আশঙ্কার অবকাশ অনুভূত হয় যে, স্বামী পৃথক ঘরে অবস্থান করিলে স্ত্রী উহাকে সুযোগরূপে গ্রহণ

করিবে সেই ক্ষেত্রে কখনও পৃথক ঘরে যাইবে না। প্রয়োজন মনে করিলে বিছানা পৃথক বা একই বিছানায় বিছিন্নভাব নিয়া থাকিবে। আর যে ক্ষেত্রে এরূপ আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই, বরং পৃথক গৃহের বিচ্ছেদ যাতনা স্ত্রীকে অধিক শায়েস্তা করিবে সেইরূপ ক্ষেত্রে পৃথক গৃহে থাকায় কোন বাধা নাই।

স্বামীর উপস্থিতিতে নফল রোযা

২০৪৭। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী তাহার স্বামী বাড়ী উপস্থিত থাকাকালে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে নফল রোযা রাখিবে না।

২০৪৮। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَاْذَنُ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَدّٰى اِلَيْهِ شَطْرُهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নাই যে, স্বামীর উপস্থিতকালে সে নফল রোযা রাখে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে। কোন স্ত্রী তাহার ঘরে কোন লোককে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে না স্বামীর অনুমতি ব্যতীত। আর (স্বামীর চিজ-বস্তু হইতে) স্ত্রী যাহা দান-খয়রাত করিবে, (স্বামীর বিনা আদেশ বিনা খবরে হইলেও) স্বামী উহার অর্দ্ধেক ছওয়াব পইবে।

ব্যাখ্যাঃ—স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ছওয়াবের সমষ্টির তুলনায় এক এক জনের ছওয়াবকে অর্দ্ধেক বলা হইয়াছে। বস্তুত: প্রত্যেকটি পূর্ণ ছওয়াব।

লা'নতের পাত্রী স্ত্রী

২০৪৯। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ اَنْ تَجِيْئَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, স্বামী তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আসিবার জন্য ডাকিলে যদি স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়) তবে ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন।

২০৫০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ

زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ

অর্থ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর বিছানা ত্যাগ করতঃ রাত্রি যাপন করিলে ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীর প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন যাবৎ না সে স্বামীর বিছানায় ফিরিয়া আসে।

নারীদের প্রতি বিশেষ সতর্কবাণী

২০৫১। হাদীছঃ— عن اسامة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ وَكَانَ عَامَّةُ

مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ

قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

অর্থ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত পরিদর্শনকালে আমি বেহেশতের দ্বারে দাঁড়াইলাম (এবং তথাকার যে সব তথ্য আমি জ্ঞাত হইলাম সে অনুসারে) বেহেশত লাভকারীদের মধ্যে ঐ লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে যাহারা দুনিয়াতে দরিদ্রতার মধ্যে (ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত) জীবন কাটাইয়াছে ; ধনিগণ ত তাহার হিসাব-নিকাশদানে আবদ্ধ থাকিবে, (তাই তাহাদের বেহেশতে প্রবেশ বিলম্বিত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা দোযখী তাহাদিগকে অবিলম্বেই দোযখে পৌঁছাইবার আদেশ করা হইবে। তদ্রূপ দোযখ পরিদর্শন-কালে আমি দোযখের দ্বারে দাঁড়াইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, দোযখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে।

২০৫২। হাদীছঃ— عن عمران رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اطلعت فى الجنة فرأيت اكثر

اهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت اكثر اهلها النساء

অর্থ—এমরান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি বেহেশত পরিদর্শন করিয়াছি (এবং উহা লাভকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছি) যে, উহা লাভকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের। দোযখকেও দেখিয়াছি (ও জ্ঞাত হইয়াছি) যে, তথায় প্রবেশকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে নারীদের।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একবার স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মে'রাজ তথা উর্দ্ধ জগত পরিভ্রমনে গিয়া ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার মহান কুদরতের বহুবিধ নিদর্শন সমুহের মধ্যে বেহেশত-দোযখও পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিদ্রাবস্থায় একাধিকবার উর্দ্ধ জগত পরিভ্রমন ও বেহেশত-দোযখ পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। নবীদের সাধারণ স্বপ্নও অকাট্য ওহী; তদ্দরুণ এই পরিভ্রমনকেও মে'রাজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের ঘটনা সেই কোনও পরিভ্রমন ও পরিদর্শনেরই ঘটনা।

স্ত্রীকে মার পিট করা

মোছলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্জ কালে আরাফার ময়দানে লক্ষাধিক লোক সমাবেশে যে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়া ছিলেন উহাতে হযরত (দঃ) বিশেষরূপে নারীদের আলোচনাও করিয়াছিলন যে—

فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم

فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا

تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم

رزقهن وكسوتهن بالمعروف -

"হে লোক সকল! তোমরা স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লার ভয় দেলে জাগরুক রাখিও। স্মরণ রাখিও, তোমরা আল্লার নামে নিরাপত্তার ওয়াদা-অঙ্গিকারের উপর তাহা-

দিগকে করায়ত্ত করিয়াছ এবং আল্লার (নির্দ্ধারিত) কালামের সাহায্যে তাহাদের ইজ্জৎ-আবরুর অঙ্গ পর্য্যন্ত নিজের জন্য হালাল করিয়া নিতে পারিয়াছ। অবশ্য তোমাদের জন্য তাহাদের জিম্মায় এই দায়িত্ব রহিয়াছে যে, তাহারা কাহারও সঙ্গে অবৈধ মেলা-মেশা করিবে না—যাহা কখনও তুমি বরদাশত করিতে পার না। যদি তাহারা সেই দায়িত্বে অবহেলা করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য মারিতে পারিবে, কিন্তু তাহা এইরূপ কঠিন হইতে পারিবে না যদ্দ্বারা শরীর ক্ষত কিংবা শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়। আর তাহাদের জন্য তোমাদের জিম্মায় রহিয়াছে ন্যায় পরায়ণতার সহিত খোরাক পোষাক সরবরাহ করা।"

আলোচ্য হাদীছের বিষয়-বস্তুট পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে :—

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ......إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"স্বামীর প্রধান্য রহিয়াছে স্ত্রীর উপর এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর উপর শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে। এই জন্য সৎস্বভাবা স্ত্রীগণ স্বামীর বাধ্যগত জীবন-যাপন করিয়া থাকে এবং স্বামীর অনুপুস্থিতিতেও আল্লাহকে ভয় করিয়া (স্বামীর মান-ইজ্জৎ ও ধন-সম্পদের) হেফাজত ও সুরক্ষা করিয়া থাকে। (উক্ত গুণের বিপরীত) যদি তোমরা কোন স্ত্রীর অবাধ্যতার সম্মুখীন হও, তবে প্রথমে তাহাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া নছীহত কর এবং (আরও অধিক কড়া-কড়ির আবশ্যক হইলে তাহার প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ) তাহার বিছানা ছাড়িয়া ভিন্ন বিছানায় থাক এবং (আরও আবশ্যক হইলে) তাহাদিগকে মারিতে পার। ইহাতে যদি স্ত্রী বাধ্য হইয়া যায় অতঃপর আর তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য অজুহাত তালাশ করিও না। স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ সকলের উপরে ও উর্দ্ধে।" (৪ পারা ৩ রুকু)

আবু দাউদ শরীফে আর এক খানা হাদীছ আছে :—

এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের কি হক্ক আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার খাওয়া-পরার ন্যায় স্ত্রীরও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাকে চেহারার উপর মারিতে পারিবে না, তাহাকে গালি-গালাজ করিতে পারিবে না, (কোন ব্যাপারে রাগতঃ তাহার সংশ্রব ত্যাগ করার) আবশ্যক হইলে অবশ্যই এক ঘরের মধ্যে থাকিয়া শুধু বিছানা ত্যাগ করিবে।

২০৫৩। হাদীছ :— عن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد

الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে যময়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও পক্ষে স্বীয় স্ত্রীকে দাস-দাসীর ন্যায় মার-পিট করা কিছুতেই সঙ্গত নহে ; কিছুক্ষণ পরেই—দিনের শেষে সে তাহার সহিত আবার মিলিত হইবে, সহবাস করিবে।

স্বামীর আদেশ হইলেও স্ত্রী শরীয়ত বিরোধী কার্য্য করিবে না

২০৫৪। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীনী এক মোসলেম নারী তাহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া ছিল ; রোগের দরুণ মেয়েটির মাথার চুল ঝড়িয়া গিয়াছে। ঐ নারীটি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমার মেয়ের স্বামী বলিতেছে, তাহার মাথায় অন্য চুল লাগাইয়া দিতে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ কাজ তুমি করিও না, কারণ ঐ কাজ যাহারা করে তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ।

ব্যাখ্যাঃ—অন্য চুল বা নকল চুল মাথায় লাগান সম্পর্কে শরীয়তের মছআলাহ কি, তাহা পোষাক পরিচ্ছেদের অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ তায়ালা বর্ণিত হইবে।

স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে নিজের হক্ক ছাড়িয়া দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ـ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

"কোন নারী যদি আশঙ্কা করে স্বীয় স্বামীর নিকট বিরাগ ভাজন ও নিস্পৃহ হওয়ার, তবে সেই স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পর মীমাংসা করিয়া নেওয়া নিন্দনীয় হইবে না ; মীমাংসা অতি উত্তম।"

আয়েশা (রাঃ) উক্ত আয়াতের মর্ম্ম বুঝাইতে যাইয়া বলেন, যেমন—কোন নারী এক স্বামীর নিকট আছে, সেই স্বামী তাহার প্রতি আকৃষ্ট নয়, ফলে সে তাহাকে তালাক দিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় ঐ নারী স্বামীর সহিত মীমাংসা কল্পে স্বামীকে বলিতে পারে যে, আপনি আমাকে তালাক দিবেন না, আমাকে আপনার নিকট রাখুন এবং অপর বিবাহও করিয়া নিন ; আপনার উপর আমার খোর-পোশের কোন দাবী থাকিবে না, এমনকি দাম্পত্ত জীবন-যাপনে সমতা রক্ষার দায়িত্ব হইতেও আপনি মুক্ত।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এইভাবে স্বীয় হক্ক ত্যাগ করিয়া হইলেও স্বামীর সঙ্গে মীমাংসায় উপনিত হওয়ার পরামর্শ দানই উক্ত আয়াতের তাৎপর্য্য।

আ'যল্ তথা গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে বীর্য্যপাত জনন্দ্রিয়ের বাহিরে করা ঃ

২০৫৫। ছাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে আমরা"আয্‌ল্"করিয়া থাকিতাম।

(অর্থাৎ ঐরূপ করা নাজায়েয হইলে কোরআন শরীফে উহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা থাকিত বা হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক উহা নিষিদ্ধ বলা হইত।)

২০৫৬। ছাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদে শত্রু পক্ষের লোক আমাদের হাতে বন্দী হইল। (নারী বন্দীনীদের সুব্যবস্থাপনা কল্পে শরীয়ত সম্মত বৈধ সম্পর্ক সূত্রে) তাহারা আমাদের করায়ত্তে আসিলে পর আমরা নিজ নিজ প্রাপ্ত রমণীকে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে আমরা আ'যল্ করিয়া থাকিতাম। এই সম্পর্কে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) চমকিত স্বরে বলিলেন, أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ "আচ্ছা! তোমরা এরূপ করিয়া থাক? হযরত (দঃ) পূনঃ পুনঃ তিনবার এইভাবে প্রশ্ন করিলেন এবং আরও বলিলেন—

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

"কেয়ামত পর্য্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হওয়া (আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি লোক অবশ্য অবশ্য জন্ম লাভ করিবেই।"

ব্যাখ্যা ঃ—যুদ্ধে বন্দীনী নারীদের জন্য ইসলাম এইটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা রাখিয়াছে। তাহাদিগকে প্রাণে বধ করার ব্যবস্থা রাখা হইলে তাহা হইত নিষ্ঠুর জংলী পশুর কার্য্যের পরিচয়। আর চিরজীবন বন্দীনীরূপে রাখা হইলে তাহা হইত তাহাদের ধ্বংসেরই নামান্তর। এতদ্ভিন্ন রাষ্ট্রের কাঁধে এক বিরাট বোঝা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকিত। আর এই আকর্ষণময়ী শ্রেণীর বিরাট দলকে দেশে ও সমাজে লাগামহীনরূপে বিচরণ করিতে দেওয়া হইলে তাহা হইত সমাজ বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর ব্যধির অপ্রতিরোধ্য বীজাঙ্কুর ছড়াছড়ি। আর বিজাতীয়া, বিদেশীণী, সহসা আগতা দলে দলে নারীগণকে দাম্পত্য পদের ন্যায় বিরাট দায়িত্বের পদে বহাল করার সুযোগ প্রাপ্তিও সহজ-সাধ্য নহে। এই সব দিক লক্ষ্য করিয়া এই নারীদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা-দীক্ষা এবং সুব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাদের প্রতি-

পালনের জন্য ইসলাম এই শ্রেণীর নারীদের পক্ষে দাম্পত্য সূত্রের ন্যায় মালিকানা সূত্রের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অর্থাৎ মাতা-পিতা বা কোন মুরব্বি ওলী কর্তৃক যেরূপে কোন রমণী দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধারূপে কোন পুরুষের হস্তে অর্পিত হয় এবং তখন ঐ পুরুষের জন্য ঐ রমণীকে ব্যবহার করা হালাল হইয়া যায়, তদ্রূপ বন্দীনীরূপে আগতা নারীগণকে শাসনকর্ত্তা খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিক ভাবে মালিকানা সূত্রে আবদ্ধারূপে ঐ লোকদের হস্তে অর্পন করিবে যাহারা কষ্ট-ক্লেশের সহিত ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ স্বীয় কষ্টে অর্জ্জিত বস্তুর অধিক যত্ন নিয়া থাকে, মাগনা ও মুফ্‌ত পাওয়া বস্তুর কোন যত্ন নেওয়া হয় না। সুতরাং ঐ নারীদের সুযত্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ নারীদের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের বিরাট ব্যয় ও দায়িত্ব বহনে মালিককে আকৃষ্ট করার জন্য মালিকের পক্ষে ঐ নারীকে "কনীয" রূপে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করা ত জায়েয ও হালাল করা হইয়াছেই, এতদ্ভিন্ন তাহার হস্তান্তরের দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ গ্রহণকেও জায়েয রাখা হইয়াছে। এস্থলে শরীয়তের একটি বিধান রহিয়াছে এই যে, কোন কনীয স্বীয় মালিকের ঔরষে সন্তান জন্ম দান করিলে তাহার হস্তান্তরের অবকাশ আর থাকে না।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার বৃত্তান্ত এই ছিল যে—জেহাদ উপলক্ষে দীর্ঘ দিন বিদেশে থাকিয়া ছাহাবীদের স্বাভাবিক মানবীয় উত্তেজনার উদ্রেক অবস্থায় শরীয়ত সম্মত হালাল রমণী লাভের পর তাহা ব্যবহার করার আগ্রহ তাঁহাদের নিশ্চয়ই হইল। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা পরিবার-পরিজনপূর্ণ সংসারী ছিলেন—স্ত্রীর ন্যায় স্থায়ী বোঝা পরিবর্দ্ধনের অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না, তাই তাঁহারা ঐ রমণীদিগকে এমন ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ চাহিতেন যাহাতে তাহারা গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক হস্তান্তরের অনুপোযোগী না হইয়া পড়ে। এতদুদ্দেশ্যে গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য তাহাদের কেহ কেহ আ'য্‌ল-ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ বা কেহ ঐ ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছায় পূর্ব্বাহ্নে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) বিস্ময়ের স্বরে তাহাদের উপর প্রশ্ন চাপাইয়া উক্ত কার্য্যের প্রতি বিরাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, অতঃপর উক্ত প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতা উল্লেখ পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিলেন যে, এরূপ প্রচেষ্টা বস্তুতঃ আল্লার নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার প্রচেষ্টা স্বরূপ যাহা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুনিয়া উপায়-উপকরণের জগত ; এস্থলে উপায়-উপকরণ ব্যবহার ও অবলম্বন করা, যেমন—রোগ ও ব্যধি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিকিৎসা এবং ঔষধ ব্যবহার করা, কোন বিপদ-আপদ

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা দোষনীয় নহে, বরং শরীয়তও উল্লেখিত স্থান সমূহে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের আদেশ করিয়া থাকে। অথচ ঐসব ক্ষেত্রেও তক্দীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ অবশ্যই বিদ্যমান আছে; ঐ সব ক্ষেত্রে ত আল্লার নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার নামে উপায়-উপকরণ ব্যবহার করাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ সাব্যস্ত করতঃ উহা হইতে নিরোৎসাহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রে ত উপায়-উপকরণ ব্যবহারে নিরোৎসাহিত করা হয় না।

উত্তর—সর্ব্ব ক্ষেত্রেই তক্দীর বা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারণ বাস্তবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম উপায়-উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উপায়-উপকরণরূপে কোন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আল্লারই নির্দ্ধারণে হইতে হইবে। অতএব কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপায়-উপকণরূপে কোন ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করিতে আল্লাহ তায়ালার তথা শরীয়তের সমর্থন অত্যাবশ্যক। নিজেদের মনগড়ারূপে যে কোন ব্যবস্থাকে উপায়-উপকরণের নামে গ্রহণ করা চলিবে না। যেমন, কোন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনুপান বা পথ্যের নামে কোন বস্তু গ্রহণ করিতে গেলে তাহা চিকিৎসকের নির্দ্ধারণেই হইবে—মনগড়ামতে করা অন্যায় হইবে।

আল্লাহ তায়ালা রোগ মুক্তির জন্য ঔষধকে উপায়-উপকরণের শ্রেণীতে রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রসুল (দঃ) তাহা আমাদিগকে জ্ঞাতও করিয়াছেন যে مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهٗ شِفَاءً "আল্লাহ তায়ালা যে কোন রোগই সৃষ্টি করিয়াছেন উহার জন্য প্রতিষেধকও সৃষ্টি করিয়াছেন।" (বোখারী)

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রহিয়াছে; সঠিকরূপে রোগের উপর ঔষধ পড়িলে আল্লার হুকুমে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।" (মোসলেম শরীফ)।

আবু দাউদ শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে—ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা ঔষধ ব্যবহার করিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়—হে আল্লার বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর; আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই যাহার প্রতিষেধক তিনি দান না করিয়াছেন, অবশ্য বার্দ্ধক্যের কোন ঔষধ তিনি পয়দা করেন নাই।

তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ -

"ইয়া রস্থলুল্লাহ ! আমরা যে, তাবীজ-গণ্ডা, ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করিয়া থাকি, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকি এবং বিভিন্ন প্রকার রক্ষা-কবচ অবলম্বন করিয়া থাকি—এই সব বস্তু-ব্যবস্থা কি আল্লার তক্দীর বা নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ করিতে পারে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, এই সব ব্যবস্থা (উপায়-উপকরণরূপে) আল্লাহ তায়ালা কর্তৃকই নির্দ্ধারিত, (অতএব ঐ দৃষ্টিতে উহা অবলম্বন করিতে হইবে।)"

পক্ষান্তরে কাহারও জন্ম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা যে, উপায়-উপকরণরূপেও সৃষ্টিকর্ত্তা বিধানকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সমর্থনীয় নহে তাহা আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বক্ষ্যমান হাদীছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কাহারও জন্ম প্রতিরোধের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা গর্ভনিরোধ প্রচেষ্টাকে উপায়-উপকরণ পর্য্যায়েও রাখেন নাই * ইহা ব্যক্ত করাই উক্ত হাদীছের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা বিভিন্ন বাক্যমালায় হযরত (দঃ) প্রকাশ করিয়াছেন। মোছলেম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে, গর্ভনিরোধ ব্যবস্থাবলম্বন প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا سَتَكُوْنُ

"কেয়ামত পর্য্যন্ত যত জীবকে সৃষ্টি করা আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন উহার প্রত্যেকটি অবশ্য অবশ্যই অজুদ বা অস্তিত্ব লাভ করিবেই।"

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে :—

مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ

"সব বীর্য্যেই গর্ভ হয় না, আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন উহাকে প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই থাকে না।"

আর এক রেওয়ায়েতে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইহাও উল্লেখ আছে :—

---

* সরাসরি জন্ম প্রতিরোধ বা আল্লার উপর ন্যস্ত বিষয়ের অযথা আতঙ্ক ও কল্পিত আশঙ্কার বাহানায়—যাহা সরাসরি জন্ম প্রতিরোধেরই নামান্তর—ইহা ব্যতিরেকে যদি উপস্থিত স্বাস্থ্যগত বাস্তব আবশ্যকতায় চিকিৎসক ব্যক্তিবিশেষকে গর্ভনিরোধ প্রচেষ্টার পরামর্শ দেয় তবে তাহা চিকিৎসা বিভাগীয় বিধান ভুক্ত হইবে, যাহা সতন্ত্র বিষয়।

لا عليكم ان لا تفعلوا فانما هو القدر

"ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে তোমার ঘড়ে কোন অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়া যাইবে না, (যাহা চাপিতে না দেওয়ার উপায় থাকে।) কারণ, উহা (তথা সন্তানের জন্ম) একমাত্র তক্বদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।"

বলা বাহুল্য উল্লেখিত উক্তির উদ্দেশ্য যে, নিষেধাজ্ঞারই নামান্তর তাহা মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন— قوله لا عليكم اقرب الى النهى "উল্লেখিত বাক্য নিষেধাজ্ঞার অতি নিকট-বর্ত্তী।" ইমাম হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, والله لكان هذا زجر "খোদার কসম—তিরস্কারও ও ভৎর্সনা প্রয়োগ করাই উল্লেখিত উক্তির উদ্দেশ্য মনে হয়।"

অবশ্য আল্লার রসুল খোলা-খোলীরূপে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতঃ ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থাকে স্পষ্ট হারাম ঘোষিত করেন নাই; তাহা করা হইলে স্বাস্থ্যগত উপস্থিত কারণে বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাদানে যে, একক ও ব্যক্তিগতরূপে ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরীয়তে জায়েয রহিয়াছে সেই অবকাশটুকুও অতিশয় সাঙ্কীর্ণ হইয়া যাইত। মোসলেম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে—

ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها -

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে আ'য্‌ল-ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, কোন মানুষ ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন কেন করে? আল্লাহ তায়ালা যে জীবকে সৃষ্টি করা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাকে অবশ্যই সৃষ্টি করিবেন। হাদীছটির বর্ণনাকারী এখানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) উক্ত আলোচনার উত্তরে (কোন মানুষ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কেন করে?—এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন এবং উহার ব্যর্থতা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু) "কেহই তাহা করিতে পারিবে না" এরূপ খোলা-খোলী নিষেধাজ্ঞার শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।

হাদীছ বর্ণনা কারীর উক্ত তথ্যের মর্ম্ম ইহাই যে, স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার শব্দ ব্যবহার করিয়া হারাম বিঘোষিত করেন নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ফ্যামেলী প্লানিং-এর ন্যায় জাতিয় পরিকল্পনা ও জাতীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মরূপে বার্থ কন্ট্রোল বা গর্ভনিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রনের অভিযান এবং আলোচ্য "আ'য্‌ল" ব্যবস্থা অবলম্বন—এই দুইটির মধ্যে আকাশ-পাতাল অপেক্ষা অধিক ব্যবধান রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে দুইটি এত বড় ব্যবধান রহিয়াছে যে, তদ্দরুণ আলোচ্য আ'য্‌লকে জায়েয এবং তথা কথিত ফ্যামিলী প্লানিং-এর বার্থ কন্ট্রোলকে হারাম বলিলে তাহাও মোটেই অত্যুক্তি হইবে না।

প্রথম ব্যবধান—"আয্‌ল" হইল একটি নিছক এককরূপের ব্যক্তিগত কার্য্য যাহা ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মানুষ ছোট বা বড় কোন কারণে অবলম্বন করিবে, তাই হয়ত উহার প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় অসন্তুষ্টি এবং শুধু তিরস্কার ও ভৎ‌র্সনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রকাশ্যভাবে হারাম ঘোষিত করার শব্দ ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন এবং এতকুটু অবকাশ লক্ষ্যেই কাহারও মতে আ'য্‌লকে মোবাহ বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বার্থ কন্ট্রোল অভিযানকে জাতিয়-কর্ম্ম ব্যবস্থারূপে সমগ্র জাতিকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আর ইহা একটি সাধারণ সত্য যে, কোন একটা অন্যায় বা অপছন্দনীয় কাজ একক ও ব্যক্তিগতরূপ পর্য্যায়ে লঘু অন্যায়-অপছন্দনীয় গণ্য হইলেও উহা জাতিগত পর্য্যায়ে পৌঁছিয়া গেলে বা সে পর্য্যায়ে পৌঁছাইবার চেষ্টা করা হইলে তাহা বহু গুণ বড় অন্যায় পরিগণিত হইবে।

দ্বিতীয় ব্যবধান—বার্থ কন্ট্রোল অভিযানের মূল কারণ হইল সারা বিশ্বে বা দেশ-বিষেশে খাদ্য ঘাটতির অগ্রিম আশঙ্কা। হিসাব-নিকাশের দ্বারা দেখান হয় যে, জন-সংখ্যা বৃদ্ধির বর্ত্তমান হার দশ বা পনর বৎসর চলিতে থাকিলে বিশ্বের বা ঐ দেশের খাদ্যোৎপাদন শক্তি খাদ্যের চাহিদা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে; ফলে সারা বিশ্ব বা ঐ দেশ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইবে। সেই ভয়েই বলা হয় বার্থ কন্ট্রোলের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

এস্থলে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট দুইটি আয়াতের মধ্যেমে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার একটি নির্দ্দেশ অনুধাবন করুন। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ—

(১) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا - وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"হে আমার রসুল! আপনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করুন যে, তোমরা আস, আমি তোমাদিগকে পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার তোমাদের

জন্য হারাম করিয়াছেন। তোমরা কোন বস্তুকে তাঁহার শরীক সাব্যস্ত করিও না, আর মাতা-পিতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে (কখনও কোন খারাব ব্যবহার করিবে না,) আর সন্তানকে মারিয়া ফেলিও না দারিদ্র্যের কারণে ও অভাবের তাড়নায় ; আমি তোমাদের রিজিকেরও জিম্মাদার এবং তাঁহাদের রিজিকেরও জিম্মাদার। (৮ পারা ৫ রুকু)

(২) وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ..... وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ... وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا - إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ -

"তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার এই আদেশ-নিষেধগুলি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে—(১) তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা বা দাসত্ব করিবে না। (২) মাতা-পিতার সহিত সর্ব্বদা ভাল ব্যবহার করিবে। (৩) আত্মীয়দের হক তাহাদেরকে দিয়া দিবে এবং গরীব-মিছকিন, অসহায়কে সাহায্য দান করিবে। অপব্যয় করিবে না ; অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। (৪) ব্যয় করার মধ্যে একেবারে কঠিনও হইও না, একেবারে এমন উদারও হইও না যে, নিঃস্ব ও অক্ষম হইয়া বসিতে হয়। (৫) নিশ্চয় তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রিজিক প্রশস্ত করিয়া দেন, যাহার জন্য ইচ্ছা কবেন রিজিক সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। তোমরা তোমাদের সন্তান মারিয়া ফেলিও না দারিদ্র্যের ভয়ে ও অভাবের আশঙ্কায় ; আমি তাহাদের রিজিকের জিম্মাদার যেরূপ তোমাদের রিজিকেরও আমি জিম্মাদার।" (১৫ পারা ৩ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য আয়াতে পঞ্চম নম্বরে রিজিকের প্রশস্ততা এবং সাঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত ঘোষনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, দারিদ্র্যের ভয় ও অভাবের আশঙ্কা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বনরূপে জন সংখ্যা কমাইবার জন্য সন্তান নিধনের পথ অবলম্বন করিও না। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাস্তব তথ্যও জানাইয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের এবং ঐ সন্তানদের

সকলের রিজিকেরই ব্যবস্থাপক আমি। সুতরাং যে বিষয়ের ভার আমার উপর ন্যস্ত, তোমাদের উপর নহে সে বিষয়ের ভয় ও আশঙ্কায় তোমরা এতদুর অগ্রসর হইও না যে, সন্তান নিধন আরম্ভ কর। যেরূপ তোমাদের নিজেদের রিজিক যোগাইতে অক্ষমতার ভয় ও আশঙ্কা করিয়া তোমরা আত্মহত্যা আরম্ভ কর না বা তোমাদিগকে হত্যা করা হউক—এরূপ পরিকল্পনা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, রিজিক-দৌলৎ আল্লার হাতে, উহার ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ, এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতের ৩ ও ৪ নম্বরে ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পূর্কে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং অতঃপর ব্যয়-সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে সন্তান নিধনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিষয় আল্লার উপর ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উপায়-উপকরণের জগতে উপায় অবলম্বন করা আল্লারই বিধান, কিন্তু তাহা অবশ্যই আল্লার মর্জ্জি মোতাবেক হইতে হইবে, শুধু নিজেদের পরিকল্পনার দ্বারা উহা করা যাইবে না।

এস্থলে আরও একটি বিষয় বোধগম্য যে, বিনা অপরাধে কাহাকেও হত্যা করা মহা পাপ, ইহা একটি সাধারণ কথা এবং শরীয়তের বিধান। সন্তান নিধনও উহার আওতাভুক্ত, কিন্তু আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উহাকে ঐ দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও অপরাধ স্বাব্যস্ত করা হয় নাই,* বরং বলা হইয়াছে যে, যেহেতু রিজিকের ব্যবস্থা আল্লার উপর ন্যস্ত তাই রিজিকের অভাব আশঙ্কায় সন্তান সংহার তথা জন-সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না।

অন্ধকার যুগে আরবে এই প্রাথা ছিল যে, দারিদ্র্যের ভয়ে, অভাব-অনটনের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করিয়া থাকিত এবং এই ব্যবস্থাকে "وأد—ওয়াদ" বলা হইত। ইহা শুধু নিরপরাধীকে খুন করার অপরাধই ছিল না, বরং আল্লাহ তায়ালা যে জিনিষ নিজ জিম্মায় রাখিয়াছেন তথা রিজিক উহার অভাবের আশঙ্কা করিয়া সন্তান খুন করা ইহাই ছিল উক্ত অপরাধের বিশেষত্ব এবং এই সূত্রেই কেয়ামতের দিন নিরপরাধী হত্যার বিচার হইতে পৃথকভাবে উক্ত অপরাধের বিচার করা হইবে। ঐ শ্রেণীর হত্যাকৃত সন্তানদিগকে পৃথকভাবে উপস্থিত করিয়া হত্যাকারীদের মুখের

---

* অভাব আশঙ্কায় বা অভাবের তাড়নায় সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা যে, নর হত্যার অপরাধ হিসাবে নহে তাহার উজ্জল প্রমাণ উক্ত আয়াতদ্বয়েই বিদ্যমান রহিয়াছে। উভয় আয়াতেই নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর গণনায় উক্ত সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা উল্লেখের পরে ولا تقتلوا النفس التى حرم الله—"অর্থাৎ অন্যায়রূপে কাহাকেও হত্যা করিও না" বলিয়া ভিন্নভাবে নর হত্যার নিষেধাজ্ঞাও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং অভাব আশঙ্কায় সন্তান হত্যাকে নর হত্যা হিসাবে নিষিদ্ধ গণ্য করা মোটেই উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নতুবা উভয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করার কোন আবশ্যক ছিল না।

উপর তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের হত্যার ব্যাপারে কি অপরাধ ও অভিযোগ ছিল? কেয়ামতের দিন এই বিশেষ অনুষ্ঠানের উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে ঃ—

وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"কেয়ামতের দিনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান—যখন হত্যাকৃত সন্তানগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কি অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল?"

বলা বাহুল্য—বর্ত্তমান বার্থ কন্ট্রোল অভিযানের মূলেও ঐ অপরাধই রহিয়াছে যে, যে জিনিষটি আল্লাহ তায়ালা নিজ জিম্মায় রাখিয়াছেন অর্থাৎ রিজিক বা খাদ্য উহার অভাব আশঙ্কায় সন্তান বৃদ্ধি নিরোধের ব্যবস্থা করা হয়, যদিও এস্থলে জীব হত্যার ঘটনা নহে, কিন্তু অপরাধের মূল বিষয়টি এখানেও বিদ্যমান; এই সূত্রেই মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে ঃ—

سَأَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ الْوَءْدُ الْخَفِىُّ وَهِىَ وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ

অর্থাৎ—গর্ভ নিরোধের জন্য আয্‌ল ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহা গোপন "ওয়াদ"—তথা অভাব আশঙ্কায় সন্তান নিধন। আর অভাব আশঙ্কায় সন্তান নিধনের পরিণতি কোরআনের এই আয়াতে উল্লেখ আছে—وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতে দিন উক্ত কার্য্যের বিচার উপলক্ষে বিশেষরূপে আল্লাহ তায়ালার গজব বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাইবে। ইহার কারণ এই যে, উক্ত কার্য্য যাহারা করিয়াছে বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গুণ—رزاق সকলের আহার দাতা—ইহার প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বোধক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, যেহেতু অভাব প্রতিরোধের উপায়রূপেও উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন আল্লার তরফ হইতে ছিল না।*

---

* খাদ্যের অভাব আশঙ্কা যাহার দরুণ অন্ধকার যুগে সন্তান নিধন কার্য্য হইয়া থাকিত এবং উহা আল্লার গজব ও অসন্তুষ্টির বিশেষ কারণ রূপে সাব্যস্ত; উক্ত অভাব আশঙ্কার কারণে নয়, বরং অন্য কোন ওজর বা কারণে যদি এককরূপে ব্যক্তিগতভাবে আয্‌ল বা গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে তাহা ওয়াদ তথা খাদ্যাভাব আশঙ্কায় সন্তান নিধন পর্য্যায়ের অপরাধ ও গোনাহ পরিগণিত হইত না। এক হাদীছে যে, মোসলেম শরীফের আলোচ্য হাদীছের বিপরীত উল্লেখ আছে যে, আয্‌ল ওয়াদ গণ্য হইবে না—উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ইহাই।

উক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টত্যই প্রতীয়মান হইল যে, খাদ্যে অভাবের আশঙ্কা ও ভয়ে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম করা তথা জন সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধ প্রচেষ্টা—চাই উহা সন্তান নিধনের ন্যায় প্রকাশ্য বর্বর নীতির মাধ্যমে হউক বা গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থার ন্যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে হউক উভয়টিই নিষিদ্ধ এবং উভয়টিই পূর্ব্বোল্লেখিত পবিত্র কোরআনের আয়াতদ্বয়ের নিষেধাজ্ঞার মূল তাৎপর্য্যের আওতাভূক্ত।

পরিতাপের বিষয়—সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি নিরোধের ব্যাপারে অন্ধকার যুগে কাফের মোশরেক বে-ঈমানদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অর্থাৎ খাদ্যে অভাবের আশঙ্কা—যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পুনঃ পুনঃ স্বীয় ক্রোধ এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন বর্ত্তমান যুগের কাফের মোশরেকগণও ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়াই বার্থ কন্ট্রোল বা গর্ভ নিরোধ পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কাফের মোশরেকদের পক্ষে তাহা বিচিত্রও নহে মোটেই। কিন্তু মোসলমান হওয়ার দাবীদারগণও যে, সেই পরিকল্পনায় মাতিয়া উঠিয়াছে ইহাই হইল বিস্ময়ের ও পরিতাপের বিষয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে যাইয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালা শেরেক পরিহার ও এক আল্লার পূজারী হওয়ার ভূমিকা বর্ণনা করিয়াছেন যদ্দারা বুঝান হইয়াছে যে, উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা এক আল্লার পূজারী হওয়ার পরিপন্থী।

যুক্তিরূপে বর্ত্তমান জন সংখ্যা বৃদ্ধির উপর হিসাব-নিকাশের দ্বারা যে ভয়াবহ খাদ্যাভাবের আশঙ্কা দেখান হয় সেই যুক্তিও অবৈজ্ঞানিক। কারণ এই হিসাব দেখাইবার সময় ৫০ বৎসর পরের জন সংখ্যাকে ভূমির বর্ত্তমান খাদ্যোৎপাদন শক্তির পরিমাণের উপর দাঁড় করান হইয়া থাকে, অথচ এইরূপ হিসাব বিজ্ঞানের পরিপন্থী। কারণ, ইহা একটি চাক্ষুষ সত্য যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে ১০ মন খাদ্য উৎপাদিত হইত বর্ত্তমান বিজ্ঞান গবেষনায় আবিষ্কৃত রসায়নিক সার ব্যবহারে ঐ পরিমাণ জমিতেই ২০ মন পর্য্যন্ত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। বিজ্ঞানোন্নত দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে এই দাবী বাস্তব সত্যরূপে পরিলক্ষিত। এই সূত্রে এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যে সব বৈজ্ঞানিকদের গবেষনায় এই অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে যাহা না হইলে বার্থ কন্ট্রোল পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বেই সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষের শুধু আশঙ্কাই হইত না, বরং সর্ব্বগ্রাশী দুর্ভিক্ষ বাস্তবেই আসিয়া যাইত, এই সব বৈজ্ঞানিকদের পূর্ব্ব পুরুষদের আমলে যদি তৎকালীন উৎপাদন শক্তির পরিমাণের উপর ১০০ বৎসর পরের জন

সংখ্যা চা পাইয়া দিয়া খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় বার্থ কন্ট্রোল পরিকল্পনা গৃহিত এবং তাহাদের ধারণা ফল প্রসূ হইত তবে এই বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্যই জগতে জন্ম লাভের সুযোগ পাইত না।

বর্ত্তমান বার্থ কন্ট্রোল পরিকল্পনার দ্বারা দুনিয়াতে যে সব লোকের আগমন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যে, এমন এমন বৈজ্ঞানিক হইবে না যাহারা ১০ মণের ভূমিতে ২০ মণ উৎপাদনকারী সারের স্থলে ৪০ মণ উৎপাদনকারী সার আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে—তাহা কে বলিতে পারে ? বরং সেরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। ১০ মণ উৎপণ্যে যথেষ্ট এই পরিমাণ জন সংখ্যা থাকা কালে রিজিকের জিম্মাদার সৃষ্টিকর্ত্তা ঐরূপ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন না যে ১০ মণের ভূমিতে ২০ মণ উৎপাদনকারী সার আবিষ্কার করে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যখন উহার প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আবার যখন জন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা ২০ মণের স্থলে ৪০ মণ উৎপাদনকারী সার আবিষ্কারকারী বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিয়া দিবেন। যেরূপ কোন কারখানার কর্তৃপক্ষ তাহার কারখানার উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা মহান আল্লাহ তায়ালা কি তাহা করিবে না—وهو الحكيم الخبير "অথচ তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ ও নিপূন হেক্‌মতওয়ালা সূক্ষ্ম কৌশলী।

স্ত্রীদের মধ্যে ছফরের সঙ্গিনী লটারি দ্বারা নির্ণয় করা

২০৫৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন ছফরে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে হইলে সকল স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করিয়া সঙ্গিনী নির্দ্ধারিত করিতেন। এক ছফরে আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) ঐরূপে সঙ্গিনী নির্দ্ধারিত হইলেন।

আরবে সাধারণতঃ রাত্রিবেলায়ই পথ চলা হইয়া থাকে। পথ চলাকালে হযরত নবী (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে কথাবর্ত্তা বলিতেন। একদা হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমার উটের উপর বসুন আর আমি আপনার উটের উপর বসি ; একে অন্যের উটের ভ্রমন উপভোগ করিব। রাত্রে ভ্রমনকালে হযরত (দঃ) আয়েশার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার উদ্দেশ্যে তাঁহার উটের লক্ষ্য করিয়া আসিলেন, তথায় হাফ্‌ছাহ (রাঃ) ছিলেন, তাই এই রাত্রে হযরতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার সৌভাগ্যের সুযোগ হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) পাইলেন এবং আয়েশা (রাঃ) সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিলেন। (হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ)

এই উদ্দেশ্যেই বাহন বদল করিয়াছিলেন আয়েশা (রাঃ) তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে তিনি সবই উপলব্ধি করিলেন।) তাই নিজকে নিজে ভর্ৎসনা করিলেন, এমনকি ভোর বেলায় বিশ্রামের জন্য একস্থানে অবস্থান করিলে আয়েশা (রাঃ) এজ্‌খের নামক ঘাস-বনে পা রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে খোদা! আমাকে দংশিবার জন্য সাপ বা বিচ্ছু পাঠাইয়া দাও। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই ব্যাপারে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোনরূপ দোষ দিতে পারিতে ছিলাম না।

ব্যাখ্যা ঃ—একাধিক বিবাহের ছুন্নতের প্রতি অনেকেই লালায়িত হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার যে, আদর্শ হযরত (দঃ) রাখিয়া গিয়াছেন সেই ছুন্নতের উপর আমলকারী দেখা যায় কোথায়? স্ত্রীদের মধ্যে ছফরের সঙ্গিনী নির্ব্বাচনে সমতা রক্ষার বাধ্য বাধকতা শরীয়তে নাই, বরং ছফরের আবশ্যক পূরণ দৃষ্টে স্বামী সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিতে পারে, কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রেও লটারির সাহায্যে সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিতেন।

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হইবে

একাধিক স্ত্রী থাকিলে স্বামীর রাত্রি-যাপন তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা শরীয়তের বিধান। অন্যথায় একাধিক বিবাহ হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হইয়াছে। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ

اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

"তোমাদের পছন্দ মোতাবেক দুই দুই, তিন তিন, চার চার পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পার, অবশ্য যদি আশঙ্কা কর যে, একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে এক বিবাহের উপরই ক্ষান্ত হও" (৪ পারা ১২ রুকু)

স্ত্রীদের মধ্যে খোরপোষ, আচার-ব্যবহার এবং রাত্রি যাপন ইত্যাদি স্বীয় সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়াবলীতে সমতা রক্ষা করার পর মনের টান ও অন্তরের ভালবাসা যাহা কাহারও নিজ সাধ্যের বস্তু নহে উহার মধ্যে সমতা স্থাপনে বাধ্য করা হয় নাই। তাহাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

"তোমরা শত ইচ্ছা করিলেও স্ত্রীদের মধ্যে (মনের টান ও অন্তরের ভালবাসার দিক দিয়া) সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া একজনের প্রতি ঝুকিয়া পড়িয়া অপরজনকে দোদুল্যমান নিরবলম্বন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিও না। আর নিজের এছ্‌লাহ্‌ বা সংশোধন ও খোদার ভয় রাখিয়া চলিলে (আল্লাহ তায়ালা ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ মাফ করিয়া দিবেন ;) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু। (ছুরা নেছা—৫ পাঃ ১৬ রুঃ)

এক স্ত্রী তাহার ভাগ অপর স্ত্রীকে দিয়া দিলে

২০৫৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মুল-মোমেনীন সওদা (রাঃ) তাঁহার ভাগের দিন আয়েশা (রাঃ)কে দিয়াছিলেন ; সেমতে হযরত নবী (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে দুইদিন থাকিতেন—একদিন আয়েশার নিজ প্রাপ্য, অপর দিন সওদার ভাগের দিন।

কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীর মধ্যে সমতা

২০৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত—অকুমারী স্ত্রীর উপর কুমারী বিবাহ করিলে কুমারী নব পত্নীর গৃহে স্বামী প্রথমে একাধারে সাতদিন অবস্থান করিবে ; অতঃপর (সেই হিসাবেই) অন্য স্ত্রীকেও সুযোগ দান করিবে। আর কুমারী স্ত্রীর উপর অকুমারী বিবাহ করিলে প্রথমে তাহার গৃহে তিন দিন অবস্থান করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুটি শরীয়তের বিধানে ন্যায় এবং সমতা রক্ষার মধ্যেও সুব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নুতন-পুরাতন, কুমারী-অকুমারী—একাধিক সকল শ্রেণীর স্ত্রীদের মধ্যেই সমতা রক্ষা করা শরীয়তের বিধান। অথচ নব পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য এবং তাহার মন বসাইবার জন্য তাহার সহিত কিছুটা দীর্ঘ মেলা-মেশার আবশ্যক। অকুমারী যেহেতু পূর্ব্বেকারই স্বামীস্পর্শা, পক্ষান্তরে কুমারী সম্পুর্ণ স্বামী অস্পর্শা, তাই এই দুই শ্রেণীর পক্ষে উক্ত আবশ্যকতার ব্যবধানও সুস্পষ্ট। এই সব বিষয়ে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া ছুন্নত তরিকা এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট অবস্থানের দিন গণনার দিক দিয়া ত সমতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু নব পত্নীকে প্রথমে সুযোগ দান করিবে এবং সে কুমারী হইলে কম সংখ্যার বন্টন না করিয়া সাত দিনের ভাগ নির্দ্ধারিত করিবে, আর নব পত্নী অকুমারী হইলে তিন দিনের ভাগ নির্দ্ধারিত করিবে।

দিনের বেলা ভাগ-বণ্টন ব্যতিরেকে সকল স্ত্রীর সঙ্গে মেলা-মেশা করা যায়ঃ

২০৬০। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি আছর নামায হইতে অবসর হইয়া স্ত্রীগণের প্রত্যেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিতেন এবং প্রত্যেকের নিকটেই কিছু সময় অবস্থান করিতেন।

সতিনের সম্মুখে অতিরঞ্জিত সুখভোগ প্রকাশ করিয়া ফখর করা নিষিদ্ধঃ

২০৬১। হাদীছঃ—আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক মহিলা আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আমার একজন সতিন আছে। আমি তাহার সম্মুখে স্বামীর পক্ষ হইতে যাহা তিনি আমাকে দেন নাই তাহা লাভের অতিরঞ্জিত আস্ফালন দেখাইলে তাহাতে গোনাহ হইবে কি? তদুত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি এমন বস্তু লাভের আস্ফালন দেখায় যাহা সে বস্তুতঃ লাভ করে নাই সে আপাদ মস্তক মিথ্যাবাদী রূপেই পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীর প্রতি সৌহার্দ প্রদর্শনে আত্মাভিমান ত্যাগ করা

২০৬২। হাদীছঃ—আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট ছাহাবী জোবায়রের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার কোন ধন-সম্পত্তি, বান্দি-গোলাম ইত্যাদি কিছুই ছিল না। ছিল শুধু একটি ঘোড়া এবং পানি বহনের একটি উট। ঘোড়ার আহারের ব্যবস্থা করা, উটের পিঠে পানি বহন করিয়া আনা, পানি উঠাইবার জন্য ডোল সেলাই করিয়া লওয়া, রুটির জন্য আটা তৈরী করা ইত্যাদি সমুদয় কার্য্য আমাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। আমি ভালভাবে রুটি পাকাইতে জানিতাম না; আমার কতিপয় মদীনাবাসীনী পড়শী মহিলা আমার রুটি পাকাইয়া দিতেন। ঐ মহিলাগণ প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিশয় মহতী ছিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জোবায়েরকে এক খণ্ড জমি দিয়াছিলেন যাহা আমাদের গৃহ হইতে প্রায় এক মাইল দুর ছিল। (ঘোড়াকে খাওয়াইবার জন্য) ঐ জমি হইতে খেজুরের দানা সংগ্রহ করিয়া আমি নিজেই স্বীয় মাথায় বহন করিয়া আনিতাম। একদা আমি খেজুর দানা মাথায় বহন করিয়া আসিতেছিলাম, পথি মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সঙ্গে কতিপয় মদীনাবাসী ছাহাবী ছিলেন। হযরত আমাকে তাঁহার যানবাহনে ছওয়ার হওয়ার জন্য ডাকিলেন, কিন্তু আমি বেগানা পুরুষদের সঙ্গে চলিতে লজ্জা

বোধ করিলাম এবং আমার স্বামী জোবায়রের গায়রত এবং আত্মাভিমানও আমার স্মরণে আসিল। হযরত (দঃ) আমার লজ্জা-বোধ অনুভব করিতে পারিলেন এবং পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহে আসিয়া স্বামী জোবায়রের নিকট সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলাম এবং ইহাও বলিলাম যে, আপনার গায়রত এবং আত্মাভিমানও তখন আমার স্মরণে পড়িয়াছিল। ইহা শুনিয়া জোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, (আমার আত্মাভিমান থাকিলেও) হযরতের যানবাহনে ছওয়ার হইয়া আসা অপেক্ষা তোমার মাথায় খেজুর দানার বোঝা বহন করিয়া আনার পরিশ্রম আমার নিকট অধিক কঠিন ও বেদনায়ক মনে হইতেছে।

আস্মা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) আমার জন্য একজন চাকর পাঠাইয়া দিলে ঘোড়ার খেদমতের কাজ হইতে আমি হাঁপছাড়ার অবকাশ পাইলাম, তিনি যেন আমাকে মুক্তি দান করিলেন।

স্বামীর সঙ্গে অভিমান করা

২০৬৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, কোন্ সময় তুমি আমার প্রতি উৎফুল্ল থাক এবং কোন্ সময় ভারাক্রান্ত হও তাহা আমি অনুভব করিতে পারি। আমি আরজ করিলাম, আপনি তাহা কি ভাবে উপলব্ধি করেন ? হযরত (দঃ) বলিলেন, উৎফুল্ল থাকা কালে কোন কথায় শপথ করিতে এইরূপ বলিয়া থাক—মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম। আর ভারাক্রান্ত হওয়াকালীন এইরূপ বলিয়া থাক—ইব্রাহীম (আলাইহেচ্ছালাম)-এর প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম।

আমি আরজ করিলাম—এই কথা সত্য, কিন্তু কসম খোদার ইয়া রসুলাল্লাহ! (অভিমান স্বরূপ—) একমাত্র আপনার নামের উচ্চারণই ত্যাগ করিয়া থাকি, (আপনার প্রতি ভক্তি-মর্য্যাদা ও মহব্বতের মধ্যে কোন পার্থক্যই আসে না।)

সন্তানের প্রতি হামদর্দি প্রকাশ

২০৬৪। হাদীছ ঃ—মেছ্ওয়ার ইবনে মাখ্রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) আবুজহলের মেয়েকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছিলেন। ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা সেই সংবাদ জানিতে পাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনার আত্মীয়-স্বজনগণ বলিয়া থাকে যে, (আপনার মেয়েদেরকে কষ্ট দেওয়া হইলেও) আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষে হইয়া কাহারও প্রতি একটু রাগও দেখান না। ঐ দেখুন! আলী (রাঃ) আবু জহলের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন।

ইহা শুনিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন, ভাষণের আরম্ভে কলেমা-শাহাদৎ পাঠ করতঃ আবুল আ'ছ-এর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তাহার নিকট আমার এক মেয়ে বিবাহ দিয়াছিলাম। (আমি তাহাকে আমার মেয়ের জন্য কতিপয় কথা বলিয়াছিলাম; সেই উপলক্ষে) সে আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়াছে। (এখন আমি আমার মেয়ে ফাতেমা সম্পর্কে বলিতেছি যে,) নিশ্চয় ফাতেমা আমার কলিজার টুক্‌রা, তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। খোদার কসম—আল্লার রসুলের মেয়ে এবং আল্লার দুশমনের মেয়ে একই ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হইতে পারিবে না। হযরতের এই ভাষণের পর আলী (রাঃ) উক্ত বিবাহের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একটি ভবিষ্যদ্বানী স্বরূপ ছিল যাহা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল। ৪৩৮ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী উক্ত ভাষণের আরও কতিপয় উক্তির হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে সমুদয় জল্পনা-কল্পনার অবসান হইয়া যায়। হযরত (দঃ) এই কথাও বলিয়াছিলেন—

وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ

بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ اَبَدًا -

"নিশ্চয় আমি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করিতে চাই না, অবশ্য এই কথা বলিতেছি যে, খোদার কসম—আল্লার রসুলের কন্যা এবং আল্লার দুশমনের কন্যা কোন সময়ই একত্র হইবে না।"

এতদ্ভিন্ন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শুধু শ্বশুরই ছিলেন না, হযরত (দঃ) তাঁহার মুরব্বিও ছিলেন। বিবাহ শাদীর ব্যাপারে মুরব্বি শুধু জায়েয এবং হালালকেই দেখেন না। মুরব্বি তাহার কনিষ্ঠদের সাংসারিক জীবন-যাপনের সুখ-শান্তি ইত্যাদি সমুদয় ব্যাপারের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন; সেই সূত্রেই উপরোল্লেখিত ভাষণে হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন যে—

اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِىْ دِيْنِهَا

"ফাতেমা আমার কলিজার টুক্‌রা। আমার ভয় হয়—(আলী আবু জহলের মেয়েকে বিবাহ করিলে) ফাতেমার সঙ্গে তাহার এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, (স্বামী হিসাবে ফাতেমার উপর আলীর যে হক্ দ্বীন ও ধর্ম্মীয়রূপে রহিয়াছে

সেই) দ্বীন ও ধর্মীয় কর্ত্তব্য পালনে ফাতেমা পদস্খলিত হইয়া পড়িবে ; (সেই ভাবে আলী ও ফাতেমার সুখের জীবন বিনষ্ট হইবে।)

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত বিবাহ প্রস্তাবে হযরত (দঃ) স্বীয় মুরব্বিয়ানা সূত্রের অধিকারও প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং ঐ ক্ষেত্রে হযরত (দঃ) তাঁহার উপর কঠোর চাপও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ঐ শ্রেণীর অধিকার এবং চাপ প্রয়োগেই উল্লেখ হইয়াছে—

২০৬৫। হাদীছ ঃ—মেছ্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন, (আবু জাহেল পারিবার—) বনী হেশাম তাহাদের মেয়েকে আলীর নিকট বিবাহ দিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছে। সেই অনুমতি আমি দিব না, দিব না, দিব না। হ্যাঁ—তবে যদি আবু তালেবের পুত্র (আলী) আমার মেয়েকে তালাক দিয়া তাহাদের মেয়ে বিবাহ করিতে চায়। ফাতেমা আমার কলিজার টুক্‌রা ; তাহার দুঃখে আমি দুঃখিত হই, তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই।

গায়ের-মহরম মহিলার সঙ্গে মেলা-মেশা করা

২০৬৬। হাদীছ ঃ— عن عقبة بن عامر رضى الله عنه

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ

অর্থ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার ! বেগানা নারীদের সঙ্গে মেলা-মেশা দেখা সাক্ষাৎ করিও না। এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। স্বামীর ভ্রাতাগণ ভ্রাতা-বধূর সহিত ঐরূপ করিতে পারে কি ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, স্বামীর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ত মৃত্যু তুল্য।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বামীর ভ্রাতা শ্রেণীর আত্মীয়দের সঙ্গে মেলা-মেশা, দেখা সাক্ষাৎকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অধিক মারাত্মক বলিয়াছেন। ইহা একটি যুক্তিযুক্ত কথা, কারণ বেগানা লোকদের অপেক্ষা ঐ শ্রেণীর আত্মীয়দের বেলায় বাধা-ব্যবধান কম বা না থাকার কারণে এস্থলে শয়তানের জন্য সুযোগ-সুবিধা অধিক রহিয়াছে, তাই এস্থলে অধিক সতর্কতার আবশ্যক।

২০৬৭। হাদীছ:— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলার নিকট তাহার মাহ্‌রাম পুরুষের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন বেগানা পুরুষ (পর্দ্দা অবস্থায়ও) যাইবে না। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার স্ত্রী এই বৎসর হজ্জ করিতে ইচ্ছা করে অথচ অমুক জেহাদের সৈন্য দলে আমার নাম লেখা হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ জেহাদের ছফর মুলতবী রাখিয়া তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জে যাও, (তাহাকে একাকী ছফর করিতে দিও না।)

প্রয়োজন ক্ষেত্রে জন শূন্য নির্জনে নয় লোকদের দৃষ্টি গোচরে মহিলার প্রয়োজন শোনা যায়

২০৬৮। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক মদিনাবাসীনী মহিলা তাহার সন্তানগণকে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (কোন প্রয়োজনে) আসিল। নবী (দঃ) তাহার প্রয়োজন শুনিবার জন্য তাহার সহিত ভিন্নভাবে আলোচনা করিলেন। এবং তাহাকে (আশ্বাস ও সান্তনা দানে) বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা (মদিনাবাসী) আমার নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়।

নারীবৎ পুরুষ হইতে পর্দ্দা করা

২০৬৯। হাদীছ:—উম্মুল-মোমেনীন উম্মে ছালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা তাঁহার নিকটে ছিলেন। তাঁহার গৃহে একজন মোখান্নাছ—নারীবৎ পুরুষ ছিল, সে উম্মে ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভ্রাতাকে বলিল, আগামী কল্য যদি আল্লাহ তায়ালা তায়েফ নগরী মোসলমানদেরে জয় করিতে দেন, তবে আমি তোমাকে তথাকার গায়লান নামক ব্যক্তির কন্যাটিকে দেখাইব (সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুগঠনের—) তাহার পেটের চামড়ায় কুঞ্চন শোভিত—সম্মুখ দিক হইতে চারটি এবং পিছন দিক হইতে (উভয় পার্শে) আটটি পরিদৃষ্ট হয়। ইহা শুনিয়া হযরত নবী (দঃ) উম্মে ছালামা (রাঃ)কে

লক্ষ্য করিয়া বিশেষ তাকীদের সহিত বলিলেন, এই ব্যক্তি কখনও যেন তোমাদের নিকট আসিতে না পারে।

ব্যাখ্যাঃ—নারীবৎ ও নারী স্বভাবের এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যাহাদের চাল-চলন আচার-ব্যবহার নারীদের অনুরূপই, এই শ্রেণীর পুরুষকে "মোখান্নাছ" বলা হয়। এই শ্রেণীর লোক অনেক সময় এরূপও হয় যে, শুধু বাহ্যিক অঙ্গ ও লিঙ্গের দিক দিয়া পুরুষ হইলেও তাহাদের নারীবৎ স্বভাব ও চাল চলনের ন্যায় আভ্যন্তরীন পুরুষত্ব-শক্তি ও মনোবৃত্তির দিক দিয়াও তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ হয় না। পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিকরূপে নারীর প্রতি যে শ্রেণীর আকর্ষণ থাকে তাহাদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর আকর্ষণের লেশ মাত্র থাকে না, বরং তাহারা নারীদের প্রতি সেই আকর্ষণ ও উহার মাধুর্য্যের কোন খোঁজ-খবরও রাখে না—সৃষ্টিগত ভাবেই তাহারা এই ধরণের হইয়া থাকে। তাহারা সাধারণতঃ আন্দর মহলে থাকিয়া মেয়ে মহলের কাজ করিয়া বেড়ায়। এই শ্রেণীর শুধু বাহ্যিক পুরুষদেরকে পবিত্র কোরআনে غير اولى الاربة নারীদের হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নাবালেগ ছেলে যাহাদের মধ্যে এখনও নারীদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিই হয় নাই তাহাদের শ্রেণীতে রাখিয়া উভয়ের জন্য পর্দ্দার বিধানে শিথিলতা রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে যে মোখান্নাছের উল্লেখ হইয়াছে তাহাকে উল্লেখিত শ্রেণীর শুধু বাহ্যিক পুরুষ গণ্য করা হইত এবং হযরতের আন্দর মহলে যাতায়াতে বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু তায়েফস্থিত গায়লানের মেয়ে সম্পর্কে সে যে উক্তি ও আকর্ষণীয় অঙ্গ সৌষ্ঠবের উল্লেখ করিল তাহাতে বুঝা গেল, সে-ত غير اولى الاربة—নারীদের হইতে নির্লিপ্ত উদাসীন নহে, নতুবা সে নারীর আকর্ষণীয় গুণের খবর রাখে কেন? তাই হযরত (দঃ) আন্দর মহলে তাহার প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

স্ত্রী স্বামীর নিকট বেগানা নারীর গুণাবলী বর্ণনা করিবে না

২০৭০। **হাদীছ**ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলা অপর মহিলার সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া আসিয়া স্বীয় স্বামীর নিকট উক্ত মহিলার ছবি-ছুরত ও আকৃতির গুণাবলী এইরূপে বর্ণনা করিবে না যেন তাহাকে স্বামীর চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে। (ইহার দ্বারা স্বামী ঐ মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে যাহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে।)

বিদেশ হইতে বিনা খবরে হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট পৌঁছিবে না

২০৭১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পুরুষের জন্য এরূপ করা না পছন্দ করিতেন যে, বিদেশ হইতে হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়।

২০৭২। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ বেশী দিন বিদেশে থাকার পর হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইবে না। (ইহাতে স্ত্রীকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পারে যাহাতে তাহার প্রতি ঘৃনা আসিয়া যায় বা স্ত্রীর অসতর্কতা বশে সন্দেহের সূচনা হইয়া ভয়াবহ পরিণামের সৃষ্টি হইতে পারে।)

২০৭৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—তুমি যদি রাত্রে বাড়ী পৌঁছ তবে তৎক্ষনাৎ স্ত্রীর নিকট চলিয়া যাইও না। যাবৎ না সে ক্ষৌর ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন হয় এবং মাথা আঁচড়াইয়া কেশ পরি পাটী করিয়া নেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তোমার কর্ত্তব্য, জ্ঞান ও সতর্কতার পরিচয় দেওয়া।

তালাকের বয়ান

তালাক দেওয়ার সঠিক নিয়ম ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ

"হে নবী! আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমরা স্ত্রীগণকে যখন তালাক দিবে তখন ইদ্দৎ গণনার সময় (তথা হায়েজ বা ঋতু)কে সম্মুখে রাখিয়া তালাক দিও এবং (তিন হায়েজ) ইদ্দৎ বিশেষ সতর্কতার সহিত গণনা করিয়া পূর্ণ করিও।"

(২৮ পারা, ছুরা তালাক)

তালাক দেওয়ার সঠিক নিয়ম হইল—ঋতুর পর সহবাস না করিয়া পরবর্তী ঋতুর পূর্ব্বে—পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে এবং দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তালাক দিবে।

২০৭৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়া ছিলেন। ওমর (রাঃ) সে সম্পর্কে হযরত (দ.)কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) পরামর্শ দিলেন যে, আবদুল্লাহকে বল, সে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া লউক। অতঃপর স্ত্রী হায়েজ আসার পর পাক পবিত্র হইলে—তখন ইচ্ছা করিলে

স্ত্রীকে রাখিয়া দিবে, আর ইচ্ছা করিলে তালাক দিবে, কিন্তু তখন সহবাস না করিয়া তালাক দিতে হইবে।

পবিত্র কোরআনে যে, বলা হইয়াছে—"ইদ্দতের সময় সম্মুখে রাখিয়া তালাক দিবে" উহার মর্ম্ম ইহাই।

হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তাহা অবশ্যই তালাক গণ্য হইবে

২০৭৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর আমার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়া ছিলাম। (আমার পিতা) ওমর(রাঃ) সে সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আলোচনা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আবদুল্লাকে বল, সে তাহার স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া লউক।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই বিবৃতি বর্ণনাকারী ব্যক্তি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কি তালাক গণ্য হইয়াছে? তিনি বলিলেন, তালাক গণ্য না হইয়া উপায় কি আছে? ইবনে ওমর যদি নিয়ম মোতাবেক তালাক দেওয়ার সুবুদ্ধি লাভে অক্ষম ও বঞ্চিত থাকিয়া থাকে সে জন্য কি প্রদত্ত তালাক গণ্য হইবে না? আমি যেরূপ তালাক দিয়াছিলাম সেই অনুসারে এক তালাক অবশ্যই গণ্য হইয়াছিল।

অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্যগত করার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাকে তালাক দেওয়া যায়

২০৭৬। **হাদীছ ঃ**— আবু ওসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক স্থানে দুইটি বাগান ছিল, আমরা সেই বাগান দুইটির মধ্যস্থলে যাইয়া বিশ্রাম নিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া থাক—এই বলিয়া হযরত (দঃ) বাগানস্থ একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। "জওনিয়া" নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে হযরতের পরিণয় হইয়াছিল। সেই মহিলাকে ঐ গৃহে উপস্থিত করা হইল। গৃহভ্যন্তরে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) তাহাকে আহ্বান করিলে সে (অবাধ্যতার উক্তি করিল, এমনকি সে) বলিল, বাদশাজাদী একজন সাধারণ লোকের স্ত্রী হইবে কেন? এতদসত্ত্বেও হযরত (দঃ) তাহার উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বলিয়া ফেলিল, "আমি আপনার হইতে আল্লার আশ্রয় চাই।" তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি মহান আশ্রয়স্থলের আশ্রয় নিয়াছ; (তুমি আমার হইতে মুক্ত—) তুমি তোমার পরিবারে চলিয়া যাও। হযরত (দঃ) গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া আবু

ওসাইদ (রাঃ)কে বলিলেন, তাহাকে এক জোড়া কাপড় দিয়া দাও এবং তাহাকে তাহার পরিবারের লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আস।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত মহিলাটির ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিল। সে সর্দারে-দুজাহানের পরিণয়ী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তাহা হারাইয়া ফেলিল। পরবর্ত্তী কালে সে সারা জীবন সেই হারানিধির অনুতাপেই কাটাইয়াছে। সারা জীবন সে নিজকে "কপাল পোড়া" বলিয়া আখ্যায়িত করিত।

তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রমান

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে সে ক্ষেত্রে তিন তালাক গণ্য না হওয়া সম্পর্কে অসমর্থিত মতবাদ বিদ্যমান থাকায় ইমাম বোখারী (রঃ) কোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রমাণিত করার জন্য এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত ও তিনটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

"(পূর্ব্ব বর্ণিত তালাক—যে তালাক সম্পর্কে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার স্বামীকে প্রদান করা হইয়াছে—) সেই তালাক দুই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। (দুই তালাক দেওয়ার পর স্বামীর অধিকার থাকে যে, পুনঃ গ্রহণ করতঃ) স্ত্রীকে সুষ্ঠুভাবে রাখিয়াও নিতে পারে কিম্বা পুনঃ গ্রহণ না করিয়া সদ্ব্যবহারে পরিত্যাগও করিতে পারে।" (২ পাঃ ১৩ রুঃ)

এস্থলে ইমাম বোখারীর বক্তব্য এই যে, তালাকের দুই সংখ্যা যখন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তখন তিন সংখ্যাও নিশ্চয় প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে ; কেননা শরীয়তের বিধানে তালাকের সংখ্যা তিন পর্য্যন্ত রাখা আছে। অবশ্য তিনের উপর কোন সংখ্যা তালাকের বিধানে নাই বলিয়া তিনের উপরের কোন সংখ্যা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, কিন্তু তিনের সংখ্যা ত বিধানের মধ্যে রহিয়াছে তবে উহা প্রবর্ত্তিত হইবে না কেন ? এতদ্ভিন্ন পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে দুই তালাক বর্ণিত হওয়ার পর তৃতীয় তালাকের এবং উহার পরিণাম ফলের বর্ণনাও রহিয়াছে ঃ—

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

"দুই এবং উপর আরও তালাক দেওয়া হইলে অন্য স্বামীর ঘর করা ভিন্ন তালাকদাতা স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী পুনঃ হালাল হইবে না।"

এই দৃষ্টিতেও ইমাম বোখারীর বক্তব্য এই যে, দুই-এর পর তৃতীয় তালাক দিলে যখন তিন তালাক এবং উহার পরিণাম ফল প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধারিত, তবে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন সংখ্যা প্রবর্ত্তিত হইবে না কেন? অথচ একের পরে দ্বিতীয় তালাক দিলে যেরূপ দুই তালাক প্রবর্ত্তিত হয় তদ্রূপ এক সঙ্গে দুই তালাক দিলেও দুই সংখ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২০৭৭। **হাদীছ**ঃ—ওয়ায়মের (রাঃ) নামক ছাহাবী (স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি) আছেম (রাঃ) নামক ছাহাবীকে বলিলেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে কোন বেগানা পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে পাইলে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিতে পারে কি এবং সেই হত্যার অপরাধে কি হত্যাকারীকে প্রানদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে? নতুবা সে তখন কি করিবে? এই বিষয়টা তুমি আমার জন্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিও। সে মতে আছেম (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ঐ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন।

আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জিজ্ঞাসায় যেহেতু বাস্তব নির্দ্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ ছিল না, (বরং সাম্ভাব্য ও কাল্পনিকরূপে রূপায়িত প্রশ্ন ছিল, যেরূপ প্রশ্ন মুরব্বিকে করা বিশেষতঃ শরীয়তের মছআলা সম্পর্কে মোটেই শোভণীয় নহে) তাই হযরত (দঃ) তাহার প্রশ্নকে না-পছন্দ করিলেন এবং অশোভণীয় আখ্যায়িত করিলেন। আছেম (রাঃ) ইহাতে (ওয়ায়মের (রাঃ)-এর প্রতি) মনক্ষুন্ন হইলেন (যে, তাহার কথায় তিনি এমন কাজ করিলেন যাহা হযরত(দঃ) না-পছন্দ করিয়াছেন।

আছেম (রাঃ) বাড়ী ফিরিলে পর ওয়ায়মের (রাঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) কি বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে আছেম (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে ভাল কাজ দেন নাই। আপনার প্রশ্নকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম না-পছন্দ ও অশোভণীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ওয়ায়মের (রাঃ) বলিলেন, আমার পক্ষে উহা বাস্তব ঘটনা, অতএব আমি ক্ষান্ত হইব না, আমি নিজেই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিব।

সে মতে ওয়ায়মের (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) তখন জনগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। ওয়ায়মের (রাঃ) হযরত (দঃ)কে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তোমার এবং তোমার স্ত্রী সম্পর্কীয় বিধান সম্বলিত কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; তোমার স্ত্রীকে নিয়া আস। অতঃপর তাহারা উভয়ে পরস্পর "লেয়ান" করিল। "লেয়ান" শেষে স্বামী ওয়ায়মের বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ!

এই স্ত্রীর উপর আমি যে অপরাধের দাবী করিয়াছি উহার পর যদি আমি তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখি তবে বস্তুতঃ আমি আমার দাবীতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষ হইতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দিল।

ব্যাখ্যা ঃ—কাহারও উপর জেনার অপরাধ প্রমাণিত করিতে চার জন প্রত্যক্ষ্যদর্শী না জুটিলে সে স্থলে যাহারা জেনার তোহমত লাগাইয়াছে তাহাদের উপর "হদ্দে-কজফ্" বা আশিটি বেত্রদণ্ডের বিধান শরীয়তে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর প্রতি ঐরূপ অভিযোগ করিলে সাক্ষী জোটাইতে না পারিলে সে স্থলে শরীয়ত লেয়ানের বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে। লেয়ানের বিবরণ সম্মুখে আসিবে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা এস্থলে দেখান হইয়াছে যে, ওয়ায়মের নামক ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়ার রীতি সেই যুগেও ছিল, অধিকন্তু হযরত (দঃ)ও কোন বাধা দেন নাই।

২০৭৮। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিল, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঐ রমণীটির বিবাহ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। তখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ রমণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, প্রথম স্বামীর সঙ্গে তাহার বিবাহ জায়েয হইবে কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—যাবৎ না দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস হয় যেমন প্রথম স্বামীর সঙ্গে হইয়াছিল।

২০৭৯। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রেফাআ'হ্ (রাঃ) নামক ব্যক্তির স্ত্রী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া প্রকাশ করিল, আমার স্বামী রেফাআ'হ্ আমাকে তালাক দিয়াছেন এবং চুড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্নকারী তালাক তথা তালাকের সর্ব্ব শেষ সীমা তিন সংখ্যার শেষ তৃতীয় তালাক প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, সে পুরুষত্বহীন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মনে হয়—তুমি প্রথম স্বামীর নিকট পুনঃ যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না যাবৎ না দ্বিতীয় (কোন) স্বামীর সহিত পরস্পর একে অন্যের স্বাদ উপভোগ কর।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে রাখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে, এই ঘটনায় তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল না, ভিন্ন ভিন্নরূপে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছিল।

পাঠক বর্গ ! উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের দ্বারা একটি বিশেষ মছআলাহ প্রমাণিত হয় এবং উহা সম্পর্কে সকল ইমামগণও এক মত। মছআলাহটি ইমাম বোখারী (রঃ)ও

৮০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিন তালাক প্রদানকারী স্বামী ঐ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে না—যাবৎ না তালাকের ইদ্দতের পর উক্ত স্ত্রীর বিবাহ অপর ব্যক্তির সহিত হয় এবং সে তাহার সঙ্গে সহবাস করে অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী হইতে তালাক পাইয়া এই তালাকেরও ইদ্দত অতিক্রম করে। দ্বিতীয় স্বামীর সহিত শুধু বিবাহের আক্‌দ যথেষ্ট নহে, সহবাস অনুষ্ঠিত হইতে হইবে এবং উভয় বিবাহ প্রত্যেকের তালাকের ইদ্দৎ পূর্ণ হওয়ার পর হইতে হইবে।

২০৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিয়া ছিলেন। (যেহেতু হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ তাই) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনঃ গ্রহণের আদেশ দিয়া ছিলেন। (এই ঘটনার বিবরণ ১৮৪৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।) অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান সম্পর্কে কেহ মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ—

لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهٰذَا ـ

وَلَوْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ـ

"যদি তুমি (হায়েজ অবস্থায়ও স্ত্রীকে) এক বা দুই তালাক দিয়া থাক তবে (তোমার পক্ষেও ঐ কথা যে,) নবী (দঃ) আমাকে উক্ত আদেশ করিয়াছিলেন, (এক স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া নিতে হইবে।) আর যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া থাক তবে সেই স্ত্রী তোমার পক্ষে হারাম হইয়া যাইবে (—তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে না) যাবৎ না সে তুমি ভিন্ন অন্য স্বামীর ঘর করিয়া আসে।" (৮০৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীছটি আলোচ্য মছআলাহ সম্পর্কে অতিশয় সুস্পষ্ট। এতদ্ভিন্ন এই মছআলাহ সম্পর্কীয় একটি বড় বিভ্রান্তি খণ্ডনকারী। এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে সকলেই অতি জঘন্য ও নিষিদ্ধ গণ্য করিয়া থাকে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও এই কার্য্যকে কোরআন নিয়া খেলা করার অপরাধরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উহার প্রতি অতিশয় রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। এক দল লোক এই বাস্তব সত্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, একত্রে তিন তালাক যখন নিষিদ্ধ তবে উহা প্রবর্ত্তিত হইবে কেন? উল্লেখিত হাদীছটির মধ্যে নিষিদ্ধ তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রকৃষ্ট নমুনা ও প্রমাণ রহিয়াছে। হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া সর্ব্ব সম্মতরূপে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে হযরত

রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তালাককে তালাক গণ্য করিয়াছেন। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল আপনি যে, স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়া ছিলেন সেই তালাক কি তালাক গণ্য হইয়াছিল? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ—বল ত দেখি! আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সুষ্ঠু পথ অবলম্বনে অক্ষম হইলে এবং বোকামি করিলে তাহাতে তালাক বাধা প্রাপ্ত হইবে কেন?

সুতরাং এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হইবে। হাঁ—ঐরূপ তালাকদাতা নিষিদ্ধ কাজ করিয়াছে তদ্দরুণ তাহার গোনাহ হইবে এবং উহা প্রতিরোধের জন্য তাহাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতে পারে।

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মুখে তিন তালাক প্রদানকারী লোককে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহার পিঠে বেত্রাঘাত করিতেন। (ফত্‌হুলবারী ৯—৩১৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়া—ইহাই পূর্ব্বাপর সকল ইমানগণের স্থির সিদ্ধান্ত। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ সকল ইমামগণ একমত যে, ভিন্ন ভিন্ন বা এক সঙ্গে—যে ভাবেই তিন তালাক দিবে তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং সেস্থলে তিন তালাক সম্পর্কীয় কোরআনের বিধান প্রযোজ্য হইবে যে, তালাকদাতা স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে না। অবশ্য যদি তাহার বিবাহ অন্য পুরুষের সঙ্গে হয় এবং সেই দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর তাহার হইতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় সে অবস্থায় প্রথম স্বামীর সঙ্গে তাহার পুনঃ বিবাহ হইতে পারে। বিশিষ্ট ইমামগণের পর উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মতামতও দেখা দিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সমর্থনহীন এবং অতি ক্ষুদ্র একটি লা-মজহাবী উপদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় আখেরী যমানার ধর্ম্মীয় বিপর্য্যয়ের স্রোতে ঐ দুর্ব্বল মতামতও ভাসিয়া আসিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সুলভ হওয়ায় উহাও এক শ্রেণীর লোকের সহায়তপুষ্ট হইয়া বহু মুখের চর্চ্চার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ বিচক্ষণ মনীষীগণের অনেকে এই দুঃখজনক অবস্থা উদ্ভবের আশঙ্কা করতঃ পূর্ব্বাহ্নেই উহার বিরুদ্ধে কোরআন-হাদীছের দলীল প্রমাণাদি সমাজের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদীছ ভিন্ন এ সম্পর্কে আরও হাদীছ বিদ্যমান আছে।

নাছায়ী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—“একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ পাইলেন যে, সে তাহার স্ত্রীকে

একত্রে তিন তালাক দিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে হযরত (দঃ) রাগান্বিত অবস্থায় লোক সমাবেশে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকাবস্থায়ই কোরআনের বিধান নিয়া খেলা করা হয়? এমনকি (হযরতের রাগ ও অসন্তুষ্টি দৃষ্টে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে) এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! ঐ তালাক দাতাকে খুন করিয়া ফেলিব কি?

ব্যাখ্যা ঃ—এস্থলে একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, একত্রে তিন তালাক যদি শুধু এক তালাক গণ্য হইত, তবে এখানে হযরতের ঐরূপ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কোন কারণই ছিল না; এক তালাক দেওয়ার কোন ঘটনায় হযরত (দঃ) ঐরূপ রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কোথাও দেখা যায় না।

কোরআনের বিধান নিয়া খেলা করার অর্থ এই যে, পবিত্র কোরআন আইন ও বিধানরূপে একটা অধিকার দিয়াছে; সেই অধিকারের ভয়াবহ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং উহার প্রতি লক্ষ্য করার যে সুযোগ রহিয়াছে তথা একত্রে তিন তালাক শেষ না করা—সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া অহেতুক উক্ত অধিকার প্রয়োগ করা। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার জন্য তিন তালাক দিয়া ফেলার কোন আবশ্যকই হয় না, সুতরাং একত্রে তিন তালাক দেওয়া কোরআনের বিধানে প্রাপ্ত অধিকার অনাবশ্যকে প্রয়োগ করাই সাব্যস্ত হয় যাহা কোরআন নিয়া খেলা করারই নামান্তর। কিন্তু খেলা করতঃ কাহারও উপর আঘাত করিলে সেই আঘাতের পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই জন্যই ঐরূপ খেলা রাগ ও অসন্তুষ্টির করাণ হইয়া থাকে। আলোচ্য ঘটনায় রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকৃত বিষয়কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ), মুগিরা (রাঃ) এমরান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করিয়াছেন এবং তদ্রূপ ফতোয়া জারি করিয়াছেন।

আবু দাউদ শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া বলিল, এ নরাধম স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাগতঃ কিছু সময় চুপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা বোকামির কাজ করিয়া তারপর আসিয়া ইবনে আব্বাস—ইবনে আব্বাস বলিয়া চিৎকার করিবে! আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিয়া কাজ করিবে আল্লাহ তাহার বিপদ মুক্তির পথ

খুলিয়া দিবেন" তুমি আল্লার ভয় রাখিয়া কাজ কর নাই। তাই তোমার বিপদ মুক্তির কোন সুযোগই আমি পাইতেছি না। তুমি আল্লার নাফরমানী করিয়াছ, তোমার স্ত্রী তোমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

মোয়াত্তা-ইমাম মালেকের মধ্যেও একখানা হাদীছ আছে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে (ব্যবহার করার পূর্ব্বেই) তিন তালাক দিয়া ছিল অতঃপর সে ঐ স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করার ইচ্ছা করিল। সেমতে সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবু হোরয়রা (রাঃ)কে ঐ সম্পর্কে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উভয়েই তাহাকে বলিলেন— لَا نَرَى اَنْ تَنْكِحَهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

"তুমি ভিন্ন অন্য স্বামীর ঘর করা ব্যতিরেকে তোমার জন্য ঐ স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করার কোন পথই আমরা দেখি না।" ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ত তাহাকে শুধু এক তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া ছিলাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন— اَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ "একের অধিক যাহা তোমার অধিকারে ছিল তাহাও তুমি হাত হইতে ছাড়িয়া দিয়াছ।"

পাঠক বর্গ! ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্ত্তৃক সুস্পষ্টরূপে পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা এবং দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বে পুনঃ গ্রহণ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষনা করা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ, বিপক্ষ দল শুধু মাত্র দুইটি হাদীছ দ্বারা তাহাদের দাবী প্রমাণ করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম নম্বরেই হইল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ যাহা মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে এবং (প্রথম খলীফা) আবু বকরের সময়ে এবং (দ্বিতীয় খলীফা) ওমরের শাসন কালের প্রথম দুই (বা তিন) বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক এক তালাক গণ্য হইত। অতঃপর ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিলেন যে, একটি কাজ যাহাতে লোকদের ভাবনা-চিন্তা ধীর-স্থিরতা অবলম্বন কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহারা (তাহা না করিয়া প্রাপ্ত অধিকার) দ্রুত শেষ করিয়া ফেলিতে অভ্যস্ত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং তাহাদের নিয়্যতের অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের কথাকে (তাহাদের সাধারণ অভ্যাস ও ইচ্ছার গতি অনুযায়ী) বাস্তবায়িত করাই শ্রেয়; সেমতে তিনি তাহাই করিলেন।

হাদীছটি মোছলেম শরীফের অপর রেওয়ায়েতে অপেক্ষাকৃত খোলাসারূপে বর্ণিত হইয়াছে—আবুছ্ছাহবা নামক এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিল, আপনার সেই বিস্ময়কর কথাটা শুনান ত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লামের সময়ে এবং খলীফা আবু বকরের সময়ে তিন তালাক এক তালাক গণ্য হইত নাকি? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন—তাহা হইত, কিন্তু খলীফা ওমরের সময়ে যখন জন-সাধারণ তালাকের আধিক্যে লিপ্ত ও অভ্যস্ত হইল তখন ওমর (রাঃ) তাহাদের উপর তিন তালাককে পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

পাঠক বর্গ! লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লেখিত হাদীছ খানার তাৎপর্য্য ব্যাপকরূপে তথা সকল প্রকার তিন তালাক সম্পর্কে কেহই গ্রহণ করে নাই, এমনকি বিপক্ষ দলও তাহা করিতে পারে না। নতুবা বলিতে হইবে যে, সব রকম তিন তালাকই রসুলুল্লার যমানায় এক তালাক গণ্য হইত। অথচ এইরূপ দাবী সত্য ও সম্ভাব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিলে সে স্থলে যে, তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত মছআলাহ, এমমকি বিপক্ষ দলও ইহাই বলিয়া থাকে; অন্যথায় কোরআনে বিঘোষিত সুস্পষ্ট বিধানকে রক্ষা করার কোন উপায়ই তাহাদের হাতে থাকে না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লমের সময়েও এই ধরণের তিন তালাকের ঘটনা ঘটিয়া ছিল। হযরত (দঃ) বিশেষ কঠোরতার সহিত সেই তিন তালাকের পরিণাম ভোগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ উপভোগ করা ব্যতিরেকে প্রথম স্বামীর সহিত পুনঃ বিবাহ হইতে পারিবে না—যেমন ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ নং হাদীছের ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ মোছলেম শরীফে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এই হাদীছ খানার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এক বৈঠকে একই সঙ্গে তালাক প্রয়োগের শব্দ একাধারে তিন বার উচ্চারণ করার ব্যাপার। যেমন, কেহ তাহার স্ত্রীকে একাধারে বলিল, তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক। এই ধরণের বাক্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবেই দুই রকম হইতে পারে। এক হইল প্রত্যেকটি শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন তালাক প্রয়োগ উদ্দেশ্য করা যাহাকে আরবী পরিভাষায় تاسيس - তাসীস্ "প্রতিটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য গ্রহণ" বলা হয়। আর এক তাৎপর্য্য ইহাও হইতে পারে যে, প্রথম শব্দের দ্বারা তালাক প্রয়োগ করা এবং পরবর্ত্তী দুইটি শব্দ উহারই পুনঃরুক্তি মাত্র, যাহাকে আরবী পরিভাষায় "تاكيد—তাকীদ বলা হয়, অর্থাৎ একটি বাক্য উচ্চারণ করতঃ উহার উদ্দেশ্যকে জোরদার করার জন্য এবং উহার উপর স্বীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিবার জন্য ঐ বাক্যটিরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা—এই পুনঃ উচ্চারণের দ্বারা ভিন্ন অর্থ প্রয়োগ উদ্দেশ্য না করা।

এই দুই প্রকার তাৎপর্য্য সূত্রে উল্লেখিত রকমের তালাক-বাক্যের দ্বারা তালাকের সংখ্যাও দুই প্রকার হইবে। প্রথম তাৎপর্য্য হিসাবে তিন তালাক হইবে এবং

দ্বিতীয় তাৎপর্য্য হিসাবে এক তালাক হইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর তালাক প্রয়োগের জন্য তাহাকে "তোমার প্রতি তালাক" এক বারই বলিয়াছে। পরবর্ত্তী দুই বারের উচ্চারণ শুধু মাত্র স্বীয় কথার পুনরুক্তি। অবশ্য এই তাৎপর্য্য শুধু মাত্র এক বৈঠকে একাধারে উচ্চারিত বাক্যবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হযরতের যুগে এবং উহার সংলগ্ন সময় পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে খোদা ভীরুতা অত্যধিক ছিল এবং হেরফের করা তথা স্বীয় আভ্যন্তরীণ নিয়্যত ও উদ্দেশ্য গোপন বস্তু হইলেও উহাকে বিকৃতরূপে প্রকাশ করার অভ্যাস তাহাদের মোটেই ছিল না। সুতরাং ঐ যমানায় যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে এইরূপ বলিত যে, তোমার প্রতি তালাক তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক তবে সাধারণতঃ এই বাক্যের দ্বিতীয় তাৎপর্য গ্রহণ করতঃ ইহাকে এক তালাক গণ্য করা হইত। কারণ, তালাক প্রদান কার্য্য শরীয়ত বিরোধীরূপে হঠাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক না দিয়া এক তালাক প্রদান করাই খোদা ভীরুতার পরিচয়। অধিকন্তু সেই যমানার লোকগণ এইরূপ আস্থার পাত্র ছিল যে, উল্লেখিত বাক্য উচ্চারণ কালে উহার প্রথম তাৎপর্য্য উদ্দেশ্য থাকিলে সে তাহার সেই নিয়্যত ও উদ্দেশ্যকে অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবে। সুতরাং সাধারণ ভাবে উক্ত বাক্যের দ্বিতীয় তাৎপর্য্য অনুযায়ীই ফৎওয়া দেওয়া হইত।

পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী যমানায় লোকদের নৈতিকতায় দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হইলে পর দেখা গেল সাধারণতঃ লোকগণ তালাক প্রদানে খোদা ভীরুতার পরিচয় না দিয়া উপস্থিত ঝোঁকের প্রবাহে স্বীয় অধিকার ও ক্ষমতার সবটুকু দ্রুত শেষ করিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় উল্লেখিত বাক্যের প্রথম তাৎপর্য্য লোকদের সাধারণ হাভ-ভাব ও মতি-গতির উপযোগী। তাই খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলের মধ্যভাগে হালাল-হারামের ব্যাপারে সতর্কতার পন্থা গ্রহণ করতঃ ঐরূপ বাক্যকে উহার প্রথম তাৎপর্য্যের উপর স্থাপন করিয়া তিন তালাক নির্দ্ধারিত করা হয় এবং উপস্থিত সকল ছাহাবীগণ উহাতে একমত্ থাকেন, কাহারও মতানৈক্য ঘটে নাই। মোছলেম শরীফে বর্ণিত হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই গবেষণা মূলক তথ্যটিই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সার কথা এই যে—ভিন্ন ভিন্নরূপে তিন বারে তিন তালাক দেওয়া হইলে অবশ্যই তিন তালাক গণ্য হইবে, ইহা সর্ব্ব সম্মত মছআলাহ। অতএব এই শ্রেণীর তিন তালাক মোছলেম শরীফের উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্যভুক্ত নহে। তদ্রূপ তিনের সংখ্যা উল্লেখ করতঃ তিন তালাক দেওয়া হইলেও অবশ্যই তিন তালাক গণ্য হইবে, কারণ সে স্থলে ভিন্ন রকমের তাৎপর্য্যের কোন অবকাশই নাই। এই শ্রেণীর তালাক সম্পর্কে সর্ব্ব সম্মতরূপে ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ মোছলেম শরীফের আলোচ্য

হাদীছ বর্ণনাকারী আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত ও সুদৃঢ় ফতোয়া ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিন তালাক গণ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং ইহাও মোছলেম শরীফের উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্যভুক্ত হইতে পারে না। ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অভিমত যদি এই হইত যে, রসুলুল্লার যমানায় ইহা এক তালাক গণ্য ছিল তবে স্বয়ং আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস উহার বিরুদ্ধে সারা জীবন তিন তালাকের ফতোয়া ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত কিরূপে দিতে পারেন? হঁা—"তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক"—সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া একাধারে তালাকের উচ্চারণ তিন বার করা হইলে সেস্থলে হুই প্রকার তাৎপর্য্য সূত্রে হুই রকম সংখ্যার অবকাশ থাকায় যমানার লোকদের সাধারণ মতি-গতি অনুপাতে সংখ্যা নির্দ্ধারণে যে বিভিন্নতা হইয়াছে মোছলেম শরীফের আলোচ্য হাদীছে আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একমাত্র তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে লোকদের নৈতিকতার উচ্চমান দৃষ্টে একটি বাক্যের এক প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণীয় ছিল। খলীফা ওমরের যমানায় সেই নৈতিকতায় হুর্ব্বলতার সূচনা দৃষ্টে খলীফা ওমরের ন্যায় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছাহাবীগণের পূর্ণ সমর্থনের সহিত উক্ত বাক্যের অপর তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের ঘোষনা প্রদত্ত হওয়ার পর, পরবর্ত্তী নৈতিকতার বিপর্য্যয়ের যুগে বিশেষতঃ বর্ত্তমান নৈতিকতা বিলুপ্তির যুগে কোন্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহা সুবুদ্ধির দ্বারাই ঠিক করা যাইতে পারে, তর্কের আবশ্যক হয় না।

এক শ্রেণীর লোক যে, উল্লেখিত হুই তাৎপর্য্য বহনকারী বাক্যের সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে তিন সংখ্যার উল্লেখ সম্বলিত বাক্য যেমন, "তোমাকে তিন তালাক দিলাম বা তোমার প্রতি তিন তালাক"—ইহাকেও জুড়িয়া দিয়া দাবী করিতে চায় যে, হযরত রসুলুল্লার যমানায় ইহাও এক তালাক গণ্য হইত এবং ইহাও মোছলেম শরীফের আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্যভুক্ত এই দাবী নিছক বাতুলতা।

বিপক্ষ দলের শেষ দলীল হইল রুকানা বা আবু রুকানা (রাঃ) নামক ছাহাবীর হাদীছ—তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ছিলেন। হযরত (দঃ) উহাকে এক তালাক সাব্যস্ত করতঃ স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়া ছিলেন।

এই দলীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর বিপক্ষ দলের কারসাজির দ্বারাই ধরা পড়ে। এই হাদীছ খানা ছেহাহ্-ছেত্তার একাধিক কেতাবে বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ আবু দাউদ শরীফে বিস্তারিত বিবরণ ও গবেষনা মূলক তথ্যাদির সহিত উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বিপক্ষ দলকে দেখা যায়, তাহারা সর্ব্বদা এই হাদীছ খানাকে অন্যান্য কেতাব সমূহ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আবু দাউদ শরীফে

মূল ঘটনার সার্ব্বিক তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করতঃ স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রুকানা বা আবু রুকানা বস্তুতঃ তাহার স্ত্রীকে তিন সংখ্যা উল্লেখ করতঃ তিন তালাক দিয়া ছিল না, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাহার স্ত্রীকে আরবী ভাষায় "বাত্তাহ" শব্দের তালাক দিয়া ছিল। "বাত্তাহ" শব্দের অর্থ ছিন্নকারী। এ সম্পর্কে শরীয়তের সাধারণ বিধান এই যে, এই শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান করা হইলে সে স্থলে তিন তালাকও হইতে পারে, কারণ তিন তালাক দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যায় এবং এক তালাক-বায়েনও হইতে পারে ; বাইন তালাক দ্বারাও বিবাহ অবশ্যই ছিন্ন হইয়া যায়---পুনরায় নূতন ভাবে বিবাহ করা ব্যাতিরেকে ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা যায় না। এই দুই রকম তালাকের একটিকে তালাকদাতার নিয়্যত দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হইবে---ইহা শরীয়তের প্রচলিত সাধারণ বিধান।

ঘটনার প্রকৃতরূপ যে ইহা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ হইল তিরমিজী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এই ঘটনার হাদীছে উল্লেখ আছে যে, "রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে বাত্তাহ তালাক দেওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। হযরত (দঃ) তাহাকে তাহার নিয়্যত জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমার নিয়্যত এক তালাক ছিল। তাহার এই নিয়্যতের দাবীর উপর হযরত (দঃ) তাহাকে কসম দিলেন। সে কসম করিয়া বলিল যে, আমার উদ্দেশ্য উহাই ছিল।

আবু দাউদ শরীফে মূল ঘটনার আসল রূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু ইমাম আবু দাউদ (রঃ) সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন যে, সত্য বলিতে রুকানা তাহার স্ত্রীকে একমাত্র তালাকে-বাত্তাহ্ দিয়া ছিল। এই কারণে বিপক্ষ দল এই হাদীছ খানার হাওয়ালা বা বরাত দানে এমন এমন কেতাবের প্রতি ছুটাছুটি করিয়া থাকে যে সব কেতাবে মূল ঘটনার আসলরূপ প্রকাশিত নাই, বরং কোন বর্ণনাকারী হয়ত তালাকে-বাত্তার এক অর্থ তিন তালাক হওয়া সূত্রে তালাকে-বাত্তার স্থলে তিন তালাক উল্লেখ করিয়াছে। বিপক্ষ দল ঐ শ্রেণীর রেওয়ায়েতের তালাশে ব্যস্ত থাকে এবং যে-সে কেতাব হইতে উহা উদ্ধার করে। ঘটনার আসলরূপ যাহা সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ ছেহাহ-ছেত্তার কেতাব আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে উহাকে এড়াইয়া চলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— বিপক্ষ দলের সর্ব্বময় পুঁজি স্বরূপ যে দুই খানা হাদীছ তাহারা তাহাদের দাবীর প্রমাণরূপে পেশ করিয়া থাকে ঐ হাদীছ দুই খানার সঠিক তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম বৃত্তান্তের আলোচনায় দেখা গেল, উহার দ্বারা বিপক্ষ দলের দাবী প্রমাণিত হয় না। এতদ্ভিন্ন উক্ত হাদীছদ্বয়ের ছনদের মধ্যে হাদীছ শাস্ত্রীয় বিধানের যে সব বাধা বিপত্তি পরিলক্ষিত হয় ঐ শ্রেণীর বাধা বিপত্তির আমল দেওয়া

না হইলে "দারেকুৎনী" নামক কেতাবের একখানা হাদীছ পেশ করা যায়, যদ্দারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে তিন তালাক তিন তালাকই গণ্য হয়।

হাদীছ খানা এই—ইমাম হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আয়েশা নাম্নী এক স্ত্রী ছিল। আলী (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হাসান (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া উপলক্ষে তাঁহার ঐ স্ত্রী তাঁহাকে মোবারকবাদ জানাইলেন। ইমাম হাসান রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, (পিতা) আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছেন আর তুমি উল্লাস প্রকাশ করিতেছ ? তোমার প্রতি তিন তালাক। তালাকের ইদ্দৎ শেষ হইলে পর ইমাম হাসান ঐ স্ত্রীর প্রাপ্ত মহর ইত্যাদি বাবদ দশ সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। তখন সে বলিল, প্রিয় স্বামীর বিচ্ছেদের বিনিময়ে এই অর্থ নেহাত তুচ্ছ। এতচ্ছ্রবণে ইমাম হাসানের চোখে অশ্রু আসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন তিন তালাক দিলে দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করা ব্যতিরেকে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা হালাল হইবে না।" এই কথা আমার নানার মুখে আমি না শুনিয়া থাকিলে নিশ্চয় আমি এই স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতাম।

মুখে উচ্চারণ ব্যতিরেকে শুধু মনে মনে স্থির করায় তালাক হইবে না

২০৮১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা করিয়া-দিয়াছেন যাহা তাহাদের শুধু কল্পনায় আসে—যাবৎ না উহাকে কার্য্যে পরিণত করে বা মুখে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ ক্রিয়া পর্য্যায়ের বস্তু কার্য্যে পরিণত না করা পর্য্যন্ত এবং বাচনিক পর্য্যায়ের বস্তু মুখে উচ্চারণ না করা পর্য্যন্ত শুধু কল্পনার দরুন উহার গোনাহ লিখিত হইবে না এবং উহার বিধানগত ফল বা ক্রিয়াও হইবে না। সে মতে কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, মনে মনে তালাকের কল্পনা স্থির করিলে শুধু উহাতে তালাক হইবে না।

● তবে কোন গোনাহের কাজের বা কথার পরিকল্পনা মনে মনে ইচ্ছাকৃত করা বা ঐরূপ কল্পনাকে অন্তরে স্থান দেওয়া তাহা গোনাহের কাজ ; সেই গোনাহ হইবে। অবশ্য কল্পনাকে ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি না করিলে এবং উহাকে অন্তরে স্থান দিয়া না রাখিলে—শুধু বুদবুদ শ্রেণীর কল্পনার উৎপত্তিতে গোনাহ হইবে না।

তদ্রূপ কল্পনা নিজে সৃষ্টি করিয়া, বরং উহাকে বাস্তবায়িত করায় উদ্যত হইয়াও যদি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে উহার বাস্তবায়ন পরিত্যাগ করে তবে ঐ কল্পনা করার এবং ইচ্ছা করার গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, পাগল এবং বেহোশ ব্যক্তির তালাক দানে তালাক হইবে না। (তবে মাদক সেবনে জ্ঞানহারা হইয়া তালাক দিলে সেক্ষেত্রে হানফী মজহাব মতে তালাক হইবে। প্রাণের ভয় দেখাইয়া তালাক দানের বাক্য উচ্চারন করাইলে সে ক্ষেত্রেও হানফী মজহাব মতে তালাক হইবে।) ইচ্ছাহীন ভাবে ভূল করিয়া স্ত্রীর প্রতি তালাক দানের বাক্য মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে তালাক হইবে।

মছআলাহ — যদি স্ত্রীকে বলা হয়, (فارقتك) "তোমাকে ভিন্ন করিয়া দিলাম" কিম্বা বলা হয়, سرحتك "তোমাকে চলিয়া যাইতে দিলাম" এই শ্রেণীর বাক্যে তালাক উদ্দেশ্য হইতে পারে। অতএব "তালাক" শব্দ ব্যবহার না করিয়াও তালাক উদ্দেশ্যে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে বাইন তালাক হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রী কর্ত্তৃক তালাক চাহিবার উত্তরে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে সে ক্ষেত্রে তালাকের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য না থাকিলেও বাইন তালাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্রোধ ক্ষেত্রে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে সে স্থলেও তালাকের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ছাড়াই বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

মছআলাহ —যদি স্ত্রীকে বলা হয়, (خلية) "তুমি খালি বা শূন্য হইয়াছ" কিম্বা বলা হয়, (برية) "তুমি বিচ্ছিন্ন" এই শ্রেণীর বাক্যেও তালাক উদ্দেশ্য হইতে পারে। অতএব তালাকের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে এইরূপ বাক্যে বাইন তালাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ স্ত্রী কর্ত্তৃক তালাক চাহিবার উত্তরে এই বাক্য প্রয়োগ করিলে তালাকের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ছাড়াও বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

মছআলাহ— যদি স্ত্রীকে বলা হয়, "তুমি হারাম" তবে তালাকের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই বাইন তালাক হইয়া যাইবে। (ফতোয়া শামী)

মছআলাহ—স্ত্রীকে যদি বলা হয়, "তুমি বা সে আমার ভগ্নি" ইহাতে তালাক বা স্ত্রী হারাম হইবে না।

মছআলাহ— যদি স্ত্রীকে বলা হয়, "তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও" সেই ক্ষেত্রে তালাকের নিয়্যত থাকিলে বা স্ত্রী কর্ত্তৃক তালাক চাহিবার উত্তরে ঐ কথা বলা হইলে উক্ত বাক্য দ্বারা বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

খোলা'-তালাক

আল্লাহ তায়ালা বলিযাছেন ঃ—

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا

أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۔

"স্ত্রীগণকে (মহর ইত্যাদি) যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ তাহা উসুল করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হালাল নহে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এরূপ আশঙ্কা বোধ করে যে, তাহাদের উপর প্রবর্ত্তিত আল্লার বিধান তাহারা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে না ; এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী নিজেকে ছাড়াইয়া নিবার জন্য মহরে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পত্তি কিছু ফেরত দেয়, তবে উহার আদান-প্রদানে তাহাদের কোন গোনাহ হইবে না। (ছুরা বাকারাহ—২ পারা)

আয়াতের মর্ম্ম এই যে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাকালে স্ত্রী হইতে কিছু উসুল করার ব্যবস্থা করুক তাহা শরীয়ত কখনও অনুমোদন করে না। এমনকি, ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং স্বামী যাহা কিছু তাহাকে প্রদান করিয়াছে উহা হইতেও কিছু উসুল করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক মিল-মহব্বৎ না হওয়ার দরুণ তাহারা উভয়েই আশঙ্কা করে যে, তাহারা দাম্পত্য জীবনের নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে পারিবে না এবং এই অবস্থার জন্য একা স্বামী দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত না হয়, তবে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে যে, স্বামী ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীকে যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছে স্ত্রী তাহা সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ প্রত্যার্পন করিয়া দেয় এবং স্বামী তাহা পাইয়া তালাক প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রীকে রেহায়ী দেয়। এই আদান-প্রদান জায়েয আছে। ইহাতে কাহারও গোনাহ হইবে না এবং এইরূপ তালাককেই খোলা'-তালাক বলা হয়।

২০৮২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ছাবেৎ ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! ছাবেৎ ইবনে কায়েসের দ্বীনদারী এবং চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন প্রকার অভিযোগই নাই, কিন্তু আমি একজন মোসলমান হইয়া ইসলাম বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত থাকিব তাহা আমার নিকট অসহনীয়। (অর্থাৎ উভয়ের মিল-মহব্বৎ সৃষ্টি না হওয়ায় স্বামীর হক্ আমার দ্বারা আদায় হইতেছে না, যাহা ইসলাম বিরোধী কাজ।)

হযরত (দঃ) ঐ রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী (মহররূপে) তোমাকে যে একটি বাগান প্রদান করিয়াছে উহা তাহাকে প্রত্যার্পন করিবে কি ? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) স্বামীকে বলিলেন, তোমার বাগান ফেরত নিয়া নেও এবং তাহাকে তালাক দিয়া দাও। সেমতে স্ত্রী বাগানটি ফেরত দিল এবং স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দিল।

বিবাহ বিচ্ছেদে পুনর্মিলনের সুপারিশ করা

২০৮৩। ছাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বরীরাহ্ নামক এক রমণী (সে ছিল ক্রীতদাসী,) তাহার স্বামী ছিল মুগীছ নামীয় এক ক্রীতদাস। (বরীরাহ্কে আয়েশা (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিলেন। বরীরাহ্ তাহার স্বামী মুগীছকে অত্যন্ত না পছন্দ করিত। সে মুক্তি লাভ করিয়া শরীয়তের বিধান মতে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করিল এবং এই সুযোগে স্বামী মুগীছকে পরিত্যাগ করিল। স্বামী মুগীছ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদের পর মুগীছের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা যেন) এখনও আমার চোখে ভাসে—মুগীছ বরীরার পেছনে পেছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইতেছে।

এতদ্দর্শনে হযরত নবী (দঃ) আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, হে আব্বাস! বরীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বরীরার উপেক্ষা বড়ই আশ্চর্য্য জনক! অতঃপর হযরত নবী (দঃ) বরীরাহকে বলিলেন, কতই না ভাল হইত যে, তুমি মুগীছকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া লইতে!

বরীরাহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করিতেছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি শুধু মাত্র সুপারিশ করিতেছি। তখন বরীরাহ বলিল, তবে হুজুর! তাহার প্রতি আমার মোটেই আকর্ষণ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—একটি ক্রীতদাসী নারী এস্থলে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে বর্ত্তমান যুগের ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগণ উহার দ্বারা শিক্ষা লাভ করিলে বড়ই উপকৃত হইবে। বরীরার সম্মুখে আল্লার রসুলের একটি প্রস্তাব আসিল, প্রস্তাবটি কোন প্রকার এবাদৎ-বন্দেগী বা পরকাল সম্পর্কীয় মোটেই নহে, বরং নিছক ব্যক্তিগত জাগতিক জীবন সম্পর্কীয়। প্রস্তাবটি বরীরার ইচ্ছা ও অভিরুচির সম্পূর্ণ বিরোধী, এমতাবস্থায় বরীরাহ জানিতে চাহিল যে, এই প্রস্তাবটি কি রসুলুল্লার আদেশ? অর্থাৎ যদি ইহা রসুলের আদেশ হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই অলঙ্ঘনীয়। বরীরাহ যখন জানিতে পারিল যে, প্রস্তাবটি আদেশ স্বরূপ নহে, সুপারিশ ও অভিপ্রায় স্বরূপ মাত্র, তখন বরীরাহ স্বীয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দিল, হযরত (দঃ)ও আর তাহাকে অধিক কিছু বলিলেন না।

বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেণীর গবেষক দল রসুলের আদেশাবলীকে এইভাবে বিভক্ত করিয়া থাকে যে, এবাদৎ বন্দেগী ও পরকাল সম্পর্কীয় বিষয়ে রসুলের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বটে, কিন্তু জাগতিক বিষয়াবলীতে যুগের তালে তাল মিলাইতে হইবে। রসুলের আদেশ সে স্থলে বাধ্যতা মুলক নহে।

এই ধরণের পার্থক্য ও ভাগ-বন্টন নিছক ভুল এবং গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলের আদেশ চাই এবাদৎ-বন্দেগী সম্পর্কীয় হউক কিংবা সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কীয় হউক, চাই আখেরাত সম্পর্কীয় হউক বা জাগতিক সম্পর্কীয় হউক--সর্ববস্থলেই রসুলের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দুইটি স্পষ্ট ঘোষনা :—

(১) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

"আপনার প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম—কস্মিন কালেও তাহারা মোমেন মোসলমান সাব্যস্ত হইবে না যাবৎ না তাহারা তাহাদের সমুদয় বিরোধকে আপনার মাধ্যমে মীমাংসা করে এবং আপনার মীমাংসার পরে আপনার আদেশ ও ফয়ছালাকে অকুণ্ঠচিত্তে মানিয়া নেয়, কোন প্রকার দ্বিধা বোধ না করে।" (৫ পারা ৭ রুকু)

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আয়াতখানা অতি সুস্পষ্ট এবং ইহার শানে-নুজুলের ঘটনা দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া যায়। খালের পানি বণ্টন লইয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ লাগিয়া ছিল এবং সেই বিবাদ মিটাইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি আদেশ দিয়া ছিলেন, এক পক্ষ সেখানে রসুলের আদেশের প্রতি কুণ্ঠা প্রকাশ করিলে এই আয়াত নাযেল হয়। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৭নং পৃষ্ঠা ১০২ হাদীছ দ্রষ্টব্য। ঘটনাটি যে, নিছক জাগতিক বিষয় ছিল তাহা বলার আবশ্যক নাই।

(২) مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا -

"কোন মোমেন মোসলমান পুরুষ, কোন মোমেন মোসলমান নারী কাহারও পক্ষে তাহার নিজ স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ থাকে না তাহার নিজস্ব কাজেও যখন সেই কাজে আল্লাহ কোন আদেশ দিয়া দেন এবং যখন আল্লার রসুল কোন আদেশ দিয়া দেন। যে ব্যক্তি আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিবে, আল্লার রসুলের আদেশ লঙ্ঘন করিবে নিশ্চয়ই সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে।" (২২ পারা ২ রুকু)

আলোচ্য বিষয়ে আয়াতটির মর্ম্ম অতি পরিষ্কার, ইহার শানে-নুজুলের ঘটনা দ্বারা মূল দাবী আরও পরিষ্কার হইয়া যায়। কোরায়েশ বংশীয়া রমণী যয়নব রাজি-য়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিবাহ যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়া ছিলেন। যায়েদ ইবনে

হারেছা (রাঃ) আরবের রীতি অনুযায়ী এক কালে ক্রীতদাস ছিলেন, তাই যয়নবের আত্মীয়গণ উক্ত বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই আয়াতে তাহাদের মতামতকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং রসুলের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ঘোষনা করতঃ উক্ত বিবাহকে বাধ্যতা মূলক করা হয়।

বিবাহ-শাদীর ব্যাপার নিছক জাগতিক ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেস্থলেও রসুলের আদেশকে অলঙ্ঘনীয় ও বাধ্যতা মূলক ঘোষনা করা হইয়াছে। সুতরাং রসুলের আদেশ সম্পর্কে আখেরাত ও জাগতিক, এবাদৎ-বন্দেগী ও ব্যক্তিগত ইত্যাদি—ভাগ-বন্টন ও পার্থক্য সম্পূর্ণ অবাস্তব, গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। হাঁ—রসুলের আদেশ এবং আদেশ নয় বরং পরামর্শ বা সুপারিশ ইত্যাদি—এইরূপ তারতম্য আছে। রসুলের আদেশ ত সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষেত্রেই অলঙ্ঘনীয় ও বাধ্যতা-মূলক। আর যাহা আদেশরূপে বলেন না, বরং পরামর্শ, সুপারিশ বা শুধু একটা প্রস্তাব দান বা অভিপ্রায় জ্ঞাপনরূপে বলেন সে ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ, ইশারা-ইঙ্গিত ইত্যাদি উপায়ে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যে, ঐ পরামর্শ ও সুপারিশ বা প্রস্তাবটি রসুল (দঃ) স্বীয় মানবীয় স্বাভাবিক ধারণা বা অভিজ্ঞতা ও খেয়ালরূপে প্রদান করিয়াছেন, না আল্লার তরফ হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, রসুল (দঃ) উহা স্বীয় মানবীয় স্বাভাবিক ধারণা, অভিজ্ঞতা ও খেয়ালরূপে বলিয়াছেন সে ক্ষেত্রে মানুষের জন্য অবকাশ আছে যে, সে নিজ অভিজ্ঞতা, অভিরুচি ও মনস্তুষ্টির উপর চলিতে পারে।

যেমন বরীরাহ (রাঃ) প্রথমতঃ জানিয়া নিল যে, স্বামী মুগীছকে পুনরায় গ্রহণ করা সম্পর্কে হযরতের উক্তিটি আদেশ স্বরূপ নহে, বরং শুধু মাত্র সুপারিশ স্বরূপ এবং সুপারিশও নিজের তরফ হইতে, কারণ হযরত (দঃ) বলিলেন, انما انا اشفع "শুধু মাত্র আমার তরফ হইতে সুপারিশ" তখন বরীরাহ (রাঃ) নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর চলিতে চাহিলে হযরত (দঃ)ও সে ক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দিলেন না।

এই শ্রেণীর আরও একটি ঘটনা মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে—মদীনাবাসীদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, মাদী খেজুর গাছের চূমরির ভিতরে মর্দ্দা খেজুর গাছের কিছু ফুল প্রবেশ করিয়া দিত এবং তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা খেজুর ফলনের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। হযরত (দঃ) মদীনায় আসিয়া মোসলমানগণকে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখিলেন এবং উহার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা হয় তোমরা এই কাজ না করিলেও (ফলন যতটুকু ভাল হওয়ার অবশ্যই) ভাল হইবে।" সেমতে ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর দেখা গেল ঐ মৌসুমে খেজুরের ফলন কম হইয়াছে। হযরত (দঃ) তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন :—

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّاْيِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ -

"আমিও মানুষ শ্রেণী ভুক্তই একজন ; যখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন হইতে কোন কথা বলি তখন অবশ্যই উহা পালন করিবে, আর যখন আমার ব্যক্তিগত খেয়াল অভিজ্ঞতা ও ধারণার উপর কোন কথা বলি তখন ঐ ক্ষেত্রে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, আমি মানুষ শ্রেণীভুক্তই ; (মানুষের খেয়াল ও ধারণার ব্যতিক্রম হইতে পারে।)

এই বিষয়টিই অপর রেওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত আছে—انتم اعلم بامور دنياكم "তোমাদের জাগতিক বিষয়াবলী তোমরা বেশী বুঝিয়া থাক।"

আধুনিক গবেষক নামধারীগণ উল্লেখিত রেওয়ায়েতদ্বয়ের "দ্বীন" ও "দুনিয়া" শব্দ দুইটি লইয়া ভ্রান্ত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে যে, দ্বীন সম্পর্কে রসুলের আদেশ বাধ্যতামূলক আর দুনিয়া সম্পর্কে রসুলের আদেশ বাধ্যতামূলক নহে। অতঃপর দ্বীনকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতে সীমাবদ্ধ করতঃ দুনিয়াকে অতিমাত্রায় প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে এবং সুদ-ঘুষ ও ব্যবসা-বানিজ্যের হালাল-হারাম—জায়েয-নাজায়েযের বাছ-বিচার ইত্যাদিকে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সব সম্পর্কে রসুলের আদেশ, বরং কোরআনেরও আদেশ এবং শরীয়তের বিধান সমূহকে উপেক্ষা করার প্রয়াস পাইতেছে।

অথচ প্রথম রেওয়ায়েতে উল্লেখিত "দ্বীন" শব্দের উদ্দেশ্য হইল—যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে ব্যক্ত করেন—চাই উহা এবাদৎ-বন্দেগী ও আখেরাত সম্পর্কে হউক বা জাগতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে হউক ; রসুল আল্লার তরফ হইতে যাহা কিছু বলেন উহাই দ্বীন। এই তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, খেজুর গাছের ঘটনা ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি সম্বলিত তিনখানা রেওয়ায়েত ইমাম মোসলেম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হইল উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতদ্বয়। মোসলেম শরীফ কেতাবে ইমাম মোসলেমের নীতি এই যে, একই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত একাধারে বর্ণিত হইলে

* امر —আম্‌র" শব্দ শাস্ত্রীয় উপভাষায় হুকুম বা আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; বরিরার জিজ্ঞাসায় সেই অর্থই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আভিধানিক পর্য্যায়ে হুকুম বা আদেশ ভিন্ন অন্য ভাবে কোন কিছু বলা ক্ষেত্রেও "আম্‌র" শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন পবিত্র কোরআনে আছে—الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالسوء এই হাদীছে "আম্‌র" শব্দ সেই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের মূল রেওয়ায়েত ও সর্ব্বাধিক মজবুত রেওয়ায়েত যেইটি সেইটিকে প্রথমে উল্লেখ করেন। এস্থলে সেই প্রথম নম্বরে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি পাঠক সমক্ষে পেশ করা হইল। উহা দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উক্তির আসল শব্দ ও প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ভাবিত হইবে এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় রেওয়ায়েতের "দ্বীন" ও "দুনিয়া" শব্দদ্বয়ের যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হইয়া থাকে উহা ছিন্ন করা সহজ হইবে।

প্রথম রেওয়ায়েতটিতে উল্লেখ আছে যে, মাদী খেজুর গাছের চুমরির ভিতর মর্দ্দা গাছের ফুল দিতে দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন—مَا اَظُنُّ يُغْنِى ذٰلِكَ شَيْئًا

"আমার মনে হয় না যে, এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ও অতিরিক্ত ফলদায়ক।" এতচ্ছ্রবনে ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিলেন এবং ফলন কম হইল, এই সংবাদ প্রাপ্তে হযরত (দঃ) বলিলেন—

اِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ فَاِنِّىْ اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُوْنِىْ
بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِهٖ -

"খেজুর গাছের জন্য উক্ত ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকিলে তাহারা উহা অবলম্বন করিতে পারে। আমি কোন সময় নিজের ধারণা প্রকাশ করিয়া থাকি, সেই ধারণা তোমাদের জন্য বাধ্যতামুলক নহে। হাঁ—আমি যদি আল্লার পক্ষ হইতে তোমাদিগকে কিছু বলি তবে উহা অবশ্যই তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।"

বলা বাহুল্য—জাগতিক পর্য্যায়ের হউক বা এবাদৎ-বন্দেগী ও আখেরাত পর্য্যায়ের হউক কিম্বা ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের হউক—যে কোন বিষয়ে রসুল (দঃ) ফয়ছালা বা আদেশ প্রয়োগ করিলে বা বিধান ও আদর্শ স্থাপন করিলে তাহা অবশ্যই আল্লার তরফ হইতে হইয়া থাকে। আল্লার তরফ হইতে প্রাপ্তি ব্যতিরেকে রসুল (দঃ) কোন ফয়ছালা বা আদেশ করেন না, কোন বিধান বা আদর্শ নির্দ্ধারিত করেন না। এই মর্ম্মেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা রহিয়াছে—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

"রসুল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কিছু বলেন না—যাহা কিছু বলেন একমাত্র ওহী প্রাপ্তির দ্বারাই বলিয়া থাকেন।" এই ক্ষেত্রে বিধান ও আদর্শ ই উদ্দেশ্য।

সুদ-ঘুষ, ব্যবসা-বানিজ্যে হালাল-হারাম—জায়েয নাজায়েযের বাছ-বিচার এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালন ইত্যাদি—

সবকে আধুনিক গবেষক দ্বীনের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন না, বরং ঐগুলিকে উমুরে-দুনিয়া বা জাগতিক ও ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া রসুল তথা শরীয়তের আওতামুক্ত করতঃ উহাতে স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতে চাহিতেছেন। বস্তুতঃ উহা সম্পর্কে রসুল (দঃ) কর্তৃক যে সব আদেশ-নিষেধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে সব বিধি-বিধান বা আদর্শ নির্দ্ধারিত হইয়াছে উহা সবই আল্লার তরফ হইতে। প্রথম রেওয়ায়েতে যে—اذا حدثتكم عن الله "যখন আমি তোমাদিগকে আল্লার তরফ হইতে কিছু বলি" বলা হইয়াছে উল্লেখিত আদেশ নিষেধ, বিধি-বিধান ও আদর্শ অবশ্যই উহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে যে, উক্ত বাক্যের স্থলে—من دينكم "তোমাদের দ্বীন হইতে" বলা হইয়াছে ঐসব উহারও অন্তর্ভুক্ত। ঐসবকে আল্লার তরফ হইতে গণ্য না করা যেরূপ বাতুলতা দ্বীন গণ্য না করাও তদ্রূপ বাতুলতা।

হাঁ—কোন একটা কাজ বা উপলক্ষ সম্পর্কে মানবীয় স্বাভাবিক ধারণা ও খেয়াল বা সাধারণ অভিজ্ঞতারূপে কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ দিলে বা সুপারিশ করিলে তাহা বাধ্যতামূলক হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অভিরুচি ও বিবেক-বিবেচনার উপর চলিতে পারে। এই শ্রেণীর বিষয়াবলীকেই প্রথম রেওয়ায়েতে......ظننت ظنا "শুধু মাত্র আমার ধারণা ও খেয়াল" বলা হইয়াছে এবং উহা তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক নহে বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উহাকেই......بشئ من رائى "যদি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং খেয়াল ও ধারণারূপে কিছু বলি" বলা হইয়াছে এবং এই শ্রেণীর বিষয়াবলী সম্পর্কেই তৃতীয় রেওয়ায়েতে বলা হইয়াছে—انتم اعلم بامور دنياكم অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াবলীর যতটুকু সম্পর্ক মানবীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতার সহিত জড়িত, যেমন—এই মার্কেটে কিসের দোকান ভাল চলিবে, এই মৌসুমে কি মালের ব্যবসা ভাল হইবে, এই মাল কোন বাজারে বেশী চালু হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি—এ সম্পর্কে তোমাদের অভিজ্ঞতা ও বিবেচনাকে অগ্রগণ্যতা দিতে পার। উমুরে-দুনিয়া বা জাগতিক বিষয় বলিতে শুধু এতটুকুই বুঝাইতেছে। কিন্তু ব্যবসা-বানিজ্যে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের বিধি-বিধান সম্পর্কেও তোমাদের বিবেচনা অগ্রগণ্য হইবে তাহা কখনও নহে। উহা সম্পর্কে রসুলের আদেশ আল্লার তরফ হইতে এবং উহা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, উহা বাধ্যতামূলক ও অলঙ্ঘনীয়।

অমোসলেম মহিলা বিবাহ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"মোশরেক নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারিবে না, যাবত না তাহারা মোমেন-মোসলমান হইয়া যায়। যদিও ঐরূপ নারী তোমার পছন্দণীয় হয়।" (২পাঃ ১১রুঃ)

২০৮৪। হাদীছ ঃ—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীকে কোন খৃষ্টান বা ইহুদী নারী বিবাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন—আল্লাহ তায়ালা মোসলমানের জন্য মোশরেক নারী বিবাহ করা হারাম করিয়াছেন। কোন নারী যদি ঈসা (আঃ)কে খোদা বলে (যেমন খৃষ্টানদের মতবাদ ; অথচ তিনি ছিলেন আল্লার সৃষ্ট বন্দা,) তবে উহা অপেক্ষা বড় শেরেক (অংশীবাদী) আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

ব্যাখ্যা ঃ— আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর মত্ ও বক্তব্য এই যে, যে সব খৃষ্টান-নাছারাদের আকিদা বিশ্বাস ও মতবাদ হইল যে, হযরত ঈসা (আঃ) তথা যিশু খৃষ্ট আল্লাহ বা আল্লার ছেলে তাহারা মোশ্‌রেক—আল্লার সঙ্গে অংশী-দারবাদী। তদ্রূপ যে সমস্ত ইহুদীদের আকিদা ও বিশ্বাস এই যে, ওযায়ের (আঃ) আল্লার ছেলে তাহারাও মোশ্‌রেক। এই শ্রেণীর খৃষ্টান ও ইহুদীরা যদিও ইঞ্জিল এবং তৌরাত কেতাবের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, কিন্তু তাহারা "কেতাবী" গণ্য হইবে না। তাহারা মোশরেক দলভুক্ত ; কারণ, তাহারা হযরত ঈসা বা ওযায়ের (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালার শরীক সাব্যস্তকারী। এই শ্রেণীর খৃষ্টান-ইহুদী মহিলার সহিত মোসলমানের বিবাহ সম্পর্কে ২ পারা ১১ রুকু ছুরা বাকারার উল্লেখিত আয়াত প্রযোয্য ;যাহার অর্থ এই—"হে মোসলমান! তোমরা মোশরেক নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারিবে না যাবৎ না তাহারা মোমেন-মোসলমান হইয়া যায়।"

৬ পারা ছুরা মায়েদার ৫ নং আয়াতে যে, বলা হইয়াছে—"তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবধারী পবিত্রাত্মা নারীদেরকে বিবাহ করা।" আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর মতে এই পবিত্রাত্মা কেতাবধারী একমাত্র তাহারা যাহারা আল্লাহ তায়ালার দেওয়া ইঞ্জিল কেতাব বা তৌরাত কেতাবের আসমানী ধর্ম্ম মতের উপর স্থিতিশীল এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ওয়াহদাহূ লা-শরীকালাহূ রূপে অটল বিশ্বাস রাখে, ঈসা (আঃ) ওযায়ের (আঃ) কাহাকেও খোদার শরীক বা খোদা গণ্য না করে। এইরূপ কেতাবধারী যেহেতু আল্লাহ-প্রদত্ব ধর্ম্ম অনুসরণে এবং ইসলামের মূল বস্তু "তৌহীদ" একত্ববাদ ও "রেসালত" হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল হওয়ার বিশ্বাস—এই দুইটির একটির উপর স্থিরপদ হওয়ায় ইসলামের অতি নিকটবর্ত্তী, তাই ঐরূপ মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল। শুধু এই আশায় যে, মোসলমান স্বামীর গৃহে ইসলামের অপর বস্তু "রেসালত" কে গ্রহন করিয়া

নেওয়া তাহার জন্য সহজ ও নিকটতম হইবে। কারণ, স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাবল্য থাকে ; এই জন্যই খৃষ্টান-ইহুদী কেতাবধারী পুরুষের নিকট মোসলমান মহিলাকে বিবাহ দেওয়া কোন প্রকারেই অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টান, ইহুদী নামধারী জাতির নারীদের সহিত মোসলমানের বিবাহ মোটেই জায়েয হইবে না—হারাম হইবে। কারণ আসমানী কেতাব বা আল্লাহ প্রদত্ব ধর্ম্ম-মতের প্রতি ইহাদের কোনই আস্থা নাই—ইহারা সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী—ধর্ম্মহীন। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি ঈমান ও অটল বিশ্বাস দুরের কথা আল্লার অস্তিত্ব তথা সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়ার প্রতিও তাহাদের বিশ্বাস নাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টান-ইহুদী নারীর সহিত মোসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েয হইবে না—হারাম হইবে। মাওলানা আশ্রফ আলী থানভী (রঃ) বয়ানুল-কোরআনে এবং মুফতী শফী (রঃ) মাআরেফুল-কোরআনে ছুরা মায়েদার উক্ত আয়াতের তফছীরে এই মছআলার উপর আলোকপাত করিয়াছেন।

ঈলার বয়ান

স্বামী যদি স্ত্রীকে কসমের সহিত বলে যে, খোদার কসম—আমি তোমার সহিত চার মাস (কিম্বা ততধিক) কালের মধ্যে সহবাস বা সঙ্গম করিব না ; ইহাকেই "ঈলা" বলা হয়।

শরীয়তে ইহার মছআলাহ এই যে, ঐ ব্যক্তি যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিল তবে তাহার কসম ভঙ্গ হইবে যাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। আর যদি সে কসমের উপর দৃঢ় থাকে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম না করে তবে এই কসমের উপর চার মাস পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্ত্রীর উপর বাইন-তালাক হইয়া যাইবে স্বামী তালাক না দিলেও ঐ তালাক হইয়া যাইবে। এই বিধান পবিত্র কোরআন ২ পারা ছুরা বাকারা ২২৬নং আয়াতে বর্ণিত আছে।

মছআলাহ—যদি ঐরূপ কসম চার মাসের কম সময়ের জন্য করে তবে সেই ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোয্য হইবে না। অবশ্য কসমে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সঙ্গম করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ--কোন পৌত্তলিক বা কেতাবী মহিলা যদি মোসলমান হইয়া যায় এবং তাহার স্বামী অমোসলেমই থাকে, সেই ক্ষেত্রে যদি তাহারা মোসলেম দেশের নাগরিক হয় তবে অমোসলেম স্বামীকে মোসলমান হওয়ার আহ্বান জানানো হইবে এবং সেও মোসলমান হইয়া গেলে উভয়ের বিবাহ বলবৎ থাকিবে। স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করিলে কাজী (বা ভারপ্রাপ্ত মোসলমান সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা

বা ইসলামী পঞ্চায়েত) দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করাইতে হইবে। আর যদি অমোসলেম দেশে উক্ত ঘটনা ঘটে এবং তাহারা তথায়ই অবস্থানকারী হয় তবে স্ত্রী মোসলমান হওয়ার পর তাহার তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করিলে তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি স্বামীকে অমোসলেম দেশে ত্যাগ করিয়া স্ত্রী মোসলেম দেশে আসিয়া মোসলমান হয় বা মোসলমান হইয়া অমোসলেম দেশ ত্যাগ করতঃ মোসলেম দেশে চলিয়া আসে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী মোসলেম দেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কাফের স্বামী হইতে তাহার বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন অমোসলেম দেশের বাসিন্দা রহিয়াছে অপর জন মোসলেম দেশের বাসিন্দা হইয়া ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তাহাদের বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

মছআলাহ ঃ—মোসলেম দেশের নাগরিক অমোসলেম নারী মোসলমান হইয়া অমোসলেম স্বামী হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে অন্য স্বামী গ্রহণ করার পূর্ব্বে তাহাকে তিন হায়েজ ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে। (শামী ২—৫৩৫)

আর যদি স্বামী-স্ত্রী অমোসলেম দেশের নাগরিক হয় এবং নারী ইসলাম গ্রহণ করিয়া তথায়ই বসবাস করে তবে অমোসলেম স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য তিন হায়েজ অতিবাহিত করিতে হইবেই। সেই তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে আর ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে না। (শামী ৫৩৭)

আর যদি ঐ নারী মোসলেম দেশে আসিয়া নাগরিক হইয়া যায় সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। এক মত্ অনুসারে সে অন্তঃসত্ত্বা হইলে ত সন্তান জন্ম পর্য্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইবে, নতুবা তাহাকে ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে না (ঐ ৫৩৮) অবশ্য এক হায়েজ কাল তাহাকে বিলম্ব করিতে হইবে। অপর মত্ অনুসারে সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সন্তান জন্ম বা তিন হায়েজ অতিবাহিত করিয়া ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে (শামী ৫৩৭)।

স্বামীহীন অমোসলেম মহিলা মোসলমান হইলে এক হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে বিবাহ করা যাইবে পূর্ব্বে নহে।

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী ও সম্পত্তি সম্পর্কে

নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কে সকল ইমামগণের একই মত্ যে, তাহার এলাকাস্থিত তাহার সমবয়স্ক লোকদের সকলের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে মৃত গণ্য করিয়া তাহার ধন-সম্পদ ভাগ-বন্টন করা যাইবে না। ঐরূপ সকলের মৃত্যু হইয়া গেলে তাহাকে মৃত গণ্য করার নিয়মিত ফয়ছালা লাভ করার পর তাহার ধন-সম্পদ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, স্ত্রী যদি সর্ব্বদিক দিয়া ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হয় তবে উল্লেখিত রূপে স্বামীর সমবয়স্ক লোকদের সকলের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। তাহাদের সকলের মৃত্যু হইয়া গেলে স্বামীর মৃত্যু গণ্য করার নিয়মিত ফয়ছালা লাভ করিবে এবং তৎপর চার মাস দশ দিন ইদ্দৎ পালন করিয়া সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

যদি স্ত্রীর জন্য ধৈর্যধারণ মানবীয় কারণে বা অন্ন-বস্ত্রের অভাব কারণে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিম্নে বর্ণিত ফয়ছালাকারগণের নিকট ঘটনা পেশ করিবে এবং প্রমাণ করিবে যে—(১) আমার স্বামী অমুক নিখোঁজ ব্যক্তি; ইহা প্রমাণ করিবে বিবাহের সাক্ষী দ্বারা বা লোক-জনের অবগতির দ্বারা। (২) অতঃপর স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সাক্ষী-সবুত দ্বারা প্রমাণ করিবে। এতদ্ভিন্ন ফয়ছালাকারও নিজের সম্ভাব্য তালাশ-তদন্তে খোঁজ লাভ না হওয়া সাব্যস্ত করিবে। এই দুই পর্ব্ব সমাপণের পর হইতে স্ত্রীকে চার বৎসর অপেক্ষা করার ফয়ছালা দিবে। এই চার বৎসরের মধ্যেও যদি নিখোঁজ স্বামীর কোন খোঁজ লাভ না হয় তবে এই চার বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর চার মাস দশ দিন ইদ্দৎ পালন করিয়া স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে।

জানিয়া রাখিবে যে—ফয়ছালাকারের নিকট ঘটনা নিয়মিত উপস্থিত করার পূর্ব্বে নিখোঁজ হওয়ার যে পরিমাণ কালই কাটিয়া থাকুক নির্দ্ধারিত চার বৎসর কালের মধ্যে উহার গণনা হইবে না। চার বৎসরের গণনা ফয়ছালাকারের ফয়ছালার পর হইতে আরম্ভ হইবে।

অবশ্য—মহিলা যদি স্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন কাটিয়া বিবাহ ব্যতীরেকে জীবন-যাপনে অপারক অবস্থায় ফয়ছালাকারের নিকট নিখোঁজ স্বামীর বিবাহমুক্ত হওয়ার প্রার্থী হইয়া থাকে এবং ফয়ছালাকারের বিবেচনায় সাব্যস্তও হয় যে, বাস্তবিকই স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। দীর্ঘ দিন কাটিবার পর সে অধৈর্য্য ও অপারক হইয়া এখন দরখাস্ত পেশ করিয়াছে—এই ক্ষেত্রে ফয়ছালাকার সম্মুখে শুধু এক বৎসর অপেক্ষার আদেশ দিতে পারে। এই আদেশ অনুযায়ী এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তালাকের ইদ্দৎ তথা তিন হায়েজ পূর্ণ করিয়া স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রকাশ থাকে যে—উল্লেখিত সর্ব্বক্ষেত্রেই নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে ফয়ছালা করা একমাত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থার শরীয়তী কাজীরই অধিকার। অবশ্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকিলে প্রচলিত সরকার কর্তৃক কোন সরকারী মোসলমান কর্ম্মকর্ত্তা যদি এই শ্রেণীর বিষয়াদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী ফয়ছালা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত

থাকেন তবে তাঁহার ফয়ছালাও বৈধ পরিগণিত হইবে। ঐরূপ কর্ম্মকর্ত্তাও যদি না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী পঞ্চায়েত গঠিত করিতে হইবে (যাহার নিয়ম সম্মুখে বর্ণিত হইবে।) উক্ত পঞ্চায়েতের শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা নয়, বরং সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তও এই ক্ষেত্রে কার্য্যকরী পরিগণিত হইবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে—যেই যেই ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করার জন্য তাহার সমবয়স্ক সকলের মৃত্যু হইয়াছে প্রমাণিত হইতে হইবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই সমবয়স্কদের মৃত্যুর জন্য কাজী বা ভারপ্রাপ্ত মোসলমান সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা ইসলামী পঞ্চায়েতকে সম্ভাব্য খোঁজ-খবর লইতে হইবে। তদ্রূপ চার বৎসর সময় সীমার ক্ষেত্রেও ফয়ছালাকারগণকে নিজেদের তদন্ত দ্বারা এই ধারণায় পৌঁছিতে হইবে যে, তাহার খোঁজ পাওয়ার কোন আশাই নাই। ঐরূপ তদন্ত ছাড়া শুধু স্ত্রী বা তাহার গার্জিয়ানের কথার উপর রায় দান করিলে তাহা বৈধ হইবে না।

আরও প্রকাশ থাকে যে—নিখোঁজ ব্যক্তি যদি এরূপ ক্ষেত্রে বা এরূপ পরিস্থিতিতে নিখোঁজ হইয়া থাকে যে ক্ষেত্রে বা যে পরিস্থিতিতে তাহার মৃত্যুর আশঙ্কাই প্রবল; যথা—যুদ্ধ ময়দানে, মৃত্যু জনিত রোগ অবস্থায় বা জলযান ডুবির পরিস্থিতিতে নদী-সমুদ্রের ভ্রমণ অবস্থায় ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত কোন সময় সীমা নাই, বরং উপরোল্লেখিত কাজী বা ভারপ্রাপ্ত সরকারী মোসলমান কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা ইসলামী পঞ্চায়েত—তাহারা সম্ভাব্য সকল প্রকার তদন্ত-তালাশ করার পর ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর ধারণা তাহাদের নিকট প্রবল হইলে তাহাকে মৃত সাব্যস্ত করিতে পারেন এবং অতঃপর ইদ্দত শেষে তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে।

ইসলামী পঞ্চায়েত গঠন ঃ

১। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা অন্ততঃ তিন জন হইতে হইবে।

২। প্রত্যেক সদস্য সৎ হইতে হইবে। সুদখোর, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী এবং নামায-রোযার পূর্ণ পাবন্দী করে না, এমনকি দাড়ি চাছিয়া ফেলে—এমন ব্যক্তিও এই পঞ্চায়েতের সদস্য হইতে পারিবে না।

৩। সদস্যগণ ঐ এলাকায় বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হইতে হইবে। যদি এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখিত রকমের সৎ লোক পাওয়া না যায়, তবে ঐ প্রভাবশালী লোকগণ সৎ-সাধু সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের দ্বারা ফয়ছালা করাইবে। ইহাতে তাহাদের ছওয়াব লাভ হইবে।

৪। পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্ততঃ একজন আলেম অবশ্যই থাকিতে হইবে। আলেম সদস্য পাওয়া না গেলে পঞ্চায়েতের সদস্যগণ প্রতিটি কাজ আলেমগণের

নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শরীয়ত সম্মতরূপে ফয়ছালা করিতে বাধ্য থাকিবে। এরূপ না করিলে সেই পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত কাজীর সিদ্ধান্ত তুল্য হইবে না।

৫। পঞ্চায়েত প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিখোঁজের সম্ভাব্য তালাশ-তদন্ত অবশ্যই করিবে। তাহা না করিয়া সিদ্ধান্ত নিলে সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হইবে না।

৬। তাহাদের সিদ্ধান্ত সমস্ত সদস্যের সর্ব্বসম্মত হইতে হইবে। মতভেদ হইলে এবং অধিকাংশের রায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলে সেই সিদ্ধান্তও কার্য্যকর হইবে না।

মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ) এই জটিল মছআলার গবেষণামূলক আলোচনায় একখানা কেতাব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন—"আল-হীলাতুন-নাজেযাহ্"।

মছআলাহ ঃ—স্বামী যদি নিখোঁজ না হয়—তাহার খোঁজ ও অবস্থান জানা আছে, কিন্তু সে বন্দী রহিয়াছে; এই ক্ষেত্রে তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ এবং তাহার ধন-সম্পদের ভাগ-বন্টম ইত্যাদি কিছুই করা যাইবে না। পরবর্ত্তী সময়ে যদি তাহার খোঁজ-খবর লুপ্ত হইয়া যায় তখন সে নিখোঁজ পরিগণিত হইবে এবং পূর্ব্ব বর্ণিত ব্যবস্থাদি গৃহিত হইবে।

জেহারের বয়ান

জেহারের প্রথা ও ভাষা আরব দেশে প্রচলিত ছিল; সেই সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ২৮ পারার প্রথম কতিপয় আয়াতে বিভিন্ন বিধান বর্ণিত রহিয়াছে। আমাদের ভাষায় জেহারের একটি বাক্য হইতে পারে—

কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে বলে—"তুমি আমার মা তুল্য বা মায়ের ন্যায়" এইরূপ বলিয়া যদি তালাক উদ্দেশ্য করে তবে বাইন-তালাক হইবে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, মা যেরূপ হারাম তুমি আমার জন্য সেইরূপ হারাম তবে জেহার হইবে। এমনকি স্ত্রীর সহিত ঝগড়া ক্ষেত্রে এরূপ বলিলে নিয়্যত ছাড়াও জেহার হইবে।

যে ক্ষেত্রে জেহার হইবে সেই ক্ষেত্রে ঐ স্ত্রীর সহিত সঙ্গম এবং সঙ্গমের ভূমিকারূপী সমুদয় আচার-ব্যবহার হারাম হইয়া যায়। অবশ্য দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হারাম হয় না।

উক্ত হারাম হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হইল জেহারের কাফ্‌ফারা আদায় করা। সেই কাফ্‌ফারা হইল, রমজান মাস ছাড়া কাফ্‌ফারার নিয়্যতে একাধারে দুই মাস রোযা রাখা সঙ্গম করার পূর্ব্বে। দুই মাস পূর্ণ করার মধ্যে যে কোন কারণে একটি রোযাও যদি ভঙ্গ করা হয় তবে বিগত রোযা ব্যর্থ হইয়া পুনরায় দুই মাসের রোযা আরম্ভ করিতে হইবে। তদ্রূপ দুই মাস রোযা পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্ব্বেও রাত্রি বেলায়ও যদি জেহারকৃত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম বা উহার আচার-ব্যবহার

করে তবে তাহা হারাম কাজ হইবে এবং কাফ্ফারা বাতিল হইয়া পুনরায় দুই মাস রোযা পূর্ণ করিতে হইবে (শামী ২—৮০০)। বয়স বা স্বাস্থ্যগত কারণে যদি ঐরূপ রোযায় সক্ষম না হয় তবে ৬০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক গরীবকে তৃপ্তির সহিত দুই ওয়াক্ত আহার করাইবে। আহার করাইবার পরিবর্ত্তে ইচ্ছা করিলে ৬০ জন লোকের ছদকায়ে-ফেৎর তথা রমজানের ফেৎরা পরিমাণ বস্তু বা পয়সাও নির্দ্ধারিত নিয়ম মতে গরীবদেরকে দান করিতে পারে।

উক্ত কাফ্ফারা আদায় করার পূর্ব্বে সঙ্গম বা উহার আচার-ব্যবহার করা হারাম হইবে। যদি করে তবে হারাম কাজ করার গোনাহ হইবে—কাফ্ফারা আদায়ের পূর্ব্বে যতবারই উহা করিবে ততবারই ঐরূপ গোনাহ হইবে যাবৎ না কাফ্ফারা আদায় করে।

কাফ্ফারা আদায় না করিয়া স্ত্রীকে যদি দাম্পত্যের হক্ হইতে বঞ্চিত রাখে তবে স্বামীকে কাফ্ফারা আদায় করা বা তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার মা" তবে সেই ক্ষেত্রে জেহার হইবে না—কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগ অত্যন্ত জঘন্য—ইহাতে গোনাহ হইবে। (শামী ২—৭৯৪)

মছআলাহ ঃ—যে ব্যক্তি কথা বলায় সক্ষম নয়, লিখিতেও সক্ষম নয় যেমন সাধারণ বোবা ব্যক্তি ; সে যদি তালাক বোধক ইশারায় তালাক দেয় এবং ইশারার সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক মৌখিক শব্দও করে তবে তালাক হইয়া যাইবে। কথা বলিতে বা লিখিতে সক্ষম ব্যক্তির শুধু ইশারায় তালাক হইবে না। এমনকি যেই বোবা ব্যক্তি লিখিতে সক্ষম তাহারও শুধু ইশারায় তালাক হইবে না।

লেয়া'নের বয়ান

জেনা বা ব্যভিচার প্রমাণিত হইলে সেস্থলে শরীয়তের বিধানে কঠোর শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। বিবাহিত হইলে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা হইবে এবং অবিবাহিত হইলে একশত বেত্রাঘাত করা হইবে। শরীয়ত সম্মত প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির উপর জেনার তোহ্মত ও অপবাদ লাগাইলে সেই অপবাদকারীর শাস্তিও অতিশয় কঠিন রাখা হইয়াছে—তাহাকে আশিটি বেত্রদণ্ড প্রদান করা হইবে এবং আজীবন তাহার কোন সাক্ষ্য কোন বিচারালয়ে গ্রহণীয় হইবে না।

কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জেনার কঠোর সাজা ভোগ করাইতে চাহিলে তাহাকে অবশ্যই কঠিন ও কষ্টার্জ্জিত বিশেষ কায়দার দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করতঃ উহা পেশ করিতে হইবে, নতুবা চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। এমনকি নিজ চোখে চাক্ষুস

দেখিয়া থাকিলেও চারজন প্রত্যক্ষ দর্শীর সাক্ষ্য পুরন করিতে না পারিলে তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে না, অন্যথায় আশিটি বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বেগানা লোকের পক্ষে এইরূপ কার্য্য সাক্ষীর অভাবে হজম করিয়া যাওয়া এবং ব্যক্ত না করা সহজ ও সহণীয় বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বেলায় তাহা সহণীয় হইতে পারে না। স্বামী নিজ চোখে স্ত্রীকে বেগানা পুরুষের সঙ্গে লিপ্ত দেখিয়া সাক্ষীর অভাবে চুপ থাকিবে এবং এই ঘৃণাকে হজম করিয়া নিবে ইহা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। তাই শরীয়ত এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সহজ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে। স্বামী স্ত্রীর উপর জেনার দাবী করিয়া সাক্ষী পেশ করিতে না পারিলে বিচারকের দরবারে স্বামী চার বার কসম করিয়া স্বীয় উক্তির সত্যতার দাবী করিবে এবং পঞ্চম বার বলিবে—স্ত্রীর উপর তাহার উক্তিতে সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ বর্ষিত হইবে। এইরূপে হলফ ও অভিশাপের বাক্য সম্পন্ন করিয়া নিলে সাক্ষী বিহীন তোহ্মতের দরুন যে শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে—আশিটি বেত্রদণ্ড তাহা হইতে সে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। এমতাবস্থায়ও যদি স্ত্রী জেনার কথা অস্বীকার করে তবে তাহাকেও চার বার কসম করিয়া স্বামীর উক্তি মিথ্যা বলিয়া দাবী করিতে হইবে এবং পঞ্চম বার বলিতে হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামীর দাবী সত্য হইলে (অর্থাৎ স্ত্রী জেনা করিয়া থাকিলে) তাহার উপর আল্লার গজব। স্ত্রীও যদি এই পঞ্চ-বাক্য পূর্ণ করে তবে সে জেনার শাস্তি হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। অতঃপর উক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিষা দেওয়া হইবে—এই ব্যবস্থাকেই "লেয়া'ন" বলা হয়। পবিত্র কোরআনে ১৮ পারা—ছুরা নূর প্রথম রুকুতেই এই বিধানের সুস্পষ্ট বয়ান রহিয়াছে এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক এই বিধান কার্য্যকরী করার ঘটনা ২০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কতিপয় হাদীছেও বর্ণিত হইতেছে।

মছআলাহ - বোবা ব্যক্তি ইশারার দ্বারা স্ত্রীর উপর জেনার দাবী করিলে ইমাম বোখারীর মতে সে ক্ষেত্রেও লেয়া'ন প্রবর্ত্তিত হইবে যেরূপ বোবার ইশারায় তালাক হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানিফার মতে বোবার ইশারা দ্বারা তালাক ত অবশ্যই হয়, কিন্তু লেয়া'ন হইবে না, কারণ বস্তুতঃ লেয়া'ন "হদ্দে-কজফ" আশিটি বেত্রদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত যাহার প্রতিটি বিষয় অকাট্য হওয়া আবশ্যক, অথচ ইশারা অকাট্য গণ্য হয় না।

মছআলাহ ঃ—স্ত্রীর উপর জেনার তোহ্মত লাগাইলে যেরূপ লেয়া'ন করিতে হইবে তদ্রূপ স্ত্রীর প্রসবিত সন্তানকে যদি স্বামী তাহার ঔরসের না বলিয়া দাবী করে সে স্থলেও লেয়া'ন প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ঐরূপ দাবী সুস্পষ্টরূপে হইতে হইবে।

ঐরূপ দাবীর প্রতি ইঙ্গিত ইশারায় আভাস প্রদান করা হইলে লেয়া'ন আসিবে না, যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা—

২০৮৫। হাদীছ ঃ– আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার একটি ছেলে হইয়াছে কাল বর্ণের। (অর্থাৎ আমার রং ফরসা, কাল বর্ণের সন্তান আমার ঔরষের হইবে কেন ?) হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উট আছে কি ? সে বলিল, হাঁ—আছে। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার (বৃদ্ধ) উটগুলি কি রঙ্গের ছিল ? সে বলিল লাল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের হইতে ধূসর রঙ্গের উট জন্ম হইয়াছে কি ? সে বলিল, হাঁ—হইয়াছে। হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লাল রঙ্গের উটের ঔরসে ধূসর রঙ্গের উট কোথা হইতে আসিল ? সে বলিল, পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের একটা হয়ত দুসর রঙ্গের ছিল উহারই তাছীরে এরূপ হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার ছেলে সম্পর্কেও এই সম্ভাবনা আছে ; তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী বংশে কেহ কাল ছিল ; সেই তাছীরে এই ছেলে কাল হইয়াছে।

লেয়া'নের মধ্যে কসমের সহিত দাবী করিতে হইবে

২০৮৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসী এক ছাহাবী তাহার স্ত্রীর প্রতি জেনার তোহ্মত আরোপ করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের উভয় হইতে নিজ নিজ দাবীর উপর শপথ ও কসম গ্রহণ করিলেন, অতঃপর তাহাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

স্বামী প্রথমে লেয়া'ন করিবে

২০৮৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হেলাল ইবনে উমাইয়া তাহার স্ত্রীর প্রতি জেনার তোহ্মত আরোপ করিয়া ছিল। প্রথমে সে-ই অগ্রগামী হইয়া স্বীয় দাবীর উপর লেয়া'ন করিয়া ছিল। হযরত (দঃ) তাহাদের উভয়কে বলিতেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যা বলিতেছ। এখনও তওবার সুযোগ রহিয়াছে এবং তওবা করাই উত্তম। কিন্তু স্বামী লেয়া'ন করার পর স্ত্রীও দাঁড়াইল এবং লেয়া'ন করিল। (একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলা হইতে বিচ্যুত হইল না।)

লেয়া'নের পরেও স্ত্রী মহরের অধিকারিণী

২০৮৮। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ স্বীয় স্ত্রীর উপর জেনার

তোহ্‌মত লাগাইলে সেস্থলে কি করা হইবে? তিনি বলিলেন, বনু-আজ্‌লান গোত্রীয় এক দম্পতির মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল—স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি জেনার তোহ্‌মত লাগাইয়াছিল, স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিতেছিল, ফলে তাহাদের মধ্যে লেয়া'ন হইল এবং পরস্পর একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দাবী করিল। সে স্থলে হযরত নবী (দঃ) তাহাদের উভয়কে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালা জানেন, নিশ্চয় তোমাদের একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের কোন একজন স্বীয় দাবী ত্যাগ করতঃ তওবা করিবে কি? তাহারা উভয়ে নিজ নিজ দাবী ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। হযরত নবী (দঃ) পুনঃ তাহাদিগকে ঐরূপ আহ্বান করিলেন, এইবারও তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। তখন হযরত নবী (দঃ) তাহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের হিসাব ও বিচার আল্লার নিকট হইবে। তোমাদের একজন ত অবশ্যই মিথ্যাবাদী— এই বলিয়া হযরত (দঃ) তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং স্বামীকে বলিলেন, এই স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার বাকি থাকিল না। তখন স্বামী বলিল, আমি যে, তাহাকে (মহররূপে) আমার মাল দিয়াছি তাহা আমাকে ফেরত দিবে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ মাল তুমি পাইতে পার না, কারণ যদি তুমি সত্যবাদীও হও (এবং স্ত্রী অপরাধিনী হয়) তবুও তুমি যে, এতদিন তাহাকে ভোগ করিয়াছ ঐ মাল তাহার বিনিময় হইবে। আর যদি তুমি তাহার উপর মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইয়া থাক তবে ত মালের দাবী আরও অধিক অসঙ্গত।

লেয়া'নের পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে

২০৮৯। হাদীছঃ- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী এক দম্পতির মধ্যে লেয়া'ন পরিচালনা করার পর তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

লেয়া'ন কারিনীর সন্তান হইলে?

২০৯০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর উপর জেনার তোহ্‌মত লাগাইল এবং ঐ স্ত্রীর প্রসূত সন্তানকে তাহার ঔরসের নয় বলিয়া দাবী করিল। হযরত নবী (দঃ) তাহাদের মধ্যে লেয়া'ন পরিচালনা করিলেন, অতঃপর তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং সন্তানটিকে তাহার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—এই শ্রেণীর সন্তান পিতার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক হইবে না, এমনকি মিরাস বা উত্তরাধিকার স্বত্বেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হইবে না।

২০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনা বোখারী শরীফ ৮০০ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। তথায় এই বিষয়টিও উল্লেখ হইয়াছে যে, লেয়া'নের পর উক্ত মহিলাটির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, যেহেতু মহিলাটির স্বামী উক্ত সন্তানকে তাহার ঔরসের নয় বলিয়া ঘোষনা করিয়াছে, তাই সন্তানটি তাহার মাতার সম্পৃক্তে পরিচিত হইয়া থাকিত। এবং এরূপ স্থলে শরীয়তের বিধান ইহাই প্রচলিত যে, ঐরূপ সন্তানের মিরাস বা উত্তরাধিকারের সম্পর্ক শুধু মাত্র মাতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবে, পিতার সঙ্গে নহে।

২০৯১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এক লেয়া'নকারী দম্পতির আলোচনা হইল। তখন আ'ছেম (রাঃ) নামক এক ছাহাবী (আত্মম্ভরিতা মূলক) কোন কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি ঐ মজলিস হইতে উঠিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই পথি মধ্যে এক ব্যক্তি (—উক্ত আ'ছেমের জামাতা) তাহার নিকট অভিযোগ করিল যে, সে তাহার স্ত্রীর সহিত এক বেগানা পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে) পাইয়াছে। (অবশ্য স্ত্রী তাহা অস্বীকার করে, কিন্তু সে তাহার দাবীর উপর দৃঢ়।) তখন আ'ছেম (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, পূর্ব্বাহ্ণে আমি যে দম্ভোক্তি করিয়া ছিলাম তাহারই প্রায়শ্চিত্তে আমি নিজেই এইরূপ ঘটনায় জড়িত হইয়া পড়িলাম (যে ঘটনায় লেয়া'ন ছাড়া গত্যন্তর নাই।) অতঃপর তিনি তাহাকে নিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্যক্তি হযরতের সম্মুখে তাহার দাবী পেশ করিল। ঐ ব্যক্তি ছিল গৌরবর্ণ, শীর্ণদেহ, মাথার চুল সোজা—কোঁকড়ানো নয়। আর যে বেগানা পুরুষটি সম্পর্কে তাহার দাবী ছিল সে বেগানা পুরুষটি ছিল শ্যামবর্ণ, মোটাদেহ, কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট। হযরত (দঃ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়া'ন পরিচালনা করিলেন।

উক্ত ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ দোয়া করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ! ঘটনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া দাও। স্ত্রী লোকটির সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর দেখা গেল, সন্তানটি ঐ বেগানা পুরুষের আকৃতি-বিশিষ্ট।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিলে পর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মহিলাটিই কি সে—যাহার সম্পর্কে হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, "জেনা সম্পর্কে সাক্ষী ব্যতিরেকে রজম তথা প্রস্থরাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়ার অবকাশ থাকিলে আমি নিশ্চয় এই নারীটিকে রজম করিতাম"? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই মহিলা সে নয়। সে ছিল অপর এক নারী। মোসলমান হওয়ার পরও তাহার জেনার অভ্যাস প্রকাশ পাইতেছিল (কিন্তু

নির্দিষ্টরূপের সাক্ষী প্রমাণের অভাবে রজমের বিধান প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদ করা যাইতে ছিল না।)

ব্যাখ্যা ঃ—আকৃতি ও দৈহিক গঠন ইত্যাদির নমুনা দ্বারা ঘটনা সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু উহার উপর ভিত্তি করিয়া আইন ও বিধানের দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না।

জেনার হদ্দ তথা প্রস্থরাঘাতে প্রাণদণ্ড বা একশত বেত্রাঘাত এবং হদ্দে কজফ—জেনার মিথ্যা তোহ্মত লাগাইবার শাস্তি আশি বেত্রাঘাত ইত্যাদি শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সাক্ষী-প্রমাণ আবশ্যক। শুধু আকার-আকৃতি, চাল-চলন স্বভাব-চরিত্রের আভাসের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে না। অবশ্য শাসন বিভাগ ঐরূপ ক্ষেত্রে তাম্বিহ ও সতর্ক করণ স্বরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

এ সম্পর্কে আরও একটি স্পষ্ট দলীল আছে। ইতিপূর্ব্বে যে হাদীছ খানা বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত হাদীছের ঘটনায় বোখারী শরীফ ৮০০ পৃষ্ঠায় এইবিষয়টিও বর্ণিত আছে যে, জেনার তোহ্মত ও তদ্দরুন লেয়া'ন হওয়ার পর দেখা গেল, মহিলাটি গর্ভবতী হইয়াছে। তখন হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, খর্বাকৃতি কাঁকলাসের ন্যায় লাল বর্ণের সন্তান জন্মিলে স্ত্রী সত্যবাদিনী ও স্বামী মিথ্যাবাদী মনে করিব, (কারণ স্বামী ঐ আকৃতির)। আর বড় নিতম্ব, বড় চক্ষু, কাল বর্ণের সন্তান জন্মিলে স্বামী সত্যবাদী এবং স্ত্রী মিথ্যাবাদিনী মনে করিব (কারণ জেনার তোহ্মতে জড়িত ব্যক্তি ঐ আকৃতির ছিল।) অবশেষে সন্তান দুর্নামের আকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইল।

স্মরণ রাখিতে হইবে—আকৃতি ও বর্ণের তারতম্য প্রমাণ রূপেত কোন স্তরেই গণ্য হইবে না, শুধু একটা ধারণা করার সূত্র হইতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহাও একমাত্র ঐস্থলে যেখানে স্বামী সন্তানকে স্পষ্টরূপে তাহার ঔরসের নয় বলিয়া ঘোষনা করে। স্বামীর পক্ষের এইরূপ ঘোষনা প্রত্যক্ষ ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতেই সঙ্গত। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে স্বামীর পক্ষে এবং স্বামীর স্পষ্ট অস্বীকার ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে আকৃতি ও বর্ণের দরুন কোন দুষণীয় কথা বলা মহা অন্যায় ও জুলুম গণ্য হইবে। ২০৮৫ নং হাদীছে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইদ্দতের বয়ান

সাধারনতঃ তালাকের ইদ্দৎ হায়েজ বা ঋতু দ্বারা পালন করা হয়। যেই মেয়ের এখনও হায়েজ আরম্ভই হয় নাই কিম্বা বার্দ্ধক্যের দরুন যাহার হায়েজ বন্ধ হইয়া

গিয়াছে—এইরূপ মহিলার ইদ্দৎ তিন মাস পালিত হইবে। ইহা পবিত্র কোরআনের বর্ণিত বিধান—২৮ পাঃ ছুরা-তালাক ৪নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

গর্ভবতীর স্বামী মারা গেলে প্রসব পর্য্যন্তই ইদ্দৎ

এই মছআলাহটি কোরআন শরীফেও বর্ণিত আছে—

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"গর্ভবতীদের ইদ্দৎ ইহাই যে, সে সন্তান প্রসব করে।" (ছুরা তালাক ৪ আয়াত)

২০৯২। হাদীছ:— উম্মে ছালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সোবায়য়া'হ্ নাম্নী এক রমণীর গর্ভকালে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামী-মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সে সন্তান প্রসব করে। অতঃপর আবুস-সানাবেল নামক এক ব্যক্তি ঐ রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তারপর (অন্য কাহারও সহিত বিবাহের প্রস্তুতি করিলে) তাহাকে সতর্ক করা হইল যে, তুমি দুই রকম ইদ্দতের দীর্ঘতম ইদ্দৎ অতিক্রম না করিয়া বিবাহ করিতে পার না। এই কথায় সে প্রায় দশ দিন বসিয়া থাকে; অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরনিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলে হযরত (দঃ) তাহাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।

ব্যাখ্যা:— স্বামী-মৃত্যুর সাধারণ ইদ্দৎ হইল চার মাস দশ দিন। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে সে স্থলে তালাকের ইদ্দৎ হইল সন্তান প্রসব করা। স্বামী-মৃত্যুর অবস্থায়ও যদি গর্ভবতীর ইদ্দৎ সন্তান প্রসব করাকে ধরা যায় তবে তাহা চার মাস দশ দিনের কমও হইতে পারে বেশীও হইতে পারে। এই সূত্রে গর্ভবতীর পক্ষে স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দৎ সম্পর্কে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থাবলম্বন স্বরূপ কাহারও ধারণা ছিল যে, চার মাস দশ দিন এবং সন্তান প্রসব করা এই দুই প্রকার ইদ্দতের মধ্যে যেইটা দীর্ঘতম হইবে বিধবা গর্ভবতীকে সেই ইদ্দৎই পালন করিতে হইবে, উহার পূর্ব্বে সে অন্য বিবাহ করিতে পারিবে না। উল্লেখিত ঘটনায় বিধবা রমণীটিকে সেই সূত্রেই সতর্ক করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী (দঃ) উহার বিরুদ্ধে তাহাকে বিবাহের অনুমতি দানে প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, স্বামীর মৃত্যু ক্ষেত্রেও গর্ভবতীর ইদ্দৎ নির্দ্ধারিতরূপে সন্তান প্রসব করা -তাহা চার মাস দশ দিনের কম দিনে হউক বা বেশী দিনে।

২০৯৩। হাদীছ:— মেছওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সোবায়য়া'হ্ নামক রমণী তাহার স্বামীর মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পরই সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বিবাহের অনুমতি চাহিলে হযরত (দঃ) তাহাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন; সেমতে সে বিবাহ করিল।

ইদ্দৎ পালনকালে স্ত্রী স্বামীর গৃহেই অবস্থান করিবে

২০৯৪ হাদীছ ঃ—মদীনার শাসনকর্ত্তা মারওয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তাহার স্বামী তালাক দিয়া দিল। কন্যার পিতা আবদুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কন্যাকে স্বামীর গৃহ হইতে নিজ গৃহে নিয়া আসিল। তখন আয়েশা (রাঃ) মারওয়ানের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, (শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতে আল্লাহকে ভয় কর এবং তালাক প্রাপ্তা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে যথাসত্বর তাহার স্বামীর গৃহে ফেরত পাঠাইয়া দাও।

তদুত্তরে মারওয়ান এক কথাত এই বলিল যে, কন্যার পিতা আবদুর রহমানকে এ বিষয়ে সম্মত করিতে পারি না। আর এক কথা এই বলিল যে, ফাতেমা-বিনতে কায়েস নাম্নী রমণীর ঘটনা আপনি অবগত নন কি? (সে বয়ান করিত যে, স্বামী তাহাকে তালাক দিলে পর স্বামীর গৃহ হইতে চলিয়া আসার অনুমতি তাহাকে হযরত নবী (দঃ) দিয়া ছিলেন।) আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এস্থলে সেই ঘটনা উল্লেখের কোন স্বার্থকতা নাই। মারওয়ান উত্তর দিল, আপনী যদি বলেন যে, ফাতেমার ঘটনায় একটি ওজর ছিল—স্বামীর গৃহবাসীদের সহিত তাহার ভীষণ ঝগড়া-বিবাদ হইত, তবে শুনুন, এস্থলেও অবস্থা তদ্রূপই।

ইদ্দৎ পালনকারীনী বিশেষ ওজরে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিতে পারে

২০৯৫। হাদীছ ঃ—ফাতেমা বিনতে কায়েস (যাহাকে স্বামী তিন তালাক দিয়াছিল এবং সে বলিয়া থাকিত যে, ইদ্দৎ পালন করাকালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে স্বামীর গৃহ ত্যাগের অনুমতি দিয়াছিলেন—সে) যে, এই বিবৃতি দিয়া থাকিত আয়েশা (রাঃ) তাহা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেন এবং তাহাকে কঠোর ভাষায় দোষারোপ করিতেন।

আয়েশা (রাঃ) মূল ঘটনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, ফাতেমা (স্বামীর সহিত) যে গৃহে বসবাস করিত উহা আশঙ্কাজনক স্থান ছিল, তাই হযরত নবী (দঃ) ফাতেমাকে তথা হইতে চলিয়া আসার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক বা দুই তালাক ক্ষেত্রে তালাকদাতা স্বামী তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে লাভ করার অধিকারী সর্ব্বাধিক

২০৯৬। হাদীছ ঃ— হাসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন মা'কেল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) ছাহাবীর ভগ্নি এক ব্যক্তির বিবাহে ছিল; সে তাহাকে এক তালাক দিয়া দিল এবং ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করার সুযোগও সে শেষ করিয়া দিল। ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পর সে তাহাকে পুনঃ বিবাহ করার প্রস্তাব করিল।

ঐ মহিলার ভ্রাতা মা'কেল (রাঃ) ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার ভগ্নি তোমার বিবাহে দিয়া তোমার গৃহিণী বানাইয়া তোমাকে সম্মানিত করিয়া ছিলাম; তুমি তাহাকে তালাক দিয়া দিয়াছ, ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়ার যে সুযোগ ছিল তাহাও তুমি গ্রহণ কর নাই। এখন তুমি পুনঃ বিবাহের প্রস্তাব দিতেছ! খোদার কসম—তোমার নিকট আর সে যাইবে না।

লোকটি ভাল ছিল, মহিলাও তাহার প্রতি আকৃষ্টা ছিল। কিন্তু ভ্রাতা মা'কেল (রাঃ) তাহাদের মধ্যে অন্তরায় ছিল।

এই ঘটনা উপলক্ষেই কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—"স্ত্রীকে যদি (এক বা দুই) তালাক দাও এবং যদি ইদ্দৎ শেষ হইয়া যায়, তারপরও যদি তালাক দাতা স্বামী তাহাকে পুনঃ বিবাহ করিতে চায়—তাহাদের উভয়ের সম্মতি ক্ষেত্রে তোমরা কেহ সেই বিবাহে বাধার সৃষ্টি করিও না" (২ পাঃ ছুরা বাকারা, ২৩২ আয়াত)।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) মা'কেল (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিয়া উহা শুনাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অভিমান ক্ষোভ ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আল্লার আদেশের অনুগত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এখনই আমি ইহা সমাধা করিব। সেমতে তিনি ঐ বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

মছআলাহ—এক বা দুই তালাক সাধারণ তথা "বাইন" ব্যতিরেকে দেওয়া হইলে পুনঃ বিবাহ ছাড়া ইদ্দতের মধ্যে ঐ স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারে। ইদ্দৎ শেষ হইয়া গেলে, কিম্বা এক বা দুই তালাক বাইন দিলে ইদ্দতের ভিতরে বা বাহিরে পুনঃ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারিবে।

স্মরণ রাখিবে—এই এক তালাকের পর আবার কোন সময় দুই তালাক দিলে এবং দুই তালাকের পর এক তালাক দিলে সমষ্টি তিন তালাক গণ্য হইয়া এই স্ত্রী একে বারে হারাম হইয়া যাইবে। হালালার ক্ষেত্র ছাড়া পুনঃ বিবাহও হারাম হইবে।

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শরীয়তী ব্যবস্থায় শোক পালন করিবে

২০৯৭। হাদীছ :—যয়নব বিনতে আবু ছালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উম্মুল মোমেনীন উম্মে হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর পিতার মৃত্যু হইল। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি স্বীয় চেহারায় সুগন্ধি লাগাইয়া বলিলেন, সুগন্ধি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না, কিন্তু আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে নারী আল্লার উপর এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তাহার পক্ষে কাহারও জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয নহে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

যয়নব বিনতে আবু ছালামাহ্ বলেন, আমি উম্মুল মোমেনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর নিকটও উপস্থিত হইয়াছি যখন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিন সুগন্ধি আনিয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, এখন সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন আমার ছিল না, কিন্তু আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া ঘোষনা দিতে শুনিয়াছি—যে নারী আল্লার উপর এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তাহার পক্ষে কাহারও জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয হইবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

যয়নব বলেন, আমি উম্মুল মোমেনীন উম্মে ছালামাহ্ (রাঃ)কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, এক মহিলা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়াছে। মেয়েটির চোখে ব্যধি আছে, সেই জন্য তাহার চোখে সুরমা দেওয়া যাইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, না।* দুই তিন বারই মহিলাটি প্রশ্ন করিল হযরত (দঃ) প্রত্যেক বারই "না" বলিলেন। অবশেষে হযরত (দঃ) বলিলেন, স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন ইসলামের বিধানে মাত্র চার মাস দশ দিন রাখা হইয়াছে, অথচ ইসলাম-পূর্ব্ব যুগে কোন মহিলার স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই মহিলাকে নিকৃষ্টতম কাপড় পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে তৈল ও সুগন্ধি বিহীন অবস্থায় দীর্ঘ এক বৎসর কাল বসিয়া থাকিয়া অতঃপর কতিপয় বিশ্রী কু-প্রথা পালন করতঃ তথা হইতে বাহির হইতে হইত।

স্বামী-মৃত্যুর শোক পালনে নারী হায়েজের গোসলে গুপ্ত স্থান ধৌত করায় সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে

২০৭৮। হাদীছঃ—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালনে আমাদিগকে নিষেধ করা হইত। হাঁ—স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন আবশ্যক এবং এই সময় আমরা সুরমা ব্যবহার করিতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করিতাম না, রঙ্গিন কাপড় পরিতাম না, অবশ্য ছিটাছিটা রংবিশিষ্ট কাপড় নিষিদ্ধ নহে। এতদ্ভিন্ন হায়েজ শেষে পাকী হাছিলের গোসল করিতে (হায়েজ স্থান যাহা ঘৃণা ও দুর্গন্ধময় বস্তু জড়িত ছিল উহাকে উত্তমরূপে) পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে "কোস্ত" নামক এক প্রকার সুগন্ধ বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইত।

---

* হযরত (দঃ) জ্ঞাত ছিলেন যে, এ স্থলে ব্যধি আশঙ্কাজনক নহে, অতি সাধারণ। ব্যধি আশঙ্কাজনক হইয়া সুরমা ব্যবহার অপরিহার্য্য হইলে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি আছে।

মছআলাহ— চার মাস দশ দিন শোক পালন কালে রঙ্গিন কাপড় নিষিদ্ধ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হইল সাজ-সজ্জা ও বেশ-ভূষা হইতে বিরত থাকা। অতএব ঐ শ্রেণীর নয় এইরূপ সাধারণ রঙ্গিন কাপড় পরিধানের অনুমতি আছে।

মছআলাহ— বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত স্ত্রীসুলভ সাক্ষাতের পূর্ব্বে তালাক দেওয়া হইলে সে ক্ষেত্রে যদি মহর নির্দ্ধারিত ছিল তবে স্ত্রীকে নির্দ্ধারিত মহরের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে হইবে।

আর যদি মহর নির্দ্ধারিত ছিল না তবে স্ত্রীকে মহররূপে কিছু দিতে হইবে না। কিন্তু স্ত্রীকে "মোত্আ" দিতে হইবে—ইহা পবিত্র কোরআনের নির্দ্দেশ (২ পাঃ ছূরা বাকারা ২৩৬নং আয়াত দ্রষ্টব্য)।

"মোত্আ" বলিতে মহিলাদের পূর্ণ পোশাক উদ্দেশ্য। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থা দৃষ্টে মধ্যম প্রকারের উক্ত পোশাক দিতে হইবে।

উল্লেখিত ক্ষেত্রে "মোত্আ" প্রদান করা ওয়াজেব, কারণ এই ক্ষেত্রে মহর দিতে হইবে না। অবশ্য তালাকের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মোত্আ প্রদান মোস্তাহাব যাহার উল্লেখ পরবর্ত্তী ২৪০নং আয়াতে আছে।

স্বীয় পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহনের ফজিলত

২০৯৯। হাদীছ ঃ-- عن ابى مسعود الانصارى رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً -

অর্থ— আবু মসউদ আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লার আদেশকৃত দায়িত্ব পালনের) ছওয়াব হাসিলের নিয়্যত করিয়া মোসলমান ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণ করিলে উহা তাহার পক্ষে ছদকা বা আল্লার রাস্তায় দান বলিয়া গণ্য হইবে।

২১০০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন, হে আদম-তনয়! (আমার নির্দ্দেশ-পথে) তোমার অর্থ ব্যয় কর (বখীলী করিও না,) তাহা হইলে তোমার উপর আমার ব্যয় ও দান অব্যাহত থাকিবে।

২১০১। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ

كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাথ বিধবা, নিঃসহায় দরিদ্রের সাহায্যে সচেষ্ট থাকে তাহার মর্ত্তবা আল্লার পথে জেহাদে আত্ম নিয়োগকারীর সমতুল্য কিম্বা সারা দিন রোযা রাখে এবং সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া থাকে তাহার সমতুল্য।

পরিবারবর্গের ব্যয় বহন অতি বড় কর্ত্তব্য

২১০২। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَّالْيَدُ

الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ......

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম দান-খয়রাত উহা যাহার পরে স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। উপরের (তথা দানকারী) হাত নীচের (তথা গ্রহণকারী) হাত অপেক্ষা মর্য্যাদাশীল। যাহাদের ব্যয় বহন তোমার জিম্মায় রহিয়াছে প্রথমে তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ কর।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, অন্যথায় অশান্তি সৃষ্টি হইবে—স্ত্রী বলিবে আমাকে রীতিমত খোর-পোশ দাও নতুবা আমাকে তালাক দিয়া দাও আমি চলিয়া যাই। চাকর বলিবে, আমাকে খাইতে দাও এবং আমার হইতে কাজ লও। ছেলে বলিবে, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করুন, আমাকে কাহার উপর ছাড়িবেন?

পরিবারবর্গের এক বৎসরের খোরাকী জমা রাখা যায়

২২০৩। **হাদীছ :**— বিশিষ্ট তাবেয়ী মা'মার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—সুফিয়ান ছৌরী (রঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবারবর্গের জন্য পূর্ণ বৎসর বা কতেক মাসের খোরাক জমা রাখা জায়েয আছে কি ? ঐ প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত কোন তথ্য আমার স্মরণে আসিল না। অতঃপর একটি হাদীছ আমার মনে পড়িল।

ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনুনজীর ইহুদীদের বস্তি ও উহার বাগ-বাগিচা মোসলমানদের হস্তগত হইয়া বন্টিত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও উহার এক অংশের মালিক হইলেন। উহার উৎপন্ন হইতে নবী (দঃ) নিজ পরিবারবর্গের এক বৎসরের খোরাক সুরক্ষিত রাখিতেন এবং বিক্রিও করিতেন।

২১০৪ **হাদীছ :**—মালেক ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় তাঁহার খাদেম ইয়ারফা আসিয়া বলিল, ওসমান, আবদুর রহমান যোবায়ের এবং সায়াদ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী—আপনি অনুমতি দিবেন কি ? তিনি বলিলেন, "হাঁ"—এই বলিয়া অনুমতি দিলেন। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সালাম করতঃ বসিয়াছেন মাত্র, এরই মধ্যে ঐ খাদেম দ্বিতীয় বার আসিয়া ওমর (রাঃ)কে বলিল, আলী এবং আব্বাসও সাক্ষাৎ প্রার্থী তাঁহাদেরকে অনুমতি দিবেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ—এই বলিয়া তাঁহাদেরকেও অনুমতি দিলেন।

তাঁহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সালামান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন ! আমার এবং ইহার (তথা আলীর) মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিন। ঐ সময় ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীত্রয়ও ওমর (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন, হাঁ—তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিয়া তাঁহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দিন।* তখন খলীফা ওমর (রাঃ)

---

* হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় খেজুর বাগান ছিল। হযরতের তিরোধানের পর আব্বাস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) উত্তরাধীকার স্বত্বের দাবীদার হইয়া ছিলেন, কিন্তু খলীফা আবু বকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "নবীগনের ত্যাজ্য সম্পত্তি আল্লার জন্য দান পরিগণিত হয় উহার মধ্যে মিরাস ও ভাগ বন্টন চলে না" এই হাদীছ অনুসারে আবুবকর (রাঃ) ঐ দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে পর আব্বাস (রাঃ) এবং ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উত্তরাধিকার সূত্রে আলী (রাঃ) উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে এই দাবী উত্থাপন করিলেন যে, উহা আল্লার রাস্তায় দানই পরিগণিত থাকিবে, কিন্তু উহার পরিচালন ভার আমাদের হাতে দেওয়া হউক। খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাতে রাজি হইয়া তাঁহাদের উভয়কে একত্রে ঐ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অনুরোধকারীগণকে বলিলেন, একটু থামুন। আসমান-জমিনের রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার কসম দিয়া আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবীগণ যাহা কিছু রাখিয়া যাই তাহার মধ্যে উত্তরাধীকার স্বত্ব চলে না। উহা আল্লার জন্য "দান" পরিগণিত হয়? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথা বলিয়াছেন। তৎপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও ঐরূপে কসম দিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও স্বীকার করিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্পত্তির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন, (মদীনার বনু-ক্বোরায়জা মহল্লা এবং খায়বর অঞ্চলের ফদক এলাকা—) এই ভূ সম্পত্তিগুলিকে আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ ছাল্লাহাহু আলাইহে অসাল্লামের করায়ত্ত করিয়াছিলেন বিনা যুদ্ধে। অতএব শরীয়তের বিশেষ বিধান মতেই উহা একমাত্র হযরতের অধীকারে ছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) উহা জনগণকে না দিয়া একা গ্রাস করিয়া নেন নাই, বরং সকলের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দান করিয়াছেন। অবশিষ্ট এই বাগান কয়টি তাঁহার জন্য ছিল—তিনি উহার উৎপন্ন হইতে স্বীয় পরিবার বর্গের জন্য এক বৎসরের প্রয়োজন পরিমাণ জমা রাখিয়া দিতেন, তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা (ইসলাম ও মোসলমানদের উপকারার্থে) আল্লার ওয়াস্তে ব্যয় করিতেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সারা জীবন উক্ত সম্পত্তি এই নিয়মেই পরিচালনা করিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাঁহার বক্তব্যের উপর ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ইহা অবগত আছেন কি? তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)কে ঐরূপ কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারাও তাহা স্বীকার করিলেন। তারপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরতের তিরোধানের পর আবুবকর (রাঃ) খলীফা হইয়া বলিলেন, আমি রসুলুল্লার নায়েব এবং তাঁহারই কার্য্য পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছি, এই বলিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির পরিচালনার ভার নিজ হস্তে নিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে উহা পরিচালনায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হইতে থাকিলে এইবার তাঁহারা খলীফা ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়া এজমালীরূপে মোতাওয়াল্লী না রাখিয়া উভয়ের জন্য সম্পত্তি বন্টন করতঃ উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইবার দাবী জানাইলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) এই সম্পত্তিকে যে কোন প্রকারে ভাগ বন্টনের দাবী কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ তিনি আশঙ্কা করিলেন, এই সম্পত্তির উপর যে কোন উপায়ে ভাগাভাগী আসিলে অবশেষে উহা মালিকানা স্বত্বে পরিগণিত হইবে। আলোচ্য হাদীছে এই বিষয়াবলীই বর্ণিত হইতেছে।

নিয়মেই তিনি উহা পরিচালনা করিলেন। ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা তখন আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমালোচনা করিয়া থাকিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা জানেন যে, আবুবকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথের পথিক ছিলেন—হক্কের উপর ছিলেন।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, খলীফা আবুবকরের তিরোধানের পর আমি বলিলাম, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকরের নায়েব—তাঁহাদেরই কার্য্যপরিচালক নিযুক্ত হইয়াছি—এই বলিয়া আমি ঐ সম্পত্তির পরিচালন ভার নিজ হস্তে নিয়াছি। তখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট আসিয়াছিলেন, আপনাদের দাবী একই ছিল। আপনি (আব্বাস) স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্রের অংশের দাবীদার ছিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পিতার অংশের দাবীদার ছিলেন। তখন প্রথমতঃ আমিও বলিয়াছিলাম যে, (আপনাদের দাবী অবাস্তব, কারণ) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের (তথা নবীদের সঙ্গে) উত্তরাধীকার স্বত্বের সম্পর্ক হইবে না; আমাদের ত্যজ্য সম্পত্তি "ছদ্‌কাহ্ ও দান" পরিগণিত হইবে।

অতঃপর যখন আমার ইচ্ছা হইল যে, (মালীকানা সূত্রে নয়, বরং শুধু মোতাওয়াল্লী ও কার্য্যপরিচালন সূত্রে) এই সম্পত্তি আপনাদের হস্তে অর্পন করিব, তখন আমি বলিয়াছি যে, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে এই সম্পত্তির পরিচালন ভার আপনাদের হস্তে অর্পন করিতে পারি এই শর্ত্তে যে, আপনাদের উপর আল্লার নামে শপথ ও অঙ্গিকার থাকিবে—আপনারা ইহার পরিচালনায় ঐ নীতিই অনুসরণ করিবেন, যে নীতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছিল, আবুবকরের ছিল এবং আমি খলীফা হওয়ার পর আমারও ঐ নীতি ছিল। তখন আপনারা উভয়ে বলিয়াছিলেন যে, এই শর্ত্তেই ইহার পরিচালন-ভার আমাদের উভয়কে অর্পন করুন। সে মতে আমি তাহা করিয়াছি। (তখন ভাগ-বন্টনের কোন কথাই ছিল না এবং তাহা হইতেও পারে না।) এখন আপনারা কি নূতন কোন ব্যবস্থা চাহিতেছেন? শুনিয়া রাখুন! আসমান জমিনের রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার কসম করিয়া আমি বলিতেছি, কেয়ামত পর্য্যন্ত আমি (ভাগ-বন্টনের) নূতন ব্যবস্থা করিব না। আপনারা যদি কাজ চালাইতে অক্ষম হন তবে ঐ সম্পত্তি পরিচালন-ভার আমার হাতে ফেরত দিয়া দেন; আমি উহার কার্য্য চালাইয়া যাইব, আপনাদের প্রয়োজন হইবে না।

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাল হইতে দান করা

২১০৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মহিলা স্বীয় স্বামীর সঞ্চিত ধন হইতে

তাহার আদেশ ব্যতিরেকেও নেক কাজে খরচ করিলে সেও (স্বামীর ছওয়াবের) সমান ছওয়াব লাভ করিবে।

স্বামীর সংসারে খাটুনি খাটা

২১০৬। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে আসিলেন—আটা পিশায়ীর চাক্কী চালাইয়া তাঁহার হাতের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে। কারণ, তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, হযরতের নিকট (বাইতুল-মালের তথা মোসলমানদের মধ্যে বিতরণের) কতিপয় গোলাম আমদানী হইয়াছে। ফাতেমা (রাঃ) আসিয়া হযরত (দঃ)কে গৃহে পাইলেন না, অতএব তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া গেলেন। হযরত (দঃ) গৃহে আসিলে পর আয়েশা (রাঃ) ফাতেমার সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন।

আলী (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) রাত্রি বেলা আমাদের গৃহে আসিলেন, তখন আমরা বিছানায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ)-এর আগমনে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিলাম, হযরত (দঃ) আমাদিগকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকিতে বলিলেন এবং তিনি আসিয়া (স্নেহভরে) আমাদের দুইজনের মধ্যস্থলে বসিলেন, এমনকি তাঁহার পায়ের শীতলতা আমার পেটকে স্পর্শ করিল। এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা যেই জিনিষ (তথা গোলাম বা চাকর) চাহিয়াছ উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষের খোঁজ তোমাদিগকে দিব কি ? তাহা এই যে—বিছানায় শুইবার সময়ে ৩৩ বার "ছোবহানাল্লাহ্" ৩৩ বার "আলহামদু-লিল্লাহ্" ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করিবা—ইহা তোমাদের পক্ষে গোলাম ও চাকর অপেক্ষা অধিক উপকারী হইবে।

গৃহের কাজ করা সুন্নত

২১০৭। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে থাকা কালে কি কাজ করিতেন ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তখন হযরত (দঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের কাম-কাজ করিয়া দিতেন এবং আজান শুনিলে জামাতের জন্য চলিয়া যাইতেন।

অনাথ নিরাশ্রয়দের ব্যয় বহনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর

২১০৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন মৃত ব্যক্তিদেরকে জানাযার নামাযের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইত। (প্রথম দিকে তাঁহার অভ্যাস ছিল—) তিনি ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তি

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন, ঋণ পরিশোধ পরিমান অতিরিক্ত কিছু রাখিয়া গিয়াছে কি? যদি বলা হইত, হাঁ—ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছে, তবে তিনি স্বয়ং জানাযার নামায পড়াইতেন। আর যদি ঐরূপ সংবাদ দেওয়া না হইত তবে (স্বয়ং তাহার জানাযার নামায না পড়িয়া) মোসলমান দিগকে বলিতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা তোমরা পড়িয়া নেও।

অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বিভিন্ন এলাকার বিজয় দান করিলেন (এবং সেই আয়ে বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠিত করিলেন) তখন তিনি বলিলেন, মোমেন-মোসলমানদের জন্য আমি তাহাদের নিজ অপেক্ষা অধিক আপন। অতএব যে মোমেন-মোসলমান (মৃত্যুকালে অসহায় অবস্থায়) ঋণ বা নিরুপায় নিরাশ্রয় এতিম-বিধবা রাখিয়া যাইবে সেই ঋণ পরিশোধের এবং সেই নিরুপায় নিরাশ্রয়দের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর থাকিবে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তি ধন রাখিয়া গেলে উহা তাহার উত্তরাধিকারীগণেরই হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ঋণ বা কর্জে-হাছানা প্রদান একটি অতিশয় জনহিতকর ব্যবস্থা। দান করা অপেক্ষা ঋণ দেওয়ার উপকারিতা বেশী; কারণ সাধারণতঃ দানের পরিমান যাহা হয় উহাতে শুধু সাময়িক প্রয়োজন মিটানো যায়। দানের ক্ষেত্রে পরিমান বেশী করা কঠিন ব্যাপার। পক্ষান্তরে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিমানে বেশী দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ—যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটাইবার সুদীর্ঘ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়; এই জন্য হাদীছে ঋণের ছওয়াব দান অপেক্ষা আঠার গুণ বলা হইয়াছে। ঋণের টাকা ফেরৎ পাওয়া না গেলে ঋণ দেওয়ার ন্যায় একটি সুব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই নবী (দঃ) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। ঋণগ্রস্ত মৃতের জানাযা তিনি পড়াইতেন না—যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৪নং হাদীছেও এই বিষয়টি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নবী (দঃ) নিজের উপর তথ সরকারী ধনভাণ্ডারের উপর প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা চাপাইয়াছেন তবুও ঋণকে বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

● নবীজী (দঃ) কিছু মাত্র সরকারী আয়ের উৎস লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকারী ধন-ভাণ্ডার তথা বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠার উদ্‌বোধনী ভাষণে ইসলামের যে নীতি ঘোষনা করিয়া ছিলেন তাহা অতুলনীয়। সরকারী ধন-ভাণ্ডারের সর্ব্ব-প্রথম ব্যয়-বরাদ্দ তিনি ঘোষনা করিলেন—নিরুপায় নিরাশ্রয় সর্ব্বহারা এতিম বিধবা অনাথদের প্রতিপালন ও আশ্রয় দান, তাহাদের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার বহন। নবীজী (দঃ) রাষ্ট্রপ্রধান, স্বয়ং তিনি খেজুর পাতার ঝুপড়িতে বাস করেন, অথচ

রাষ্ট্রীয় ধন জনগণের জন্য ব্যয় করিতে এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিরাশ্রয় জনতার আশ্রয় দানের দায়িত্ব বহনে কত বড় বলিষ্ঠ ঘোষনা তিনি প্রদান করিলেন! যে—সকল এতিম-বিধবার ব্যয় বহন আমার কাঁধে নিলাম। এমনকি বাল-বাচ্চা নিয়া প্রাণ বাঁচাইবার তাকিদে ঋণের বোঝা লইয়া যে দুনিয়া ত্যাগ করিবে তাহার ঋণের বোঝাও আমার মাথায় উঠাইলাম; ঋণ দাতার ক্ষতি করা হইবে না।

প্রগতির দাবীদার বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রনায়কগণের প্রণীত বাজেট তথা সরকারী ধনের ব্যয় বরাদ্দের তুলনা নবীজীর ব্যয়-বরাদ্দ ঘোষনার সহিত করা হইলেই পার্থক্য এবং নবীজীর ঘোষনার বলিষ্ঠতা সহজে অনুমিত হইবে।

পানাহার সম্পর্কে

২১০৯। হাদীছ ঃ— ওমর-ইবনে-আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিপালনে ছিলাম। (এক বর্ত্তনে কতিপয় ব্যক্তি একত্রে) খানা খাওয়ার সময় আমি বর্ত্তনের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন দিক হইতে লোক্‌মা গ্রহণ করিতাম। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে বালক! খানা খাওয়ার সময় বিছমিল্লাহ্ বলিয়া খানা আরম্ভ করিবে, ডান হাতে খানা খাইবে এবং নিজের সম্মুখস্থল হইতে খাইবে।

ওমর-ইবনে-আবু ছালামাহ বলেন, অতঃপর আমি সারা জীবন খানা খাওয়ায় এই ছুন্নত পালন করিয়া চলিয়াছি।

২১১০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দর্জ্জি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে খানার দাওয়াত করিল। হযরতের সঙ্গে আমিও সেই দাওয়াতে গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছি, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ত্তনের চতুর্দ্দিক হইতে কদুর টুকরা সমূহ বাছিয়া বাছিয়া খাইয়া ছিলেন; ঐ দিন হইতে আমি কদু তরকারী ভাল বাসিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ—এক বর্ত্তনে একত্রে কতিপয় ব্যক্তি খানা খাইতে বসিলে সুন্নত তরিকা এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখস্থল হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। অপরের সম্মুখস্থলের দিকে হাত বাড়াইবে না। অবশ্য সঙ্গীগণ সম্পর্কে যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, ঐরূপ করিলে তাহারা মোটেই কোনরূপ অপছন্দ করিবে না, তবে ঐরূপ করা দূষনীয় নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

এক জনের পূর্ণ খানায় দুই জনের প্রয়োজন মিটিতে পারে

২১১১। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই জনের খানা তিন জনের এবং তিন জনের খানা চার জনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

ব্যাখ্যা :— এই হাদীছের উদ্দেশ্য হইল অভাবীদের সাহায্যে লোকদিগকে প্রলুব্ধ করা যে, কাহারও নিকট নিজের পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে আর একজন ক্ষুধার্ত আছে এরূপ স্থলে ঐ ক্ষুধার্তকে সঙ্গে লইয়া খাওয়া উচিত। এইরূপ করিলে আল্লাহ তায়ালা বরকত দিবেন এবং উভয়ের প্রয়োজন পূর্ণ হইবে। দুই জনের পক্ষে তৃতীয় জন এবং তিন জনের পক্ষে চতুর্থ জনের ব্যবস্থাও ঐরূপই।

মোমেন ব্যক্তি উদর পুরিয়া খায় না

২১১২। হাদীছ :— নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মিছকিন সঙ্গে না লইয়া খানা খাইতেন না। একদা আমি এক ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য ডাকিয়া আনিলাম; সে অনেক পরিমাণ খানা খাইল। পরে তিনি আমাকে বলিলেন, এই ব্যক্তিকে আর কোন দিন আমার সঙ্গে খাইবার জন্য ডাকিও না। আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—মোমেন এক উদরে খায়, আর কাফের সাত উদরে খায়।

২১১৩। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ছিল সে অনেক বেশী পরিমাণে খানা খাইত, সে ইসলাম গ্রহণ করিল, অতঃপর সে কম পরিমাণ খানা খাইত। এই ঘটনা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, মোমেন ব্যক্তি এক উদরে খায় পক্ষান্তরে কাফের সাত উদরে খাইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা :— আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, মোমেন ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক কাজেই এবাদৎ-বন্দেগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, এমনকি পানাহারের মধ্যেও সে সতর্কতা অবলম্বন করিবে যে, অতি মাত্রায় খাইলে অলসতার সৃষ্টি হইয়া এবাদৎ-বন্দেগীতে বিঘ্ন ঘটিবে সেই আশঙ্কায় সে কখনও উদর পুরিয়া পানাহার করিবে না। পক্ষান্তরে কাফেরদের সেই বালাই নাই; ভোগ-ভোজনই তাহাদের একমাত্র কাম্য তাই একজনে সাত জনের পানাহারে তৃপ্তি লাভ করে।

খানা খাইতে বসিবার নিয়ম

২১১৪। হাদীছ :— আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এক

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আসন আকারে বা হাতের উপর ভর করিয়া কিম্বা হেলান দিয়া খাইতে বসি না।

গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাওয়া

আরবদেশে একটি বকরি সাধারণতঃ প্রায় ছয় খণ্ড করা হইত। এক একটি বাহু ও উরু এক এক খণ্ডই হইত। এইরূপ বড় বড় খণ্ড দাঁতে কাটিয়া খাওয়া অস্বাভাবিক। ঐরূপ বড় খণ্ড ছুরি-চাকু দ্বারা কাটিয়া খাওয়াতে কোন দোষ নাই।

প্রথম খণ্ডের ১৫২নং হাদীছখানা উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী দেখাইয়াছেন যে, একদা নবী (দঃ) বকরির একটি ভুনা আস্ত বাহু ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইয়া ছিলেন।

গোশতের খণ্ড বড় না হইলে এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণে-ছুরি কাঁটা ব্যবহার করা যাহা অধুনা ফ্যাসন রূপে প্রচলিত নবীজীর সুন্নত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

খাদ্য বস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি করিবে না

২১১৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কখনও কোন খাদ্য বস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি করিতেন না। পছন্দ হইলে গ্রহণ করিতেন, পছন্দ না হইলে গ্রহণ করিতেন না।

স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার নিষিদ্ধ

২১১৬। হাদীছ ঃ— عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ

وَلَا تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ

فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, তোমরা চিকন বা মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করিও না এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে কিছু পান করিও না এবং উহার বর্ত্তনে খানা খাইও না। কাফেরগণ দুনিয়াতে ঐ সবের দ্বারা ভোগ বিলাস করে, তোমরা আখেরাতে (—বেহেশতের মধ্যে) ঐ সব লাভ করিবে।

মধু ও মিঠা বস্তু

২১১৭। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিঠা বস্তু এবং মধু ভাল বাসিতেন।

বন্ধু-বান্ধবের জন্য বিশেষ খানা তৈরী করা

২১১৮। হাদীছ ঃ— আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু শোয়ায়েব নামক এক মদীনাবাসী ছাহাবী তাহার একটি ক্রীতদাস ছিল গোশত বিক্রয়কারী। ঐ ছাহাবী তাহার ক্রীতদাসকে বলিল, পাঁচ জন লোকে খাইতে পারে এই পরিমাণ খানা তৈরী কর ; আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করিব। দাওয়াতে যাইবার সময় অতিরিক্ত একজন লোক হযরতের সঙ্গী হইল। হযরত (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন, তুমি আমাদের পাঁচ জনকে দাওয়াত করিয়া ছিলে ; অতিরিক্ত একজন লোক আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে দাওয়াতে শরীক হওয়ার অনুমতি দিতে পার, ইচ্ছা করিলে অনুমতি না-ও দিতে পার। সে ব্যক্তি বলিল, হুজুর। আমার পক্ষ হইতে অনুমতি আছে।

নিম্নমানের খাদ্য বস্তুকেও ফেলাইতে নাই

২১১৯। হাদীছ ঃ— আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাত দিন আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অতিথি থাকিয়া ছিলাম। আমি দেখিয়াছি—তিনি, তাঁহার স্ত্রী এবং তাহার ভৃত্য তাহারা তিন জন সম্পূর্ণ রাত্রকে এবাদতের জন্য বণ্টন করিয়া লইয়াছেন। একজন তাহাজ্জোদ পড়িতে থাকেন তারপর তিনি অপর জনকে জাগাইয়া দেন—এইভাবে সারা রাত্র তাঁহার গৃহে তাহাজ্জোদ নামায পড়া হইতে থাকে। তাঁহার নিকট অবস্থান কালে তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—

একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণের মধ্যে খুরমা বণ্টন করিলেন। প্রত্যেকের ভাগে সাতটি করিয়া খুরমা আসিল। আমার ভাগের সাতটির মধ্যে একটি ছিল নীরস শক্ত চিটা শ্রেণীর ; এইটিই আমার পছন্দসই ছিল। কারণ, উহাকে বেশী সময় মুখে চিবাইতে পারিয়াছি।

শুষ্ক খুরমা না বানাইয়া তাজা পাকা খেজুর খাওয়া

২১২০। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় এক ইহুদী ছিল—আমি তাহার নিকট খেজুর কাটিবার মৌসুমে (নির্দ্ধারিত তারিখে) প্রদান করা শর্তে খেজুর অগ্রিম বিক্রি করিয়া টাকা গ্রহণ করিতাম। মদিনার অনতি দূরে "রুমা" এলাকায় জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেজুর বাগান ছিল। এক বৎসর আমি ঐ ইহুদীকে খেজুর প্রদাণে নির্দ্ধারিত সময় হইতে বিলম্ব করায় বাধ্য হইয়া পড়িলাম।

মৌসুমের (নির্দ্ধারিত) সময় আসিলে ইহুদী আমার নিকট উপস্থিত হইল, অথচ আমি খেজুর এখনও কিছুই সংগ্রহ করি নাই। অতএব আমি তাহার নিকট পরবর্ত্তী বৎসর পর্য্যন্তের সময় চাহিলাম। সে তাহা অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সংবাদ দিলাম ; তিনি কতিপয় ছাহাবীকে বলিলেন, চল—জাবেরের জন্য ইহুদী হইতে সময় লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসি। তাঁহারা আমার বাগানে আসিলেন এবং ইহুদীর সঙ্গে কথা বলিলেন। সে বলিল, আমি সময় দিতে পারিব না। নবী (দঃ) এই অবস্থা দৃষ্টে দাঁড়াইলেন এবং বাগানে ঘুরিয়া আসিয়া ইহুদীকে পুনরায় অনুরোধ করিলেন ; সে অস্বীকারই করিল।

এই সময় আমি কিছু তাজা পাকা খেজুর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে দিলাম। তিনি তাহা খাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বাগানে তোমার ঘর কোন্ স্থানে ? আমি তাঁহাকে উহা দেখাইলাম। তিনি তথায় বিছানা বিছাইতে বলিলেন ; আমি বিছানা বিছাইয়া দিলাম, তিনি তথায় ঘুমাইলেন। অতঃপর জাগ্রত হইলেন ; তখন আমি পুনরায় এক মুষ্টি তাজা পাকা খেজুর উপস্থিত করিলাম তিনি উহাও খাইলেন। নবী (দঃ) পুনরায় আবার ইহুদীকে অনুরোধ করিলেন ; সে প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি এইবারও দাঁড়াইলেন এবং বাগানে ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, জাবের ! তোমার বাগানে যে পরিমাণ খেজুরই আছে উহা সংগ্রহ কর এবং ইহুদীর প্রাপ্য পরিশোধ কর। সংগৃহিত খেজুরের নিকটে নবী (দঃ) দাঁড়াইয়া থাকিলেন। খেজুর এই পরিমাণ সংগৃহিত হইল যে, ইহুদীর প্রাপ্য পরিশোধ হইয়া ঐ পরিমাণই অবশিষ্ট থাকিল। (অথচ পূর্ব্বে বাগানে পরিশোধ পরিমাণ খেজুরও ছিল না।) এই বরকত দৃষ্টে আমি নবীজী সমীপে ছুটিয়া আসিলাম এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলিলাম, (এই নূতন মোজেযা দৃষ্টে নূতন ভাবে) আমি সাক্ষ্য দিতেছি— আপনি নিশ্চয় আল্লার রসুল।

আ'জওয়া নামক খেজুরের গুণ

২১২১। হাদীছ ঃ— সায়া'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি দিন ভোরে সাতটি আ'জওয়া খেজুর খাইবে—যত দিন সে উহা খাইবে ততদিন কোন প্রকার বিষ বা যাদু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারিবে না।

একত্রে খাইতে বসিলে পরস্পর সমান সমান খাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

২১২২। হাদীছ ঃ—জাবালা-ইবনে-ছোহায়েম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কতিপয় ব্যক্তি একত্রে বসিয়া খেজুর খাইতে ছিলাম। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে

ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় আমাদিগকে বলিলেন, কেহ কেহ এক সঙ্গে দুইটি করিয়া খেজুর উঠাইবে এইরূপ করিও না। হাঁ—যদি অপর সঙ্গীর অনুমতি লওয়া হয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

আঙ্গুল সমূহ চাটিয়া খাওয়া

২১২৩। **হাদীছ**ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খানা খাওয়ার পরে হাত পরিষ্কার করার পূর্ব্বে অবশ্যই প্রত্যেকে হাত নিজে চাটিয়া খাইবে অথবা (আদর সোহাগরূপে) অন্যকেও চাটাইতে পারে।

খাওয়ার পর রুমাল ব্যবহার করা

২১২৪। **হাদীছ**ঃ—সায়ীদ (রঃ) ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, অগ্নিস্পর্শে তৈরী খাদ্য খাইলে নূতন অজু করিতে হইবে কি? জাবের (রাঃ) বলিলেন, না; হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় আমরা ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ খুব কমই পাইতাম; (খেজুরের উপরই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।) ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ হইলে (হাত ধোয়ার পর) আমাদের ত রুমাল ছিল না তাই হাতে-পায়ে ধৌত হাত মুছিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতাম—নূতন ভাবে অজু করিতাম না।

খাওয়ার পর দোয়া

২১২৫। **হাদীছ**ঃ—আবু উমামাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, খাওয়া শেষে অবশিষ্ট খাদ্য বা দস্তরখান উঠাইবার সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া পড়িতেন :—

الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا

অর্থ—পাক পবিত্র ও অফুরন্ত বহু বহু প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে প্রভু পরওয়ারদেগার! (তোমার নেয়ামত—খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আসুদা ও তৃপ্ত হইয়া অবশিষ্ট ফেরত দিতেছি, কিন্তু) ইহা হইতে কখনও অমুখাপেক্ষী হইতে পারিব না, উহাকে কখনও চিরবিদায় দিতে পারিব না, উহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিব না।

কোন কোন সময় এই দোয়াও পড়িতেন :—

الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور

অর্থ—সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লার জন্য যিনি দয়া করিয়া আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতি চিরপ্রত্যাশী এবং চিরকৃতজ্ঞ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পানাহার শেষে আরও একটি দোয়া বিভিন্ন হাদীছের কেতাবে বর্ণিত আছেঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন, পান করাইয়াছেন, অধিকন্তু আমাদিগকে মোসলমান দলভুক্ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ—জগতের বুকে ইসলাম লাভের তৌফিক ও সুযোগ আল্লাহ তায়ালার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও এহ্‌সান। কোন এক কবি বলিয়াছে—

آدمیت دادۂ بازم مسلمان کردۂ

اے خدا قربان شوم احسان بر احسان کردۂ

হে খোদা! তুমি আমাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছ, তদুপরি মোসলমান হওয়ার সুযোগ ও তৌফিক দান করিয়াছ; আমি নিজকে তোমার চরণে বিলীন ও উৎসর্গ করিয়া দিলাম; তুমি কৃপার উপর কৃপা করিয়াছ।

এত বড় নেয়ামত ইসলাম! কিন্তু সেই নেয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শোকোর-গুজারীর প্রতি সাধারণতঃ খেয়াল ও মনোযোগ খুব কমই হইয়া থাকে। তাই দয়াল নবী স্বীয় উম্মতের জন্য পানাহারের দোয়ার সঙ্গে ইসলাম নেয়ামতের উপর শোকোর-গুজারীকে জড়াইয়া দিয়াছেন যেন উহা সর্ব্বদা সকলের মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে।

খাদ্য প্রস্তুতকারীকে খাদ্যের কিছু অংশ দেওয়া চাই

২১২৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমার খাদেম বা পরিচালক তোমার জন্য খানা নিয়া আসিলে তাহাকে তোমার সাথে বসাইয়া খাওয়াইবার মত মনোবল যদি তোমার না থাকে তবে অন্ততঃ এক-দুই লোকমা তাহাকে অবশ্যই দিবে। কারণ, এই খানা তৈরী করার সমুদয় কষ্ট ক্লেশ—আগুনের উত্তাপ ও ধুঁয়ার যন্ত্রণা সে-ই সহ্য করিয়াছে।

খাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালায় শোকোর আদায় করার ফজিলত

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আহার্য্য উপভোগকারী আল্লার শোকোর আদায় করিলে সে ঐ পরিমাণ ছওয়াবের অধিকারী হয় যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করে ঐ ব্যক্তি যে অনাহারী থাকিয়া ধৈর্য্য ধারণ পুর্ব্বক রোযা রাখিয়াছে।

আকিকার বয়ান

আকিকার সামর্থ্য না থাকিলে সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নাম রাখা ও মুখে-মিষ্টি দেওয়া

২১২৭। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল। আমি তাহাকে লইয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) তাহার নাম রাখিয়া দিলেন, ইব্‌রাহীম। অতঃপর একটি খুরমা চিবাইয়া তাহা শিশুটির মুখের ভিতর দিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য সর্ব্বাঙ্গিন বরকত ও উন্নতির দোয়া করিলেন, তারপর শিশুকে আমার নিকট দিয়া দিলেন।

২১২৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা একটি নবজাত শিশু হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোলে দেওয়া হইল। হযরত (দঃ) খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখের ভিতরে দিয়া দিলেন। শিশুটি হযরতের কোলে পেশাব করিয়া দিল ; হযরত (দঃ) পেশাব স্থানে পানি ঢালিয়া দিলেন।

২১২৯। হাদীছ ঃ—আবুবকর-তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মক্কায় থাকা কালেই (আমার ছেলে) আবহুল্লাহ গর্ভে থাকে। গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে আমি হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম এবং ক্বোবা নগরীতে অবস্থান করিলাম, তথায় আবহুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হইল। অতঃপর আমি তাহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিয়া আসিলাম এবং তাহাকে হযরতের কোলে রাখিয়া দিলাম। হযরত (দঃ) একটি খুরমা আনাইলেন এবং উহা চিবিয়া তাহার মুখের ভিতরে দিয়া দিলেন, অতঃপর তাহার উন্নতির জন্য দোয়া করিলেন। সে-ই ছিল মদীনার মধ্যে মোসলমানদের সর্ব্ব প্রথম নবজাত শিশু, যদ্দ্বারা মোসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া ছিল। কারণ, একটা গুজব ছড়াইয়া ছিল যে, ইহুদীরা মোসলমানদের প্রতি যাদু করিয়াছে—মোসলমানদের সন্তানাদি হইবে না।

আকিকা করা আবশ্যক

২১৩০। হাদীছ ঃ— সালমান ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আকিকা করার কর্ত্তব্যও আসিয়া পড়ে। সুতরাং তাহার পক্ষ হইতে জানোয়ার জবেহ করিবে এবং তাহার মাথা কামাইয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে।

২১৩১। হাদীছ ঃ—হাসান বছরী (রঃ) সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, শিশু আবদ্ধ থাকে আকিকার সঙ্গে। সপ্তম দিন শিশুর পক্ষ হইতে জানোয়ার জবেহ করিবে এবং তাহার মাথা কামাইয়া দিবে ও নাম রাখিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—সামর্থ্য থাকিলে আকিকা করার আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে, যেন শিশু উহার সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছে। আকিকার কাজ সমাধা করিয়া শিশুকে মুক্ত করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলিয়াছেন, (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) সন্তানের আকিকা না করা হইলে কেয়ামতের দিন মাতা-পিতার জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করা হইবে না। (ফতহুলবারী)

সপ্তম দিন আকিকা করাই উত্তম, এমনকি প্রথম সপ্তম দিন আকিকা করা না হইয়া থাকিলে দ্বিয়ীয় বা তৃতীয় সপ্তম দিন করিবে।

রজব মাসের সম্মানে জানোয়ার জবেহ করা

২১৩২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "ফরা" ও "আতীরা" ইসলাম বিরোধী কাজ।

অন্ধকার যুগে রীতি ছিল—পালিত পশুর প্রথম বাচ্চাটিকে দেব-দেবীর নামে জবেহ করা হইত উহাকেই "ফরা" বলা হয়। তদ্রূপ রজব মাসের সম্মানেও জানোয়ার জবেহ করা হইত উহাকেই "আতীরা" বলা হয়।

জবেহ করার বয়ান

জবেহ দুই প্রকার—(১) নিয়মিত জবেহ, তাহা হইল—গলা তথা বুক ও হল্‌কোমের মধ্যে কোন স্থানে বিশেষ চারিটি বা চারিটির মধ্যে অন্ততঃ তিনটি রগ বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলিয়া ধারাল বস্তু দ্বারা কাটিয়া দেওয়া। (২) এজতেরারী বা ঠেকা উদ্ধারের জবেহ, তাহা হইল—জীব দেহের কোনও স্থান ধারাল জিনিষ দ্বারা বিছমিল্লাহ্ বলার উপর কাটিয়া দেওয়া।

এই দ্বিতীয় প্রকার জবেহ একমাত্র ঐ স্থলেই অনুমোদিত যেখানে নিয়মিত জবেহ সম্ভব নহে, নতুবা নিয়মিত জবেহ অবশ্যই করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকার জবেহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত্ত হইল জীব-দেহের কোন স্থান বা কোন অঙ্গকে কাটিতে হইবে যাহার জন্য ধারাল বস্তু হওয়া আবশ্যক।

কাটা ব্যতীত কোন বস্তুর আঘাতে মৃত্যু হইলে বা উর্দ্ধ হইতে পতিত হওয়ায় মৃত্যু হইলে বা অন্য পশুর শিংএর আঘাতে মৃত্যু হইলে বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু হইলে তাহা সাধারণ মৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হারাম পরিগণিত হইবে। ইহা শরীয়তের একটি বিধান যাহা পবিত্র কোরআনে ষষ্ঠ পারা ছুরা মায়েদার প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যে কোন প্রকারের মৃত্যু উল্লেখিত কোন শ্রেণী ভুক্ত মৃত্যু হইলে সেই ক্ষেত্রে উহা সাধারণ মৃত গণ্য হইয়া হারাম পরিগণিত হইবে যেমন—

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ -

"গুলির আঘাতে মৃত সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা "মওকূজাহ্—আঘাতে মৃত"-এর শ্রেণীভুক্ত (যাহাকে কোরআনে হারাম বলা হইয়াছে)।

ব্যাখ্যাঃ—গুলি চাই আকারে বড় হউক যেমন ধনু বা গুলাইলের গুলি, কিম্বা আকারে ছোট ছোট হউক যেমন বন্দুকের কার্তুজে ভরা গুলি সমুহ—ইহা যেহেতু ধারাল বস্তু নহে, বরং গোলাকৃতির, তাই ইহা দ্বারা শরীর কাটিবে না শুধু আঘাত লাগিবে, এমনকি ভীষণ আঘাতে ছিন্ন হইয়া রক্তও প্রবাহিত হইতে পারে; সুতরাং যে কোন প্রকার গুলির আঘাতে মৃত মৃতই গণ্য হইবে এবং হারাম হইবে, উহা কোন পর্য্যায়ের জবেহ পরিগণিত হইবে না। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই বিষয়টিই বুঝাইয়াছেন।

২১৩৩। হাদীছঃ— আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লোহার ফলক বিশিষ্ট লাঠির দ্বারা কৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহার ধারাল অংশের কোপে কাটিয়া থাকিলে তাহা খাইতে পারিবে। আর উহার ডাণ্ডার আঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহা মওকূজাহ্—আঘাতে মৃত গণ্য হইবে, উহা খাইতে পারিবে না।........,

শিকারী কুকুর দ্বারা কৃত শিকার

কুকুর ও বাজ পাখীকে শিকারী হওয়ার শিক্ষা দান করতঃ শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত শিক্ষার পরিচয় যথা রীতি দেখা যাওয়ার পর যদি উহাকে কোন জংলী পশু-পক্ষীর প্রতি বিছমিল্লাহ বলিয়া ধাবিত করা হয় এবং সে উহাকে ঘায়েল করতঃ মৃত অবস্থায় মালিকের নিকট নিয়া আসে, সে নিজে উহার কোন অংশ ভক্ষন না করে তবে উহা দ্বিতীয় প্রকার জবেহ পরিগণিত হইয়া হালাল গণ্য হইবে। কিন্তু মালিক যদি ঐ শিকারকে জীবিত পায় তবে অবশ্যই উহাকে নিয়মিত জবেহ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় তাহার হাতে জবেহ না হইয়া মরিয়া গেলে তাহা মৃত গণ্য হইবে এবং হারাম হইয়া যাইবে।

২১৩৪। হাদীছ ঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইহা রসুলুল্লাহ! আমরা শিক্ষিত কুকুরকে ধাবিত করিয়া থাকি জংলী পশু শিকার করার জন্য। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ কুকুর যেটাকে পাকড়াও করে তোমার জন্য (অর্থাৎ শিকার করিয়া তোমার জন্য যেমনটি তেমন রাখে—সে নিজে উহার কোন অংশ ভক্ষন না করে) সেইটাকে তুমি খাইতে পার। আমি আরজ করিলাম, যদি কুকুর উহাকে মারিয়া ফেলিয়া থাকে? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি মারিয়া ফেলে তবুও উহা হালাল হইবে।

২১৩৩নং হাদীছে উল্লেখ আছে, আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ইহাও আরজ করিলাম যে, আমরা কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার কুকুরকে যদি তুমি বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড়িয়া থাক তবে উহার কৃত শিকার খাইতে পারিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কুকুর যদি ঐ শিকারের কিছু অংশ ভক্ষন করিয়া থাকে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে উহা খাইতে পারিবে না, কারণ উহাকে কুকুর নিজের জন্য শিকার করিয়াছে তোমার জন্য শিকার করে নাই। (নতুবা সে উহা খাইত না, ইহাই তাহার শিক্ষার আসল পরিচয়।) আমি ইহাও আরজ করিলাম যে, কোন সময় একটি পশুকে শিকার করিতে আমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও শামিল হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ শিকার খাইতে পারিবে না, কারণ তুমি ত তোমার কুকুরকে বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড়িয়াছ, অন্য কুকুরকে ত তুমি বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড় নাই।

২১৩৫। হাদীছ ঃ—আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ্। আমরা ইহুদী-নাছারাদের দেশে বাস করি,

তাহাদের পাত্রে কি আমরা খাইতে পারি? আরও আরজ করিলাম আমাদের দেশে শিকার পাওয়া যায়—আমরা তীর-ধনু দ্বারা শিকার করিয়া থাকি, শিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি এবং অশিক্ষিত কুকুর দ্বারাও শিকার করিয়া থাকি—এই সবের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে হালাল হইবে?

হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহুদী-নাছারাদের পাত্র ভিন্ন যদি অন্য পাত্র পাও তবে তাহাদের পাত্রে খাইও না, আর যদি অন্য পাত্র না পাও তবে উহাকে ধৌত (করিয়া পাক) করতঃ উহার মধ্যে খাইতে পার। আর তীর-ধনুর দ্বারা শিকার যদি বিছমিল্লার সহিত করিয়া থাক তবে উহা খাইতে পার। শিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার যদি বিছমিল্লার সহিত করিয়া থাক তাহাও খাইতে পার। অশিক্ষিত কুকুরের শিকারকে যদি জবেহ করিয়া নিতে পার তবে উহা খাইতে পারিবে।

শিকার করার জন্য কুকুর পোষা

২১৩৬। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان -

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু-পালের হেফাজতকারী কুকুর বা শিকার করার কুকুর ব্যতীত, অন্য কুকুর পোষিবে প্রতি দিন তাহার নেক আমলের ছওয়াব তুই ক্বিরাৎ পরিমাণ কমিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—"ক্বিরাৎ" নিক্তির ওজনের ক্ষুদ্রতম একটি পরিমাণ বিশেষ, কিন্তু কেয়ামতের দিন—যে দিন বিভিন্ন ক্ষুদ্র জিনিষও ফলাফলের দিক দিয়া অনেক বড় হইবে সেই কেয়ামতের দিন এক ক্বিরাতের পরিমাণ অন্য এক প্রসঙ্গে হাদীছের মধ্যে ওহোদ পাহাড় সমান হইবে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

২১৩৭। হাদীছ ঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি যে, আমরা কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, শিক্ষা প্রদত্ত কুকুরকে যদি তুমি বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড় এবং সে তোমার জন্য শিকার করিয়া আনে তবে তাহা খাইতে পার যদিও তাহার আক্রমণে শিকার মরিয়া গিয়া থাকে। কিন্তু যদি সে উহার কিছু অংশ ভক্ষন করে তবে মনে করিতে হইবে সে উহা তোমার জন্য শিকার করে নাই, (অতএব উহা জবেহ করিতে না পারিলে

হালাল হইবে না।) আর যদি তোমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুর শরীক হইয়া শিকার ধরে (এবং ঐ শিকার মরিয়া যায়) তবে তাহা খাইতে পারিবে না।

২১৩৮। হাদীছ :—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—নবী(দঃ) বলিয়াছেন, তোমার কুকুরকে বিছমিল্লাহ বলিয়া (কোন শিকারের প্রতি) ছাড়িয়াছ, সে শিকার করিয়াছে এবং মারিয়া ফেলিয়াছে তবুও খাইতে পারিবে, কিন্তু যদি ঐ কুকুর শিকারের কিছু অংশ ভক্ষন করে তবে উহা খাইতে পারিবে না, কারণ সে উহা নিজের জন্য ধরিয়াছে। আর যদি তোমার কুকুরের সহিত অন্য কুকুর যাহাকে বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড়া হয় নাই, শামিল হইয়া শিকার করিয়া থাকে এবং শিকার মরিয়া গিয়াছে তবে ঐ শিকার খাইও না। কারণ তুমি জান না যে, কোন কুকুরটি শিকারকে বধ করিয়াছে।

আর যদি তুমি কোন শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়া থাক এবং তালাশে লাগিয়া থাকিয়া এক-দুই দিন পরে তুমি ঐ শিকারকে মৃত অবস্থায় পাও তবে যদি উহার মধ্যে একমাত্র তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত মৃত্যুর অন্য কোন কারণের চিহ্ন বা প্রমাণ পাওয়া না যায় তবে তুমি উহাকে খাইতে পার, আর যদি উহাকে পানিতে ডুবা অবস্থায় পাও তবে উহা খাইতে পারিবে না।

বাঁশের ফালি বা ভাঙ্গা পাথর খণ্ড ইত্যাদি যাহা দ্বারা কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত করা যায় উহা দ্বারা জবেহ হইতে পারে

২১৩৯। হাদীছ :—কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি ক্রীতদাসী বকরির পাল চরাইতে ছিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, একটি বকরি মুমূর্ষু অবস্থায়, তখন সে একটি পাথর ভাঙ্গিয়া উহার (ধারাল কিনারা) দ্বারা ঐ বকরিটিকে জবেহ করিয়া দিল। কায়াব (রাঃ) স্বীয় লোকদিগকে বলিলেন, ইহা কেহ খাইও না যাবৎ না আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) উহাকে খাইবার আদেশ করিলেন।

মছআলাহ :—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহিলারাও জবেহ করিতে পারে।

২১ ০। হাদীছ :—রাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—কোন এক জেহাদের ছফরে তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমাদের নিকট ছোরা-চাকু নাই (কি দিয়া জবেহ করিব ?) হযরত (দঃ) বলিলেন, যে কোন বস্তু কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত করে উহা দ্বারাই জবেহ করিতে পার, নখ ও দাঁত দ্বারা হইবে না। নখ দ্বারা হাব্‌শীগণ জবেহ করে, আর দাঁত (ধারাল বস্তু নহে) উহা হাড় শ্রেণীর।

ঐ জেহাদে আমরা উট-বকরি গণিমতরূপে শত্রু পক্ষ হইতে লাভ করিয়া ছিলাম, উহা হইতে একটি উট ছুটিয়া গিয়া আমাদের হাত-ছাড়া হইবার উপক্রম হইল। (উহাকে ধরিবার মত কোন ব্যবস্থাও আমাদের নিকট ছিল না;) এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল উহাতেই তাহার দফারফা হইয়া গেল। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উট গৃহ-পালিত পশু বটে, কিন্তু অনেক সময় উহা জংলী জানোয়ারের রূপ ধারণ করিয়া বসে; এমতাবস্থায় যদি উহা হাত-ছাড়া হওয়ার পর্য্যায়ে চলিয়া যায় তবে তাহাকে এইরূপই করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত উটের ঘটনা দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এবং অন্যান্য ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ একটি জরুরী মছআলাহ প্রমাণিত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জবেহ্ দুই প্রকার—(১) নিয়মিত জবেহ্ এবং (২) এজতেরারী জবেহ্। দ্বিতীয় প্রকার জবেহ্ সাধারণতঃ একমাত্র জংলী পশু-পক্ষীর জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে। গৃহ পালিত পশু-পক্ষীর জন্য নিয়মিত জবেহই নির্দ্ধারিত, কিন্তু কোন পালিত পশু যদি পোষ-মানা ত্যাগ করতঃ জঙ্গলীরূপ ধারণ করিয়া বসে, যেমন উট ও মহিষের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় এবং ষাঁড়ের মধ্যেও কোন কোন সময় দেখা যায় যে, পোষ-মানা ছাড়িয়া দেয়, মানুষের হাতে ধরা দেয় না, বরং মানুষ দেখিলেই আঘাত করিতে আসে, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, পাগলা হইয়া গিয়াছে—এই অবস্থা সাধারণতঃ উট মহিষ ও ষাঁড় ইত্যাদি বড় জানোয়ারের ক্ষেত্রেই ধর্তব্য, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি ছোট জানোয়ারের বেলায় ধর্তব্য নহে। তদ্রূপ কোন গৃহ পালিত পশু যদি গৃহে বাসের অভ্যাস ত্যাগ করতঃ জঙ্গলী পশুর ন্যায় গৃহ মুক্ত হইয়া মানুষের নাগাল হইতে ছুটিয়া পালায় এবং মরু প্রান্তর বা নিবিড় বন-জঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতে থাকে—এই উভয় ক্ষেত্রেই সেই পালা-পোষা পশুও জঙ্গলী পশুর ন্যায় গণ্য হইবে এবং ঐরূপ অবস্থায় উহার উপর দ্বিতীয় প্রকার জবেহ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।

এতদ্ভিন্ন যদি কোন গৃহ পালিত পশু এমন বেকায়দা স্থানে পতিত হয় যে স্থান হইতে যথা সময়ে উহাকে উদ্ধার করাও সম্ভব নহে এবং ঐ স্থানে যাইয়া উহাকে নিয়মিত জবেহ করারও সুযোগ নাই, অথচ অনতিবিলম্বে কিছু করা না হইলে উহার ধ্বংস সাধিত হইবে। যেমন, কোন জানোয়ার যদি কূপের মধ্যে পতিত হয়, এমতাবস্থায় উহার উপর আবশ্যকীয় জবেহ প্রযোয্য হইবে। অবশ্য খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ধারাল অস্ত্রের আঘাতে যেন উহার মৃত্যু ঘটে, অন্য কোন কারণে নহে। যেমন, কূপের পানিতে যেন উহার নাক ডুবিয়া না থাকে। ক্ষত করিয়া জবেহের কাজ সমাধা করিতে হইবে।

আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এই ফৎওয়া দিতেন।

বিছমিল্লাহ বলিয়া জবেহ করা

কোন জীব জবেহ করাকালে বিছমিল্লাহ তথা আল্লার নাম উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। ইচ্ছাকৃত উহা এড়াইয়া গেলে ঐ জীব মৃত গণ্য হইবে—উহা খাওয়া হারাম হইবে। ইহা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধান—

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"যেই জীব জবাহ করার সময় আল্লার নাম লওয়া হয় নাই ঐ জীব খাইবে না।"

অবশ্য যদি ভুলে আল্লার নাম উচ্চারণ ছুটিয়া যায় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে। আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ভুলে আল্লার নাম উচ্চারণ ছুটিয়া গেলে উহা খাওয়ায় দোষ হইবে না।

মহিলার জবাহ করা

২১৪১। হাদীছঃ— কাআব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মহিলা (ধারাল ভাঙ্গা) পাথর খণ্ড দ্বারা জবাহ করিল। সেই সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ঐ জবাহ কৃত জীবকে খাওয়ার আদেশ করিলেন।

জব্ব্—সাণ্ডা খাওয়া

ইহা একটি পাহাড়ী জীব, গর্তের মধ্যে বাস করে পানির এলাকায় থাকে না।

২১৪২। হাদীছঃ— আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "জব্ব্" আমি খাই না; তবে আমি উহাকে হারামও বলি না।

২১৪৩। হাদীছঃ— খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (স্বীয় খালা উম্মুল-মোমেনীন) মাইমুনা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভাজা করা "জব্ব্" উপস্থিত করা হইল! রস্থলুল্লাহ (দঃ) উহার দিকে হাত বাড়াইলেন। উপস্থিত একজন নবী-পত্নী বলিলেন, রস্থলুলাহ (দঃ) যাহা খাইতে উদ্যত হইতেছেন উহা কি জিনিষ তাহা বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলেই বলিল, ইহা জব্ব্। রস্থলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ হস্ত উঠাইয়া নিলেন। খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি হারাম ইয়া রস্থলুল্লাহ? তিনি বলিলেন, না; তবে আমাদের এলাকায় ইহা নাই, অতএব উহার প্রতি আমার ঘৃণা মনে হয়। খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি উহাকে আমার সম্মুখে টানিয়া আনিলাম এবং খাইতে লাগিলাম। রস্থলুল্লাহ (দঃ) আমার প্রতি তাকাইতে ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ- আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে, নবী (দঃ) জব্ব্ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হানফী মজহাবের আলেমগণ বলেন, এই হাদীছ অনুসারে জব্ব্ খাওয়া নিষিদ্ধ। উপরের হাদীছদ্বয় প্রথম কালের।

মছআলাহ ঃ—সাধারণ অবস্থায় একমাত্র ঐ বস্তুই খাইতে পারিবে যাহা শরীয়ত মতে হালাল। হারাম বস্তু খাইতে পারিবে না ; অবশ্য যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাধ্য হইয়া পড়ে তবে হারাম বস্তু শুধু প্রাণ বাঁচাইবার পরিমাণে খাইতে পারিবে। ইহা কোরআনের বিধান—২ পাঃ ছুরা বাকারা ১৭২,১৭৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

কোন জীবের প্রতি চানমারী করা

২১৪৪। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সঙ্গে ছিলাম, তাঁহার চলার পথে কতিপয় যুবক একটি মুরগীকে বাঁধিয়া রাখিয়া উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতঃ লক্ষ্য ঠিক করা শিখিতে ছিল। তাহারা দুর হইতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়া ছুটিয়া পালাইল। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুরগীটিকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া খোঁজ নিতে লাগিলেন, এই কাজ কে করিল এবং তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি এই কাজ করে হযরত নবী (দঃ) তাহার প্রতি লা'নৎ করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নৎ করিয়াছেন ঐ ব্যক্তিকে যে কোন প্রাণীকে জীবিত অবস্থায় কোন অঙ্গহানি করিয়া দেয়।

মোরগের গোশ্‌ত খাওয়া

২১৪৫। হাদীছ ঃ— যহ্‌দম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ছাহাবী আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বসা ছিলাম। আমাদের সম্মুখে খানা উপস্থিত করা হইল উহার মধ্যে মোরগের গোশ্‌ত ছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে গৌর বর্ণের একজন লোক ছিল সে ঐ খানায় শরীক হইল না। আবু মূছা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আস ! খানায় শামিল হও। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মোরগের গোশ্‌ত খাইতে দেখিয়াছি। ঐ লোকটি বলিল, একদা আমি মোরগকে খারাব জিনিষ খাইতে দেখায় আমার ঘৃনা জন্মিয়াছে, এমনকি আমি কসম করিয়াছি যে, আমি মোরগের গোশ্‌ত খাইব না।

আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, আস ! খানায় শামিল হও। তোমার কসম প্রসঙ্গে আমি তোমাকে হাদীছ শুনাইতেছি—

একদা আমি আমার গোত্রীয় কতিপয় লোকের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ছদকা-খয়রাতে আগত পশু-পাল গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিতে ছিলেন। ঐ সময় তিনি (কোন ব্যাপারে) রাগান্বিত ছিলেন, এমতাবস্থায় আমরা তাঁহার নিকট ছওয়ারী বানাইব বলিয়া জানোয়ার চাহিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে ছওয়ারী দিবেন না বলিয়া কসমের সহিত অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট তোমাদিগকে ছওয়ারীরূপে দিবার মত অবশিষ্ট কোন কিছু নাই।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই গণিমতের কতিপয় উট হযরতের নিকট পৌঁছিল। তখন হযরত (দঃ) আমাদিগকে খোঁজ করিলেন এবং আমাদিগকে পাঁচটি উট দিলেন। তথা হইতে আমরা চলিয়া আসার অনতিকাল পরেই আমি আমার সঙ্গীগণকে বলিলাল, হযরত (দঃ) (বোধ হয়) তাঁহার কসম ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই ভুলের সুযোগ গ্রহণ করিলে আজীবন আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। সেমতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পুনঃ উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি ত আমাদিকে ছওয়ারী না দেওয়ার কসম করিয়া ছিলেন, (কিন্তু পরে আমাদিগকে তাহা দিয়াছেন—) মনে হয় আপনি কসম ভুলিয়া গিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ছওয়ারী দেওয়ার সুযোগ দিয়াছেন (তাই আমি দিয়াছি। আর কসম সম্পর্কে কথা এই যে,) কোন বিষয় কসম খাওয়ার পর যখন আমি কসমের বিপরীত দিকটা উত্তম বলিয়া বুঝি তখন আমি ঐ উত্তমটাকে কার্য্যে পরিণত করি এবং কসমের কাফ্ফারা দিয়া দেই।

ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া

২১৪৬। হাদীছঃ— আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আমরা একবার একটি ঘোড়া জবেহ করিয়াছি এবং উহা খাইয়াছি।

২১৪৭। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের জেহাদ কালে গাধার গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ছিলেন এবং ঘোড়া সম্পর্কে অনুমতি দিয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত একটি হাদীছও অন্যান্য কেতাবে বর্ণিত আছে, অবশ্য সেই হাদীছ খানার সনদ (তথা উহা হাদীছ হওয়ার প্রমাণ) একটু দুর্ব্বল; তাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক প্রমুখ ইমামগণ ঘোড়ার গোশ্‌তকে মকরুহ বলিয়াছেন।

গাধার গোশ্ত খাওয়া

২১৪৮। **হাদীছ ঃ**—আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ-পালিত গাধার গোশ্ত হারাম বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন।

২১৪৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল, গাধার গোশ্ত খাওয়া হইতেছে। পুনরায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ অভিযোগই করিল। তৃতীয়বার এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, গাধা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলা হইতেছে। এইবার হযরত (দঃ) এই ঘোষনা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দেওয়ার আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহ পালিত গাধার গোশ্ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন, কারণ উহা অপবিত্র হারাম।

এই ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে যত ডেগের মধ্যে গাধার গোশ্ত রান্না করা হইতে ছিল এবং উহা টগবগ করিতে ছিল এমতাবস্থায় ঐ সব ডেগ উপুড় করিয়া সব গোশ্ত ফেলিয়া দেওয়া হইল।

হিংস্র জন্তুর গোশ্ত খাওয়া

২১৫০। **হাদীছ ঃ**— আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকল প্রকার হিংস্র জীবের গোশ্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মৃত জীবের চামড়া কাজে লাগানো

২১৫১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার চলার পথে একটি মৃত বকরি দেখিতে পাইলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা ইহার চামড়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা কর নাই কেন? সকলেই আরজ করিল, ইহা ত মৃত! হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা শুধু খাওয়া হারাম।

২১৫২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়ছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন; তখন বলিলেন, এই ছাগলের মালিকদের পক্ষে কোন দোষ ছিল না যদি তাহারা ইহার চামড়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মৃত জীবের চামড়া দাবাগত তথা বিশেষ কায়দায় শুষ্ক করার পর উহা ব্যবহার করা যায়।

খরগোশ খাওয়া

২১৫৩। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মার্‌রোজ-জাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশকে ধাওয়া করিলাম। সঙ্গীগণ দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া গেল। অতঃপর আমি উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং (আমার মুরব্বী) আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট নিয়া আসিলাম। তিনি উহাকে জবেহ করিলেম এবং উহার পাছের রান দুইটি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন।

কোরবানীর বয়ান

ঈদের নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করিলে কোরবানী আদায় হয় না

২১৫৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করিয়াছে তাহার সেই জবেহ শুধু নিজে খাইবার জন্য হইয়াছে (উহা কোরবানী হয় নাই।) আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে জবেহ করিয়াছে তাহার কোরবানী সঠিকরূপে হইয়াছে এবং সে ইসলামের বিধান মতে কাজ করিয়াছে।

২১৫৫। হাদীছ ঃ—জুন্দুব বাজালী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একবার ঈদের নামাযে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জামাতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করিয়াছে তাহার কোরবানী হয় নাই। তাহাকে নামাযের পর অন্য একটি পশু জবেহ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করে নাই সে (নামাযের পর) জবেহ করিবে।

এক বৎসরের কম বয়সের ছাগল কোরবানী হইবে না

২১৫৬। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোরবানীর ঈদের দিন নামাযান্তে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষন দানে বলিলেন, আজিকার দিনে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল নামায পড়া। তারপর নামায হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোরবানী করা। যে ব্যক্তি আমাদের এই নিয়ম মতে নামায পড়িয়া কোরবানী করিবে তাহার কোরবানী শুদ্ধ হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবাই করিয়াছে উহা শুধু তাহার গৃহে গোশ্‌ত খাওয়ার কাজে লাগিবে, কোরবানী মোটেই গণ্য হইবে না।

এতচ্ছ্রবনে আমার মামা আবু বোরদাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি নামাযের জন্য আসিবার পূর্ব্বেই আমার কোরবানীর পশু জবাই করিয়া ফেলিয়াছি। আমি ভাবিয়াছি, এই দিন পানাহারের দিন গোশত খাওয়ার দিন; আমার গৃহে সর্ব্বাগ্রে বকরি জবাই হউক। তাই তাড়াতাড়ি আমি আমার বকরিটি জবাই করিয়া নামাযে আসিবার পূর্ব্বেই সকাল বেলার খানা আমি খাইয়াছি, পরিবারবর্গকেও খাওয়াইয়াছি এবং পড়শীদেরকেও দিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহার স্থলে তোমাকে অন্য একটি কোরবানী করিতে হইবে; উহা তোমার শুধু গোশ্‌ত খাওয়ার বকরী সাব্যস্ত হইয়াছে। মামা বলিলেন, আমার নিকট কোরবানী করার কোন পশু নাই; একমাত্র ছয় মাস বয়সের একটি মোটা-তাজা বকরি আছে যাহা সাধারন দুইটি বকরি হইতেও উত্তম—ইহা কি আমার কোরবানীর জন্য যথেষ্ট হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—উহাকে প্রথমটার স্থলে কোরবানী করিয়া দাও, কিন্তু তোমার পরে অন্য কাহারও জন্য কখনও ছয় মাসের বকরি কোরবানীতে যথেষ্ট হইবে না।

দুম্বার কোরবানী

২১৫৭। হাদীছ ঃ—ওকবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে কতিপয় ছাগল-দুম্বা কোরবানীর জন্য ছাহাবী গণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলিলেন। সেমতে বণ্টনের পর ছয় মাস বয়সের একটি দুম্বা অবশিষ্ট থাকিল। নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এইটা কোরবানী কর।

মছআলাহ ঃ—দুম্বা যদি এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, সাধারণ এক বৎসর বয়স্কের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই রূপ দুম্বা এক বৎসর বয়সের কম হইলেও উহার কোরবানী শুদ্ধ হইবে। সাধারণ ভাবে দুম্বা এক বৎসরের কম বয়সে কোরবানী হয় না। দুম্বা ভিন্ন ছাগল ইত্যাদি কোন অবস্থায়ই এক বৎসরের কম বয়সে কোরবানী হইবে না।

● কোরনানীর পশু মোটা-তাজা হওয়া উত্তম। আবু উমামা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা কোরবানীর পশু মোটা-তাজা হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিতাম; মদিনাবাসী সকলেই এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিতেন। (৮৩৩ পৃঃ)

কোরবানী নিজ হাতে জবেহ করা

২১৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাদা-কাল বিচিত্র রং বিশিষ্ট দুইটি দুম্বা কোরবানী করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, হযরত (দঃ) উহার প্রত্যেকটির মাথা পা দ্বারা দাবাইয়া বিছমিল্লাহে-আল্লাহু আকবার বলিয়া নিজ হাতে জবেহ করিয়াছেন।

● আবু মূছা আশআরী (রাঃ) তাঁহার কন্যাগণকে আদেশ করিতেন, তাহারা যেন নিজ হস্তে কোরবানী করে। (৮৩৪পৃঃ)

মছআলাহ ঃ— "বিছমিল্লাহ" এবং "আল্লাহু-আকবর" উভয়টি উচ্চারণে জবেহ করিবে।

কোরবানীর গোশ্‌ত কত দিন খাওয়া যায়

২১৫৯। হাদীছ ঃ—ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে কোরবানীর গোশ্‌ত (মক্কা হইতে) মদীনা পর্য্যন্ত নিয়া আসিতাম।

২১৬০। হাদীছ ঃ—সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক বৎসর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষনা দিলেন, যাহারা কোরবানী করিয়াছে তাহাদের গৃহে যেন কোরবানীর গোশ্‌ত তৃতীয় দিনের পর বাকি না থাকে। পরবর্ত্তী বৎসর ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বৎসরও কি গত বৎসরের ন্যায় তিন দিনের বেশী কোরবানীর গোশ্‌ত রাখিব না ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, কোরবানীর গোশ্‌ত খাও, লোকদিগকে দাও এবং জমা করিয়াও রাখিতে পার। গত বৎসর লোকগণ অভাবে ছিল, তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা জমা না রাখিয়া লোকদের সাহায্য কর।

২১৬১। হাদীছ ঃ— ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিদেশে ছিলাম। তথা হইতে বাড়ী আসিলে পর আমার সম্মুখে গোশ্‌ত উপস্থিত করা হইল এবং বলা হইল, ইহা আমাদের কোরবানীর গোশ্‌ত। আবু সায়ীদ (রাঃ) বলিলেন, এই গোশ্‌ত আমার সম্মুখ হইতে দূরে নিয়া যাও, আমি ইহা মুখেও দিব না। অতঃপর আমি আমার ভ্রাতা আবু কাতাদার নিকট আসিলাম এবং এই কথা উল্লেখ করিলাম (যে, আমাদের ঘরে এখনও কোরবানীর গোশ্‌ত রহিয়াছে। অথচ তিন দিনের বেশী কোরবানীর গোশ্‌ত জমা রাখা নিষিদ্ধ।) তিনি বলিলেন, আপনার অনুপস্থিতে সেই হুকুম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

২১৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কোরবানীর গোশ্‌ত (বেশী দিন রাখার জন্য) নিমক দিয়া রাখিতাম। অতঃপর তাহা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পেশ করিতাম।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, তিন দিনের বেশী কোরবানীর গোশ্‌ত খাইও না। হযরত (দঃ) ইহা অলঙ্ঘনীয় আদেশরূপে বলেন নাই, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, অন্যদেরকে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া চাই।

ঈদের নামায খোৎবার পূর্ব্বে হইবে

২১৬৩। হাদীছঃ— আবু ওবায়দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতে ঈদের নামায পড়িয়াছি তিনি নামায পড়িয়া পরে খোৎবা দিয়াছেন এবং তিনি বলিলেন, হে লোক সকল। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই ঈদের দিনসমূহে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—রমজানের রোযার পর ঈদুলফেৎরের দিন এবং কোরবানীর গোশ্‌ত খাওয়ার ঈদের দিন।

আবু ওবায়েদ (রঃ) বলেন, আমি খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতেও ঈদের নামায পড়িয়াছি, ঐ দিন জুমার দিন ছিল। তিনিও ঈদের নামায পড়িয়া তারপর খোৎবা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে লোক সকল! অদ্য দুইটি ঈদ একত্রিত হইয়াছে। দুর প্রান্ত হইতে আগতদের মধ্যে কেহ মদীনা শহরে থাকিয়া জুমার নামায আদায় করিয়া যাওয়ার খাহেস রাখিলে তাহা সমাধা করিয়া যাইতে পার। আবার কেহ ইচ্ছা করিলে জুমা না পড়িয়াও চলিয়া যাইতে পার—আমার পক্ষ হইতে অনুমতি আছে।

আবু ওবায়েদ (রঃ) বলেন, তারপর আমি খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতেও ঈদের নামায পড়িয়াছি। তিনিও নামায পড়িয়া তারপর লোকদের সম্মুখে খোৎবা দিয়াছেন।

পানীয় বস্তু সমূহের বয়ান ঃ

মদ্যপানের পরিণাম

আল্লাহ তায়ালা বরিয়াছেন ঃ—

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্ত্তি ও লটারী এ সবই অবৈধ বস্তু (এই সবের ব্যবহার) শয়তানের কাজ বলিয়া পরিগণিত, অতএব তোমরা ঐ সব পরিহার কর; তবেই তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।"

২১৬৪। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْآخِرَةِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে মদ্য পান করিবে এবং উহা হইতে তওবা না করিবে আখেরাতের জীবনে সে ঐ (নামীয়) নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস, আমোদ-স্ফুর্ত্তি ও আনন্দ উপভোগের যে সব বস্তুনিচয় রহিয়াছে মানুষ ঐ সবের নাম সমূহের সহিতই পরিচিত, তাই আখেরাতে ঐ শ্রেণীর যে সব বস্তুনিচয় রহিয়াছে ঐ বস্তুনিচয় কোরআন হাদীছে ঐ সব নামের মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু এস্থলে দুইটি বিষয় মনে রাখিবে—একটি এই যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের বস্তুর নাম এক দেখা গেলেও গুণাগুণের দিক দিয়া লক্ষ লক্ষ গুণের ব্যবধান রহিয়াছে। আর একটি এই যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সীমাবদ্ধ মাত্রার বাহিরে অবৈধ হওয়ায় কোন কোন বস্তু দুনিয়াতে হারাম ও নিষিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু আখেরাতে সেই সীমাবদ্ধতা না থাকায় তাহা তথায় জায়েয ও বৈধ হইয়া যাইবে। যেমন, পুরুষের জন্য স্বর্ণালঙ্কার, রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ইত্যাদি। তদ্রূপ কোন বস্তুর মধ্যে উপকারীতার সঙ্গে দীন ও দুনিয়ার দিক দিয়া কোন বিশেষ অপকারীতা থাকার দরুণ উহা দুনিয়াতে নিষিদ্ধ ও হারাম রহিয়াছে, কিন্তু আখেরাতের সেই বস্তুর মধ্যে ঐ অপকারিতা থাকিবে না এবং তথায় উহা বৈধ ও জায়েয গণ্য হইয়া ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের বস্তুরূপে ব্যবহৃত হইবে। যেমন মদ—দুনিয়াতে ইহা আমোদ-প্রমোদের বা অন্য কোন উপকারের খেয়ালে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বড় দোষ রহিয়াছে—যেই দোষ বহু পাপ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বহু অপকারিতার কারণ। তাহা হইল উহার মাদকতা দোষ, যাহার সর্ব্ব নিম্ন অপকারিতা হইল এই যে, কিছু সময়ের জন্য হইলেও মানুষের মস্তিষ্কের উপর এমন একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যদ্দারা মানুষের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় এবং ঐ সময় তাহার উপর পশুত্বের স্বভাব ছওয়ার হইয়া বসে। কারণ, মানুষের মধ্যে ত পশুত্বের স্বভাব আছেই কিন্তু তাহার অমূল্য রত্ন জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনাশক্তি ঐ স্বভাবের প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিয়া রাখে। অধিকন্তু মদ মানুষের পশুত্ব স্বভাব ও পশুত্ব শক্তির মধ্যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া দেয়। এই ধরণের বহু দোষ মদের মধ্যে রহিয়াছে যদ্দরুণ সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাকে অপবিত্র ও শয়তানী কাজের বস্তু নামে আখ্যায়িত করিয়া উহাকে হারাম ঘোষনা করিয়াছেন।

বেহেশতের অসংখ্য নেয়ামতরাশীর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ স্ফুর্ত্তি উপভোগের জন্য এক প্রকার পানীয় হইবে; সাধারণ পরিচয়ের জন্য কোরআন

হাদীছে উহাকে খাম্‌র—শরাব বা মদ নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বেহেশতের আনন্দদায়ক পানীয়কে তোমাদের পরিচিত নাম খাম্‌র—শরাব বা মদ নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে শুধু পরিচয় লাভের জন্য। নতুবা দুনিয়ার পানীয় মদ ও বেহেশতের ঐ নামের পানীয়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য কর যে—

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ - لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

"উহার রং হইবে নির্ম্মল স্বচ্ছ সাদা, উহা পানে হইবে অতি সুস্বাদু। উহার মধ্যে এমন কোন ক্রিয়া থাকিবে না যদ্দরুণ মস্তিষ্কে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—মাথায় চক্র বা মাত্‌লামীর ক্রিয়া উহাতে মোটেই থাকিবে না। (২৩ পাঃ ৬ রুঃ)

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ -

"বেহেশতবাসীগণ আমোদ-স্ফূর্ত্তিস্থলে বন্ধু বান্ধবদের সহিত পানপাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে। সেই পানীয়ের মধ্যে এমন কোন ক্রিয়া থাকিবে না যদ্দরুণ মুখে অসংযত কথা আসে বা অনাচার কাজ সঙ্ঘটিত হয়।" (২৬ পারা ছুরা তুর)

আলোচ্য হাদীছে যে বলা হইয়াছে—আখেরাতের জিন্দেগীতে ঐ (মদ নামীয়) নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে—ইহার দুই অর্থ করা হইয়াছে। এক অর্থ এই যে, (এক পক্ষ কালের জন্য) ঐ নেয়ামতের স্থল বেহেশ্‌ত হইতেই বঞ্চিত থাকিবে। আর এক অর্থ এই করা হয় যে, অন্যান্য আমলের বদৌলতে বা মদ্য পানের শাস্তি ভোগের পর বেহেশত লাভ হইলেও সে তথায় ঐ নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

আঙ্গুর ব্যতীত অন্য বস্তুর সুরাও হারাম

২১৬৫। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা প্রথম যখন বিঘোষিত হয় তখন মদীনা এলাকায় আঙ্গুরের (অভাবের দরুণ উহার) রসে তৈরী মদের প্রচলন ছিল না।

২১৬৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) একদা মদীনার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া ভাষনে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মদ হারাম বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। উহা (সাধারণতঃ) পাঁচ প্রকার জিনিষ দ্বারা তৈরী হয়—আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম, এবং যব। বস্তুতঃ যে কোন জিনিষের মাদকতা জ্ঞান-শক্তির উপর অবরণের সৃষ্টি করে উহাই মদ বলিয়া গণ্য হইবে। (মদ হারাম হওয়া শুধু আঙ্গুরের রসে সীমাবদ্ধ নহে।)

২১৬৭। হাদীছ:— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবু ওবায়দাহ (রাঃ), আবু তাল্‌হা (রাঃ), উবাই-ইবনে-কায়াব (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণকে কাঁচা ও শুষ্ক খেজুর হইতে তৈরী সুরা পান করাইতে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উক্ত সুরা ফেলিয়া দেওয়ার আদেশ করা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিলাম।

২১৬৮। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট "বিত্‌য়া" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। উহা মধু দ্বারা তৈরী সুরা; ইয়ামান দেশে উহা পানের প্রচলন ছিল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সে প্রসঙ্গে বলিলেন, যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করে উহাই হারাম।

শরাব বা মদ ভিন্ন নামের আড়ালে পান করার পরিণতি

২১৬৯। হাদীছ:—আবু আমের (রাঃ) কিম্বা আবু মালেক (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত হওয়ার দাবীদারদের মধ্যে এমন এমন লোকও হইবে যাহারা জেনা বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে, (নাম বদলাইয়া ভিন্ন নামের আড়ালে) মদ পান করিবে, গান বাজনায় লিপ্ত হইবে। (এই শ্রেণীর) একদল লোক কোন একটি পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি অবস্থানরত হইলে পর অপ্রত্যাশিত ভাবে রাত্রি বেলা অকস্মাৎ সেই পর্ব্বৎ তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িবে এবং অপর এক দলকে চিরজীবনের জন্য বানর ও শুকর বানাইয়া দেওয়া হইবে।

দাঁড়াইয়া পানি পান করা

দাঁড়াইয়া পানি পান করা সম্পর্কে কতিপয় হাদীছে নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রহিয়াছে। মোছলেম শরীফে এ সম্পর্কে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে—(১) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) দাঁড়াইয়া পানি পান করার উপর তিরস্কার করিয়াছেন। (২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, খবরদার! কেহ দাঁড়াইয়া পানি পান করিবে না। যদি কেহ ভুলে ঐরূপ করিয়া বসে তবে বমি করতঃ ঐ পানি ফেলিয়া দেওয়া উচিৎ। (৩) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) দাঁড়াইয়া পানি পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আনাছ (রাঃ)কে সকলে জিজ্ঞাসা করিল যে, দাঁড়াইয়া আহার করা কিরূপ? তিনি বলিলেন উহা ত আরও জঘন্য!

পক্ষান্তরে কোন কোন হাদীছে এবং কোন কোন ছাহাবী হইতে দাঁড়াইয়া পানি পান করার বৈধতাও বর্ণিত আছে। সকল দিক দৃষ্টে হাদীছ বিশারদগণ এই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া পানি পান করা অবৈধ না হইলেও মকরুহ ও বর্জ্জনীয়। অবশ্য ফজিলত ও বরকতের পানি দাঁড়াইয়া পান করা সর্ব্বসম্মতরূপে উত্তম। একাধিক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যম্‌যম্ কূপের পানি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছের বিষয়টিকেও উহার অন্তরভুক্ত করা হইয়া থাকে। কারণ, যেই পাত্রের পানি দ্বারা ওজু করা হয় উহার অবশিষ্ট পানি বরকতের পানি গণ্য হয়।

২১৭০। **ছাদীছ** ঃ—আমীরুল-মোমেনীন আলী (রাঃ) (তাঁহার রাজধানী) কুফা নগরীতে একদা জোহরের নামায পড়িয়া সর্ব্বসাধারণের বৈঠকস্থানে জনগণের অভাব অভিযোগ সমাধানে বসিলেন। এমনকি আছরের নামাযের ওয়াক্ত আসিয়া গেল, তখন পানি উপস্থিত করা হইল। আলী (রাঃ) উহা হইতে কিছু অংশ পান করিলেন এবং হাত মুখ ও পা (ইত্যাদি ওজুর অঙ্গ) ধৌত করতঃ ঐ পাত্রের অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া পান করিলেন এবং বলিলেন, লোকেরা দাঁড়াইয়া পানি পান করাকে দূষণীয় গণ্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি যাহা আমি করিলাম।

২১৭১। **ছাদীছ** ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যম্‌যমের পানি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

খোরমা ভিজানো পানি পান করা

২১৭২। **ছাদীছ** ঃ— আবু উসাইদ (রাঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। নব বধূই সেবিকা ছিলেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য রাত্রি বেলায়ই কিছু খোরমা একটি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম; (সেই পানিই নবী (দঃ)কে শরবৎ রূপে পান করানো হইয়াছিল।)

২১৭৩। **ছাদীছ** ঃ—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোরমা ও কাঁচা খেজুর কিম্বা খোরমা ও কিশমিশ একত্রে ভিজাইতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন ভিজাইতে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—পানীয় পানি সুস্বাদ করার জন্য আরব দেশে খোরমা খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করা হইত। এই ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল যে, পানিতে যেন মাদকতা সৃষ্টি না হয়; সেই জন্যই অনেক বেশী সময় ভিজাইয়া রাখিতে নিষেধ করা হইত এবং উল্লেখিত রূপে দুই শ্রেণীর বস্তু একত্রে ভিজাইতেও নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, উহাতে মাদকতা সৃষ্টির আশঙ্কা অধিক।

পানিতে দুধ মিশ্রিত করিয়া পান করা

২১৭৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একজন সঙ্গী সহ এক মদিনাবাসী ছাহাবীর নিকট তাহার বাগানে প্রবেশ করিলেন। ঐ ছাহাবী তখন বাগানে পানি সেচনের কাজ করিতে ছিলেন। নবী (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী ঐ ছাহাবীকে সালাম করিলেন। ছাহাবী সালামের উত্তর দানে স্বীয় মাতা পিতা নবীজীর চরণে উৎসর্গ বলিয়া আরজ করিলেন। সময়টি অত্যন্ত উত্তাপের সময় ছিল।

নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তোমার নিকট রাত্রি বেলা মশকে সুরক্ষিত পানি আছে কি? নতুবা বাগানের এই হাউজ হইতেই পান করি। ঐ ছাহাবী আরজ করিলেন, আমার নিকট রাত্রে মশকের মধ্যে সুরক্ষিত পানি রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাগানস্থ ঝুপড়িতে গেলেন এবং একটি পাত্রে মশক হইতে পানি লইয়া উহার উপর ছাগল হইতে দুধ দোহন করিয়া দিলেন। প্রথম বার নবী (দঃ) পান করিলেন, দ্বিতীয়বার পুনরায় ঐরূপে পানীয় আনিলেন—উহা সঙ্গী ব্যক্তি পান করিল।

পানি পান করার নিয়ম

২১৭৫। হাদীছ ঃ— আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পানি পান করার সময় কেহ পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়িবে না এবং প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাবাঙ্গ ডান হাতে স্পর্শ করিবে না এবং ডান হাতে এস্তেন্জা করিবে না।

২১৭৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) দুই বা তিন শ্বাসে পানি পান করিতেন এবং তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন শ্বাসে পানি পান করিতেন।

রৌপ্য পাত্রে পানি পান করা

২১৭৭। হাদীছ ঃ—হোজায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে কিছু পান করিবে না। মোটা বা মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। এই সব বস্তু দুনিয়া বা ইহজগতে কাফেরগণ ব্যবহার করে, তোমরা ব্যবহার করিবে পরকাল বা আখেরাতে।

২১৭৮। হাদীছ ঃ—উম্মে ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করিয়া থাকে সে নিশ্চয় তাহার পেটে জাহান্নামের অগ্নি ভর্তি করিতেছে।

খাদ্য ও পানির পাত্র ঢাকিয়া রাখা

২১৭৯। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাস বলিয়াছেন, রাত্রি বেলা ঘুমাইবার সময় (বিছমিল্লাহ বলিয়া) প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিও, (বিছমিল্লাহ বলিয়া) ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিও, খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢাকিয়া দিও ; অন্ততঃ একটি কাষ্ঠ খণ্ড হইলেও উহার উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দিও।

২১৮০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোমায়েদ (রাঃ) নামক এক আনছারী ব্যক্তি "নকী" নামক স্থানে তাহার গৃহ হইতে একটি পাত্রে করিয়া নবী ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য দুগ্ধ নিয়া আসিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, পাত্রটি আবৃত কর নাই কেন ? অন্ততঃ একটি কাষ্ঠ খণ্ডই উহার উপর আড়াআড়িভাবে রাখিতে! (৮৩৯পৃঃ)

মশকের মুখ হইতে পানি পান করা

২১৮১। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, মশকের মুখের সহিত মুখ লাগাইয়া পানি পান করা হইতে।

২১৮২। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং কাহারও দেয়ালের উপর তাহার প্রতিবেশীকে কড়ি রাখায় বাধা দানে নিষেধ করিয়াছেন।

২১৮৩। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মশকের মুখ হইতে পানি পান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বরকতের পানি বেশী পান করা

২১৮৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ঘটনা উপলক্ষে আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আছরের নামায উপস্থিত হইল, কিন্তু আমাদের নিকট সামান্য একটু পানি ভিন্ন আর পানি ছিল না। ঐ পানিটুকু এক পাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তিনি উহার মধ্যে হাত রাখিয়া হাতের আঙ্গুল সমুহ ছড়াইয়া দিলেন এবং সমস্ত লোকদেরে উহা হইতে অজু করার জন্য ডাকিলেন। আমি দেখিতে ছিলাম নবীজীর আঙ্গুলের ফাঁক হইতে পানি উথলিয়া উঠিতেছে। সকল লোক ঐ পানি হইতে অজু করিল এবং পান করিল।

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আমার সাধ্য মতে পেট পুরিয়া ঐ পানি পান করিলাম। কারণ, বুঝিয়া ছিলাম যে, এই পানি অতি বরকতের পানি। আমরা চৌদ্দ বা পনর শত লোক সেখানে ছিলাম।

রোগ ব্যাধি সম্পর্কীয় বয়ান

রোগের দরুন গোনাহ মাফ হয়

২১৮৫। হাদীছ— ان عائشة رضى الله تعالى عنه قالت

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ

اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ۔

অর্থ—উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানের উপর যে কোন প্রকার বালা-মছিবত আসিলে আল্লাহ তায়ালা উহার দ্বারা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন, এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলেও।

২১৮৬। হাদীছঃ— عن ابى سعيد الخدرى و ابى هريرة (رض)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ

وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ۔

অর্থ—আবু ছায়ীদ (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমান ব্যক্তির উপর কোন দুঃখ আসিলে, কোন কষ্ট-যাতনা আসিলে, কোন দুর্ভাবনা বা উদ্বেগ আসিলে, কোন দুশ্চিন্তা আসিলে—যে কোন প্রকার কষ্ট আসিলে এবং কোন প্রকার শোক আসিলে, এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলেও উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির গোনাহ মাফ করিয়া দেন।

২১৮৭। হাদীছ:— عن كعب رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من

الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالارزة

لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة -

অর্থ—কায়া'ব (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির অবস্থা শশ্য গাছের অবস্থারূপ। শস্য গাছকে বাতাসের ঝাপটা একবার কাত করিয়া ফেলিয়া দেয়, আর একবার (অপর দিকের ঝাপটায়) দাঁড় করিয়া দেয়—এইভাবে বিভিন্ন দিকের বাতাস উহাকে বিভিন্ন দিকে ফেলিয়া দেয় (তদ্রূপ মোমেন ব্যক্তিও বিভিন্ন রকম আপদ-বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেই থাকে।)

পক্ষান্তরে মোনাফেকের অবস্থা বৃহৎ বট বৃক্ষের ন্যায়—বাতাসের ঝাপটায় কমই আক্রান্ত হয়, কিন্তু যখন আক্রান্ত হয় তখন সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়।

২১৮৮। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من

الزرع من حيث اتتها الريح كفأتها فاذا اعتدلت تكفأ بالبلاء

والفاجر كالارزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله اذا شاء -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির অবস্থা শস্য গাছের অবস্থারূপ। বিভিন্ন দিকের বাতাসের ঝাপটা উহাকে কাত করিয়া ফেলিতে থাকে, এক একবার সোজা হয় আবার কাত হইয়া পড়ে। মোমেন ব্যক্তির অবস্থাও তদনুরূপ—সে বালা-মছিবতের দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে।

পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তির অবস্থা বৃহৎ ও শক্ত বৃক্ষের ন্যায়। বাতাসের ঝাপটা উহাকে নত করিতে পারে না, কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয় তখন উহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ধ্বংস করিয়া দেন।

ব্যাখ্যা ঃ—পরীক্ষার স্থল ইহজগতে আল্লাহ তায়ালা ধরা-বান্ধা এক নিয়ম জারি না রাখিয়া বিভিন্ন নিয়ম জারি রাখিয়াছেন, নতুবা পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিত। যেমন—স্থান বিশেষে ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে শান্তির জিন্দেগী দান করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"যে কোন নারী বা পুরুষ ঈমানদার হইয়া নেক আমল করিবে আমি তাহাকে (দুনিয়াতে) শান্তির জেন্দেগী দান করিব এবং (আখেরাতে) তাহার আমলের উত্তম প্রতিফল দান করিব। (১৪ পারা—ছুরা নহ্‌ল ১৩ রুকু।)

পক্ষান্তরে নাফরমানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

"যে ব্যক্তি আমাকে ভুলিয়া থাকে তাহার জন্য সঙ্কীর্ণ জেন্দেগী হইবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব।" (১৬ পারা—ত্বা-হা ৭ রুকু)

এই অবস্থায় মোমেনের কর্ত্তব্য হইল শান্তির জেন্দেগী আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান গণ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালার শোকর-গুজারী করা, আল্লার প্রতি অধিক ধাবিত হওয়া, কোন প্রকার ফখর-গরুরীতে পতিত না হওয়া।

স্থান বিশেষে উহার বিপরীতও হয়—মোমেন ব্যক্তির উপর আপদ-বিপদ বালা-মছিবৎ অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকে। যেমন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় মোমেনের কর্ত্তব্য হইবে—আপদ-বিপদকে ঈমানদারের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থারূপ গণ্য করতঃ ধৈর্য্য ধারণ করা এবং পরবর্ত্তী হাদীছে বর্ণিত সুসংবাদের আশা পোষণ করা।

২১৮৯। হাদীছ ঃ— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন (মোমেন) ব্যক্তির মঙ্গল চাহিলে তাহাকে বালা-মছিবতে পতিত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বিষয়টি পরিস্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট যদি কোন বন্দার জন্য বিশেষ মর্ত্তবা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাহার আমল তাহাকে ঐ মর্ত্তবায় পৌঁছাইতে পারে না তবে আল্লাহ তায়ালা ঐ বন্দাকে শারীরিক বা ধন-জনের বালা-মছিবতে লিপ্ত করেন এবং (সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর ছবর ও ধৈর্য্য ধারনের তৌফিকও দান করেন।) ঐ ব্যক্তি সেই বালা-মছিবতের উপর ছবর করে এবং এই অছিলায় সে ঐ মর্ত্তবায় পৌঁছিতে সক্ষম হয়।

২১৯০। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর রোগের প্রকোপ যত কঠোর হইত ঐরূপ অন্য কাহারও উপর দেখি নাই।

২১৯১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার জ্বর আসিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার ত অত্যধিক জ্বর। হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আমার জ্বর আসিলে তোমাদের দ্বিগুণ জ্বর আসিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই জন্য যে, আপনার ছওয়াব দ্বিগুণ? হযরত (দঃ) বলিলেন, বস্তুতঃ তাহাই।

যে কোন মোসলমানের উপর কোন দুঃখ-যাতনা আসে, এমনকি তাহার পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হয় বা তার চেয়েও মামুলী কোন কষ্ট তাহার হয় আল্লাহ তায়ালা উহার দ্বারা অবশ্যই তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন। তাহার গোনাহ ঝরিয়া পড়ে যেরূপ (শীতের পরে) বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া থাকে।

রোগীকে দেখিতে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য

২.৯২। হাদীছ ঃ—عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا

الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ -

অর্থ—আবু মুছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্ষুধার্তকে খাইতে দাও, রোগীকে দেখিতে যাও এবং ক্রীতদাসকে মুক্ত কর।

বেহুঁশ রোগীকে দেখিবার জন্য যাওয়া

২১৯৩। হাদীছ ঃ—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি অসুস্থ হইলে পর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) পায়ে হাটিয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় পাইলেন। তখন হযরত নবী (দ) অজু করিয়া তাঁহার অজুর পানি আমার উপর বহাইয়া দিলেন, তাহাতে আমার হুঁশ ফিরিয়া আসিল। আমি হযরত নবী (দঃ)কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার সম্পত্তি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব—উহা সম্পর্কে আমি কি ফয়ছালা করিয়া যাইব? হযরত (দঃ) আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের মিরাস সম্পর্কীয় আয়াত নাযেল হইল।

মৃগী রোগীর মর্ত্তবা

২১৯৪। হাদীছ ঃ— আতা ইবনে আবু রবাহ্ (রঃ) বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিলেন, একজন বেহেশ্‌তী রমণী তোমাকে দেখাইব কি? আমি বলিলাম, নিশ্চয়। তিনি বলিলেন, ঐ যে কৃষ্ণবর্ণা রমণীটি। একদা সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে আসিয়া বলিল, আমি মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া যাই এবং তাহাতে আমি উলঙ্গ হইয়া পড়ি। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পার তাহাতে তুমি বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি দোয়া করিতে পারি—আল্লাহ তোমাকে এই রোগ হইতে মুক্তি দান করুন। এতচ্ছ্রবনে রমণীটি বলিল, আমি ছবরই করিব। অবশ্য আপনি এতটুকু দোয়া করুন যেন আমি ঐ অবস্থায় উলঙ্গ না হইয়া যাই। হযরত (দঃ) তাহার জন্য দোয়া করিলেন।

অন্ধ ব্যক্তির মর্ত্তবা

২১৯৫। হাদীছ ঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ

عَبْدِى بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমি আমার কোন বন্দাকে যদি তাহার অতি প্রিয় বস্তু—চক্ষুদ্বয়ের বিপদে পতিত করি (অর্থাৎ সে অন্ধ

হইয়া যায়) এবং সে ঐ বিপদে ছবর করে তবে তাহার চক্ষুদ্বয়ের বিনিময়ে আমি তাহাকে বেহেশ্‌ত দান করিয়া থাকি।

রোগীর সাক্ষাতে কি বলিবে

২১৯৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন রোগীকে দেখিতে গেলে তাহাকে শান্তনা দান করিয়া এইরূপ বলিতেন—لَا بَأْسَ طَهُورٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

"অস্থির হইবে না; (রোগ-যাতনার দ্বারা) ইনশা-আল্লাহ (গোনাহ মাফ হইয়া) পবিত্রতা লাভ হইবে।"

এক গ্রাম্য বৃদ্ধ সদ্যঃ মদীনায় আগত ও ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তি অসুস্থ হইল। হযরত (দঃ) তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহাকে শান্তনা দান করিয়া ঐরূপ বলিলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের কথা খণ্ডন করিয়া বলিল, না—না, বরং ভীষণ প্রকোপের জ্বর যাহা বৃদ্ধকে কবরে নিয়া ছাড়িবে। তদুত্তরে হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তাহাই হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—বৃদ্ধ নিজেই নিজের বিপদ টানিয়া আনিল। হযরতের শান্তনা দানের উপর আস্থা আনিল না। হযরতের কথা খণ্ডন করতঃ বিপরীত উক্তি করিল। হযরত (দঃ) বিরক্তির সহিত তাহার উক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন, ফলে অনতিবিলম্বে তাহাই ঘটিল—বৃদ্ধ ঘটনার পরদিনই কবরস্থানের যাত্রী হইল।

মৃত্যু কামনা করা

২১৯৭। হাদীছঃ— عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ

خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ"

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুঃখ-কষ্টের দরুণ কখনও কেহ মৃত্যু কামনা করিও না। যদি সেইরূপ কিছু করিতেই হয় তবে এই দোয়া করিবে—...... اللهم احينى "হে আল্লাহ! যাবৎ আমার পক্ষে জীবিত থাকা ভাল হয় তাবৎই আমাকে জীবিত রাখ। আর যখন আমার পক্ষে মৃত্যু মঙ্গলময় হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর।"

ব্যাখ্যা ঃ—দুঃখ-যাতনার দরুণ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু আল্লার প্রেমে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নহে।

২১৯৮। হাদীছ ঃ—কায়স ইবনে আবু হাযেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কতিপয় লোক রোগগ্রস্ত খাব্বাব (রাঃ) ছাহাবীকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি এতই অসুস্থ ছিলেন যে, পর পর সাত বার দাগ লাগানোর চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমাদের যে সব সঙ্গীগণ ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমন অবস্থায় যে, তাঁহাদের নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতে মোটেই ব্যয় হয় নাই (—তাঁহারা দুনিয়ার ধন-দৌলত ভোগ করেন নাই ; কষ্টে ক্লিষ্টে দুনিয়ার জেন্দেগী কাটাইয়া গিয়াছেন।) কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এত এত ধন-দৌলত পাইয়াছি যে, উহা রাখিবার স্থান পাইতেছি না। বাধ্য হইয়া মাটি তথা অনাবশ্যক জায়গা-জমি ও ইমারত-অট্টালিকায় ব্যয় করিতেছি।

ঐ সময় খাব্বাব (রাঃ) আরও বলিলেন, স্বীয় কষ্ট-যাতনার আধিক্যে মৃত্যুর জন্য দোয়া করা যদি হযরত নবী (দঃ) নিষেধ না করিতেন তবে অবশ্য, আমি মৃত্যু কামনা করিয়া দোয়া করিতাম।

অতঃপর আর একদিন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম। ঐদিন তিনি একটি বাগান তৈরী করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, মোসলমান ব্যক্তি তাহার সকল প্রকার ব্যয়েই ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে—এই এক প্রকার ব্যয় ব্যতীত যাহা সে মাটি তথা (অনাবশ্যক) জায়গা-জমির মধ্যে করিয়া থাকে।

২১৯৯। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কাহারও আমল তাহাকে বেহেশ্‌তের অধিকারী বানাইতে যথেষ্ট নহে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি আমলের দ্বারা

বেহেশ্‌তের অধিকারী হইতে পারিবেন না ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও না— যাবৎ না আল্লার মেহেরবাণী ও রহমত আমাকে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া নেয়। অবশ্য সাধ্যানুযায়ী ছেরাতে-মোস্তাকীম বা সৎপথের উপর থাকিয়া আল্লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

আর তোমাদের কেহ মৃত্যু কামনা করিবে না। কারণ, নেককার ব্যক্তি বেশী বয়স পাইয়া অধিক নেক কাজ করার সুযোগ লাভ করে এবং বদকার ব্যক্তি অধিক বয়স পাইয়া তওবা করার সুযোগ লাভ করে।

রোগী দেখিতে যাইয়া রোগীর জন্য দোয়া

বেহেশ্‌ত লাভের ঘোষণা প্রাপ্ত ছাহাবী সায়াদ ইবনে আবী ওক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) আমাকে রোগ অবস্থায় দেখিতে আসিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত মোবারক আমার ললাটের উপর রাখিলেন, অতঃপর আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন, اللهم اشف سعدا। "হে আল্লাহ! সায়াদকে সুস্থ করিয়া দিন।"

২২০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন রোগীর নিকট আসিলে বা কোন রোগীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে (স্বীয় ডান হাত রোগীর শরীরে বুলাইতেন এবং) এই দোয়া পড়িতেন—

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

"হে সকলের প্রভু-পরওয়ারদেগার! যন্ত্রনা ও ব্যাধি দুর করিয়া দিন, রোগ মুক্তি দান করুন ; রোগ মুক্তির মালিক একমাত্র আপনিই। এমন রোগ মুক্তি দান করুন যাহার ফলে কোন প্রকার রোগ না থাকে।"

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বয়ান

রোগ ও ঔষধ

২২০১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যত প্রকার রোগই সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। (রোগ অনুযায়ী ঔষধ ঠিকভাবে পড়িলে আল্লার আদেশে রোগ দুর হইয়া থাকে।)

পুরুষ রোগীকে নারীর সেবা শুশ্রূষা ?

২২০২। **হাদীছ ঃ**— রুবাইয়্যে বিন্‌তে মোয়াওয়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা (নারী ছাহাবী) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে যাইয়া থাকিতাম। আমরা তথায় লোকদের পানি পানের ব্যবস্থা করিতাম, আহতদের চিকিৎসা করিতাম, লোকদের সেবা করিতাম এবং নিহত ও আহতগণকে মদীনায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতাম।*

তিনটি জিনিষ বহু রোগের অব্যর্থ ঔষধ

২২০৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষের মধ্যে রোগ মুক্তি নিহিত রহিয়াছে—রক্ত-মোখন, মধু পান এবং তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগা, কিন্তু দাগার চিকিৎসা হইতে আমি আমার উম্মৎকে নিষেধ করিতেছি।

২২০৪। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল,

---

* পাকিস্তান-পূর্ব্ব যুগে অমোসলেমদের প্রতিপত্তিতে অবাঞ্ছিত রীতি-নীতির প্রচলন ছিল, কিন্তু তখনকার মোসলমানগণ ঐরূপ রীতি-নীতিকে নাপন্দছ করিতেন। অধুনা এক শ্রেণীর লোক ঐ সব অবাঞ্ছিত রীতি-নীতিকে বহাল তবীয়তে পাকা পোক্তারূপে কায়েম ভাবে আঁকড়িয়া থাকার পক্ষপাতি। এমনকি ঐ সব রীতি-নীতি অনৈছলামিক হওয়া সত্ত্বেও কোরআন-হাদীছের কোন একটা নজিরের বাহানা অবলম্বনে তিলকে তাল বানাইবার প্রবণতাও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন সরকারী হাসপাতাল সমূহে যুবতি রমণীদের দ্বারা নার্সিং-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। এই রীতি যে, কি জঘন্য তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু এই জঘন্য রীতিকেও ইসলামী ও শরীয়ত সম্মত বলিবার দুঃসাহস করা হইয়া থাকে এবং তাহারা হয় ত আলোচ্য পরিচ্ছেদ ও উহাতে উল্লেখিত হাদীছখানাকে তাহাদের দাবীর নজিররূপে তুলিয়া ধরিতে পারে। অথচ এই দুইটির মধ্যে তিল ও তাল অপেক্ষা অধিক ব্যবধান। কারণ, উল্লেখিত হাদীছের ঘটনা হইল যুদ্ধের জরুরী অবস্থা কালীন ঘটনা। ইসলামী রাষ্ট্রের উপর কাফের শত্রুর আক্রমণ কালে নারীদের উপরও দেশ রক্ষায় সহযোগিতা করা ফরজ হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন উহা বিশেষ আবশ্যকাধীন ছিল যে, তখন মোসলমানদের সংখ্যা সল্পতার দরুন উহার বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না ; সকল পুরুষ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও যুদ্ধের আবশ্যক পুরা হইত না। ঐরূপ প্রয়োজন-স্থলের ব্যাপার নিতান্তই ভিন্ন বিষয়। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সমালোচিত অবস্থা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

সিভিল এণ্ড মেলেটারী হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডের জন্য মহিলা নার্স এবং পুরুষ ওয়ার্ডের জন্য পুরুষ নার্স দ্বারা অত্যন্ত সন্তোষ-জনকরূপে কাজ চলিতে দেখিয়াছি।

আমার ভ্রাতার ভয়ানক দাস্ত হইতেছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে মধু পান করাও; সে তাহাকে মধু পান করাইল। (কিন্তু দাস্ত বন্ধ হইল না, তাই) সে দ্বিতীয় বার আসিয়া ঐ খবরই দিল। এইবারও হযরত (দঃ) তাহাকে ঐ কথাই বলিলেন। তৃতীয় বারও ঐ কথাই বলিলেন যে, তাহাকে মধু পান করাও। চতুর্থ বার আসিয়া সে বলিল, মধু পান করাইয়াছি, কিন্তু দাস্ত আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার কালাম সত্য, তোমার ভ্রাতার পেটে এখনও দোষ রহিয়াছে, আবার তাহাকে মধু পান করাও। এইবার মধু পান করাইলে পর সে ভাল হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা :— পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বর্ণনা করতঃ মৌমাছির উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে মধুর উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন— فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ "উহা মানুষের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ" উল্লেখিত হাদীছে হযরত (দঃ) এই আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কালজিরার উপকারিতা

২২০৫। **হাদীছ** :—খালেদ ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গালেব নামক আমাদের এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ছিল। আবু আতীক (রঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা কালজিরার ব্যবস্থা কর—উহার পাঁচটি বা সাতটি দানা পিষিয়া জয়তুন তৈলের সহিত রোগীর নাকের উভয় ছিদ্রে ফোটারূপে প্রবেশ করাইয়া দাও।

আয়েশা (রাঃ) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত নবী (দঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছেন—

اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا مِنَ السَّامِ

"কালজিরা একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত সর্ব্ব রোগেই অব্যর্থ মহৌষধ।"

রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য

২২০৬। **হাদীছ** :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রোগী ও শোকার্তকে "তালবীনাহ" বা "হারিরা" খাওয়ার পরামর্শ দিতেন এবং বলিতেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, "হারিরা" রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে এবং দুশ্চিন্তা লাঘব করে।

ব্যাখ্যা :—তাল্‌বীনাহ্‌ বা হারিরা এক প্রকার লঘুপাক খাদ্য যাহা আটা ও মধু পানিতে ঘোলিয়া তরলরূপে পাকান হয়।

উদ-হিন্দীর উপকার

২২০৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-কায়স্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা উদ্-হিন্দী ব্যবহার করিও; সাত প্রকার ব্যাধিতে উহা উপকারী। শিশুদের আল্‌জিব ফুলিয়া ব্যথা হইলে উহা ঘষিয়া বা কুটিয়া পানির সহিত নাকের ভিতরে ফোটায় ফোটায় প্রবেশ করিবে এবং পাঁজরে ব্যথা হইলে ঐরূপে উহা পান করাইতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—উদ্-হিন্দী' ইউনানী শাস্ত্রীয় ভাষায় অগুরু কাষ্ঠকে বলা হয়, কিন্তু আলোচ্য হাদীছে উহা উদ্দেশ্য নহে! আর একটি বস্তু আছে যাহাকে ইউনানী শাস্ত্রে কোস্ত্-হিন্দী বা কোস্ত্-শীরীন্ বলা হয়—উহা গিরিমল্লিকা ফুল গাছের কাষ্ঠ যাহাকে বাংলা ভাষায় 'কুট' বলা হয়। এস্থলে উহাই উদ্দেশ্য বলিয়া ইমাম বোখারী ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফ ৮৫১ ও ৮৫২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতদ্বয়ে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আভিধানিক অর্থ সূত্রে এই উদ্দেশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণই, কারণ 'উদ্' অর্থ কাষ্ঠ এবং 'হিন্দী' অর্থ ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয়। অগুরু কাষ্ঠ যেরূপ সাধারণতঃ পাক-ভারতের সিলেট অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ কুট্ও সাধারণতঃ পাক-ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

রক্ত-মোক্ষন ব্যবস্থা অবলম্বন

২২০৮ হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ)কে এক ব্যক্তি রক্ত-মোক্ষন কার্য্যের মজুরী ও পারিশ্রমিক প্রদান ও গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। আবু তায়বা নামক এক ক্রীতদাস হযরতের রক্ত-মোক্ষন করিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহার পারিশ্রমিক প্রায় সাত সের পরিমাণ খাদ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। তদুপরি তাহার মালিকদের নিকট সুপারিশ করিয়া তাহার উপর ধার্য্যকৃত আয়ের পরিমাণে লাঘব করিয়া দিয়াছিলেন এবং হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য রক্ত-মোক্ষন চিকিৎসা-ব্যবস্থা অতি উত্তম……।

২২০৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) একদা এক রোগীকে দেখিতে গেলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রোগীর নিকট হইতে যাইব না যাবৎ না সে রক্তমোক্ষন করায়। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, রক্ত-মোক্ষন চিকিৎসায় আরোগ্য রহিয়াছে।

২২১০। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা মাথা ব্যথার দরুন এহ্‌রাম অবস্থায় মাথায় রক্ত-মোক্ষন করিয়াছিলেন।

ব্যঙের ছাতার গুণ

২২১১। হাদীছ:—ছায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যঙের ছাতা 'মন্ন্' তুল্য; উহার রস চোখের জন্য ভাল ঔষধ।

ব্যাখ্যা:—'মন্ন্' মরু অঞ্চলের এক প্রকার বৃক্ষ হইতে নির্গত মিষ্ট খাদ্য বস্তু। বনী-ইস্রাইলগণ শাস্তি ভোগ স্বরূপ মরুভূমি তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর আবদ্ধ জীবন-যাপন কালে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কৃপাবলে তাহাদের জন্য অস্বাভাবিক আকারে উহা জোটাইয়া ছিলেন। কোন প্রকার ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতিরেকেই তাহারা উহা লাভ করিত। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে প্রথম পারায় বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীফ চতুর্থ খণ্ড হযরত মূছার বয়ান দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ব্যঙের ছাতা একটি খাদ্য বস্তু যাহা মন্নের ন্যায় বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে তোমরা জোটাইতে পার। উহার আরও একটি গুণ এই যে, উহার রস চক্ষু রোগের অব্যর্থ ঔষধ। অবশ্য হাদীছে বর্ণিত গুণাগুণ একমাত্র সাদা বর্ণীয়টার জন্য, আর যেইটা কাল হয় সেইটা বিষাক্ত।

জ্বর উপসমের ব্যবস্থা

২২১২। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট; অতএব উহাকে পানির সাহায্যে দমাইয়া দাও।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জ্বর হইলে বলিতেন, আজাব দুর করার ব্যবস্থা কর।

২২১৩। হাদীছ:—আবুবকর-তনয়া আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট জ্বরাক্রান্তা কোন মহিলাকে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিতেন এবং হাতে পানি লইয়া তাহার গায়ের জামার কোন ফাক দিয়া উহা তাহার গায়ে বহাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের জ্বরকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করার পরামর্শ দিয়া থাকিতেন।

২২১৪। হাদীছ:—রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—জ্বরের মূল জাহান্নামের উত্তাপ হইতে। সুতরাং উহাকে পানির সাহায্যে ঠাণ্ডা কর।

২২১৫। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জাহান্নামের উত্তাপ হইতে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব পানির সাহায্যে উহাকে ঠাণ্ডা কর।

ব্যাখ্যা ঃ—জাগতিক গরম ও তাপ হইতে জ্বরের উৎপত্তি দেখা যায়, কিন্তু জাগতিক গরম ও উত্তাপের মূল কেন্দ্র হইল জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ যে গরমের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া থাকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে উহাই ভূমণ্ডলে ছড়াইয়া তাপ ও গরমের সৃষ্টি করে। প্রথম খণ্ডে ৩২৭নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

জ্বরের সময় পানি ব্যবহার একটি সাধারণ ব্যবস্থা, এমনকি ঢাকা সিভিল এণ্ড মেলেটারী হাসপাতালে দেখিয়াছি—অতি মাত্রায় উত্তাপের সহিত জ্বর আসিলে ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীর সম্পূর্ণ শরীর বরফ দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয়। আর জ্বর অবস্থায় মাথায় পানি দেওয়া ত একটি অবধারিত নিয়ম। অবশ্য পানি ব্যবহারে বিশেষ নিয়ম পালন বা কোন উপসর্গের আশঙ্কায় রোগীকে পানি ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত রাখা একটি সতন্ত্র কথা।

কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে

কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ -

অর্থ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যাধি ছোঁয়াচে বা সংক্রামক শ্রেণীর নাই—কোন রোগ সম্পর্কে ঐরূপ আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করিবে না। অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্নরূপেও কিছু নাই—ঐরূপ আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করিবে না। পেঁচা সম্পর্কে যে সব অলীক ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে উহারও কোন বাস্তবতা নাই। ছফর মাসকে অশুভ মনে করা ইহারও মোটেই কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য কুষ্ঠ রোগী হইতে দুরে থাকিও যেরূপ বাঘ-ভল্লুক হইতে দুরে থাকার চেষ্টা করিয়া থাক। (৮৫০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের প্রথম বাক্য لا عدوى "কোন ব্যাধি সম্পর্কে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক হওয়ার আকিদা ও বিশ্বাস রাখা নিষিদ্ধ" এবং সর্ব্বশেষ বাক্য فر من المجذوم كما تفر من الاسد "কুষ্ঠ রোগী হইতে দুরে থাকিও" এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা নাই। কারণ, কোন রোগ বা ব্যাধিকে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক বিশ্বাস না করার উদ্দেশ্য এই যে—কোন ব্যাধি সম্পর্কে এরূপ আকিদা পোষণ করিবে না যে, এই ব্যাধিগ্রস্থের সংস্পর্শেই অন্য মানুষ আক্রান্ত হইয়া যায়, উহার জন্য আল্লার সৃষ্টিরও আবশ্যক হয় না। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে শুধু সংস্পর্শের দরুনই উক্ত ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া যায়।

মূল বিষয় এই যে, দুনিয়ার সমুদয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এমনকি যে সব ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়াকে আমরা আবহমান কাল হইতে বিভিন্ন কার্য্যকারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া আসিতেছি ঐ সবের জন্ম এবং অস্তিত্বও প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকারণের দ্বারা নহে, বরং স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লার সৃষ্টিতে হইয়া থাকে। দৃঢ়তার সহিত অটল অনড়রূপে এই আকিদা ও বিশ্বাস রাখাই ইসলামের শিক্ষা।

প্লেগ, কুষ্ঠ ইত্যাদি কতিপয় রোগ সম্পর্কে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে মোশরেকেদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যে ধারণা বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান পূজারীদের মধ্যেও দেখা যায় যে, এই সব রোগ ছোঁয়াচে ও সংক্রামক। অর্থাৎ এই রোগগ্রস্থ রোগীর সংস্পর্শেই অন্য লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যায় আল্লার সৃষ্টির তোয়াক্কা রাখে না। এই ধরণের আকিদা ও বিশ্বাস ইসলাম বিরোধী। আলোচ্য হাদীছে ঐ শ্রেণীর সংক্রামকতাকেই অলীক ও অবাস্তব বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে কোন রোগ ছড়াইবার দরুন তদ এলাকার বায়ু-বাতাস ও পানি ইত্যাদি দুষীত হওয়ায় দুষীত বায়ু-বাতাসে ও দুষীত পানির দরুন বা কোন রোগীর সংস্পর্শের দ্বারা উক্ত রোগের দুষীত পদার্থ স্পর্শকারীর দেহে প্রবেশ করার দরুন রোগাক্রান্ত হওয়ার শুধু আশঙ্কা, তাহাও কেবল বাহ্যিক উপকরণের পর্য্যায়ে করা যাইতে পারে, কিন্তু এই উপকরণ এবং উহার দরুন রোগের উৎপত্তি একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্ব্বময় ক্ষমতাধিকারী আল্লার সৃষ্টিতেই হইতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা রোগ সৃষ্টি করিয়া না দিলে হাজার উপকরণেও রোগ সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

সার কথা এই যে, রোগের আক্রমণ একমাত্র আল্লার সৃষ্টিতেই হইতে পারে ইহার উপর দৃঢ়তার সহিত অটল বিশ্বাস ও আকিদা রাখিতে হইবে। হাঁ—মহামারী এলাকার দুষীত বায়ু-বাতাস ও পানি বা রোগের দুষীত পদার্থ রোগের পক্ষে শুধু মাত্র বাহ্যিক কারণ গণ্য হইবে।* এই সূত্রেই আলোচ্য হাদীছে কুষ্ঠ রোগীর

---

* এই শ্রেণীর বাহ্যিক কারণ সমুহকে ইসলামী পরিভাষায় এক বচনে "سبب সবব" এবং বহু-বচনে "اسباب—আস্‌বাব" বলা হয়। সব রকম সবব্‌ই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করাতে সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব সববের মাধ্যমে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে তাহাও আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করিলেই সৃষ্টি হইতে পারে অন্যথায় নহে। তাই পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালাকে "مسبب الاسباب—মোসাব্বেবুল-আস্‌বাব" অর্থাৎ সকল কারণের মহাকারণ ও তথা সকল কারণের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং কারণ সমূহের মাধ্যমে সংঘটিত বস্তু সমূহেরও সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়।

বিজ্ঞান শুধু বাহ্যিক কারণ পর্য্যন্ত পৌছিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ইসলাম তাহাকে কারণের কারণ পর্য্যন্ত পৌছিবার পথ দেখাইয়াছে। অতএব ইসলাম বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং বিজ্ঞানের পক্ষে অধিক উন্নতির পথ প্রদর্শক।

স্পর্শে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং অন্য হাদীছে প্লেগের মহামারী এলাকায় আগমনে নিষেধ করা হইয়াছে। বোখারী শরীফ ৮৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, চর্ম্ম রোগাক্রান্ত উটের মালিক যেন তাহার উট ঐ ব্যক্তির উটের সঙ্গে একত্রে না রাখে যাহার উট সুস্থ।" এই সব নিষেধাজ্ঞা নিছক এইরূপ যেরূপ জ্বরাক্রান্তকে ঠাণ্ডা বস্তু ব্যবহার করা হইতে এবং বদহজমের রোগীকে গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করা হইতে নিষেধ করা হইয়া থাকে। ×

অন্ধকার যুগে, বিজ্ঞান পূজারীদের ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার ধারণা আর ইসলাম অনুমোদিত শুধু বাহ্যিক কারণ গণ্য করা উভয়ের মধ্যে বিরাট দুইটি ব্যবধান আছে।

(১) ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতায় বিশ্বাসীগণ রোগের সৃষ্টি ও জন্মকে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে মনে করেন না, বরং সংক্রামকতার দ্বারাই রোগের উৎপত্তি ও জন্ম বলিয়া ধারণা করে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা এই যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা, আর বাহ্যিক কারণ শুধু অছিলা মাত্র। অছিলার ক্ষমতায় কোন বস্তুর জন্ম হয় না, জন্ম হয় আল্লার সৃষ্টিতে। এই জন্যই মহামারী এলাকায় এবং সংক্রামকতার ক্ষেত্রেও হাজার হাজার লোককে রোগমুক্ত দেখা যায়। তাহাদের বেলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রোগের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই তাহারা মুক্ত রহিয়াছে। নতুবা ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতায় বিশ্বাসীদের মতে রোগের সৃষ্টি কারক যাহা তাহা ত সকলের জন্যই বিদ্যমান। ↑

× এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী ও কুষ্ঠ রোগের সংক্রামকতা যদি নিছক বাহ্যিক কারণ পর্য্যায়ের হইয়া থাকে তবে হাদীছ শরীফে শুধু এই দুইটি রোগের সংশ্রব এড়াইবার আদেশ কেন করা হইল, অথচ আরও বহু রোগের অনেক অনেক বাহ্যিক কারণ রহিয়াছে উহা সম্পর্কেত হাদীছে বিশেষ কোন আলোচনা দেখা যায় না। উত্তর এই যে, প্লেগ ও কুষ্ঠ এই দুইটি রোগ সম্পর্কে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক হওয়ার আকিদা ও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাই স্বাভাবিকরূপে এস্থলে মানুষের মনে দুর্ব্বলতা আসিবে। এতদ্ভিন্ন উক্ত রোগদ্বয়ের সংস্পর্শে যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে সেই রোগীর বা অন্যান্যদের পক্ষে অন্ধকার যুগের আকিদা ও বিশ্বাস কবলীত হইয়া ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাই হাদীছে এই দুইটি রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কারণ, অন্য কোন রোগ সম্পর্কে সেইরূপ আকিদার প্রচলন নাই।

↑ ইহা একটি বিরাট প্রশ্ন যাহা চাক্ষসরূপে প্রমাণিত। এই প্রশ্ন এড়াইবার জন্য বিজ্ঞান পূজারীদের নিছক কাল্পনিক সমূদ্রে হাতড়াইতে হয়, কিন্তু ইসলামের শিক্ষামতে উত্তর সহজ।

(২) আর একটা ব্যবধান কার্য্য ক্ষেত্রে এই দেখা দিবে যে, সংক্রামকতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে রোগীকে অস্পৃশ্য ভাবিবার প্রবণতা দেখা দিবে। এমনকি তাহার প্রতি মানবতার হক আদায় করিতেও বাধার সৃষ্টি হইবে। ফলে রোগীর প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা এবং মরিয়া গেলে তাহার দাফন-কাফন কার্য্য পর্য্যন্ত ব্যহত হইবে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা ও আকিদা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক অর্থাৎ এই ভাবিয়া যে, আল্লাহ তায়ালা আমার ভিতর রোগ সৃষ্টি না করিলে আমি কস্মিন কালেও আক্রান্ত হইব না—এই বিশ্বাস লইয়া প্রয়োজনীয় সব কাজেই অগ্রসর হওয়া সহজ হইবে।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহার নজীর স্থাপন করিয়াছেন। ইবনে মাজাহ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে— ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা হযরত রসুলুলাহ (দঃ) এক কুষ্ঠ রোগীকে হাত ধরিয়া নিজের খাবার বর্ত্তনে এক সঙ্গে বসাইলেন, এবং বলিলেন, খানা খাও ; আমি আল্লার উপর ভরসা করিতেছি এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি।"

অথচ কুষ্ঠ রোগীর সংশ্রবকে রোগাক্রান্তির সম্ভাব্য বাহ্যিক কারণ গণ্য করিয়া হযরত (দঃ) সাধারণ ভাবে উহা এড়াইয়া চলার পরামর্শ দিয়াছেন এবং নিজেও সাধারণতঃ এড়াইয়া চলিয়াছেন। মোছলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, "একদা সাক্বিফ্ গোত্রের এক দল লোক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল! (হযরত (দঃ) তাহাদের প্রত্যেককে বায়য়াৎ—হাতে হাত দিয়া দ্বীন-ইসলামের অঙ্গীকার করার সুযোগ দিলেন, কিন্তু) তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল, তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, (দূর হইতেই) আমি তোমার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া নিলাম, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

এস্থলে হযরত (দঃ) বাহ্যিক কারণকে উহার শ্রেণীমত মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন যে, উহাকে সৃষ্টিকারীর মর্য্যাদা দিওনা,* সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা—তাঁহার সৃষ্টি ব্যতিরেকে হাজার

---

* এখানেই একটি প্রশ্নের মিমাংসা হইয়া গেল—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে কুষ্ঠ রোগী হইতে দূরে থাকার আদেশ করা হইয়াছে, অথচ ইবনে-মাজাহ শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সূত্রে দেখা যায় স্বয়ং হযরত (দঃ) কুষ্ঠ রোগীকে এক বর্ত্তনে নিজের সঙ্গে বসাইয়া খানা খাওয়াইয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে উভয়টির গড়মিল পরিদৃষ্ট হয়। উহার মিমাংসা এই যে, দূরে থাকার আদেশটি রোগাক্রান্তির বাহ্যিক কারণ হওয়া দৃষ্টে এবং ইহার ক্ষেত্রে হইল সাধারণ অবস্থা। আর সঙ্গে বসাইয়া খাওয়ান হইল প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টে যে, শুধু

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাহ্যিক কারণেও কোন কিছুর উৎপত্তি ও জন্ম হইতে পারে না। অতএব মানবতার হক্ ও ইসলামী কর্ত্তব্য পালনের প্রয়োজন ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করিতে হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া আল্লার উপর ভরসা ও নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক অগ্রসর হইও।

যে কোন রোগের উৎপত্তির মূল একমাত্র আল্লার সৃষ্টি। আল্লার সৃষ্টির কথা এড়াইয়া ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার কথা যে, সাধারণ দৃষ্টিতেও অচল তাহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি সহজ ও সরল পন্থায় নিম্নে বর্ণিত হাদীছে বুঝাইয়াছেন।

২২১৬। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ

اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ اِبِلِىْ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ

فَيَاْتِى الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছোঁয়াচে বা সংক্রামকতার দ্বারা কোন রোগের উৎপত্তি বা জন্ম হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিবে না—ইহার কোন বাস্তবতা ও ভিত্তি নাই। ছফর মাসকে অশুভ মনে করিবে না। পেঁচা সম্পর্কে যে সব কথা প্রচলিত রহিয়াছে উহারও কোন বাস্তবতা বা ভিত্তি নাই। ইহা শুনিয়া এক গ্রাম্য ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! অনেক সময় আমার উট দল কোন এক পশু-চরণ এলাকায় থাকে; আমার উটগুলি পূর্ণ সুস্থ ও সুন্দর থাকে—জংলী হরিণের ন্যায় দেখায়। অতঃপর তথায় কোন একটি চর্ম্ম রোগী উট আসে এবং আমার সুস্থ উটগুলির সঙ্গে থাকে, ফলে আমার উটগুলিও চর্ম্ম রোগাক্রান্ত হইয়া যায়।

হযরত (দঃ) তাহার বক্তব্যের (মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার ধারণায় প্রথম চর্ম্ম রোগী উটটির সংস্পর্শে ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতারূপে তাহার সুস্থ উটগুলি

বাহ্যিক কারণে রোগ সৃষ্টি হইতে পারিবে না—সর্ব্বময় স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্ব্বশক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে। অতএব বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

অবশ্য এরূপ বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করার জন্য শরীয়ত দুইটি ক্ষেত্রেই অনুমতি দিয়া থাকে। একটি হইল যদি কামেল তাওয়াক্কুল তথা আল্লার উপর অনঢ় অটল সুদৃঢ় ভরসা ও নির্ভর স্থাপনকারী হয়। আর একটি হইল যদি মানবতার কর্ত্তব্য ও ইসলামী হুকুম তথা রোগীর সেবা শুশ্রূষা বা কাফন-দাফন ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়।

রোগাক্রান্ত হইয়াছে—এই ধারণার) উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টিকারী কে ?

অর্থাৎ একটির মধ্যে রোগ অপরটি হইতে আসিয়াছে ; তবে এই ছেল্‌ছেলার সর্ব্ব প্রথমটির মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী কে ? যিনি উহার মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী তাঁহাকেই সর্ব্ব ক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টিকারী বিশ্বাস করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বাক্য তথা—و لا صفر ইহার অর্থ যাহা করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও একটি অর্থ ইহার করা হইয়া থাকে যে, "ছফর" এক প্রকার পেটের রোগ যাহাকে অন্ধকার যুগে অত্যধিক সংক্রামক বলিয়া গণ্য করা হইত। ইমাম বোখারী (রঃ) এই দ্বিতীয় অর্থকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

প্লেগ ইত্যাদি মহামারী রোগ সম্পর্কে

২২১৭। হাদীছ ঃ— اسامة بن زيد يحدث سعدا رضى الله عنهما

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال عذاب عذب به

بعض الامم ثم بقى منه بقية فتذهب المرة وتأتى الاخرى فمن سمع

بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه ۔

অর্থ—উছামা (রাঃ) আবু সায়ীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা প্লেগ রোগের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বস্তুতঃ ইহা অতীত কালের কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লার তরফ হইতে প্রেরিত আজাব ছিল। (এই রোগের মহামারীতে সেই সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার পর) উহারই অবশিষ্ট ধরা-পৃষ্ঠে রহিয়া গিয়াছে যাহা কোন সময় লুক্কায়িত থাকে কোন সময় প্রকাশ পায় ; কোন অঞ্চলে এই রোগ বিস্তারের সংবাদ জ্ঞাত হইলে তথায় যাইবে না এবং স্বীয় অবস্থান অঞ্চলে এই রোগের মহামারী দেখা দিলে উহা হইতে পলায়ন উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইবে না—(এই ভাবিয়া যে, এই স্থান হইতে চলিয়া গেলে ঐ রোগ হইতে বাঁচা যাইবে অন্যথায় বাঁচা যাইবে না। ১০৩২ পৃঃ)

২২১৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফৎ কালে একবার মদীনা হইতে সিরিয়া উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 'সার্‌গ' নামক স্থানে পৌঁছিলে পর সিরিয়া এলাকার সর্ব্বাধিনায়ক ছাহাবী আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তাঁহার বিশিষ্ট সঙ্গীগণ সহ খলীফা ওমরের নিকট

উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের মহামারী দেখা দিয়াছে। ওমর (রাঃ) তখন মোহাজের ছাহাবীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করিয়া মহামারীর সংবাদ তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করতঃ তথায় উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইল। এক দল বলিলেন, আপনি সিরিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া মদীনা হইতে আসিয়াছেন, এখন (মহামারীর ভয়ে উদ্দেশ্য স্থলে না পৌঁছিয়া) ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। অপর দল বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী এবং মোসলেম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি আপনার সঙ্গে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে মহামারীর মুখে উপস্থিত করিয়া দিবেন তাহা আমরা ভাল মনে করি না।

ওমর (রাঃ) উভয় দলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং মদীনাবাসী ছাহাবা—আনছারগণকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহারাও মোহাজেরগণের ন্যায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদেরকেও চলিয়া যাইতে বলিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোরায়েশ বংশীয় ঐ লোকগণ যাঁহারা মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে ইসলামের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মুরব্বি শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গেকে ডাকিয়া আন। তাঁহারা সমবেত হইলেন এবং সকলে একমত হইয়া পরামর্শ দিলেন যে, আপনি আপনার সঙ্গীগণকে নিয়া মদীনায় ফিরিয়া যান। তাঁহাদিগকে মহামারীর মুখে উপস্থিত করিবেন না। সেমতে ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিয়া দিলেন, ভোর হইলেই আমি মদীনার পথে রওয়ানা হইব আমার সঙ্গীগণকেও রওয়ানা হইতে হইবে। তখন ছাহাবী আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আল্লার তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ হইতে পালাইতে চান ? * ওমর (রাঃ) আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ)কে আশ্চার্য্যান্বিত স্বঃরে বলিলেন, তুমি ভিন্ন অন্ন কেহ এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে, (কিন্তু তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শোভা পায় না।) এই বলিয়া ওমর (রাঃ) প্রশ্নের উত্তর দানে বলিলেন, হাঁ—আমরা আল্লার এক তকদীর (নির্দ্ধারণ) হইতে আল্লারই অপর তকদীরের (নির্দ্ধারণের) প্রতি যাইতেছি।

---

* অর্থাৎ সিরিয়ায় মহামারীর সংবাদে তথায় যাওয়া হইতে বিরত থাকা এবং মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা মনে হয় মহামারী কবলিত হওয়ার আশঙ্কা ও ভয়ের কারনে হইতেছে। অথচ যাহা কিছু হয় সবই তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী হয়, এমতাবস্থায় মহামারী এলাকায় যাওয়া হইতে বিরত থাকা বস্তুতঃ তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ হইতে পলায়ন করা।

(অর্থাৎ সিরিয়ায় পৌঁছিলে তাহা আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণেই হইত এবং এখন মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তনও আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণেই হইতেছে।↑ কার্য্য ক্ষেত্রে কোন একটি দিক বাস্তবায়িত হওয়ার পরই তাহা তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ সাব্যস্ত হইবে—বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব্বে কোন দিককেই তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণরূপে সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নে মানুষ নিজ বিবেক বুদ্ধির দ্বারাই স্বীয়-কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিবে। এই তথ্যটি বুঝাইবার জন্য ওমর (রাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন—

বল ত! তুমি যদি তোমার উট চরাইবার জন্য কোন ময়দানে যাও যাহার একটি প্রান্ত সবুজ-শ্যামল অপর প্রান্ত ঊষর। উহার যে প্রান্তেই তোমার উট বিচরণ করাইবা তাহা আল্লার তরফ হইতে তকদীর ও নির্দ্ধারণ অনুযায়ীই হইবে। (কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে তুমি নিজ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা কোন্ প্রান্ত নির্ব্বাচন করিবা? সবুজ-শ্যামলা প্রান্তই নির্ব্বাচন করিবা, নতুবা বোকা বরং অপরাধী সাব্যস্ত হইবা। অবশ্য এই নির্ব্বাচন বাস্তবায়িত হওয়ার পর সাব্যস্ত হইবে যে, ইহাই আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণ ছিল, অতএব তোমার নির্ব্বাচন আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীরের বিরোধী বা উহার বাহিরে নহে।

↑ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কাজই আল্লার তকদীর তথা আল্লার নির্দ্ধারণ মোতাবেক হইয়া থাকে, অবশ্য সেই নির্দ্ধারণ বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও জানা থাকে না। অতএব তকদীর একটি শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও আকিদা সম্পর্কীয় বিষয়, যদ্দ্বারা মানুষ আপদ-বিপদ আসিয়া গেলে পর ছবর ও ধৈর্য্য ধারণের পথ পায় এবং আবশ্যক স্থলে ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়াও জীবন বিপন্নের পথে অগ্রসর হইতে বাধা মুক্ত হইতে পারে।

কার্য্য ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা একটা দিক নির্ণয় করতঃ সে দিকে অগ্রসর হইবে—মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই বিধানই রাখিয়াছেন। সেই দিক নির্ণয় শরীয়ত বহির্ভূত হওয়াও অপরাধ এবং তকীরের বুলি আওড়াইয়া হাত-পা গুটাইয়া থাকাও অপরাধ।

দিক নির্ণয় মানুষের বুদ্ধি-বিবেক দ্বারাই হইবে এবং কার্য্য ক্ষেত্রে উহার বাস্তবায়নও তাহার প্রাপ্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির দ্বারাই হইবে যদ্দরুন সে ঐ কার্য্যের মজা বা সাজা ভোগ করিবে। অবশ্য কার্য্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়ার পর সাব্যস্ত করা যাইবে যে, তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ এইটাই ছিল। ওমর (রাঃ) তাহাই বলিয়াছেন যে, আমরা এক তকদীর হইতে অপর তকদীরের প্রতি যাইতেছি অর্থাৎ সিরিয়ায় যাওয়া বাস্তবায়িত হইলে তাহাও আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীরই সাব্যস্ত হইত এবং মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন বাস্তবায়িত হইলে তাহাও আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীরই সাব্যস্ত হইবে। কার্য্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব্বে যেহেতু আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীর সম্পর্কে কাহারও কিছু জানা থাকে না, তাই কার্য্যের ফল ভোগের ব্যাপারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

দৃষ্টান্তটি দ্বারা ওমর (রাঃ) বুঝাইয়া দিলেন যে, সিরিয়ার পথে অগ্রসর হওয়া বা মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা উভয়টির কোন্‌টি আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণ তাহা কাহারও জানা নাই, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা আমাদিগকে উহার একটি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সেমতে আমরা মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তনকে নির্ব্বাচন করিয়াছি, ইহা বাস্তবায়িত হইলে ইহাই আল্লার তরফ হইতে তকদীর ও নির্দ্ধারণ সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে সিরিয়ায় যাওয়া বাস্তবায়িত হইলে তাহাও আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণই সাব্যস্ত হইত—এই তথ্যকেই ওমর (রাঃ) প্রকাশ করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের এই নির্ব্বাচন আল্লার তকদীর হইতে পলায়ন তথা আল্লার তরফ হইতে নির্দ্ধারিত তকদীরের বিরোধী বা উহার বাহিরে নহে, বরং সম্ভাব্য এক তকদীর হইতে অপর তকদীরের প্রতি ধাবিত হওয়া মাত্র। আমরা যে, মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এই প্রত্যাবর্ত্তনও আল্লার নির্দ্ধারণ বা তকদীরের কারণেই হইতেছে।*)

খলীফা ওমর (রাঃ) এই আলোচনা দ্বারা মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তনকে বৈধ প্রমাণিত করিতেছিলেন—ইতি মধ্যে বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আপনাদের এই বিতর্কের বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ এল্‌ম তথা শরীয়তের বিধান সম্বলিত একটি সুস্পষ্ট হাদীছ আমার জানা রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিলেন—

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ -

অর্থ—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, কোন অঞ্চলে প্লেগের সংবাদ পাইলে তথায় যাইও না। এবং কোন অঞ্চলে অবস্থান কালে তথায় প্লেগ ছড়াইয়া পড়িলে প্লেগ হইতে পলায়নের খেয়ালে তথা হইতে বাহির হইও না।

---

* পাঠক বর্গ! স্মরণ রাখিবেন, শরীয়ত বিরোধী দিকে অগ্রসর হইয়া নিজকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য তকদীরের ছুতা ধরা নিষ্ফল, বরং গোনাহ ও নাজায়েয। পক্ষান্তরে শরীয়ত সম্মত দিক নির্ব্বাচনে অযথা প্রশ্ন এড়াইবার জন্য বা সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাব্য কষ্ট-যাতনার উপর ধৈর্য্য ধারণের উদ্দেশ্যে তকদীরের কথা তুলিয়া ধরায় দোষ নাই, বরং এরূপ ক্ষেত্রে বাধামুক্ত হওয়ার একটি বিশেষ অবলম্বনই হইল তকদীরের প্রতি ঈমান।

(খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত এই হাদীছের পূর্ণ অণুকূলে ছিল। কারণ, তিনি সিরিয়ায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তথায় প্লেগের সংবাদ পাইয়াছিলেন।) হাদীছের অণুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক হইয়াছে দেখিয়া তিনি আল্লার প্রশংসা করিলেন এবং মদীনা পানে যাত্রা করিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—প্লেগ বা মহামারী এলাকায় বাহির হইতে আগমণকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু অন্ধকার যুগের বা বিজ্ঞান পুজারীদের ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার বিশ্বাস ও আকিদা এই নিষেধাজ্ঞার কারণ নহে। ঐরূপ ধারণা ও আকিদা যে সম্পূর্ণ অলীক ও নিষিদ্ধ তাহা একাধিক হাদীছে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। আলোচ্য নিষেধাজ্ঞাটি শুধু মাত্র সতর্কতার ব্যবস্থা স্বরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই সূত্রে যে, মহামারী ছড়াইবার দরুন তদ অঞ্চলের বায়ু-বাতাস ও পানি দুষিত হয় এবং দুষিত বায়ু-বাতাস ও পানি রোগ সৃষ্টিকারী নয় বটে, কিন্তু উহা রোগের জন্য বাহ্যিক কারণের পর্য্যায় ভুক্ত। তাই কার্য্যকারণের জগতে শরীয়ত উহাকে সতর্কতা মুলক ব্যবস্থা অবলম্বন শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছে—তাহাও শুধু এমন ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে উহার ঐরূপ মর্য্যাদা দেওয়ায় মানবীয় কর্ত্তব্য ও ইসলামী হক্ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। যেমন, মহামারী এলাকায় বাহির হইতে জন-সাধারণের আগমন না হইলেও উক্ত এলাকাবাসীদের জীবন-যাপন ইত্যাদি ব্যাপার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে উক্ত বাহ্যিক কারণকে মর্য্যাদা দেওয়া হইলে ঐরূপ আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে শরীয়ত উহাকে কোন মর্য্যাদা দেওয়ার আদেশ করে নাই, বরং উহাকে উপেক্ষা করিয়া মূল সৃষ্টিকর্ত্তা স্বাধীন ও সর্ব্বশক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা ও নির্ভর স্থাপন করার পন্থা অবলম্বনের আদেশ করিয়াছে। এই সূত্রেই মহামারী এলাকা হইতে পলায়নে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে দুষিত বায়ু-বাতাস ও পানি ইত্যাদি বাহ্যিক কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সতর্কতা মুলক ভাবেও তদ এলাকা পরিত্যাগ করার জন্য শরীয়ত পরামর্শ দিলে বা উৎসাহ প্রদান করিলে, বরং নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করিলে মহামারী এলাকা হইতে পলায়নের হিরিক পড়িয়া বিভিন্ন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। যথা—

(১) তদ এলাকায় ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি হইবে। (২) এলাকাবাসীদের চলিয়া যাওরার ফলে রোগীদের সেবা শুশ্রূষা এবং মৃতদের কাফন-দাফন ইত্যাদি মানবীয় কর্ত্তব্য ও ইসলামী হক্ নষ্ট হইবে। (৩) এলাকার সব লোক অপসারিত নিশ্চয়ই হইবে না, এমতাবস্থায় অধিকাংশ লোক পলায়ন করিয়া গেলে অবশিষ্টদের জীবন-যাপন শুধু কঠিনই নহে, দুষ্কর হইয়া পড়িবে। এতগুলি অনিষ্টের সম্মুখে একটা বাহ্যিক কারণের প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে না, বরং উপেক্ষা করাই যুক্তি সঙ্গত।

সার কথা এই যে, দুষিত বায়ু-বাতাস ইত্যাদি বাহ্যিক কারণের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাই, উহা শুধু একটি বাহ্যিক কারণ বটে, তাই উহা একটি দুর্ব্বল জিনিষ ; অতএব যে ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই সেই ক্ষেত্রে ত উহার প্রতি লক্ষ্য করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং এই সূত্রেই মহামারী এলাকায় সাধারণ আগমনে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, বহিরাগমনের সাময়িক বাধায় বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। তদ্রূপ কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে সাধারণ মেলামেশায় বাধা দেওয়া হইয়াছে, কেননা দুরে দুরে থাকিয়াও তাহার সেবা শুশ্রূষার কাজ চলিতে পারে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত দুর্ব্বল জিনিষ—বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করার পথ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সূত্রেই মহামারী এলাকা হইতে পলায়নকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।* অবশ্য ইহা ওলামাদের এক জামাতের অভিমত। অপর জামাতের অভিমত এই যে, তদ এলাকা পরিত্যাগ সম্পর্কেও দুষিত বায়ু-বাতাস ও পানি ইত্যাদিকে রোগের জন্য বাহ্যিক কারণ গণ্য করিয়া সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার তথা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু শর্ত্ত এই যে, আকিদা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় রাখিতে হইবে যে, রোগ সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্ব্বশক্তির অধিকারী—তিনি মহামারী এলাকার মধ্যেও রোগ মুক্ত রাখিতে পারেন এবং অন্যত্রও রোগাক্রান্ত করিতে পারেন। ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতাকে রোগ সৃষ্টিকারী মনে করা হারাম ও ঈমানের পরিপন্থী। আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা এরূপ অবস্থায়ই প্রযোজ্য এবং এইরূপ ধারণার বশীভুত হইয়া তদ এলাকা পরিত্যাগ করাকেই রোগ হইতে পলায়ন করা বলা হইয়াছে। আকিদা ও বিশ্বাসকে একমাত্র আল্লার দিকে সুদৃঢ় রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু-বাতাসের জন্য অন্যত্র যাওয়া রোগ হইতে পলায়ন করা নহে এবং ইহা নিষিদ্ধও নহে।

মছআলাহ :—(১) মহামারী এলাকা হইতে কোন বিশেষ আবশ্যক বশতঃ বা পুর্ব্ব নির্দ্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোথাও যাওয়া জায়েয আছে ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। (২) ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতাকে রোগ সৃষ্টিকারী মনে করিয়া মহামারী এলাকা হইতে চলিয়া যাওয়া হারাম ও ঈমানের পরিপন্থী ইহাতেও কাহারও দ্বিমত নাই। (৩) রোগ সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা—আল্লার সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে সংক্রামকতায় রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না এই আকিদা ও বিশ্বাস অনড় অটলরূপে সুদৃঢ় রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু-বাতাসের উদ্দেশ্যে মহামারী এলাকা ছাড়িয়া

---

* মাওলানা থানভীর বাওয়াদেরুন্-নাওয়াদের কেতাব হইতে এই তথ্য সংগৃহীত।

অন্যত্র যাওয়া সম্পর্কে ওলামাদের দ্বিমত রহিয়াছে।× এক জামাত আলেমের মত এই যে, এইরূপ যাওয়া জায়েয নহে—ইহাও আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত—ইহাও কবিরা গোনাহ।↑ আর এক জামাত আলেমের মত্ এই যে, এরূপ যাওয়া জায়েয আছে, আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা শুধু ২নং অবস্থায় প্রযোজ্য। ৮৫২ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতের ইঙ্গিত দানে একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

২২১৯। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه قال
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন মোসলমানের মৃত্যু প্লেগ রোগে হইলে সে শহীদের মর্ত্তবা লাভ করিবে।

কোন রোগ ছোঁয়াচে বা স্পর্শক্রামী হওয়ার ধারনা অবাস্তব—ইহা বিশ্বাস করিবে না

২২২০। হাদীছ :— ان عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال —
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ اِنَّمَا الشُّؤْمُ
فِى الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন রোগ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক হয় না, কোন ব্যাধি সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা করা নিষিদ্ধ।

কোন বস্তু অশুভ অলক্ষ্মী হওয়ার ধারণাও ভিত্তিহীন; কোন বস্তু সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা পোষণ করিবে না। অশুভ অলক্ষ্মী হওয়ার যদি বাস্তবতা থাকিত তবে স্ত্রী, ঘোড়া এবং বাড়ী—এই তিন জিনিষের মধ্যে তাহা হইত।

অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ত এই তিন জিনিষের মধ্যেও অলক্ষ্মী-অশুভতার কিছু নাই; তবে এই বস্তুত্রয় অবলম্বনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন উহা ক্রুটিজনিত হইয়া ক্ষতির কারণ না হয়। অন্য জিনিষের ক্ষতি এড়ানো সহজ, এই তিন জিনিষের ক্ষতি এড়ানো কঠিন, যেহেতু ইহার প্রত্যেকটি সর্ব্বদার জীবনসঙ্গী।

× ফত্হুলবারী ১০—১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য —

↑ "বাওয়াদেরুন্-নাওয়াদের" মাওলানা থানভী দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য হাদীছের প্রথম বাক্যটির বিস্তারিত আলোচনা "কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে" পরিচ্ছেদের আরম্ভে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। অশুভ-অলক্ষ্মী" সম্পর্কীয় বাক্যটির বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে জেহাদ অধ্যায়ে ঘোড়া সম্পর্কীয় আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।

মহামারী এলাকায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকার ফজিলত

২২২১। হাদীছ ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها

سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَهَا نَبِىُّ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ

اللهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهٖ

صَابِرًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَنْ يُّصِيْبَهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهٗ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, প্লেগ রোগের সূচনা আল্লার আজাবরূপে ছিল। এখনও যাহাদের প্রতি আল্লাহ উহা প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঈমানদারদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালা উহাকে রহমত বানাইয়া দিয়াছেন। (মোমেন ব্যক্তি উহার দ্বারা শহীদের মর্ত্তবা লাভ করিয়া থাকে।)

সুতরাং আল্লার যে বান্দা নিজ এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে পর তথায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্থিরপদ থাকিবে—মনে-প্রাণে এই কথা গাঁথিয়া রাখিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাই তাহার উপর বর্ত্তিবে সে অবশ্যই শহীদের সমান মর্ত্তবা লাভ করিবে।

ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গে

২২২২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْعَيْنُ حَقٌّ..........

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নজর লাগার প্রতিক্রিয়া (বাহ্যিক কারণ পর্য্যায়ে) একটি বাস্তব জিনিষ।

২২২৩। হাদীছ — عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজর লাগার ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক করার পরামর্শ দিয়াছেন।

২২২৪। হাদীছ ঃ— عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها

ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى بيتها جارية فى وجهها

سفعة فقال استرقوا لها فان بها النظرة

অর্থ—উম্মে ছালামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলেন—তাহার মুখমণ্ডলে যেন ঝাঁজ লাগিয়াছে। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, মেয়েটিকে ঝাড়-ফুঁক করাও; তাহার উপর নজর লাগিয়াছে।

২২২৫। হাদীছ ঃ— عن الاسود قال سألت عائشة رضى الله عنها

عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبى صلى الله عليه وسلم

فى الرقية من كل ذى حمة -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব রকম বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়াছেন।

২২২৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক শ্রেণীর ঝাড়-ফুঁকে এইরূপ বলিয়া থাকিতেন—

تربة ارضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا -

"আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের এক জনের থুথু (মিশ্রিতরূপে ব্যবহার করা হইতেছে এই উদ্দেশ্যে যে,) আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের ইচ্ছা ও আদেশে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।"

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে, কাহারও দেহে ফুলা-ফাটা বা ক্ষত শ্রেণীর কোন ব্যাধি থাকিলে উহার ঝাড়-ফুঁক হযরত নবী (দঃ) এরূপে করিতেন যে, স্বীয় শাহাদৎ আঙ্গুলে থুথু লাগাইয়া উহার সঙ্গে একটু মাটি জড়াইয়া নিতেন এবং উহাকে ব্যাধিস্থানে লাগাইতেন এবং উল্লেখিত দোয়াটি পড়িতেন।

২২২৭। ছাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কাহাকেও ঝাড়-ফুঁক করিলে ডান হাত তাহার উপর বুলাইতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ

إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا -

অর্থ—হে সর্ব্বজনীন প্রভু-পরওয়ারদেগার! ব্যাধি দূর করিয়া আরোগ্য দান করুন যেন ব্যাধির নাম-নিশান বাকি না থাকে। আপনি ভিন্ন অন্য কোথাও হইতে আরোগ্য লাভ হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্যাধি হইলে ব্যাধি স্থানে হাত বুলাইবে এবং উক্ত দোয়া পড়িবে।

মন্ত্র-তন্ত্রের ধার না ধারিয়া আল্লার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কোল করার ফজিলত

২২২৮। ছাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মজলিসে আসিয়া বয়ান করিলেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ এবং তাঁহাদের উম্মতের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সেই উপলক্ষে দেখিয়াছি, কোন নবী চলিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে মাত্র একজন লোক রহিয়াছে, কাহারও সঙ্গে দুইজন লোক রহিয়াছে, কোন নবীর সঙ্গে এক দল লোক রহিয়াছে, কোন কোন নবী চলিয়াছেন যাঁহার সঙ্গে দল ও জামাত অপেক্ষা কম লোক রহিয়াছে, কাহারও সঙ্গে একজনও নাই। আবার দেখিতে পাইলাম, আকাশ-জোড়া এক বিরাট জামাত আসিতেছে; তখন আমি ভাবিলাম, ইহারা আমার উম্মত হইবে, কিন্তু আমাকে জ্ঞাত করা হইল, ইহারা হইতেছে মূছা (আঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণ। অতঃপর আমাকে বলা হইল, আপনি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করুন। তখন আমি আকাশ-জোড়া আর একটি বিরাট জামাত দেখিতে পাইলাম। ঐ সময় আমাকে অন্যান্য দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে বলা হইল। আমি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দিকে আকাশ-জোড়া বিরাট বিরাট জামাত দেখিতে পাইলাম। আমাকে বলা হইল, এই সবের সমষ্টি আপনার উম্মত। ইহাদের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে যাহারা বিনা-হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। এতটুকু বলার পরেই হযরত (দঃ) স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং

মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত (দঃ) উক্ত সত্তর হাজার লোক সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা দিলেন না।

ছাহাবাদের মধ্যে উহা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। তাঁহারা বলিলেন, আমরা (সর্ব্বপ্রথম) আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসুলের এত্তেবা ও তাবেদারী গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ঐ সত্তর হাজার আমরা হইব, অথবা আমাদের জীবনের একাংশ যেহেতু অন্ধকার তথা কুফুরী যুগে কাটিয়াছে তাই আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যাহারা ইসলামের হালতেই জন্ম নিয়াছে তাহারা হইবে।

উক্ত জল্পনা-কল্পনার খবর হযরত নবী (দঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন—

هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"তাহারা ঐ শ্রেণীর লোক যাহারা কোন কিছুকে অশুভ-অমঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করে নাই, মন্ত্র-তন্ত্রের ধার-ধারে নাই, আগুনে পোড়া লোহার দাগ লাগান ব্যবস্থার চিকিৎসা গ্রহণ করে নাই। সর্ব্বদা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কোল ও ভরসা করিয়াছে।"

ঐ সময় ওকাশাহ্ (রাঃ) নামক ছাহাবী আরজ করিলেন, হুজুর। আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ আমাকে ঐ সত্তর হাজারের একজন করেন। হযরত (দঃ) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! ওকাশাহ্কে উহাদের দলভুক্ত করিয়া দিন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ঐরূপই আরজ করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, এই দোয়ার সৌভাগ্য ওকাশাহ্ তোমার পূর্ব্বেই নিয়া গিয়াছে।*

ব্যাখ্যা ঃ—তপ্ত লৌহাদি দ্বারা দাগাইয়া চিকিৎসা করা আবশ্যকস্থলে জায়েয আছে বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া যথা সাধ্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা বা আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করা উত্তম। এ-সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্পষ্ট উক্তি হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—হযরত (দঃ) এই ব্যবস্থা উপকারী হওয়া বিশেষ জোরের সহিত বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন, وانهى امتى عن الكى "আমি আমার উম্মতকে দাগানের ব্যবস্থা হইতে নিষেধ করি।" অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা নাজায়েয শ্রেণীর নহে, বরং পছন্দিত না হওয়া শ্রেণীর। বোখারীর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে—وما احب ان اكتوى "দাগ লাগানকে আমি পছন্দ করি না।" পছন্দিত না হওয়ার কারণরূপে আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, শরীরে আগুনে পোড়া দাগ লাগান একটি অশুভ কাজ।

---

* ওকাশাহ্ (রাঃ) যেই অন্তরে কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ঐ দোয়া পাইবার উপযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী লোকটির অন্তর হয় ত সেই শ্রেণীর হইতে পারে নাই, শুধু দেখাদেখি বলিয়াছিল, তাই হযরত (দঃ) তাহার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়াছেন।

মন্ত্র-তন্ত্র যদি অনৈছলামিক বাক্যাবলীর দ্বারা হয় তবে ত উহা সুস্পষ্ট নাজায়েযই বটে। আর যদি ইসলামিক বাক্যাবলী, এমনকি কোরআন-হাদীছের দ্বারাও হয় তবুও উহার আধিক্য পছন্দনীয় নহে বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার দ্বারা সমাজে এই ব্যাধি সৃষ্টি হয় যে, কোরআন-হাদীছের মূল উদ্দেশ্য তথা আমল করা হইতে দূরে সরিয়া ঐ অমূল্য ধনকে নগণ্য ঝাড়-ফুঁকের কাজের জন্য রাখে। অথচ কোরআন-হাদীছ নাজেল হওয়ার উদ্দেশ্যের গণ্ডির ভিতর ঐ ঝাড়-ফুঁকের কোন স্থানই নাই।

মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে তিরমিজি শরীফে ও নেছায়ী শরীফে একখানা হাদীছ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে —

مَنِ اكْتَوٰى اَوِاسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ -

"যে ব্যক্তি দাগ লাগায় বা মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেয় সে তাওয়াক্কোল তথা আল্লার উপর ভরসা স্থাপন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।"

মন্ত্র-তন্ত্র, এমনকি জায়েয শ্রেণীর ঝাড়-ফুঁক এবং ঔষধ-পত্রাদির চিকিৎসা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। ঔষধকে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা রোগের চিকিৎসার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—উহা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ দান; তিনি বান্দাদিগকে রোগের চিকিৎসার জন্য উহা দান করিয়াছেন। অতএব উহা অবলম্বন করা সাধারণ ক্ষেত্রে তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী নহে।

পক্ষান্তরে মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক, এমনকি যদি উহা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারাও হয় উহা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে না যে, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতকে ঝাড়-ফুঁকের জন্য নাজেল করিয়াছেন। অতএব ইহা ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করা পর্যায়ের নহে এবং ইহা সাধারণ ক্ষেত্রেও তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী গণ্য হইতে পারে।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা-হিসাবে বেহেশ্‌ত লাভকারীদের সংখ্যা সত্তর হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আলেমুল-গায়েব আল্লার ওহী দ্বারা পরিচালিত রসুলের উক্তির উপর কিছু বলা অনধিকার চর্চ্চা বৈ নহে। কাহারও মতে এই সংখ্যার উল্লেখ সীমাবদ্ধতার অর্থে নহে, বরং সংখ্যার আধিক্য বুঝাইবার জন্য। অন্য এক হাদীছ দ্বারা আরও অনেক অধিক সংখ্যা প্রমাণিত হয়।

কোন বস্তুকে অশুভ অলক্ষ্মী মনে করা

২২২৯। **হাদীছ :**— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—কোন কিছুকে অশুভ অমঙ্গল বা কুলক্ষণ গণ্য করিও না—ঐরূপ ধারণা অলীক ও ভিত্তিহীন। হাঁ—শুভ লক্ষণ গণ্য করা ভাল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভ লক্ষণ কি রূপ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, (যেমন—) তোমাদের কেহ (কোন পরিস্থিতিতে তাহার পক্ষে যাহা ভাল ঐরূপ) ভাল অর্থ বোধক কোন শব্দ শুনিতে পায়।

২২৩০। **ছাদীছ ঃ—** عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا

اَلْفَالُ الصَّالِحُ اَلْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার কোন ভিত্তি নাই- কোন কিছুকে অশুভ কুলক্ষণ মনে করাও ভিত্তিহীন। অবশ্য ভাল অর্থ বোধক কোন বাক্য শুনিয়া উহাকে শুভ লক্ষণরূপে গণ্য করা ভালই।

গণক-ঠাকুর সম্পর্কে

২২৩১। **ছাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট গণক-ঠাকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাদের কথার কোনই মূল্য নাই। জিজ্ঞাসাকারীগণ আরজ করিল, ইহা রসুলুল্লাহ! তাহাদের কথা অনেক সময় ঠিক হইতে দেখা যায়। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, (প্রকৃত ঘটনা এই যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে ফেরেশতাগণ উর্দ্ধ জগতে যে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকেন উহা হইতে) দুষ্ট জ্বিনগণ দুই-একটি বাক্য লুকোচুরি করিয়া শুনিয়া আসে। অতঃপর ঐ জ্বিন তাহার সঙ্গে সম্পর্কধারী গণক-ঠাকুরের কানে ঐ বাক্য পৌঁছাইয়া দেয়। গণক-ঠাকুর উহার সঙ্গে শতটা মিথ্যা কথা মিশাল দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—দুষ্ট জ্বিনদের উর্দ্ধ জগতের দিকে যাইয়া ফেরেশতাদের আলোচনা শুনিবার সুযোগ একটি অতি বিরল সুযোগ। অতঃপর তথা হইতে কোন কথা নিয়া বাঁচিয়া আসা ততধিক বিরল। কারণ, নক্ষত্র জাতীয় উল্কা নিক্ষেপ করিয়া ঐরূপ ঘটনা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা আদিকাল হইতেই প্রবর্তিত ছিল, অধিকন্তু হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের পর ঐ ব্যবস্থাকে

অত্যধিক জোরদার করা হইয়াছে।* সুতরাং এই যুগে ঐরূপ লুকোচুরির সুযোগ যে কত দুর বিরল হইবে তাহা সহযেই অনুমেয়। অতএব এই পর্য্যায়ের বিরল ও নগণ্য এক-দুইটা কথার দ্বারা ত গণকের ব্যবসা চলিতে পারে না, তাই সে উহার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মনগড়া কথা মিশাল দিয়া চালু করে। ঐ এক-দুইটা কথা যাহা জ্বিনের মারফৎ পাইয়া ছিল উহা ঠিক হইতে দেখা যায় যাহার সুনামে শতটা মিথ্যা অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও চাপা পড়িয়া থাকে এবং ঐ এক-দুইটা সত্যের বদৌলতে গণক ঠাকুরের ব্যবসা চলিতে থাকে।

উল্লেখিত তথ্যটি হইল গণক-ঠাকুরের এক-দুইটা কথা সত্য হওয়ার সূত্র, কিন্তু গণক-ঠাকুরের কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাহার নিকট যাওয়া হারাম হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে তাহাকে ভবিষ্যদ্বানীর অধিকারী তথা আলেমুল-গায়েব গণ্য করার অর্থ বুঝায় যাহা শেরেকী গোনাহ।

যাদু সম্পর্কে

২২৩২। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মদীনার বনী-যোরায়েক গোত্রীয় লবীদ নামক মোনাফেক এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর যাদু করিয়াছিল। যাহার প্রতিক্রিয়া হযরতের উপর এরূপ হইয়াছিল যে, কোন করণীয় কাজ সম্পর্কে হযরতের এরূপ মনে হইত যেন ঐ কাজ তিনি করিয়া নিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সেই কাজ করেন নাই। (এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দীর্ঘ ছয় মাস কাটিল,) এমনকি একদা রাত্রিবেলা হযরত (দঃ) আমার গৃহেই ছিলেন, কিন্তু ঐ দিন তিনি পুনঃ পুনঃ দোয়া করিলেন। তারপর নিদ্রা হইতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া বলিলেন, হে আয়েশা! শুন, আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করিষাছেন এবং আমি যাহা জানিতে চাহিয়া ছিলাম তাহা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন।

দুই জন লোক আসিয়া একজন আমার মাথার দিকে অপরজন পায়ের দিকে বসিয়া ছিল। এমতাবস্থায় লোক দুইটি আমার সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্নোত্তর করিল—

প্রশ্ন—এই ব্যক্তির কি রোগ হইয়াছে?

উঃ—তাঁহাকে যাদু করা হইয়াছে।

প্রঃ—কে যাদু করিয়াছে?

উঃ—লবীদ-ইবনে-আ'ছাম—মোনাফেক এবং ইহুদীদের দোস্ত।

---

* এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রঃ—কি বস্তুর সাহায্যে যাদু করিয়াছে ?

উঃ—চিরণীর ভগ্নাংশ ও আঁচড়ানে ছিন্ন চুল।*

প্রঃ—ঐ সব বস্তু কোথায় পোঁতা হইয়াছে ?

উঃ - ঐ সব বস্তু মর্দ্দা খেজুর গাছের ফুলের খোলসে ভর্ত্তি করিয়া জার্‌ওয়ান নামক অন্ধ কূপে পাথরের নীচে পোঁতিয়া রাখা হইয়াছে। (কূপটি হযরত (দঃ)কে ঐ স্বপ্নে দেখানও হইয়াছিল।)

অতঃপর হযরত (দঃ) কতিপয় ছাহাবীকে সঙ্গে নিয়া ঐ কূপের নিকটে পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, এইটাই ঐ কূপ যেইটা আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে। উহার পচা পানির রং মেন্ধী ভিজান পানির ন্যায় ছিল এবং কূপটি যেই বাগানে অবস্থিত সেই বাগানের খেজুর গাছগুলিও ভূতের মাথার ন্যায় বিশ্রী দেখাইতেছিল। হযরত (দঃ) কূপ হইতে ঐ সব জিনিষ বাহির করাইলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! বিপরীত যাদুর সাহায্যে আপনার উপর কৃত যাদু রদ করার ব্যবস্থা করিলেনে না কেন ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আরোগ্য দান করিয়াছেন, এখন এই ব্যাপারে লোকদের মধ্যে চর্চ্চা ছড়াইবার পন্থা অবলম্বন করাকে আমি পছন্দ করি না। অতঃপর হযরত (দঃ) ঐ কূপটিকে ভরাট করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা :— হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসূল ছিলেন, কিন্তু তিনিও মানুষ ছিলেন। মানবীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁহার উপর প্রবর্ত্তিত হইত। যেমন—নিদ্রার ক্রিয়া তাঁহার উপর হইত, রোগের ক্রিয়া তাঁহার উপর হইয়াছিল। কিন্তু রসূল হওয়ার পদ-মর্য্যাদায় এবং দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে এই শ্রেণীর সব রকম ক্রিয়া হইতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অবশ্যই হেফাজত করিতেন। যেমন—তাঁহার উপর নিদ্রার ক্রিয়া অবশ্যই হইত, কিন্তু যে কোন সময় তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইতে পারে তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ব করিতে না পারিলে নবুওতের দায়িত্ব পালনে বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে, তাই আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার চোখের উপর ত নিদ্রার ক্রিয়া হইবে, কিন্তু তাঁহার মন-মগজের উপর এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর কোনরূপ ক্রিয়া হইবে না। অতএব নিদ্রাবস্থায়ও ওহী অবতীর্ণ হইলে তিনি তাহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি, সংরক্ষণ ও আয়ত্ব করিতে পারিতেন। সকল নবীদের

---

* এতদভিন্ন ঐ সবের সাথে এক খণ্ড ধনুকের গুণ বা রজ্জুও ছিল যাহার মধ্যে এগারটি গিরা দেওয়া ছিল। (ফৎহুল বারী)

জন্যই আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাই নিদ্রার দরুণ নবীদের অজু ভঙ্গ হইত না। এই তথ্য বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

তদ্রূপ এস্থলেও যাদুর দরুন তাঁহার উপর প্রতিক্রিয়া ছিল বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর কোন প্রতিক্রিয়া আদৌ ছিল না যদ্দ্বারা নবুওতের পদ-মর্য্যাদায় এবং উহার দায়িত্ব পালনে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার উপর ঐ যাদুর ক্রিয়া শুধু মাত্র একটুকু ছিল যে, একটা কাজ না করিয়াও মনে হইত যেন করিয়াছেন এবং একটা কাজ করার পরেও এরূপ ধারণা হইত যেন করেন নাই। এতটুকু ক্রিয়াও সব রকম কার্য্য সম্পর্কে ছিল না। বোখারী শরীফ ৮৫৮ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ বর্ণিত আছে উহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঐ প্রতিক্রিয়াটুকুও শুধু মাত্র স্ত্রী-সঙ্গম সম্পর্কীয় ব্যাপারে হইয়া থাকিত। এই পর্য্যায়ের প্রতিক্রিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মোটেই নহে, কিছুটা অস্বস্তির কারণ ছিল মাত্র। দীর্ঘ ছয় মাস কাল উদ্বেগ ভোগের পর উল্লেখিত ঘটনা ঘটে এবং এই উপলক্ষেই কোরআন শরীফের দুইটি ছূরা—ক্কুল্ আউ'জু বি-রাব্বিল্ ফালাক্, ক্কুল্ আউ'জু বি-রাব্বিন্ নাছ নাযেল হয়। উক্ত ছূরাদ্বয়ের এগারটি আয়াত; বর্ণিত আছে, যাদুর বস্তুসমূহের মধ্যে যে এগারটি গিরা সম্বলিত এক খণ্ড ধনুকের গুণ বা রজ্জু ছিল উক্ত ছূরাদ্বয়ের এক একটি আয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি গিরা খসিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে ছূরাদ্বয়ের তেলাওয়াত শেষ করার সাথে সাথে গিরাগুলিও সব খুলিয়া গেল এবং হযরত (দঃ) বন্ধনমুক্তি লাভের ন্যায় তৎক্ষণাৎ স্বস্তি লাভ করিলেন।

মছআলাহঃ— যাদু করা হারাম, কিন্তু যাদু হইতে মুক্তি লাভের জন্য যাদু শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন করা জায়েয আছে। অবশ্য শরীয়ত বিরোধী মন্ত্র-তন্ত্র বা ঐরূপ কোন কার্য্য অবলম্বন করা যাইবে না।

হযরত (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা

২২৩৩। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) খয়বর জয় করার পর তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় (ইহুদীদের চক্রান্তে এক ইহুদী নারীর পক্ষ হইতে) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে রন্ধিত বকরির গোশ্‌ত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। (হযরত (দঃ) উহার একটি টুক্‌রা খাওয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন সময় আল্লার কুদরতে ঐ গোশ্‌তের টুক্‌রা হযরত (দঃ)কে বিষের সংবাদ জ্ঞাত করিয়া দিল এবং হযরত (দঃ) তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিলেন।) অতঃপর হযরত (দ.) উক্ত এলাকার ইহুদীগণকে একত্রিত করার আদেশ করিলেন। তাহাদিগকে একত্রিত করা হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি কথা

জিজ্ঞাসা করিব, তোমরা আমাকে সঠিক সত্য উত্তর দিবে কি ? তাহারা বলিল, নিশ্চয়। সেমতে হযরত (দঃ) (প্রথমতঃ তাহাদের জবানের সত্যতা জ্ঞাত হওয়ার জন্য) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের (বংশের) আদি পিতা কে ছিল ? তাহারা উত্তরে একজনের নাম উল্লেখ করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাদের আদি পিতা ত অমুক ব্যক্তি ছিল। তখন তাহারা বলিল, আপনার কথাই ঠিক। অতঃপর পুনরায় হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি পুনঃ একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবে ত ? তাহারা বলিল, নিশ্চয়—যদি মিথ্যা বলি তবে আপনি তাহা ধরিয়া ফেলিবেন যেমন প্রথম উত্তরে ধরিয়াছেন।

এইবার হযরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরকবাসী কাহারা হইবে ? তাহারা বলিল, আমরা কিছু দিন নরকে বাস করিব, অতঃপর আপনার দল আমাদের পরিবর্ত্তে নরকবাসী হইবে। হযরত (দঃ) তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোমরাই তথায় লাঞ্ছিতরূপে চিরকাল থাকিবে, আমরা কখনও তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হইব না।

তারপর হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আর একটা কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবে ত ? তাহারা বলিল, হঁা। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই বকরির গোশ্‌তে বিষ মিশ্রিত করিয়াছ কি ? তাহারা বলিল, হঁা। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমরা এই কাজ করিয়াছ ? তাহারা বলিল, আমরা ভাবিয়াছি—যদি আপনি নবুওতের মিথ্যা দাবীদার হইয়া থাকেন তবে (এই বিষে আপনার দফারফা হইবে এবং) আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিব। আর আপনি প্রকৃত নবী হইয়া থাকিলে বিষ আপনার ক্ষতি করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—নরকবাসী সম্পর্কে ইহুদীরা যে মন্তব্য করিয়াছিল উহা তাহাদের জাতিগত বদ্ধমূল মিথ্যা আকিদা ও অমূলক বিশ্বাস ছিল। পবিত্র কোরআনেও তাহাদের এই আকিদা ও বিশ্বাসের সমালোচনা রহিয়াছে, আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً - قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ - أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - بَلٰى مَنْ
كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خٰلِدُونَ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ -

ইহুদীদের অপরাধ গণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, তাহাদের আর একটি অপরাধ এই যে, "তাহারা দাবী করিয়া থাকে, দোযখ আমাদিকে স্পর্শ করিবে না, হাঁ—অল্প কয়েক দিন হয় ত আমাদের দোযখে থাকিতে হইবে।"*

তাহাদের দাবীর অবাস্তবতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে বলিতেছেন, "আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, এই দাবী সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন ঘোষণা ও ওয়াদা-অঙ্গীকার লাভ করিয়াছ কি যাহার বরখেলাফ আল্লাহ করিবেন না? না—দলীল-প্রমাণ ছাড়াই তোমরা নিজেরাই আল্লার উপর একটা কথা চাপাইয়া দিতেছ?

তোমাদের জন্য দোযখ নিষিদ্ধ নহে, তোমরাও দোযখে যাইবে; (দোযখে যাওয়া ও বেহেশ্‌তে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নির্দ্ধারিত আইন এই—) যাহারা পাপ করিয়া পাপে ডুবিয়া যাইবে তাহারা হইবে নরকবাসী তাহারা তথায় চিরকাল থাকিবে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে এবং নেক আমলসমূহ করিবে তাহারা হইবে বেহেশ্‌তবাসী, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। (১ পাঃ ৯ রুঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিষ প্রয়োগকারিণী মূল অপরাধিনী নারীটির প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ হযরত (দঃ) ঐ নারীটির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরতের সঙ্গে ঐ খাদ্য গ্রহণে আরও তিনজন ছাহাবী শরীক ছিলেন; তন্মধ্যে বিশ্‌র-ইবনে-বরা (রাঃ) নামক ছাহাবী বিষাক্ত গোশ্‌তের কিছু অংশ গলধঃ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ফলে তাঁহার উপর বিষের ক্রিয়া হইয়াছিল এবং চিকিৎসা বিফল হইয়া তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ বিচার প্রার্থী হইলে পর হযরত (দঃ) ঐ নারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বিষের কিছু অংশ হযরতের পেটেও প্রবেশ করিয়াছিল, অবশ্য উহার কোন উপস্থিত প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না। কিন্তু সময় সময় অন্য উপসর্গের সঙ্গে উহারও প্রতিক্রিয়া দেখা দিত, এমনকি মৃত্যু শয্যার রোগকালীন ঐ প্রতিক্রিয়া এত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল যে, উহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কারণ হয় এবং হযরত (দঃ) শহীদের মর্ত্তবা লাভ করেন। বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে।

---

* তাহারা বলিয়া থাকিত যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ধোকায় পড়িয়া চল্লিশ দিন গো-শাবকের পুজা করিয়াছিল সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে আমাদেরকে চল্লিশ দিন দোযখে থাকিতে হইবে, নতুবা আমরা ত নবীর জাত—নবীর বংশ আমরা তাতেই পার হইয়া যাইব, আমাদেরকে দোযখ স্পর্শ করিতে পারিবে না। সম্মুখে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আইন ও নীতি ঘোষণা করিয়া দিয়া তাহাদের ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন।

বিষ পানে আত্মহত্যার পরিণতি

২২৩৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ

فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا

فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَسَمُّهٗ فِىْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهٗ فِىْ يَدِهٖ يَجَأُ بِهَا فِىْ بَطْنِهٖ فِىْ نَارِ

جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাহাড় (ইত্যাদি কোন উচু স্থান) হইতে নিজকে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে সে দোযখের আগুনের মধ্যে ঐরূপে নিজকে পাহাড় হইতে ফেলিতে থাকিবে—পাহাড়ে চড়িয়া তথা হইতে নিজকে ফেলিবে, আবার চড়িবে আবার ফেলিবে, আবার চড়িবে আবার ফেলিবে। (যাবৎ না তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় দোযখে থাকিয়া) সে সব সময়ই ঐরূপ করিতে (এবং উর্দ্ধ হইতে পতিত হওয়ার যাতনা ভোগিয়া যাইতে) বাধ্য হইবে।

আর যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দোযখের আগুনের মধ্যে তাহার হাতে বিষ থাকিবে সে উহা পান করিতে থাকিবে, (যাবৎ না তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় সে দোযখে থাকিয়া) সব সময়ই বিষ পান করতঃ উহার যন্ত্রনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

আর যে ব্যক্তি কোন লৌহ-অস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করিবে দোযখের আগুনের মধ্যে তাহার হাতে লৌহ-অস্ত্র থাকিবে। (যাবৎ না তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় সে দোযখে থাকিয়া) সব সময় ঐ অস্ত্র দ্বারা নিজ পেটকে ঘায়েল ও আঘাত করিতে থাকিবে।

পোষাক-পরিচ্ছদের বয়ান

শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা ব্যতিরেকে যে কোন ক্ষেত্রে পোষাক-পরিচ্ছদকে বর্জ্জন করার রছম বা প্রথা পালন করা যে একটি গর্হিত কাজ উহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে একটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ধকার যুগে

কাফের মোশরেকগণ কা'বা শরীফের তওয়াফ করা কালে পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করতঃ উলঙ্গ হইয়া যাইত—এই শ্রেণীর গর্হিত কার্য্যের প্রতি নিন্দা ও কটাক্ষ্য করতঃ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ -

"আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, কে হারাম করিয়াছে আল্লাহ প্রদত্ব শোভাদানকারী লেবাছ-পোষাককে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বন্দাদিগকে দান করিয়াছেন ?"

অর্থাৎ লেবাছ-পোষাক হইল আল্লার নেয়ামত এবং আল্লার একটি দান, কোন স্থানে উহা বর্জ্জন করিতে হইলে শুধু মনগড়া রছম-রীতির অনুসরণে উহা বর্জ্জন করা যাইবে না। সেরূপ করিলে তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিপরীত কার্য্য হইবে।

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا فِىْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ -

"আল্লার নেয়ামত—আহার্য্যকে আহার কর, পাণীয়কে পান কর, পরিধেয়কে পরিধান কর—অবশ্য অপব্যয় ও অহঙ্কারের পর্য্যায়ে নহে।"

অর্থাৎ তুমি আল্লার বন্দা ; আল্লার দান পানাহার ও লেবাছ-পোষাককে আল্লার তথা শরীয়তের নিয়ম ব্যতিরেকে বর্জ্জন করিতে পার না। নতুবা তাহা আল্লার নেয়ামতকে উপেক্ষা করার শামিল হইবে যাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও পক্ষে সমীচীন নহে।

পরিধেয়কে পায়ের গিঁঠের নীচে করার ভয়াবহ পরিণতি

২২৩৫। হাদীছ :— عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি করিবেন না ঐ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি বড়মানুষী ও গরিমা বশে স্বীয় পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলে।

২২৩৬। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

"যে ব্যক্তি স্বীয় পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলে, বড়মানুষী ও গরিমা বশে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না।

এতচ্ছ্রবনে আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার (সেলাই বিহীন) লুঙ্গির এক কিনারা (সময় সময় *) ঝুলিয়া পড়ে যদি না আমি বিশেষরূপে যত্নবান হই এবং লক্ষ্য রাখি (যাহা সব সময় দুষ্কর)। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনিত তাহাদের ন্যায় নন যাহারা বড়মানুষী ও গরিমা বশে ঐরূপ করে।

২২৩৭। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি করিবেন না ঐ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি গরিমা করিয়া বড়মানুষী দেখাইবার জন্য স্বীয় লুঙ্গি হেঁচড়াইয়া চলে।

ব্যাখ্যাঃ—শারীরিক গঠনের দরুন পরিধেয় কাপড় ঝুলিয়া পড়িলে সে স্থলেও কাপড় পায়ের গিঁঠের নীচে যেন যাইতে না পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য ঐরূপ অবস্থায় অলক্ষ্যে ঝুলিয়া পড়িলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু লক্ষ্য হওয়ার সাথে সাথে কাপড় গিঁঠের উপর উঠাইয়া নিতে হইবে।

বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত পরিধেয় কাপড় পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া দেওয়া বা ঝুলাইয়া রাখা নিষিদ্ধ ↑; যদিও অহঙ্কার গরিমা ও বড়মানুষীর খেয়াল অন্তরে উপস্থিত না দেখা যায়। কেননা, এই রীতি ও ফ্যাসনের উৎপত্তি উহা হইতেই। এক হাদীছে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্যটি উল্লেখ করিয়াছেন। মেশকাত শরীফে** আবু দাউদ শরীফ হইতে সেই হাদীছ খানা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

* ফত্‌হুল বারী ১০—২০৯

↑ এই বিধান একমাত্র পুরুষদের জন্য। নারীদের জন্য পায়ের পাতা আবৃত রাখাই কর্ত্তব্য—এই মছআলাহ অন্য হাদীছে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

** باب فضل الصدقة

এক নবাগত ছাহাবী হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। হযরত (দঃ) স্বীয় উপদেশাবলীর মধ্যে এই কথাও বলিলেন—

وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ ۔

“পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হইতে খুব সতর্কতার সহিত বিরত থাকিও, কারণ এই অভ্যাসটা অহঙ্কার গরিমা ও বড়মানুষী গণ্য হয় যাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত নারাজ ও অসন্তুষ্ট।”

ফত্হুল বারী ১০ম খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠায় আরও দুই খানা হাদীছ এই বিষয়ে আছে—

(১) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

وَاِيَّاكَ وَجَرَّ الْاِزَارِ فَاِنَّ جَرَّ الْاِزَارِ مِنَ الْمَخِيْلَةِ ۔

“বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলা হইতে বিরত থাকিও। কারণ, কাপড় হেঁচড়াইয়া চলা অহঙ্কার ও গরিমার মধ্যে শামিল।”

(২) আম্র(রাঃ) নামক ছাহাবী রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাতে আসিলেন। ঐ ছাহাবীর পরিধেয় কাপড় ঝুলান ছিল। তিনি হযরতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমার পায়ের গোছা সরু (তাই উহা পূর্ণ ঢাকিয়া রাখার জন্য কাপড় ঝুলান হইয়াছে।) হযরত (দঃ) বলিলেন—

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ يَا عَمْرُو اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلَ ۔

“আল্লাহ যে জিনিষকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন উহাই উত্তম; নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া রাখে।”

উল্লেখিত তথ্যের মর্ম্মই এই যে, অহঙ্কার ও গরিমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা সীমাবদ্ধ নহে, বরং কোন প্রকার বাস্তব ওজর ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃত পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া বা ঐরূপ থাকিতে দেওয়াই নিষিদ্ধ; যদিও অহঙ্কার ও গরিমার ভাব উপস্থিত না থাকে। এই কারণেই অনেক হাদীছে মূল “এস্‌বাল” তথা পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলানকেই নিষিদ্ধ এবং দোযখের আজাব ভোগের কারণ বলা হইয়াছে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি—

২২৩৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين

من الازار ففى النار۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পায়ের গিঁঠদ্বয়ের নীচে পরিধেয় কাপড় ঝুলাইয়া দিলে দোযখের আজাব ভোগ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মূল এস্‌বাল সম্পর্কে আরও হাদীছ বর্ণিত আছে—নেছায়ী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل

لا ينظر الى مسبل الازار۔

"হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঐ লোকদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করেন না যাহারা পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া দেয়।"

আবু-জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيمة

ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المنان بما اعطاه والمسبل ازاره والمنفق

سلعته بالحلف الكاذب۔

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তিন প্রকার লোকের প্রতি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কোন সহানুভূতি হইবে না এবং তাহাদেরে ক্ষমা করতঃ তাহাদের পবিত্রতা সাধন করিবেন না; তাহাদিকে ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে। (১) যে ব্যক্তি দান করিয়া উহার খোটা দেয়, (২) যে ব্যক্তি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া দেয়, (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় বিক্রয় দ্রব্যকে মিথ্যা কসমের দ্বারা চালু করিতে চায়।"

এই সব হাদীছের মধ্যে পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলাইয়া দেওয়ার উপরই আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি এবং দোযখ ও আজাবের উল্লেখ রহিয়াছে।

অহঙ্কার ও গরিমার উল্লেখ নাই। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের রীতিও বিভিন্ন হাদীছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। মোসলেম শরীফে আছে—

عن ابن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازاري

استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما

زلت اتحراها بعد فقال بعض القوم الى اين فقال انصاف الساقين -

"আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতে ছিলাম। আমার পরিধেয় লুঙ্গি ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার লুঙ্গি উপরের দিকে উঠাইয়া পর। আমি লুঙ্গিকে একটু উপরে উঠাইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী পরিমাণ উঠাও। আমি বেশী পরিমাণ উঠাইলাম এবং ঐ দিন হইতে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি অবলম্বন করিলাম। কোন কোন লোক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, লুঙ্গি কতটুকু পরিমাণ উঠাইয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন পায়ের গোছার মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত।

নেছায়ী শরীফে হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الى انصاف الساقين والعضلة

فان ابيت فاسفل فان ابيت فمن وراء الساق ولا حق

للكعبين في الازار -

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্রের শেষ সীমা পায়ের গোছা ও উহার মাংসপিণ্ডের মধ্য ভাগ। যদি তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পার তবে আরও একটু নীচে নামাইতে পার, তাতেও সন্তুষ্ট না হইলে গোছার শেষ সীমা পর্য্যন্ত। কিন্তু পায়ের গিঁঠদ্বয়ের কোন অংশের উপরই পরিধেয় বস্ত্র আসিতে পারিবে না।"

ফত্‌হুল বারী (১০—১১) কেতাবে আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ) হইতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে—

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ

وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ

"মোমেন ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র গোছাদ্বয়ের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত থাকিবে। অবশ্য গিঁঠদ্বয় পর্য্যন্তও রাখিতে পারে—তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু আরও অধিক নীচে গেলে দোযখের আজাব ভোগ করিতে হইবে।"

● ইমাম বোখারী একটি পরিচ্ছেদে প্রমান করিয়াছেন যে, নবী (দঃ) পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁঠের উপরে রাখিতেন।

২২৩৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতের কোন) একজন লোক মাথা আঁচড়াইয়া (সাজ সজ্জার সহিত) এক রঙ্গের জোড়া পোষাক পরিধান পূর্ব্বক গর্ব্ব ও গরিমাভরে চলিতে ছিল ; হঠাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জমিনে ধসাইয়া দিলেন। সে কেয়ামত পর্য্যন্ত ধসিতে থাকিবে।

২২৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি মাটিতে হেঁচড়াইয়া চলিতে ছিল, তাহাকে জমিনে ধসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেয়ামত পর্য্যন্ত সে ধসিতেছে।

হযরতের ব্যবহারিক কাপড়

২২৪১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইয়ামান দেশের তৈরী ডোরাযুক্ত সবুজ রঙ্গের এক প্রকার কাপড় ছিল—উহাকে বেশী পছন্দ করিতেন।

২২৪২। হাদীছ ঃ—আবু বোর্‌দাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) মোটা কাপড়ের একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিধানে এই কাপড় দুই খানা ছিল যখন তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পুরুষের জন্য তসর বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করা

২২৪৩। হাদীছ ঃ—আবু ওসমান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আজারবাইজানে থাকাকালে আমাদের নিকট খলীফা ওমরের পত্র পৌঁছিয়াছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অবশ্য দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতঃ (হযরত নবী (দঃ)) দেখাইয়াছেন যে, এই পরিমান ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন কাপড়ের মধ্যে রেশমী সূতার বুনান ডোরা বা রেশমী কাপড়ের সঞ্জাব দেওয়া হইলে ঐ কাপড় ব্যবহার জায়েয আছে। অবশ্য উহা দুই আঙ্গুল অন্য হাদীছ দৃষ্টে চার আঙ্গুল চওরার অধিক হইতে পারিবে না।

২২৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবু ওসমান (রঃ) বলিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পত্রে ইহাও ছিল—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا

اِلَّا مَنْ لَمْ يَلْبَسْ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُ ـ

"হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি ইহজগতে রেশমী কাপড় পরিধান করিবে সে আখেরাতে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

২২৪৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَّلْبَسَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

"যে ব্যক্তি ইহজগতে রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে সে অবশ্য অবশ্যই আখেরাতে উহা হইতে মাহ্‌রুম ও বঞ্চিত থাকিবে।

২২৪৬। **হাদীছ ঃ**— ছাবেৎ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) খোৎবার মধ্যে বলিয়াছেন—

قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا

فَلَنْ يَّلْبَسَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

"মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহজগতে রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে সে আখেরাতে নিশ্চয় উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

২২৪৭। **হাদীছ ঃ**—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

"ইহজগতে রেশমী কাপড় একমাত্র ঐ ব্যক্তিই ব্যবহার করিবে আখেরাতে যাহার কোন প্রকার নেয়ামত লাভের সুযোগই হইবে না।"

২২৪৮। হাদীছঃ—হোযায়ফা (রাঃ) মাদায়েন এলাকায় ছিলেন; একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে পানি পান করাইতে বলিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহার জন্য রৌপ্যের তৈরী পাত্রে পানি নিয়া আসিল; তিনি ঐ পানির পাত্রটি তাহার উপর ছোড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, ইহা তাহার উপর নিক্ষেপ করার একমাত্র কারণ এই—আমি তাহাকে এইরূপ পাত্রে পানি দিতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু সে বিরত থাকে না।

আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(পুরুষের জন্য) স্বর্ণ-চান্দি এবং মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় ব্যবহার করা—দুনিয়াতে ইহা কাফেরদের জন্য। আমাদের জন্য ইহা পরকালের জীবনে হইবে।

২২৪৯। হাদীছঃ— عن حذيفة رضى الله تعالى عنه

قال نهانا النبى صلى الله عليه وسلم ان نشرب فى انية الذهب والفضة وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه

অর্থ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন—স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করিবে না, মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করিবে না এবং উহার উপর বসিবে না।

২২৫০। হাদীছঃ— عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه

قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسى -

অর্থ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, লাল বর্ণের রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন ব্যবহার করিতে এবং তসর কাপড় ব্যবহার করিতে।

২২৫১। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যোবায়ের (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)কে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের শরীরে চর্ম্মরোগ ছিল (সূতী কাপড়ে জ্বালা-যন্ত্রনা হইত।)

● ইমাম বোখারী (রঃ) ৮৬৮ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, নবী (দঃ) পোশাক-পরিচ্ছদে এবং বিছানা ইত্যাদিতে আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন করিতেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের ৭৫নং হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছেন।

নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার জায়েয

২২৫২। হাদীছ :—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা আমাকে এক জোড়া কাপড় দিলেন যাহা (সম্পূর্ণ বা নাজায়েয পরিমাণে মিশ্রিত) রেশমী ছিল। আমি উহা পরিধান করিয়া বাহির হইলাম—যদ্দরুন হযরতের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমি ঐ কাপড় জোড়াকে ফাড়িয়া মেয়েদের পরার উপযোগী বানাইয়া দিলাম।

২২৫৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কন্যা উম্মে-কুলছুম রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার পরিধানে রেশমী চাদর দেখিয়াছেন।

নূতন কাপড় পরাইয়া কিরূপ দোয়া করিবে

২২৫৪। হাদীছ :—একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কতকগুলি চাদর লোকদেরে দান করার জন্য উপস্থিত করা হইল। উহাতে একটি পশমী কাল রঙ্গের চাদর ছিল। হযরত (দঃ) সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কাহাকে দিব? সকলেই চুপ রহিল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, উম্মে-খালেদ (বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাতিন)কে নিয়া আস। তাহাকে আনা হইলে হযরত (দঃ) ঐ চাদরটি নিজ হস্তে তাহাকে পরাইয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন—ابلى واخلقى "(আল্লাহ তোমাকে সুদীর্ঘ আয়ু দান করুন;) এই কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরাণ হইয়া যায়—ইহার পরে আরও কাপড় পরার সুযোগ যেন তুমি পাও।"

পুরুষের শরীরে জাফ্‌রান দ্বারা রঙ্গ লাগান

২২৫৫। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পুরুষের শরীর জাফ্‌রান দ্বারা রঙ্গীন করা নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— জাফ্‌রানে রঞ্জিত কাপড়ও পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

জুতা পায় দেওয়া সম্পর্কে

২২৫৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ

بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা প্রত্যেকে জুতা পায়ে দেওয়ার সময় ডান পা হইতে আরম্ভ করিবে এবং খুলিবার সময় বাম পা হইতে আরম্ভ করিবে—ডান পা জুতা পরার সময় প্রথমে হইবে এবং খোলার সময় শেষে হইবে।

২২৫৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمش احدكم فى نعل

واحدة ليحفهما جميعا او لينعلهما جميعا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ শুধু এক জুতা পায়ে দিয়া চলিবে না—উভয় পা খালি রাখিবে বা উভয় পায়ে জুতা পরিবে।

অঙ্গুরী বা আংটি সম্পর্কে

২২৫৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন (সিল-মোহর কার্য্যে ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রথমতঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিয়া থাকিতেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উহাকে বর্জ্জন করিলেন এবং বলিলেন, সর্ব্বদার জন্য ইহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম। (হযরতের দেখাদেখি কোন কোন লোক স্বর্ণ আংটি বানাইয়া ছিল, হযরত (দঃ)কে বর্জ্জন করিতে দেখিয়া) সকলেই উহা বর্জ্জন করিল।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তে পুরুষের জন্য স্বর্ণ আংটি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত আংটি ব্যবহৃত হইয়া ছিল। অতঃপর উহা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্বর্ণ অঙ্গুরী নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রথম খণ্ডে ৬৫১নং হাদীছে উল্লেখ আছে।

২২৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আংটি ছিল রৌপ্য নির্ম্মিত যাহার উপরিভাগও রৌপ্যই ছিল।

২২৬০। **হাদীছ** ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার হস্তেই থাকিত। অতঃপর আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে আসিল, (যখন তিনি খলীফা বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন)। তারপর উহা খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে আসিল এবং তারপর খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে আসিল। ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত হইতে উহা "আরীস্" নামক কূপে পড়িয়া গিয়াছিল। উহার উপর অঙ্কিত করা ছিল—"মোহাম্মাদোর-রস্থলুল্লাহ্"।

২২৬১। **হাদীছ** ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি আংটি তৈরী করিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন, আমি একটি আংটি তৈরী করিয়াছি এবং উহার উপর একটি বিশেষ বাক্য অঙ্কিত করিয়াছি। অন্য কেহ নিজ আংটিতে ঐ বাক্য অঙ্কিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি লিপি ও দাওয়াতনামা প্রেরণ করিবেন উহার জন্য সিল-মোহর আবশ্যক—সেই প্রয়োজনে হযরত (দঃ) প্রথমে একটি স্বর্ণ আংটি তৈরী করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পুরুষের জন্য স্বর্ণ আংটি ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় হযরত (দঃ) উহা পরিত্যাগ করিয়া আর একটি রৌপ্য আংটি তৈয়ার করিলেন। উহার উপর সিল-মোহরের বাক্য এক লাইনে "মোহাম্মাদ", এক লাইনে "রস্থল" আর এক লাইনে "আল্লাহ"—এই ভাবে "মোহাম্মাদোর-রস্থলুল্লাহ" বাক্য অঙ্কিত করা ছিল। ঐ আংটি হযরতের হস্তে থাকিত হযরত (দঃ) প্রয়োজন স্থলে উহা দ্বারা সিল-মোহর করিতেন।

হযরতের তিরোধানের পর ঐ আংটি খলীফা আবু বকরের হস্তে আসিল, তিনি সরকারী কাগজ-পত্রে উহার দ্বারাই সিল-মোহর করিতেন। খলীফা হিসাবে হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে কার্য্য পরিচালকরূপে তিনি ঐ সিল-মোহর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পর খলীফা ওমর (রাঃ) উহা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পর খলীফা ওসমানের হস্তে ঐ আংটি আসিল।

একদা ওসমান (রাঃ) মদীনার নিকটস্থিত "আরীস্" নামক কূপের পারে বসিয়া ঐ আংটি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে ছিলেন, হঠাৎ উহা ঐ কূপে পড়িয়া গেল। কূপের সমুদয় পানি শুষ্ক করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত আংটির তল্লাশি চালান হইল, কিন্তু উহা আর পাওয়া গেল না।

মছআলাহ ঃ— মহিলাদের জন্য স্বর্ণের অঙ্গুরী ব্যবহার করা জায়েয আছে। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার স্বর্ণের অঙ্গুরী ছিল। (৮৭৩ পৃঃ)

শিশুদের গলায় মালা পরানো

২২৬২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদীনার কোন এক বাজারে হযরত রস্থলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। হযরত (দঃ) যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন আমিও তাঁহার সাথে ছিলাম। হযরত (দঃ) বাড়ী আসিয়া শিশু হাসান (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, দুষ্ট কোথায় ? দুষ্ট কোথায় ? হাসানকে ডাকিয়া আন। তখন শিশু হাসান হাটিয়া আসিতে ছিল ; তাহার গলায় (পুতি বা লং ফুলের) মালা ছিল। হযরত (দঃ) হাসানের প্রতি হাত বাড়াইলেন, হাসানও হযরতের প্রতি হাত বাড়াইল এবং উভয়ে অপরকে জড়াইয়া ধরিল। হযরত (দঃ) হাসানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهٗ -

"হে আল্লাহ ! আমি তাহাকে ভালবাসি ; আপনিও তাহাকে ভালবাস্থন এবং যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসিবে তাহাকেও ভালবাস্থন।"

মছআলাহ ঃ—পুরুষের জন্য যে জিনিষ ব্যবহার নিষিদ্ধ যেমন স্বর্ণ অলঙ্কার বা সাড়ে চার মাষার অধিক রৌপ্য অলঙ্কার—তাহা শিশু ছেলেদিগকে ব্যবহার করানও নিষিদ্ধ। যাহারা উহা শিশুকে ব্যবহার করাইবে এবং যাহারা শিশুর গাজ্জিয়ান থাকিবে তাহারা গোনাহগার হইবে।

নারীবেশী পুরুষ এবং পুরুষবেশীনী নারী

২২৬৩। **হাদীছ ঃ**— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال

لَعَنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সব পুরুষদের প্রতি লানৎ করিয়াছেন যাহারা নারীবেশী হয় এবং ঐ সব নারীদের প্রতি লানৎ করিয়াছেন যাহারা পুরুষবেশীনী হয়।

গোঁফ, নখ ইত্যাদি কাটিয়া ফেলা

২২৬৪। **হাদীছ ঃ**— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ

وَتَقْلِيمِ الْاَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ -

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফেৎরতের মধ্যে (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবগত কার্য্যাবলীর মধ্যে বা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল নবীর চিরাচরিত রীতি-নীতির মধ্যে) পরিগণিত—(১) নাভির নিম্নস্থলের লোম কামাইয়া ফেলা, (২) নখ কাটিয়া ফেলা, (৩) গোঁফ কাটিয়া ফেলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— উল্লেখিত হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর কার্য্যক্রম ইমাম বোখারী (রঃ) ৮৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন—

"আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মোচ এত মিহি করিয়া কাটিতেন যে, ঐ স্থানের চামড়া দৃষ্ট হইত এবং তিনি ঠোঁটদ্বয়ের উভয় পার্শসংলগ্ন লোমও কাটিতেন বা নিম দাড়ির উভয় পার্শ ছাটিয়া কাটিয়া রাখিতেন।"

২২৬৫ হাদীছ ঃ— عَن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ

وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি ফেৎরতরূপে পাঁচটি কাজকে উল্লেখ করিয়াছেন—(১) খাৎনা বা মোসলমানী করা, (২) নাভির নীচে ক্ষুর ব্যবহার করা, (৩) মোচ কাটা, (৪) নখ কাটা, (৫) বগলের লোম উপরাইয়া ফেলা।

দাড়ি লম্বা রাখা

২২৬৬। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا

اللِّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِاعْتَمَرَ

قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ اَخَذَهُ -

অর্থ—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মোসলমানগণ! তোমরা কাফের-মোশরেকদের রীতি পরিহার করিয়া চলিও—তোমরা দাড়ি বেশী পরিমাণ রাখিও এবং মোচ যথা সম্ভব কাটিয়া ফেলিও।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন হজ্জ বা ওমরা সমাপ্ত করিতেন তখন (চুল কাটার সঙ্গে) দাড়িকে মুষ্ঠি বদ্ধ করিয়া মুষ্ঠির নীচে যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা কাটিয়া ফেলিতেন।

২২৬৭। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللُّحٰى -

অর্থ—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোচের বিলুপ্তি কর এবং দাড়িকে লম্বা হইতে দাও।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- এ সম্পর্কে আরও ছুইটি হাদীছ উল্লেখ যোগ্য—

(১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا

الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللُّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোচ ভালরূপে কাটিয়া ফেল এবং দাড়ি ঝুলাইয়া বা লট্‌কাইয়া রাখ—অগ্নি পূজকদের রীতি বর্জ্জন করিয়া চল। (মোসলেম শরীফ)

(২) عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ

الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ........

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দশটি কাজ ফেৎরতের মধ্যে শামিল—(১) মোচ কাটা। (২) দাড়ি লম্বা রাখা······(মোসলেম শরীফ)

'ফেৎরত' শব্দের ছুই অর্থ—(১) সৃষ্টিগত স্বভাব, যেই স্বভাবের উপর আল্লাহ তায়ালা মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (২) পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের চিরাচরিত রীতি। উভয় অর্থ দৃষ্টে উল্লেখিত হাদীছের মর্ম্ম এই যে, মোচ কাটা ও দাড়ি রাখা ইত্যাদি দশটি কার্য্যের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এই কাজগুলি সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক মানবের জন্য সৃষ্টিগত স্বভাবরূপে নির্দ্ধারিত। ইহার জন্য

ভিন্ন কোন দলীলের প্রয়োজন নাই। ক্ষুধা দুর করার জন্য আহার করা আবশ্যক, পিপাসা দুর করার জন্য পানি পান করা আবশ্যক; এই আবশ্যকতা প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হয় না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তদ্রূপ পুরুষের মোচ কাটা দাড়ি রাখা এমন একটি প্রয়োজনীয় কাজ যাহার প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্তে ভিন্ন কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যক হয় না। কিম্বা যেহেতু ইহা আল্লাহ প্রেরিত আদর্শ-মানব পয়গাম্বরগণের চিরাচরিত রীতি ও আদর্শ, তাই উহা পালনের জন্য আর কোন দলীল প্রমাণের আবশ্যক নাই।

পাঠক বর্গ! দাড়ি সম্পর্কীয় হাদীছ সমুহে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যনীয়। প্রথম এই যে—এই সব হাদীছে শুধু দাড়ি রাখার আদেশই নহে, বরং পূর্ণ এবং লম্বা দাড়ি রাখার আদেশ করা হইয়াছে। তিনটি শব্দের মাধ্যমে দাড়ি রাখার আদেশ হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে—(১) "اعفاء—এ'ফা" অর্থ চুল ইত্যাদিকে লম্বা হইতে দেওয়া—তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখা। (২) "ارخاء—এর্‌খা" অর্থ লট্‌কাইয়া বা ঝুলাইয়া রাখা। (৩) "توفير—তওফীর" অর্থ পূর্ণ ও বেশী হইতে দেওয়া।

উল্লেখিত শব্দ সমূহের মাধ্যমে দাড়ি রাখার আদেশের তাৎপর্য্য ইহাই যে, দাড়ি রাখিবে এবং উহাকে ছাটিয়া-কাটিয়া ছোট করিবে না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটি হাদীছ তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهٖ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا

হযরত নবী (দঃ) স্বীয় দাড়ির লম্বা দিক এবং পার্শ দিক হইতে কিছু অংশ ছাটিতেন। "من" শব্দটি আরবী ভাষার বিধান মতে স্পষ্টরূপেই বুঝাইতেছে যে, নগণ্য অংশই ছাটার মধ্যে আসিত। দাড়িকে সুবিন্যস্ত করার আবশ্যক পরিমাণই ছাটিতেন মাত্র, উহার অধিক নহে।

দাড়ি বেশী ও লম্বা এবং ঝুলাইয়া ও লট্‌কাইয়া রাখার আদেশের সঙ্গে কিছু অংশ ছাটার সামঞ্জস্যতা বিধান দৃষ্টে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকের দাড়ি উহার স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখিলে যতটুকু লম্বা হইবে উহার শুধু নগণ্য অংশ বাকি রাখার পন্থা অবলম্বন করা হইলে তাহা নিশ্চয়ই দাড়ি রাখার আদেশ সম্পর্কীয় প্রত্যেকটি হাদীছেরই বরখেলাফ হইবে।

তদুপরি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে যাঁহারা দেখিয়াছেন—যাঁহারা হযরতের আদর্শ অনুসরণে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সেই ছাহাবীগণের আমল ও নীতি এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ গণ্য হইবে। দাড়ি রাখার সীমা ও পরিমাণ

সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীর আমল যাহা শুধু গতানুগতিক ভাবে ছিল না, বরং সতর্কতা ও যত্নের সহিত সীমা নির্দ্ধারণরূপের ছিল—আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমল ২২৬৬নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি দাড়িকে মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া মুষ্ঠির নিম্নের অংশ ছাটিয়া ফেলিতেন। এইরূপ আমলই ওমর (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে। (ফত্‌হুল বারী ১০—২৮৮)

দ্বিতীয় লক্ষ্যনীয় বিষয়টি এই যে, দাড়িকে পূর্ণ ও লম্বা এবং লট্‌কাইয়া ও ঝুলাইয়া রাখার নির্দ্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এই রীতি ও নিয়ম পালনের মাধ্যমে তোমরা অমোসলেম মোশরেক ও মজুছীদের রীতি-নীতি পরিহার করিয়া চল। এই প্রসঙ্গে বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ তফছীর-কার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) লিখিয়াছেন, "তৎকালে মোশরেক মজুছীরা দাড়ি ছাটিয়া-কাটিয়া ছোট করিয়া রাখিত এবং তাহাদের কেহ কেহ দাড়ি সম্পূর্ণ কামাইয়াও ফেলিত। সুতরাং দাড়ি সম্পূর্ণ কামাইয়া ফেলা যেরূপ ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী তদরূপ দাড়িকে ছাটিয়া-কাটিয়া বিশেষ পরিমাণ হইতে ছোট করিয়া ফেলাও ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

খেজাব ব্যবহার করা

২২৬৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মওহাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে একটি পানির পেয়ালা দিয়া উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইল। (তাঁহার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় চুল একটি রৌপ্য কৌটায় সুরক্ষিত ছিল।) কোন লোকের উপর বদ-নজরের ক্রিয়া বা কোন রোগের আক্রমণ হইলে তাঁহার নিকট পানির পাত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকিত। (তিনি পানিতে ঐ চুল ডুবাইয়া দিতেন এবং রোগী আরোগ্য লাভের জন্য সেই পানি ব্যবহার করিত।) আমি সেই কৌটার মধ্যে তাকাইয়া দেখিয়াছি। চুল কয়টি লাল রঙ্গের ছিল।

২২৬৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبِغُوْنَ

فَخَالِفُوْهُمْ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদী-নাছারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাহাদের রীতি বর্জ্জন করিয়া চলিও।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে চুল দাড়ি রং করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই ; এতদৃষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং বা কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলিয়াছেন। কিন্তু মোসলেম শরীফের এক হাদীছে কালো খেজাব নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেমগণ উহাকে নাজায়েয বলিয়াছেন।

উভয় হাদীছের সামঞ্জস্য বিধান কল্পে এক শ্রেণীর আলেমগণ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব জুহরীর বিবৃতি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه
والاسنان تركناه

"আমরা কালো খেজাব ব্যবহার করিতাম যাবৎ চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হইত। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন আসিয়া যাইত এবং দাঁতও খসিয়া পড়িত তখন কালো খেজাব বর্জ্জন করিতাম।" (ফত্‌হুল বারী ২০—২৯২)

ছাহাবীগণের মধ্যে সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাছ (রাঃ) ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ) কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলিতেন।

চুল কাটা সম্পর্কে

২২৭০। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "কাযা" নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—"কাযা" ছেলে-মেয়েদের মাথার চুল কাটার এক প্রকার ফ্যাসন যাহা সেই কালে প্রচলিত ছিল। মাথার সম্মুখ ভাগে এবং দুই পার্শে তিন খণ্ড চুল রাখিয়া বাকি চুল কামাইয়া ফেলা হইত ; হযরত (দঃ) উহা নিষেধ করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য লাভের কতিপয় অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা

২২৭১। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লার লা'নৎ ঐ নারীদের প্রতি যাহারা মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করিয়া কেশের পরিমাণ বেশী দেখাইবার ব্যবস্থা অবলম্বনে সমাজকে প্রলুব্ধ করে কিম্বা নিজে উহা অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়। এবং আল্লার লা'নৎ ঐ নারীদের প্রতি যাহারা শরীরে চিত্র বা নাম উৎকীর্ণ করিয়া অঙ্কিত করার প্রতি সমাজকে প্রলুব্ধ করে কিম্বা নিজে উহা গ্রহণ করে।

২২৭২। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا

فَأَرَادُوا أَنْ يَّصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ

اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসিনী একটি মেয়ে বিবাহ হওয়ার পর সে রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার মাথার চুল উঠিয়া গেল। তাহার মুরব্বিগণ কৃত্রিম চুল মিশ্রনে তাহার মাথায় কেশ বেশী দেখাইবার ব্যবস্থাবলম্বনের ইচ্ছা করিয়া উহা সম্পর্কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা লা'নৎ করিয়াছেন ঐ নারীদের প্রতি যাহারা কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করিয়া মাথার কেশ অধিক দেখাইবার ব্যবস্থা গ্রহণে প্রলুব্ধ করে কিম্বা নিজে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২২৭৩। হাদীছঃ—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মহিলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার মেয়ের মাথায় এক প্রকার ঘা হইয়াছে যাহাতে তাহার মাথার চুল ঝরিয়া গিয়াছে। মেয়েটি আমার বিবাহিতা; তাহার মাথায় অন্যের চুল মিশাইয়া দিতে পারি কি? নবী (দঃ) বলিলেন, একজনের মাথার চুল অপর জনের মাথায় মিশাইবার কাজ যে করে এবং যাহার মাথায় মিশানো হয়—উভয়ের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ।

২২৭৪। হাদীছঃ— আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বীয় শাসনকালে হজ্জ উপলক্ষে মদীনা শরীফে আসিয়া একদা সর্ব্বসাধারণের সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহ রক্ষী পুলিশের হাতে

এক গুচ্ছ কৃত্রিম চুল ছিল, উহা তিনি নিজ হাতে লইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায়? (তাঁহারা এইরূপ বিষয়ে লোকদিগকে কেন নছিহত করে না?)

আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ইহা হইতে (অর্থাৎ কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা হইতে) নিষেধ করিতে শুনিয়াছি এবং ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, বনী-ইস্রাঈলদের নারীগণ যখন এই কৃত্রিম চুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিল তখনই তাহাদের ধ্বংস ও পতন আসিয়াছিল।

২২৭৫। হাদীছঃ— সায়ীদ ইবনে মোছাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) মদীনায় তাঁহার সর্ব্বশেষ ছফরে আসিয়া তিনি আমাদের মধ্যে ভাষণ দানকালে এক গুচ্ছ কৃত্রিম চুল হাতে নিয়া বলিয়াছিলেন, ইহুদীগণ ছাড়া অন্য কেহ ইহা ব্যবহার করে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না।

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ চুল ব্যবহার করাকে "মিথ্যা" আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছ সমূহে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে—(১) শরীরে চিত্র বা নাম উৎকীর্ণ ও অঙ্কিত করা, (২) কৃত্রিম উপায়ে মাথার কেশ বেশী করা। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একখানা হাদীছ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে—সেই হাদীছ খানা ইমাম বোখারী (রঃ) পুনঃ এস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছে অপর দুইটি বিষয়ও লা'নৎ এবং অভিশাপের কারণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—(৩) ললাট বা কপালের উর্দ্ধদেশে মাথার চুল উপড়াইয়া কপাল প্রশস্ত করা, (৪) রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘর্ষণ করতঃ দাঁত সরু করিয়া দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করা।

কোরআন-হাদীছে যে কার্য্যের প্রতি লা'নৎ বা অভিসাপের উল্লেখ হয় উহা অতি বড় গোনাহ গণ্য হইয়া থাকে। সে মতে শরীরে চিত্র বা নাম উৎকীর্ণ করা অতি বড় গোনাহ এবং ইহা কোন প্রকার পার্থক্য ও তারতম্য ব্যতিরেকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য বড় গোনাহ। ঐ গোনাহের তওবা সম্পন্ন হওয়ার জন্য উক্ত অঙ্কণ দুরীভুত করার সার্বিক চেষ্টা আবশ্যক। এমনকি শুধু অঙ্গহানি হইতে বাঁচিয়া ঘা ও জখমের মাধ্যমে হইলেও তাহা করিতে হইবে। (ফত্‌হুল বারী, ১০—৩০৬)

কৃত্রিম চুল ব্যবহার করাও বড় গোনাহ, কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ে তারতম্যের অবকাশ থাকায় সেই তারতম্যে ইমামগণের মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। কৃত্রিম চুল দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইল মানুষেরই ছিন্ন কেশ বা চুল, আর এক

হইল মানুষের চুল নয়, বরং অন্য কোন রঙ্গিন বস্তু। ইমাম মালেক (রঃ) উভয় প্রকারের বস্তুই আসল কেশের সহিত জড়াইয়া কৃত্রিম উপায়ে কেশ অধিক দেখানকে নাজায়েয বলিয়াছেন। ইমাম শাফী (রঃ) মানুষের ছিন্ন চুল মাথায় ব্যবহার করা সমানভাবেই নাজায়েয বলিয়াছেন, কিন্তু চুল ভিন্ন অন্য রঙ্গিন বস্তু কেশরূপে ব্যবহার করা বিবাহিতাদের পক্ষে জায়েয এবং অবিবাহিতাদের পক্ষে নাজায়েয বলিয়াছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, মানুষের ছিন্ন চুল হইলে তাহা উভয়ের জন্য নাজায়েয এবং চুল ভিন্ন অন্য জিনিষ হইলে তাহা উভয়ের জন্য জায়েয। (আওজাযুল্ মাছালেক, ৬—৩২৮)

সারকথা এইযে, কৃত্রিম চুল ব্যবহার করাকে আলোচ্য হাদীছে লা'নতের কারণ বলা হইয়াছে, এস্থলে মানুষের ছিন্ন চুল ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার উদ্দেশ্য, কিন্তু চুল ভিন্ন অন্য রঙ্গিন বস্তুও উহার অন্তর্ভুক্ত কি না—সে সম্পর্কে ইমামগণের মতানৈক্য আছে।

ললাট বা কপালের চুল উপড়ান এবং দাত ঘর্ষণকেও এক শ্রেণীর আলেমগণ আলোচ্য হাদীছের বাহ্যিক ব্যাপকতা দৃষ্টে ব্যাপক আকারেই বড় গোনাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন (ফতহুল বারী ১০—৩১০)। কোন কোন আলেম স্বামীর সম্মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশ এবং বেগানাদের সম্মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশের তারতম্য করিয়াছেন এবং আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুকে বেগানাদের উদ্দেশ্যের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। (ফতওয়া শামী ৫—৩২)।

পাঠক বর্গ! ফেক্কাহ্ শাস্ত্র হইল আইন ও বিধান পর্য্যায়ের বস্তু। তাই সেখানে উপস্থিত অপরাধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় এবং উল্লেখিত শাস্তির সহিত সেই অপরাধের সাধারণভাবে সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট না হইলে অপরাধকে কঠোরতম করার জন্য ভিন্ন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা হয়। পক্ষান্তরে কোরআন ও হাদীছে শুধু আইন ও বিধানের সাঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতেই কথা বলা হয় নাই, বরং পাক পবিত্র মানুষ ও পাক পবিত্র সমাজ গঠনের জন্য সুদুর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছ সমূহ উহারই নমুনা।

বিলাস বহুল প্রসাধনীর ছড়াছড়ি ও রূপ-সজ্জার এরূপ প্রবণতা যে, সৃষ্টিগত ভাবে যে জিনিষ লাভ হয় নাই কৃত্রিম উপায়ে হইলেও উহার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ ধরনের ছড়াছড়ি ও প্রবণতা অবশ্যই বেগানা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, ঐ হাদীছখানাকে ইমাম মোসলেম আলোচ্য হাদীছ সমূহের সংলগ্নে বর্ণনা করিয়া উল্লেখিত তথ্যটিই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

দুই শ্রেণীর জাহান্নামী লোক যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে মোসলেম সমাজে পরিদৃষ্ট হয় নাই, হযরতের যমানার পরে মোসলেম

সমাজেও তাহাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, উক্ত হাদীছে ঐ শ্রেণীদ্বয়ের বিবরণ দানে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনায় হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ

الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ

مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

দ্বিতীয় প্রকার জাহান্নামী "ঐ নারীগণ যাহারা কাপড় পরিহিতা অবস্থাও উলঙ্গ,* (রূপ-সজ্জা ও অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা) লোকদেরে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হয়। তাহাদের (কৃত্রিম কেশে বোঝাই কবরী-বিশিষ্ট) মাথা উটের কুঁজের ন্যায় দেখায়। তাহারা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না, এমনকি তাহারা বেহেশ্‌তের ঘ্রানও পাইবে না যাহা বহু বহু দুরের স্থান হইতেও পাওয়া যাওয়ার উপযোগী।"

কৃত্রিম রূপ-সজ্জার প্রবণতা যে, কেন উদয় হয় এবং সেই প্রবণতা যে, কত রকম অভিশাপময় নির্লজ্জ সাজ-গোজ জোগাইয়া আনে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা হযরত (দঃ) এই হাদীছে দিয়াছেন। এবং এই সূত্রেই যে অত্র পরিচ্ছেদের মূল হাদীছ সমূহে বর্ণিত কৃত্রিম সাজ-সজ্জাগুলি লা'নতের কারণ তাহা বুঝাইবার জন্যই ইমাম মোসলেম (রঃ) উক্ত হাদীছ সমূহের সংলগ্নে এই হাদীছটিকে উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাদের সম্মুখে বাস্তব রূপ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব সর্ব্বদা বিকশিত তাহাদেরকে দেখাইবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় না। হইলেও দুই চার বার মাত্র হইতে পারে; উহা অভ্যাসে পরিণত হয় না।

ধার করা কৃত্রিম উপায়ে হইলেও রূপ-সজ্জা ও অঙ্গ ভঙ্গির প্রদর্শণী করিতে হইবে এই প্রবণতা সমাজকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া নেয়। কারণ, প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য না হইলে কৃত্রিম রূপ-সজ্জার প্রবণতা আসিবে কেন? আর রূপ-সজ্জা প্রদর্শণীর প্রথম পদক্ষেপেই বে-পর্দ্দা বেহায়া নির্লজ্জ হইতে হইবে এবং এই পথে সমাজে জঘন্যতম ব্যভিচার ছড়াইবে যাহা সমাজের নৈতিক পতন। অধিকন্তু সময় সময় সমাজের নৈতিক পতনে আল্লাহ পাকের গজবের লীলা প্রকাশ পাইয়া সমাজের বাহ্যিক পতন তথা ধ্বংসও ঘটিয়া যায়। বনী-ইস্রাঈলদের নারীগণ কৃত্রিম

---

* "কাপড় পরিহিতা অবস্থায়ও উলঙ্গ" এই বাক্যে রূপ সজ্জার রূপসীদের নির্লজ্জ দৃশ্যকে সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। মিহি বস্ত্র পরিধান করা এবং আঁট-সাট পোশাক পরিয়া আকর্ষণীয় অঙ্গ সমূহের গঠণ ফুঠাইয়া তোলা উলঙ্গ হওয়ারই নামান্তর।

রূপ-সজ্জার প্রদর্শণীতে লিপ্ত হওয়ায় গোটা বনী-ইস্রাঈল সমাজের পতন ও ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছিল—সেই ইতিহাসের প্রতিও হযরত (দঃ) ২২৭৪ নং হাদীছে ইঙ্গিত দান করিয়াছেন।

সার কথা এই যে, কৃত্রিম রূপ-সজ্জায় মত্ত নারীগণ সাধারণতঃ উহা প্রদর্শণীর প্রবণতায় লিপ্ত থাকে। তাই আলোচ্য হাদীছসমূহে কোন প্রকার তারতম্য না করিয়া সমানভাবে ঐ শ্রেণীর নারীদের প্রতি লা'নৎ করা হইয়াছে এবং সমাজে যেন এই কৃত্রিম রূপ-সজ্জার সূত্রপাতই না হইতে পারে তাহার জন্য সতর্কতা-মূলকভাবে কঠোরতাই অবলম্বন করা হইয়াছে।

ফটো বা ছবি সম্পর্কে

২২৭৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) একদা মদীনার এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহের উপর দিক দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ছবি অঙ্কনকারী ছবি আঁকিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আমি নিজ কানে শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (ছবি অঙ্কনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া থাকেন—) আমি যেরূপ আকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকি যে ব্যক্তি উহার তুলনায় আকৃতি বানায় সেই ব্যক্তির ন্যায় অপরাধী আর কেহ নাই—এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা একটি ক্ষুদ্র দানা বা চীনা সৃষ্টি করুক ত দেখি!

২২৭৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (জীবের) ছবি বানাইবে কেয়ামতের কঠিন সময়ে তাহাকে বলা হইবে, এই ছবির মধ্যে আত্মা দান কর। সে তাহা কখনও পারিবে না, (ফলে আজাব ভোগ করিবে।)

ফটো বা ছবি প্রস্তুতকারীগণ আজাব ভোগ করিবে ঃ

২২৭৮। হাদীছ ঃ— قالت عائشة رضى الله تعالى عنها

قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِّى

عَلٰى سَهْوَةٍ لِّىْ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَتَكَهٗ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ

اللّٰهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি স্বীয় গৃহের তাকের উপর একটি পর্দ্দা লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলাম, ঐ পর্দ্দাটি ছবিযুক্ত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পর্দ্দাটিকে ফাড়িয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিগণ সর্ব্বাধিক কঠিন আজাব ভোগ করিবে যাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গুণ ও ছেফৎ—আকৃতি দান কার্য্যের তুলনা অবলম্বন করে। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, অতঃপর আমি ঐ পর্দ্দার খণ্ডগুলি দ্বারা গদি ও আসন তৈরী করিলাম।

২২৭৯। হাদীছ ঃ—মছরুক (রঃ) একদা এক ব্যক্তির ঘরের বারান্দায় ছবি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি—

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ

"নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তায়ালার নিকট তথা আখেরাতে সর্ব্বাধিক কঠিন আজাব ছবি তৈরীকারকদের হইবে।"

২২৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহারা কোন প্রাণীর ছবি তৈরী করে পরকালে তাহাদেরে আজাব ও শাস্তি দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা (দুনিয়াতে) যে সব আকৃতি বানাইয়াছিলে ঐ সবের মধ্যে আত্মা দান কর। (আত্মা দানে তাহারা অক্ষম, তাই আজাব ভোগ করিবে।)

ছবি প্রস্তুত ও অঙ্কনকারীদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ ঃ

দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৭২ নম্বরে যে হাদীছ খানা অনুদিত হইয়াছে উক্ত হাদীছ খানা ইমাম বোখারী (রঃ) অত্র পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার মধ্যে বিশেষরূপে এই বাক্যটি বর্ণিত আছে— ولعن المصور "রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছবি অঙ্কনকারীর প্রতি লানৎ বা অভিশাপ করিয়াছেন।"

ছবিযুক্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলা ঃ

২২৮১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের মধ্যে ছবিযুক্ত বস্তু রাখিতেন না; ঐরূপ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

পূর্ব্বে অনুদিত ২২৭৮ নং হাদীছটিও এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

ছবিযুক্ত বিছানায় না বসা এবং যে ঘরে ছবি আছে সেই ঘরে প্রবেশ না করা ঃ

২২৮২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একটি গদি বা আসন ক্রয় করিয়া আনিয়া গৃহে রাখিলেন, উহাতে ছবি ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের দরওয়াযায় পৌঁছিলেই তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পতিত হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন না, দরওয়াযায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার চেহারার রং পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন— আমি আরজ করিলাম, স্বীয় গোনাহ হইতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করিতেছি, আমার কসুর কি হইয়াছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, এই গদিটি কেন? আমি আরজ করিলাম, আপনি উহার উপর বসিবেন এবং বিছানারূপে ব্যবহার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع
الصور يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم -

"তুমি কি জাননা যে, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে ছবি থাকে এবং যে ব্যক্তি ছবি বানাইবে (আঁকিয়া বা যে কোন উপায়ে) তাহাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে এবং (তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ) বলা হইবে, যেই অকৃতি তুমি বানাইয়াছ উহার মধ্যে জীবন দান কর ত দেখি!

যে ঘরে ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না ঃ

২২৮৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত জিব্রিল (আঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করার অঙ্গিকার করিলেন। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন না। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন জিব্রিল (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার প্রতি মনক্ষুণ্ণতার কথা উল্লেখ করিলেন। জিব্রিল (আঃ) হযরতের নিকট বলিলেন, إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب

"আমরা কখনও প্রবেশ করি না ঐ গৃহে যেই গৃহে ছবি থাকে এবং ঐ গৃহেও না যেই গৃহে কুকুর থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ—এই ধরণের একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রিল (আঃ) কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময় সাক্ষাৎ করা সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ওয়াদা করিলেন। নির্দ্ধারিত ঐ সময় উপস্থিত হইল, কিন্তু জিব্রিল (আঃ) আসিলেন না। হযরত (দঃ) মনক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার বার্ত্তা বাহকগণ ত ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। অতঃপর খাটিয়ার নীচে একটি কুকুর শাবকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি (ঘৃণার স্বরে) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! এইটা ঘরে ঢুকিল কোন সময়? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন খোদার কসম—ইহার সম্পর্কে আমি কিছুই জ্ঞাত নহি।

হযরত (দঃ) তৎক্ষণাৎ উহাকে বাহির করার আদেশ করিলেন (এবং নিজ হস্তে পানি লইয়া ঐ স্থানটি ধৌত করিয়া দিলেন)। অতঃপর জিব্রিল আলাইহেচ্ছালামের সাক্ষাৎ হইল। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি সাকাৎ করিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, আমি সেই অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আসেন নাই। জিব্রিল (আঃ) বলিলেন, কুকুর-শাবকটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক ছিল।

“আমরা ঐ গৃহে প্রবেশ করি না যেই গৃহে কুকুর থাকে এবং ঐ গৃহেও না যেই গৃহে ছবি থাকে।

২২৮৪। **হাদীছ** ঃ— عن عبد الله انه سمع ابن عباس يقول

سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবু তাল্‌হা (রাঃ)-এর মুখে শুনিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না ঐ গৃহে যেই গৃহে কুকুর আছে এবং ঐ গৃহেও না যেই গৃহে চিত্র ও ছবি আছে।

ব্যাখ্যাঃ—“تماثيل—তামাছীল” শব্দটি বহু বচন, উহার এক বচন হইল “تمثال—তেমচাল”। কামুস্ ইত্যাদি আরবী অভিধান দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তেমছাল অর্থ صورة—সুরত অর্থাৎ ছবি—অঙ্কিত হউক যেমন চিত্র বা গঠিত হউক যেমন মূর্ত্তি। যাহারা সার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য কোন অর্থ করে তাহাদের মতামত আরবী অভিধান বিরোধী এবং নিম্নে বর্ণিত স্পষ্ট হাদীছের বিরোধী। এতদ্ভিন্ন ২২৭৮ এবং ২২৮২ নং হাদীছদ্বয়েরও বিরোধী।

২২৮৫। হাদীছ ঃ—বুস্‌র ইবনে সায়ীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং ওবায়দুল্লাহ (রঃ) আমাদের উভয়ের সম্মুখে ছাহাবী যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) ছাহাবী আবু তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ "যেই গৃহে ছবি আছে সেই গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"

বুস্‌র (রঃ) বলেন, যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) রোগাক্রান্ত হইলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ী গেলাম। তাঁহার গৃহে ছবিযুক্ত একটি পর্দা দেখিতে পাইলাম। তখন আমি আমার সঙ্গী ওবায়দুল্লাহকে বলিলাম, তিনি ত ছবি না রাখা সম্পর্কে আমাদিগকে হাদীছ শুনাইয়া ছিলেন।

এতচ্ছ্রবনে ওবায়দুল্লাহ (রঃ) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, উক্ত হাদীছে তিনি এই বাক্যও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কাপড়ের মধ্যে যদি গাছ-পালা কিম্বা লতা-পাতার ছবি থাকে তবে তাহা নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত।

মছআলাহ ঃ—কোন জীবের ছবি ভিন্ন গাছ-পালা, লতা-পাতা ইত্যাদির ছবি দূষণীয় নহে। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১৮ নং হাদীছ খানা সুস্পষ্ট প্রমাণ।

———

২১তম অধ্যায়

মানবীয় সভ্যতা বা ইসলামী আদর্শ

ইহা একটি বিরাট অধ্যায়। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) পৃথক একখানা কেতাবও লিখিয়াছেন, উহাতে তিনি এ সম্পর্কে বহু বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থেও যথেষ্ট বিষয়াবলী উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার অধিকাংশ বিষয়াবলী সম্পর্কীয় হাদীছেরই অনুবাদ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। যথা—মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। জেহাদে যাইতে হইলেও মাতা-পিতার অনুমতি লওয়া। মাতা-পিতার খেদমত করিয়া যাওয়া। মাতা-পিতার নাফরমানী কবিরা গোনাহ—উহা পরিহার করা। মাতা-পিতা অমোসলেম পৌত্তলিক হইলেও তাহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। মাতা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে তবুও তাহার খেদমত করা। অমোসলেম পৌত্তলিক ভ্রাতার প্রতিও সদ্ব্যবহার করা। রক্তের সংশ্রব আছে এমন আত্মীয়দের হক্‌ আদায় করা। ছোট শিশু অন্যের হইলেও তাহার বিরক্ত সহ্য করা এবং তাহাকে আদর-স্নেহ করা। শিশুকে কোলে বসান। শিশুকে উরুর উপর বসান। ঈমানের জযবায় পরিবার পরিজনের সঙ্গে মধুর জীবন-যাপন করা। অনাথ-বিধবাদের সাহায্যে তৎপর হওয়া। গরীব-মিছকীনদের সাহায্যে তৎপর হওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া করা। প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া যদিও সামান্য বস্তু হয়। প্রতিবেশীদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনে বাড়ীর সদর দরওয়াজার নিকটবর্ত্তিতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দান করা। সব রকম সদ্ব্যবহার অযাচিত ভাবে করা। সুচরিত্র ও দানশীলতা অবলম্বন করা এবং কৃপনতাকে ঘৃণা করা। প্রয়োজনীয় গৃহ-কার্য্য সম্পাদনে কুণ্ঠিত না হওয়া। লোক-জনের প্রীতি লাভ হইলে তাহা আল্লার দান গণ্য করা। কাহাকেও মহব্বৎ করা আল্লার মহব্বতে উদ্বুদ্ধ হইয়া। কাহারও পরিচয় দানে তাহার কোন অবস্থার উল্লেখ করা, কিন্তু তাহার কুৎসা বা নিন্দাজনক বিষয় উল্লেখ না করা। গীবৎ তথা কাহারও অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা দোষ বর্ণনা না করা। ভাল লোকের প্রশংসা করা। যাহাদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইবে তাহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। চোগলখোরী কবিরা গোনাহ—উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা। মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কাহারও দুর্ণাম রটিতে দেখিয়া তাহাকে সংবাদ দিয়া দেওয়া। সম্মুখে কাহারও প্রসংশা না করা। কাহারও প্রসংশায় ততটুকুই বলা যতটুকু জানা আছে।

যে কাজে কোন খারাপ বিষয়ের চর্চ্চা ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে উহা হইতে বিরত থাকা—চাই সেই খারাপ বিষয়ের সম্পর্ক কোন মোসলমানের সঙ্গে হউক বা কাফেরের সঙ্গে হউক। দ্বীনের কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাহারও সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বন্ধ করা। দ্বীনের ব্যাপারে অপরাধী ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করা। বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাওয়া। সাক্ষাতের জন্য যাইয়া (বন্ধুর মন রক্ষার্থে) তথায় খানা খাওয়া। আগন্তুকদের সহিত সাক্ষাৎ কালে ভাল লেবাছ-পোশাকের ব্যবস্থা করা। হাসিবার স্থলে মৃদু-হাসা। দুঃখ যাতনা এবং রাগে ও রোগে ধৈর্য্য ধারণ করা। (অযথা) কাহারও মুখের উপর তিরস্কান না করা। আল্লাহ বিরোধী কার্য্যের মোকাবিলায় ক্রোধান্বিত হওয়া এবং কঠোর হওয়া। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কোমলতা অবলম্বন করা। মেহমানের দাবী আছে—ইহা লক্ষ্য রাখা। মেহমানের জন্য পানাহারের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গৃহ স্বামীকে মেহমানদের সঙ্গে খাইবার অনুরোধ করা। কথাবার্ত্তায় বড়কে অগ্রাধিকার দান করা। কাল যুগ বা সময়কে দোষী না করা—উহাকে মন্দ না বলা। উত্তম নাম গ্রহণ করা। মন্দ নাম বর্জ্জন করা। মন্দ নাম থাকিলে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ভাল নাম রাখা। অশ্চার্য্যান্বিত হইলে সে স্থলে ছোবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহু আকবর বলা।

কাহারও গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে অনুমতি লাভের ভূমিকা গ্রহণ করা যথা—সালাম করা। সালাম আল্লাহ তায়ালার একটি নামও আছে সে মতে এই শব্দটির মর্য্যাদা দান করা। ছোট বড়কে সালাম করিবে। সালামের চর্চ্চা অধিক করা। পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা। গৃহভ্যন্তরে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর সালাম করা। প্রেরিত সালাম পৌঁছাইয়া দেওয়া। মোসলেম অমোসলেম মিলিত মজলিসেও মোসলমানদিগকে সালাম করা। কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির সহিত সালামের আদান প্রদান না করা যাবৎ না তাহার তওবার লক্ষণ প্রকাশ পায়—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, মদ্য পানকারীকে সালাম করিও না। অমোসলমদের সালামের উত্তরে সালাম ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন কায়দায় উত্তর প্রদান করা। দলীয় সর্দারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। মোছাফাহা করা। উভয় হস্তে মোছাফাহা করা—বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাম্মাদ ইবনে ফায়েদ সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও মোহাদ্দেছ আবদুল্লাহ ইবনে মোবাররকের সঙ্গে উভয় হস্তে মোছাফাহা করিয়াছিলেন। মোয়ানাকাহ করা। মুরুব্বির আহবানে সঙ্গে সঙ্গে নতশিরে সাড়া দেওয়া। মজলিসের মধ্যে কোন এক জনকে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে না বসা। কাহারও গোপন কথা প্রকাশ না করা। রাত্রি বেলা ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করা। বয়স বেশী হইয়া গেলেও খত্না করা। শরীয়তের কাজে বাধা সৃষ্টি করে এরূপ খেলা-ধূলা হইতে বিরত থাকা।

এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই সব পরিচ্ছেদে যে হাদীছ সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ঐ সব হাদীছের অনুবাদ বিভিন্ন স্থানে হইয়া গিয়াছে। উল্লেখিত বিষয়াবলী ছাড়া আলোচ্য অধ্যায়ে আরও কতিপয় বিষয় রহিয়াছে, হাদীছের অনুবাদের সহিত ঐ সবের বর্ণনা করা হইতেছে—

মাতার সহিত সর্ব্বাধিক সদ্ব্যবহার করা

২২৮৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহার পাইবার বেশী অধিকারী কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তারপরও তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) এইবারও বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তারপর? হযরত (দঃ) এইবার বলিলেন, তারপর তোমার পিতা।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায় সন্তানের উপর পিতার হক্ অপেক্ষা তিনগুণ বেশী হক্ মাতার।

মাতা-পিতাকে মন্দ না বলা

২২৮৭। হাদীছ ঃ—عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কবিরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাধিক বড় গোনাহ এই যে, মানুষ স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি লান-তান গালি-গালাজ করে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হে আল্লার রসুল! মানুষ নিজের মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে কি রূপে? হযরত (দঃ) বলিলেন, (সরাসরি নিজের মাতা-পিতার উপর গালি প্রয়োগ না করিলেও এইরূপ হইয়া থাকে) যে, একজন মানুষ অপর কোন মানুষের পিতাকে গালি দেয় ঐ ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) এই ব্যক্তির পিতাকে গালি দিয়া থাকে। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয় এবং সেই ব্যক্তি এই ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়।

● মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হইয়া থাকে। এই বিষয়ে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১১২৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

মাতা-পিতার অবাধ্যতা কবিরা গোনাহ

২২৮৮। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত--(১) আল্লার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া (৩) মিথ্যা কসম খাওয়া।

রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা

২২৮৯। **হাদীছ ঃ**— ان جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه

سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অর্থ—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আ:লাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, রক্তের সম্পর্ক রহিয়াছে ঐরূপ আত্মীয়দের আত্মীয়তা যে ব্যক্তি ছেদন করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

২২৯০। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ

لَهُ فِى رِزْقِهٖ وَاَنْ يُنْسَاَ لَهُ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার কামনা থাকে রিজিকের মধ্যে প্রশস্ততা লাভ করা এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম অর্জ্জন করা সে যেন ছেলা-রহমী করে তথা রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলে।

২২৯১। **হাদীছ ঃ**— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার খাহেস থাকে রিজিকে প্রশস্ততা লাভ করার এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম অর্জ্জন করার তাহাকে ছেলা-রহমী বজায় রাখিতে হইবে।

২২৯২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের রুহ্ পয়দা করিয়া সারিলে পর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা (আল্লার কুদরতে) আকৃতি ধারণ করিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল, মানুষ আমাকে

ছেদন করিবে তাহা হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে আমি রক্ষা-কবচ লাভের জন্য দাঁড়াইয়াছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তুমি কি আমার এই ঘোষনায় সন্তুষ্ট হইবে যে—যেই ব্যক্তি তোমাকে বজায় রাখিয়া চলিবে তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় থাকিবে এবং যেই ব্যক্তি তোমাকে ছেদন করিবে তাহার সঙ্গে আমি আমার সম্পর্ক ছেদন করিব? সে বলিল, হে পরওয়ারদেগার! এরূপ ঘোষনা হইলে নিশ্চয় আমি সন্তুষ্ট আছি। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তোমার জন্য আমি এই ঘোষনা বলবৎ করিয়া দিলাম।

২২৯৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ

اللّٰهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালার নাম) "রহ্‌মান" হইতেই "রাহেম" শব্দ (যাহার অর্থ—রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা) গৃহিত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াদিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিবে আমার রহমতের সম্পর্ক তাহার সহিত বজায় থাকিবে। আর যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্ককে ছেদন করিবে আমি তাহার সঙ্গে আমার রহমতের সম্পর্ক ছেদন করিব।

২২৯৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাহেম শব্দ (যাহার অর্থ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা; আল্লার নাম "রহমান"-এর) একটি শাখা; (তাই আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষনা—) যে ব্যক্তি উহাকে বজায় রাখিয়া চলিবে আমার রহমতের সম্পর্ক তাহার সঙ্গে বজায় থাকিবে, আর যে ব্যক্তি উহাকে কাটিয়া ফেলিবে তাহার হইতে আমার রহমতের সম্পর্ক কাটিয়া ফেলিব।

২২৯৫। হাদীছ ঃ—আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে এই কথা ঘোষনা করিতে শুনিয়াছি—

اِنَّ آلَ اَبِىْ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَائِىْ اِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আমার বাপ-দাদার বংশধর হওয়ার ভিত্তিতে কেহ আমার বন্ধু নহে, আমার বন্ধু হইলেন আল্লাহ এবং নেককার মোমেনগণ।" (তবে নবী (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন—)

অবশ্য বাপ-দাদার বংশধরদের সঙ্গে আমার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রহিয়াছে; আমি সেই আত্মীয়তার হক্ আদায় করিয়া যাইব।

প্রতিদানের দ্বারা আত্মীয়তার হক, আদায় হয় না

২২৯৬। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিদানের দ্বারা বস্তুতঃ আত্মীয়তা রক্ষাকারী গণ্য হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মীয়তা রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি যে আত্মীয়তা ছিন্নকারীর সঙ্গেও আত্মীয়তা জুড়িয়া রাখে।

সন্তান-সন্ততিকে আদর স্নেহ করা—চুমা দেওয়া বুকে জড়াইয়া ধরা

২২৯৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় শিশু পৌত্র হাসান (রাঃ)কে চুমা দিলেন। আক্‌রা' ইবনে হাবেস (রাঃ) নামক ছাহাবী তথায় উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন, আমার দশটি সন্তান আছে একটিকেও কোন দিন চুমা দেই নাই। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, من لا يرحم لا يرحم "যাহার অন্তরে রহম নাই আল্লার তরফ হইতেও তাহার প্রতি রহম হয় না।"

২২৯৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক বেদুইন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পৌঁছিল। সে বলিল, আপনারা শিশু-দেরে চুমা দিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু তাহা করি না। তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন—

اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اِذَا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

"আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরকে বে-রহম বানাইয়া দিয়া থাকিলে আমি কি কিছু করিতে পারি ?

২২৯৯। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কতিপয় যুদ্ধবন্দী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পৌঁছিল। তাহাদের মধ্যে একটি মহিলা ছিল তাহার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। সে তাহাদের দলের মধ্যে কোন শিশু দেখিলেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিত এবং বুকে তুলিয়া দুধ পান করাইত। (পুত্র-হারা মহিলাটি এইভাবে তাহার শিশু পুত্রকে খোঁজ করিতে ছিল, এমতাবস্থায় সে একটি শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিল এবং প্রাণ ভরিয়া দুধ পান করাইল। শিশুর প্রতি তাহার স্নেহ মমতার দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া) নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন ঃ—

أَتُرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِىَ تَقْدِرُ عَلٰى اَلَّا

تَطْرَحَهٗ فَقَالَ لَلّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا

"তোমরা কি ধারণা কর—এই মহিলাটি তাহার সন্তানকে আগুনে ফেলিয়া দিতে পারিবে ? ছাহাবীগণ সকলেই বলিলেন, না ফেলিবার অবকাশ থাকিলে সে কখনও ফেলিবে না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, খোদার কসম—এই মহিলাটি তাহার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহশীল। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বন্দাদের প্রতি তদপেক্ষা অনেক বেশী স্নেহশীল।"

খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান নিধন হইতে বিরত থাকা

২৩০০। ছাদীছ ঃ—عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ ! কোন গোনাহ সর্ব্বাধিক বড় ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা অথচ একমাত্র আল্লাহই তোমাকে স্বষ্টি করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তারপর কোন্টা ? হযরত (দঃ) বলিলেন, সন্তান বধ করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সঙ্গে খাইবে (এবং তাহাতে অভাব আসিয়া যাইবে।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপরে কোন্টা ? হযরত (দঃ) বলিলেন, (তোমার প্রতিবেশী যে স্বীয় আব্‌রু-ইজ্জৎ রক্ষার ব্যাপারে তোমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে—সেই) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।

ব্যাখ্যা ঃ— অভাবের ভয়ে সন্তান বধ করার অপরাধের ধারায় মূল অপরাধ প্রাণ বধ করা নহে। অপরাধের এই ধারাটি পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত রহিয়াছে। সেই আয়াতে প্রাণ বধ করার অপরাধ ভিন্ন ভাবে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অভাবের ভয়ে সন্তান বধ করার অপরাধ বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা—نحن نرزقهم واياكم "আমিই তাহাদের রেজেকের ব্যবস্থা করিব যেরূপ তোমাদের রেজেকের ব্যবস্থাও আমিই করিয়া থাকি" বলিয়া সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন যে,

এই অপরাধের ধারায় মুল অপরাধ হইল মানব সন্তানের জন্মে অভাবের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হওয়া, নতুবা উল্লেখিত বাক্যটি সংযোজনের কোন অর্থই হয় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "আয্‌ল তথা গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে বীর্য্যপাত জনন্দ্রিয়ের বাহিরে করা" পরিচ্ছেদে ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এতিমের লালন-পালন করা

২৩০১। হাদীছঃ— سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم فى الجنة

هكذا وقال باصبعيه السبابة والوسطى -

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় হস্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙ্গুলদ্বয়কে মিলিতভাবে দেখাইয়া বলিয়াছেন, আমি এবং অতিমের প্রতিপালনকারী বেহেশ্‌তের মধ্যে এইরূপে থাকিব।

অনাথ বিধবার সাহায্য করা

২৩০২। হাদীছঃ—ছাফওয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বিধবাদের এবং গরীবদের সাহায্য সহায়তাকারীর ছওয়াব ঐ ব্যক্তির সমান যে ব্যক্তি আল্লার পথে জেহাদে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে বা যে ব্যক্তি প্রতি দিন রোযা থাকে এবং প্রতি রাত্র নামায পড়িয়া কাটায়।

সকল মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা

২৩০৩। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতে ছিলাম, আমাদের সহিত এক গ্রাম্য ব্যক্তিও ছিল, সে নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে এইরূপ বলিল—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا

"হে আল্লাহ! আমাকে এবং মোহাম্মদ (দঃ)কে তোমার রহমত দান কর আমাদের সঙ্গে অন্য কাউকে শামিল করিও না।"

(সে মনে করিল যে, শরীকান বেশী হইলে ভাগে কম পড়িবে।) হযরত (দঃ) নামাযের সালামান্তে ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একটি সুপ্রশস্ত বস্তুকে তুমি সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছ। (অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে সকলকেই শরীক কর তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না, কারণ আল্লাহ তায়ালার রহমত ও দান অতি প্রশস্ত।)

২৩০৪। হাদীছ :— نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَرَاحُمِهِمْ

وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ

سَائِرُ جَسَدِهٖ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى

অর্থ—নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর দয়া ও কৃপা প্রদর্শনে এবং মায়া-মমতা প্রদর্শনে এবং একে অন্যের ব্যাথায় ব্যথিত হইয়া সাহায্যে ছুটিয়া আসার ব্যাপারে একটি দেহের ন্যায় হইতে হইবে। একটি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হইলে দেহের সমূদয় অঙ্গেই নিদ্রাহীনতা ও জ্বর আসিয়া যায়।

২৩০৫। হাদীছ :— جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

অর্থ—জরীর ইবনে আবছুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (আল্লার বন্দাদের প্রতি) দয়া না করে তাহার প্রতি (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) দয়া করা হয় না।

প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করা

২৩০৬। হাদীছ :— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ

حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা জিব্রিল ফেরেশতা (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) আমার উপর চাপ দিয়া আসিতেছেন, এমনকি আমার ধারণা হইল—প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বা উত্তরাধীকারী সাব্যস্ত করিয়া দিবেন।

২৩০৭। হাদীছ :—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতেও ঐরূপ বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিবেশীর

সহিত সদ্ব্যবহারের জন্য জিব্রিল ফেরেশ্‌তা সর্ব্বদা আমাকে চাপ দিয়া আসিতেছেন, এমনকি আমার ধারণা হইল, প্রতিবেশীকে ওয়ারেস সাব্যস্ত করিয়া দিবেন।

প্রতিবেশীর কোন অশান্তি সৃষ্টি না করা

২৩০৮। হাদীছ ঃ– আবু শোরায়হ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া উঠিলেন—

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ

"খোদার কসম সে মোমেন নহে, খোদার কসম সে মোমেন নহে, খোদার কসম সে মোমেন নহে। হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ ব্যক্তি ইয়া রসুলাল্লাহ। হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহার দ্বারা অশান্তির ভয় হইতে নিরাপদ নহে।

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া

২৩০৯। হাদীছ ঃ—আবু শোরায়হ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিজ চক্ষুদ্বয় দ্বারা তাকাইয়া আছি এমতাবস্থায় আমার নিজ কানে আমি হযরত (দঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ جَائِزَتَهٗ قِيْلَ وَمَا جَائِزَتُهٗ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ قَالَ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ
فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْدَهٗ حَتّٰى يُحْرِجَهٗ) وَمَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

"যে ব্যক্তি আল্লার উপর ঈমান রাখে এবং আখেরাতের সমুদয় বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে তাহার কর্ত্তব্য হইবে প্রতিবেশীকে সম্মান করা। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ঈমান রাখে এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাহার কর্ত্তব্য হইবে মেহমানকে সম্মান করা যাবৎ মেহমান আদর আপ্যায়ন পাইবার অধিকারী। হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার সীমা কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, এক দিন এক রাত্র, (এই সময়ে মেহমানকে সাধ্যানুযায়ী বিশেষ সমাদর করিতে হইবে।

মেহমান ইহার অধিক অবস্থান করিলে) তিন দিন পর্য্যন্ত সাধারণ জেয়াফৎ বা মেজবানীর ন্যায় ব্যবস্থাই যথেষ্ট হইবে। এর অতিরিক্ত অবস্থান করিলে তখনকার পানাহার মেহমানকে দান-খয়রাত করার ন্যায় গণ্য হইবে। আর মেহমানের জন্য এত দিন অবস্থান করা হালাল হইবে না যাহাতে গৃহস্বামী কষ্ট বোধ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ঈমান রাখিবে এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে ভাল কথা বলা নতুবা চুপ থাকা।

২৩১০। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাহার কর্ত্তব্য হইবে মেহমানকে সমাদর করা। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমান রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে ভাল কথা বলা কিম্বা চুপ থাকা।

প্রতিটি ভাল ব্যবহারে ও ভাল কথায় দান-খয়রাতের ছওয়াব হয়

২৩১১। হাদীছ:— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেকটি ভাল কথায় ও ভাল ব্যবহারে দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।

মিষ্ট ভাষী হওয়া

আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিষ্ট ভাষী হওয়া দান-খয়রাত করার সমতুল্য নেক কাজ।

২৩১২। হাদীছ:— আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোযখের উল্লেখ পূর্ব্বক উহা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং দোযখের ভয়ঙ্কর অবস্থার

আলোচনায় তাঁহার চেহারা মোবারক কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। হযরত (দঃ) দুই তিন বার ঐরূপ করিলেন, তারপর বলিলেন—

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"শুধু মাত্র এক খণ্ড খুরমা দান-খয়রাত করার সামর্থ থাকিলে তাহা করিয়াও দোযখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর। যদি ততটুকু সামর্থ্যও না থাকে তবে অন্ততঃ মিষ্ট ভাষী হইয়া সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখ।

প্রত্যেক কাজে নম্রতা অবলম্বন করা

২৩১৩। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দল ইহুদী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হইল এবং তাহারা (সালাম করার সুরে) বলিল, السام عليكم (আস্‌সামু আ'লাইকুম— বলিল যাহার অর্থ হইল—তোমার মৃত্যু আসুক)।

আয়শা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাদের কথা যথার্থরূপে ধরিয়া ফেলিলাম, তাই আমি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রোধের সহিত বলিলাম, عليكم السام واللعنة "তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক এবং লা'নত বর্ষিত হউক।" রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ

"হে আয়েশা। ক্ষান্ত ও শান্ত হও ; সর্ব্বক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা কোমলতাকে পছন্দ করেন।"

আয়শা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ। আপনি শুনিয়াছেন কি—তাহারা কি বলিয়াছে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও সমুচিত উত্তর দিয়াছি— আমি বলিয়াছি, عليكم "যে জিনিষ আমার উপর আসিবার জন্য বলিয়াছ তাহা তোমাদের উপর পতিত হউক।"

(হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার কথা তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবে, তাহাদের কথা আমার উপর ক্রিয়া করিবে না। (মোছলেম শরীফ)

মোসলমানদের পরস্পর সাহায্যকারী হওয়া

২৩১৪। **হাদীছঃ**—আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ

"মোমেনগণ পরস্পর পোক্ত ইমারত ইত্যাদির ন্যায়, যাহার এক অংশ অপর অংশের শক্তি যোগাইয়া থাকে—এক অংশ অপর অংশকে মজবুৎ করিয়া থাকে। অতঃপর হযরত (দঃ) এক হাতের আঙ্গুল সমুহ অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেখাইলেন। অর্থাৎ ইমারতের গাথুনিতে এক ইট অপর ইটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইটসমূহ যেভাবে পরস্পর সাহায্যকারীরূপে একত্রিত হয় এবং মজবুৎ দেয়াল বা ইমারতে পরিণত হয়। মোমেনগণকে সেইরূপ হইতে হইবে।

ভাল কাজে সুপারিশ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً

سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করিবে সে ঐ ভাল কাজের ছওয়াব হইতে এক অংশের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করিবে সেই খারাপ কাজের গোনাহের এক বোঝা তাহাকেও বহন করিতে হইবে।"

২৩১৫। হাদীছঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন ভিক্ষুক বা সাহায্য প্রার্থনাকারী আসিলে তিনি নিকটস্থ লোকদিকে বলিতেন—

اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهٖ مَا شَاءَ

"এই ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া সম্পর্কে আল্লার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তিনি স্বীয় রসুলের (আমার) মুখে বলাইবেন, কিন্তু তোমরা তাহার জন্য আমার নিকট সুপারিশ কর—সর্ব্বাবস্থায়ই তোমরা তাহাতে ছওয়াব পাইবে।"

গালি-গালাজ ও বদ-মেযাজী হইতে বিরত থাকা

২৩১৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিল। হযরত (দঃ) দুর হইতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, এই লোকটি কতই না জঘন্য। অতঃপর সে হযরতের নিকট আসিয়া বসিলে হযরত (দঃ) তাহার সঙ্গে সহাস্যে মিশিলেন এবং উদার ও কোমল ব্যবহার দেখাইলেন। ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ার পর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! দুর হইতে লোকটিকে দেখিয়া আপনি

তাহার সম্পর্কে এই এই বলিয়াছেন অতঃপর তাহার সঙ্গে সহাস্যে মিশিলেন এবং উদার ব্যবহার দেখাইলেন! হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি আমাকে বদ-মেযাজ গালি-গালাজকারী কখনও দেখিয়াছ কি? হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهٖ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি জঘন্য গণ্য হইবে ঐ ব্যক্তি যাহার বদ-মেযাজীর ভয়ে মানুষ তাহার সঙ্গে মেলামেশা করে না।"

ব্যাখ্যা ঃ—মূল ঘটনা সম্পর্কিত ব্যক্তি জগন্য শ্রেণীর মোনাফেক ছিল। তাহার প্রকৃত অবস্থা লোকদিগকে জ্ঞাত করার প্রয়োজনে তাহার খারাবি ও মন্দ দিকটা প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে ব্যবহারে উদারতা অবলম্বন করা হইয়াছে—ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল স্বভাব ছিল। অন্যথায় সে এবং তাহার নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য লোকও হযরত (দঃ)কে বদ-মেযাজ গণ্য করিয়া তাঁহার হইতে দূরে থাকিত—ইহা আল্লার নিকট অপছন্দনীয়।

কাহারও প্রতি ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ না করা

আল্লাহ তায়ালা পাক কালামে বলিয়াছেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের কেহ কাহারও প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবে না; হইতে পারে—যাহার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হইতেছে, (আল্লাহ তায়ালার নিকট) তাহার মর্য্যাদা বিদ্রূপকারী অপেক্ষা অধিক। তোমাদের নারীগণকেও বিশেষরূপে নিষেধ করা হইতেছে—তাহারাও একে অন্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবে না; যাহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে (আল্লাহ তায়ালার নিকট) তাহার মর্য্যাদা বিদ্রূপকারিনী অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। আর তোমরা পরস্পর খোটা দিয়া বা কটাক্ষপাত করিয়া কথা বলিবে না এবং কাহারও প্রতি কুৎসাজনক খেতাবী নাম প্রয়োগ করিবে না।

এই সব ফাছেকী কাজ, ঈমানদার হওয়ার পর ফাছেকী কার্য্যের নাম-নিশান থাকাও অতি জঘন্য। যাহারা এই শ্রেণীর কার্য্য হইতে তওবা না করিবে তাহারা মহাপাপী ও অন্যায়কারী। (২৬ পারা—ছুরা হুজ্‌রাত ১ রুকু)

২৩১৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যম্‌আ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—কেহ যেন কাহারও প্রতি ঐরূপ বস্তুর দরুণ না হাঁসে যে বস্তু তাহা হইতেও প্রকাশ হইয়া থাকে। (যেমন, কাহারও বায়ু নির্গত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাঁসাহাঁসি করা চাই না; বায়ু সকলেরই নির্গত হয়।)

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কেহ স্বীয় স্ত্রীকে উট বা গরু-ছাগলের ন্যায় কিরূপে মার-ধর করে ? অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই আবার তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিতে হয়।

কাহারও প্রতি কু-উক্তি না করা

২৩১৮। হাদীছ ঃ— عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ

وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ

অর্থ—আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে— তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাছেক বা কাফের বলিলে যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ফাছেক কাফের না হয় তবে অবশ্যই ফাছেক কাফের হওয়ার সমতুল্য গোনাহ সেই ব্যক্তির উপর পড়িবে যে বলিয়াছে।

চোগলখোরী না করা

"এক জনের নামে কোন কথা অন্য এক জনের নিকট লাগান" ইহাকেই চোগলখোরী বলে। ইমাম বোখারী (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কবিরা গোনাহ।

২৩১৯। হাদীছ ঃ—হাম্মাম ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ছিলাম, এক ব্যক্তির নামে তাঁহার নিকট অভিযোগ করা হইল যে, সে খলিফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট লোকদের নামে দুর্ণাম করিয়া থাকে। সেই উপলক্ষে হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন—

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না।"

দুমুখা হওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা চাই

২৩২০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

عِنْدَ اللّٰهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَاْتِى هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্ব্বনিকৃষ্ট মানুষ ঐ ব্যক্তিকে দেখিবে যে ব্যক্তি এক দলের সম্মুখে এক ধরণের কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গি নিয়া আসে এবং অপর দলের সম্মুখে অন্য ধরণের কথাবার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গি নিয়া যায়।

সন্দেহ পোষণ ও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে বিরত থাকা

২৩২১। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ

الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا

تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সন্দেহ করা হইতে বিরত থাক ; কারণ, সন্দেহ (অবাস্তব হইলে তাহা) নিশ্চয় মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। লোকদের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইও না এবং লোকদের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিয়া বেড়াইও না। কাহারও প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখিও না। পরস্পর বিচ্ছেদ ভাব প্রদর্শন করিও না। তোমরা সকলে ভাই ভাই এক আল্লার বন্দারূপ ধারণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ—কাহারও প্রতি অহেতুক ও ভিত্তিহীন সন্দেহ পোষণ করা না-জায়েয। আর বিভিন্ন কার্য্য-কলাপ ও আলামত বা নিদর্শন পাওয়ার সন্দেহ আসিয়া গেলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত সন্দেহ পর্য্যায়ের বিষয়কে মুখে বলা বা কার্য্যে ও আচরণে প্রকাশ করা না-জায়েয।

অবশ্য কাহারও সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাহার মুরব্বিকে তাহার সন্দেহ জনক আচরণের সংবাদ দেওয়া বা কোন দুষ্কৃতিকারীর দুষ্কৃতি হইতে অন্য লোকদেরকে বাঁচাইবার জন্য তাহার সন্দেহ জনক আচরণ লোকদেরকে জ্ঞাত করা জায়েয আছে। এইরূপ স্থলে জায়েয হওয়ার অবকাশ বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াচেন এবং এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন—

২৩২২। হাদীছ :— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ

مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا - وَقَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই জন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা আমাদের দ্বীন-ইসলামের কোনো কিছু জানে বলিয়া আমার ধারণা হয় না।

লায়ছ নামক বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, ঐ দুই ব্যক্তি মোনাফেক ছিল।

ব্যাখ্যা :— ফত্‌হুলবারী কেতাবে উক্ত হাদীছ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, এই ধারণা ও সন্দেহ না-জায়েয পর্য্যায়ের নহে। কারণ, এস্থলে ঐ মোনাফেক ব্যক্তিদ্বয়ের দুষ্কৃতি হইতে লোকদিগকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাহাদের অবস্থা প্রকাশ করা হইলাছিল। না-জায়েয সন্দেহ হইল শুধু নিন্দা করার জন্য কাহারও সম্পর্কে সন্দেহ করা বা সন্দেহের কথা প্রকাশ করা।

২৩২৩। হাদীছ :— قال انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا

وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ

اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও প্রতি কেহ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে না, কাহারও প্রতি কেহ হিংসা করিবে না, পরস্পর বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন আচরণ করিবে না। তোমরা সকলে এক আল্লার বান্দা—ভাই ভাই হইয়া থাকিবে। কোন মোসলমানের পক্ষে জায়েয হইবে না যে, স্বীয় মোসলমান ভাই হইতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করতঃ তিন

দিনের বেশী সালাম-কালাম বন্ধ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ মানবীয় দুর্ব্বলতার দরুণ মনোবেদনা হজম করা অসহনীয় হইলে তিন দিনের জন্য উহার প্রতিক্রিয়া ধারণ জায়েয আছে, কিন্তু তিন দিনের অতিরিক্ত নহে।)

কোন গোনাহ করিলে তাহা লোকদের নিকট বলিয়া বেড়াইবে না

২৩২৪। **ছাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের প্রত্যেকই ক্ষমার্হ। কিন্তু ঐ লোকদের গোনাহ মাফ করা হইবে না যাহারা গোনাহ্ করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ তায়ালার ভয় হইতে নির্ভীক ও নির্ভয় হওয়ার বড় পরিচয় হইল ইহা যে, কোন ব্যক্তি হয়ত রাত্রি বেলা কোন গোনাহ বা অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার সেই অপকর্ম্মকে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আল্লার তরফ হইতে হয় নাই, ফলে উহা গুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে নিজেই ভোর বেলা লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায় যে, আজ রাত্রে আমি এই এই করিয়াছি।

(অপকর্ম্ম ও গোনাহ করার পর অন্তরে অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টির আবশ্যক ছিল এবং আল্লাহ তায়ালা যে, তাহাকে পাপের অবস্থায় পাকড়াও করিয়া লোক সমক্ষে অপমানিত করেন নাই, তাহাকে তওবা করার সুযোগ দিয়াছেন—ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার কর্ত্তব্য ছিল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু সে উল্টা —) আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়কে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন সে তাহা ফাঁস করিয়া দিতেছে।

অহঙ্কারী হইবে না

২৩২৫। **হাদীছ**ঃ— عن حارثة بن وهب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر

অর্থ—হারেছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে বেহেশতী লোকদের পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি— তাঁহারা হয় নম্র স্বভাবের, লোকদের নিকটও নম্র বলিয়া পরিগণিত। (নম্রতার দরুণ দুর্ব্বল দেখাইলেও আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা এত বড় মর্ত্তবাওয়ালা যে—)

আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ হইবে বলিয়া কসম খাইয়া বসিলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার কসম কার্য্যে পরিণত করিয়া দিয়া থাকেন।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, তোমাদিগকে দোযখী লোকদের পরিচয়ও বলিয়া দিব—তাহারা হয় কঠোর স্বভাবের অহঙ্কারী।

২৩২৬। ছাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতই কোমল প্রকৃতির ছিলেন যে, মদীনাবাসী কোন একজন ক্রীতদাসীও তাহার সাহায্যের জন্য হযরত (দঃ)কে হাত ধরিয়া নিয়া যাইতে চাহিলে তিনি তাহার উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছিয়া যাইতেন।

কোনও মোসলমান ভাই হইতে বিচ্ছেদ-ভাব অবলম্বন করিবে না

২৩২৭। ছাদীছ ঃ— عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ

اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا

وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ـ

অর্থ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা জায়েয নহে যে, স্বীয় মোসলমান ভাই হইতে সম্পর্ক ছেদন অবস্থায় তিন দিনের অধিককাল অতিক্রম করে—উভয়ের সাক্ষাৎ হইলেও একে অপর হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। তাহাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট উত্তম পরিগণিত হইবে যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ করিয়া প্রথমে অপর জনকে সালাম করে।

কাহারও বাড়ি বেড়াইতে গেলে তাহার গৃহে আহার গ্রহণ করা

২৩২৮। ছাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক মদীনাবাসী ছাহাবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তিনি আহারও করিলেন। অতঃপর যখন তথা হইতে চলিয়া আসার ইচ্ছা করিলেন তখন ঐ গৃহের এক স্থানে বিছানার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। সেমতে একটি চাটাই সামান্য ধৌত করিয়া তথায় বিছান হইল। হযরত (দঃ) উহার উপর নামায পড়িলেন এবং ঐ গৃহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন।

সত্যবাদী হইবে, মিথ্যা হইতে বিরত থাকিবে

২৩২৯। ছাদীছ :— عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدى الى البر

وان البر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكون

صديقا وان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى

النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ـ

অর্থ—আবছুল্লা ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সত্যবাদিতা নেক আমলের প্রতি পরিচালিত করে এবং নেক আমল মানুষকে বেহেশতে পৌছায়। নিশ্চয় মানুষ সত্যের উপর অবিচল থাকিয়া সত্যবাদী আখ্যা লাভ করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ মানুষকে দোযখে পৌছায়। নিশ্চয় মানুষ মিথ্যায় অভ্যস্ত হইয়া আল্লার দরবারে মিথ্যাবাদী বলিয়া লিখিত হইয়া যায়।

আদর্শবান হওয়া কর্ত্তব্য

২৩৩০। ছাদীছ :—আবছুল্লা ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্ব্বোত্তম বাণী হইল আল্লার কেতাব কোরআন শরীফ এবং সর্ব্বোত্তম আদর্শ হইল, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ।

অন্যের ছুর্ব্যবহারের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

"ধৈর্য্য অবলম্বনকারীগণকে বেহিসাব প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে।"

২৩৩১। ছাদীছ :—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যাথাদায়ক ছুর্ব্যবহারের উপর ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ তায়ালার ন্যায় কেহ করিতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ তায়ালার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে তাহাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা পানাহার দান করেন, সুখে-সুস্থতায় রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্যের ব্যথাদানের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা ইহা মহান আল্লাহ তায়ালার গুণ। মানুষের কর্ত্তব্য এই গুণে গুণান্বিত হওয়ায় যত্নবান হওয়া।

কোন মোসলমানকে কাফের বলিবে না

২৩৩২। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার মোসলমান ভাইকে কাফের বলিলে উহার পরিণতি উভয়ের এক জনের উপর অবশ্যই বর্ত্তিবে।

২৩৩৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার মোসলমান ভাইকে কাফের বলিলে উহার পরিণতি তাহাদের উভয়ের এক জনের উপর অবশ্যই বর্ত্তিবে।

অর্থাৎ—যাহাকে কাফের বলা হইয়াছে সে যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই সেইরূপ হইয়া থাকে তবে ত কাফের শব্দ প্রয়োগকারীর কথা ঠিকই হইয়া গেল, অন্যথায় ঐরূপ বলার অতি বড় গোনাহ যে বলিয়াছে তাহার উপর পতিত হইবে।

ক্রোধ সংবরণ করা

২৩৩৪। হাদীছ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ

اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মল্ল যুদ্ধে বিজয়ী প্রকৃত বীর পুরুষ নহে, প্রকৃত বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখিতে সক্ষম হয়।

২৩৩৫। হাদীছ ঃ – আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমাকে কিছু নছিহত করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ক্রোধ হইতে বিরত থাক। ঐ ব্যক্তি বার বার নছিহত করার অনুরোধ করিতে ছিল হযরত (দঃ) বার বারই তাহাকে বলিতে ছিলেন—لا تغضب "ক্রোধ হইতে বিরত থাক।"

লজ্জা-শরম অবলম্বন করা

২৩৩৬। হাদীছ ঃ— এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে; একদা তিনি এই হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "লজ্জা-শরম সম্পূর্ণই কল্যাণময়।"

ইহা শুনিয়া বোশায়র ইবনে কায়াব নামক এক ব্যক্তি বলিল, দর্শন শাস্ত্রে লিখিত আছে—কোন কোন লজ্জা-শরমে মানুষের মধ্যে গাম্ভীর্য্যের গুণ সৃষ্টি হয়, কোন কোন লজ্জা-শরমে মানুষের মধ্যে ধীরস্থিরতার গুণ সৃষ্টি হয় (আবার কোন কোন লজ্জা-শরমে মানুষের মধ্যে দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়।)

এই ব্যক্তির উক্তিতে ছাহাবী এমরান (রাঃ) ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লার রসুলের কথা শুনাইতেছি, আর তুমি উহার মোকাবিলায় (মানব রচিত) দর্শন পুস্তকের কথা দেখাইতেছ ?

অর্থাৎ—আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের কথা ও উক্তি যে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে সেস্থানে উহার উপরই চূড়ান্ত মিমাংসা হইবে। অন্য কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা চলিবে না। অন্য কোন কিছু উহার বিরোধী হইলে তাহা বর্জ্জনীয় ও লঙ্ঘনীয় হইবে এবং বুঝিতে হইবে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উক্তির বিরুদ্ধে যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই ভুল। যেমন আলোচ্য বিষয়ে সেই ভুলটা সহজে ধরাও যায়। কেননা লজ্জা-শরম এমন একটা গুণের নাম যাহা মানুষেন জন্য অন্যায় বা অশোভনীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বা অন্য যে কোন প্রভাবে ন্যায় ও কর্তব্য কাজে বাধা বা সৎ সাহসের অভাব সৃষ্টি হইলে তাহা লজ্জা-শরমের আওতাভুক্ত নহে, বরং উহা নিছক দুর্ব্বলতা (Inferiarify complex)।

সাধারণ প্রচলিত দৃষ্টিতে হয়ত ইহাকেও লজ্জা-শরম বলা হয় এবং সেই সূত্রেই হয়ত আলোচ্য ঘটনায় দর্শন পুস্তকের উদ্ধৃতিতে কোন কোন "লজ্জা-শরমে দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়" বলা হইয়াছে, কিন্তু এই দর্শনের ভিত্তি হইল প্রচলিত ভুলের উপর। আর আল্লার রসুল যাহা বলিয়াছেন তাহাই হইল সঠিক, সত্য ও বাস্তব।

২৩৩৭। হাদীছঃ— আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই তথ্যটি পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদের হইতেও বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে যে, কাহারও লজ্জা-শরম রহিত হইয়া গেলে সে প্রবৃত্তির বশে সব কিছুই করিতে পারে।

সহজ পন্থা অবলম্বন করা ও কঠিন পন্থা এড়াইয়া চলা

২৩৩৮। হাদীছঃ— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا سَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, লোকদের জন্য সহজ সরল পন্থা অবলম্বর কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন

করিও না। লোকদের মধ্যে শান্তি ও আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা কর, ঘৃনা ও অনাস্তা সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ পন্থা অবলম্বন করিও না।

ব্যাখ্যা :—দ্বীনের প্রতি আহ্বান ও তব্‌লীগের ব্যাপারে এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম প্রয়োগ ও প্রবর্ত্তন তথা ইসলামী বিধি-নিষেধের দ্বারা শাসন পরিচালন সম্পর্কে উল্লেখিত আদেশগুলি করা হইয়াছে। তব্‌লীগের সময় দ্বীনকে লোকদের সম্মুখে এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিবে যাহাতে লোকেরা দ্বীনকে সহজ ও সরল মনে করে কঠিন বোধ না করে। তদ্রূপ ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনকালে দ্বীনের অনুশাসনগুলি লোকদের উপর যথা সাধ্য সহজ ও সরল পন্থায় প্রয়োগ করিবে, কঠিন পন্থায় নহে। দ্বীনের বিষয়গুলি লোকদিগকে বুঝাইতে এবং তাহাদের উপর উহা প্রয়োগ করিতে এরূপ পন্থা ও ব্যাবস্থা অবলম্বন করিবে যাহাতে লোকগণ দ্বীনকে শান্তির বস্তু বোধ করে, দ্বীনের প্রতি তাহাদের ঘৃনা না জন্মে।

বলা বাহুল্য, দ্বীনের হুকুম-আহকাম পূর্ণরূপে জারী করার জন্যই এই সব ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ; সুতরাং যদি এই সব নির্দ্দেশের পরিপ্রেক্ষীতে দ্বীনের হুকুম-আহ্কামের ছাট-কাট করা হয় তবে তাহা বোকামিই হইবে। যেমন, যদি কোন মিকচার ঔষধে তিক্ত অংশ থাকে, তবে শিশু রোগীকে উহা সহজে খাওয়াইবার জন্য নানারূপের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, কিন্তু সহজ করার জন্য তিক্ত অংশকে বাদ দেওয়া হয় না।

দ্বীনের হুকুম পালন করা আবশ্যক, কিন্তু উহা পালন করাইতে সহজ পন্থা ছাড়িয়া কঠিন পন্থা অবলম্বন করা এবং সেই কঠিন পন্থা লোকদের উপর চাপাইয়া দেওয়া মোটেই সমীচীন নহে। ইহাই উল্লেখিত হাদীছের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য। উহারই একটি নজীর নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

২৩৩৯। ছাদীছ :—আযরাক ইবনে কায়েছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা একটি শুষ্ক খালের কিনারায় নামায পড়িতে ছিলাম। ঐ সময় ছাহাবী আবু বরযা (রাঃ) একটি ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া তথায় পৌছিলেন এবং ঘোড়াটি রাখিয়া তিনিও নামাযে শরীক হইলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার ঘোড়াটি ছুটিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নামায ছাড়িয়া ঘোড়ার পিছনে ছুঠিলেন এবং উহাকে ধরিয়া আনিলেন। অতঃপর পুনরায় নামায পড়িয়া নিলেন।

আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। সে ছাহাবী আবু বরযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, ঐ বৃদ্ধ মিঞাকে দেখ—তিনি ঘোড়ার জন্য নামায ছাড়িয়া দিয়াছেন। আবু বরযা (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হযরত রসুলুল্লা (দঃ) দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেহ আমাকে কোন বিষয়ে মালামত করে নাই। (উপস্থিত ঘটনার কটাক্ষকারী অযথা কঠোরতার দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিয়াছে।) আমার বাড়ী অনেক দুরে ; আমি নামায

ভঙ্গ না করিলে আমার ঘোড়া আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইত। ফলে আমি সারা রাত্রেও বাড়ী পৌছিতে সক্ষম হইতাম না। অতঃপর আবু বরযা (রাঃ) উল্লেখ করিলেন, তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহবতে ও সাহচর্য্যে রহিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) দ্বীনের ব্যাপারে সরল ও সহজ পন্থা অবলম্বনের কত বেশী পক্ষপাতি ছিলেন।

ব্যাখ্যা :—নামায আদায় করা ফরজ উহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে, কিন্তু এই নামায আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতাও অবলম্বন করা যায় যে, যে কোন প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভয়-ভীতির আশঙ্কাই হউক না কেন কোন অবস্থাতেই নামায ভঙ্গ করিয়া যাওয়া যাইবে না। আবার সহজ পন্থাও অবলম্বন করা যায় যে, ক্ষয়-খতি বা পেরেশানী হইতে পারে এইরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইলে নামায ভঙ্গ করতঃ সেই কাজ সমাধা করিয়া অতঃপর পুনঃ নামায আদায় করিবে। শরীয়তের মাছআলাহ দ্বিতীয় ব্যবস্থাকেই অনুমোদন করে এবং মূল পরিচ্ছেদে বর্ণিত সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য ইহাই।

লোকদের সঙ্গে মেলামেশা রাখিবে

আবদুল্লাহ ইবনে মস্‌উদ (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকদের সঙ্গে মেলামেশা রাখিও, কিন্তু তোমার দ্বীনকে তাহাদের দ্বারা ঘায়েল হইতে দিওনা। অর্থাৎ মেলামেশা বা বন্ধুত্বের খাতিরে বা চাপে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে শরীক হইও না।

২৩৪০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেও অত্যধিক মেলামেশা রাখিতেন। এমনকি আবু ওমায়ের নামে আমার একটি ছোট ভ্রাতা ছিল ; সে একটি নোগায়ের পাখী পোষিয়া রাখিয়া ছিল। একদা পাখীটি মরিয়া গেলে হযরত (দঃ) আমার ভ্রাতাকে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু ওমায়ের তোমার নোগায়ের কি হইল ?

২৩৪১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল—তাহাদের সঙ্গে আমি নেকড়ার তৈরী খেলার বউ দ্বারা খেলা-ধুলা করিতাম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলে আমার বান্ধবীগণ দৌড়িয়া পালাইত। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে খোঁজ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন ; আমরা পুনঃ খেলা আরম্ভ করিতাম।

অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে

২৩৪২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি এক ছিদ্র হইতে দুইবার দংশিত হয় না।

অর্থাৎ মোমেনের জন্য হুশিয়ার হওয়া এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। একবার এক স্থানে ধোকা খাইলে পুনরায় তথায় ধোকা খাইবে না।

মেহমানকে খাতির আপ্যায়ণ করিবে

২৩৪৩। হাদীছ ঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি আমাদিগকে কোথাও কোন প্রয়োজনে পাঠাইয়া থাকেন, পথি মধ্যে আমরা কোন লোকেদের মেহমান হইতে বাধ্য হই, কিন্তু তাহারা আমাদের মেহমানদারী করে না, এরূপস্থলে আমাদিগকে কি করার পরামর্শ দেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা ঠেকায় পড়িয়া কোন লোকদের মেহমান হইলে যদি তাহারা তোমাদের মেহমানদারী করে তবে ত তাহা সাদরে গ্রহণ কর। আর যদি তাহারা তোমাদের প্রয়োজন পুরন না করে, তবে মেহমানের জন্য সাধারণভাবে যে পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণ সামগ্রী তাহাদের নিকট হইতে উসুল কর।

ব্যাখ্যা ঃ—মেহমানের খাতির আপ্যায়ণ করা যে, কতদুর জরুরী ও আবশ্যক সে সম্পর্কে "প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া" পরিচ্ছেদে দুই খানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে সেই আবশ্যকতাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উহা মেহমানের জন্য গৃহস্বামীর উপর একটি প্রাপ্য হক্ স্বরূপ—যাহা তাহাকে আদায় করিতেই হইবে। যদি কোন গৃহস্বামী ঐ হক্ আদায় না করে এবং বিদেশী মেহমান প্রাণ বাঁচাইতে লাচার হইয়া পড়ে তবে সে ঐ হক্ উসুল করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

অবাঞ্ছিত কাব্য বর্জ্জন করিবে; জ্ঞান ও নছিহতের কাব্য জায়েয আছে

কবিগণ সাধারণতঃ যে সব অবাঞ্ছিত কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে উহারই নিন্দা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ -

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

"কাব্যের পথের পথিক ভ্রষ্ট লোকগণই হইতে পারে ; দেখ না ! তাহারা কিরূপে সর্ব্বপ্রকার কল্পনার ময়দানে দুরদুরান্তের দিকে ছুটিয়া বেড়ায়। কথায় যাহা বলে কার্য্যে তাহা কিছুই করে না, অবশ্য যাহারা পাকা ইমানদার নেককার, আল্লাহকে স্মরণ রাখায় অভ্যস্ত এবং মজলুম হইয়া অপবাদের প্রতিউত্তরে কবিতা রচনা করে (তাহারা সাধারণতঃ ঐ সব নিন্দনীয় স্বভাব সমুহ এড়াইয়া চলিয়া থাকে ; তাই তাদের কাব্য জায়েয পরিগণিত হইবে।)

২৩৪৪। **হাদীছ** :— ان ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه اخبره

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

অর্থ—উবাই ইবনে কায়াব(রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন কাব্যে জ্ঞানের কথাও থাকে (উহা দুষনীয় নহে)।

২৩৪৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অন্ধকার যুগের "লবীদ" নামক একজন কবি যিনি পরে মোসলমানও হইয়াছিলেন তাহার কাব্যের প্রসংশা করিয়া) বলিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে বড়ই সত্য কথা বলিয়াছে লবীদ—

الا كل شئ ما خلا الله باطل — (وكل نعيم لا محالة زائل)

"নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী (এবং যত প্রকার ভোগ-বিলাসের সামগ্রীই থাকুক সবই বিদায় গ্রহণকারী।)"

হযরত (দঃ) অন্ধকার যুগের আরও একজন কবি উমাইয়্যা ইবনে ছল্তের কাব্যেরও প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, তাহার কাব্য ইসলামী ভাবধারার খুবই নিকটবর্ত্তী ছিল।

২৩৪৬। হাদীছ :—ওরওয়াহ্ (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (আরবেয় কাফেররা যখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কুৎসা রটাইয়া কবিতা ছড়াইতে লাগিল তখন) ছাহাবী কবি হাচ্ছান (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উহার প্রতিউত্তরে কাফেরদের দুর্ণামে কবিতা রচনার অনুমতি চাহিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মক্কার কাফেররা আমারই বংশধর—তাহাদের দুর্ণাম করিয়া আমাকে কিরূপে বাঁচাইবে ? হাচ্ছান (রাঃ) বলিলেন, কাব্যের মধ্যে কৌশলে আপনাকে এমনভাবে দুর্ণাম হইতে বাহির করিয়া নিব যেরূপ রুটি তৈরীর আটার মধ্যে একটা চুল থাকিলে সেই চুলটিকে আটা হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, উহার গায়ে একটুও আটা জড়ান থাকে না।

ওরওয়াহ্ (রঃ) বলেন, একদা আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বসিয়া হাচ্ছান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কোন বিষয়ে মন্দ বলিতে ছিলাম।

আয়েশা (রাঃ) আমাকে তাহাতে বাধা দিলেন এবং বলিলেন, হাচ্ছান (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে কাফেরদের কুৎসা রটানোর প্রতিউত্তর দানে উহা প্রতিহত করিতেন; (ইহা হাচ্ছানের একটি বিশেষ কীর্ত্তি।)

২৩৪৭। হাদীছ:— আবু হোরায়রা (রাঃ) একদা তাঁহার ওয়াজের মধ্যে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লেখ করতঃ বলিলেন, একদা হযরত নবী (দঃ) ছাহাবী কবি আবদুল্লা ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রসংশা করিয়া বলিলেন, তোমাদের এক ভাই আছে সে কবিতার মধ্যে অশ্লীল কথা বলে না, তাহার কবিতা এই শ্রেণীর—

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهٗ — اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٗ

"আমাদের মধ্যে আল্লার রসুল বিদ্যমান রহিয়াছেন যিনি অন্ধকার চিরিয়া প্রভাতের আলো ফুটিয়া বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লার কেতাব তেলাওয়াতে দাঁড়াইয়া যান (ফজরের নামাযের মধ্যে।)

اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا — بِهٖ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٗ

"তিনি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া হেদায়েতের পথ দেখাইয়াছেন; ফলে অন্তর হইতে আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি যে, তিনি যাহা কিছু বলেন সবই বাস্তব।"

يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهٗ عَنْ فِرَاشِهٖ — اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

"মানুষের মধুর নিদ্রার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গের সময় উপস্থিত হয়—কাফেরদের শয্যা যখন তাহাদের বোঝায় ভারাক্রান্ত থাকে সেই সময় আল্লার রসুলের দেহ তাঁহার শয্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।"

২৩৪৮। হাদীছ:—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মদীনায় ইহুদী গোত্র বনী-কোরায়জার নজীরহীন বিশ্বাস-ঘাতকতার বিরুদ্ধে সমর অভিযানকালে) হাচ্ছান (রাঃ)কে বলিলেন, এই বিশ্বাসঘাতক কাফেরদের দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা কর; ফেরেশ্তা জিব্রাঈল (আঃ) তোমার সাহায্যে আছেন।

আল্লার জেকের, এলম শিক্ষা, কোরআন তেলাওত ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া কবিতায় মগ্ন হইবে না

২৩৪৯। ছাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلى جوف احدكم

قيحا خير له من ان يمتلى شعرا

অর্থ--আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও অভ্যন্তর কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা পূঁজে পরিপূর্ণ হওয়া উত্তম।

২৩৫০। ছাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمتلى جوف الرجل

قيحا حتى يريه خير من ان يمتلى شعرا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও অভ্যন্তর পূঁজে পরিপূর্ণ হইয়া পঁচিয়া যাউক ইহাও কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

আল্লার মহব্বতে অপরকে মহব্বৎ করা

২৩৫১। ছাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি লোক রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাস্থলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি নেককার শ্রেণীর লোকদেরে ভালবাসে, কিন্তু আমলের দিক দিয়া সে ব্যক্তি ঐ লোকদের সম শ্রেণীর হইতে পারে নাই—এরূপ ব্যাক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

"তহুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন— المرء مع من احب "কোন ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোকদেরকে ভালবাসিবে কেয়ামতের দিন সে তাহাদের সঙ্গী হইবে।"

২৩৫২। ছাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল—ঐরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে যে নেককার শ্রেণীর লোকদেরে ভালবাসে, কিন্তু আমলের দিক দিয়া সে তাহাদের সম শ্রেণীর হইতে পারে নাই। তহুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, (কেয়ামতের দিন) মানুষ ঐ শ্রেণীর লোকদের দলভুক্ত হইবে যে শ্রেণীর লোককে সে ভালবাসে।

২৩৫৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেয়ামত কবে আসিবে? হযরত (দঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি করিয়াছ? উত্তরে লোকটি আরজ করিল—অধিক নামায, রোযা, দান-খয়রাতের দ্বারা কেয়ামতের জন্য প্রস্তুতি করিতে পারি নাই, কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের মহব্বৎকে মজবুতরূপে আঁকড়াইয়া আছি। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহাদেরকে ভালবাস পরকালে তুমি তাহাদেরই দলভুক্ত হইবে।

আনাছ (রাঃ) বলেন, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের জন্যও কি এই নিয়ম? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তোমরাও তদ্রূপই। আমরা এই কথা শুনিতে পাইয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলাম।

আনাছ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত (দঃ) মুল জিজ্ঞাসা— কেয়ামত কবে আসিবে এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিলেন যে, ছাহাবী মুগিরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ছেলে—আমার সম বয়স্ক বালক নিকট দিয়া যাইতে ছিল। তাহার প্রতি ইশারা করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, এই বালকটি বাঁচিয়া থাকিলে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই (তোমাদের) কেয়ামত আসিয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ভালবাসা সম্পর্কে যে নিয়ম এই হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে তাহা ছাহাবীদের জন্য অত্যধিক আনন্দের কারণ হইয়াছিল; যেহেতু ছাহাবীদের মহব্বৎ ছিল আল্লার রসুলের সঙ্গে। তদ্রূপ ছাহাবা, তাবেয়ীন তাবে-তাবেয়ীন প্রভৃতি নেককার শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে যাহাদের ভালবাসা থাকিবে তাহাদের জন্যও এই হাদীছের তথ্যটি আনন্দের বস্তু। পক্ষান্তরে যাহারা ইসলামের দাবীদার হইয়া ইহুদ-নাছারা শ্রেণীর লোকদের প্রতি ভালবাসা রাখিবে তাহাদের জন্য এই তথ্য ভয়াবহও বটে।

কেয়ামত কায়েম হওয়া সম্পর্কে যে তথ্য হযরত (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন উহার ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তাহার মৃত্যু হইতেই কেয়ামত কায়েম হইয়া যায়। সেমতে আলোচ্য হাদীছের মুল প্রশ্নকারী ব্যক্তির বয়স এবং উপস্থিত লোকদের বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত (দঃ) একটি বালকের সঙ্গে তুলনা করতঃ বলিলেন, এই বালকটি বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তোমাদের কেয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। কারণ, এই বালকটির বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান বয়স্কদের মৃত্যু অবধারিত।

কথাবার্ত্তায় অশুভ বাক্য ব্যবহার করিবে না

অন্যের প্রতি দূরের কথা, নিজের বেলায়ও অশুভ অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই।

২৩৫৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এইরূপ বলিবে না যে, আমার

মন-মেজাজ খবিস হইয়া গিয়াছে। হাঁ—(মন-মেজাজ ভাল না লাগিলে) এইরূপ বলিবে যে, আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

কাল, যুগ বা সময়কে গালি দিবে না

২৩৫৫। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান যুগ ও সময়কে গালি দেয়। অথচ সময়ে ও যুগে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা আমিই ঘটাইয়া থাকি। (সুতরাং কাহারও উপর কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে সে যদি উহার জন্য সময়কে গালি দেয় তবে সেই গালি আমার উপর পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন সময় আমারই সৃষ্ট—) দিবা রাত্রির গমনাগমন আমারই কুদরতে হয় (এবং ইহারই নাম সময়।)

খারাব জিনিসকে ভাল নামের আখ্যা দিবে না

ঘৃণার যোগ্য খারাব জিনিষের উপর ভাল আখ্যা প্রয়োগ করা হইলে সমাজের মধ্যে ঐ জিনিষের প্রতি ঘৃণা থাকে না, ফলে মানুষ উহাতে লিপ্ত হয় এবং উহাকে খারাবও মনে করে না—ইহা অতি ভয়ঙ্কর ; হালাল-হারামের ক্ষেত্রে এইরূপ হইলে ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। যথা—অধুনা সূদকে ইন্টারেষ্ট বা "লাভ" বলা হয়। তদ্রূপ লটারি জাতীয় জুয়াকে "পুরস্কার" বলা হয়। ইহা অতিশয় ভয়ঙ্কর ; সূদ এবং জুয়া অকাট্য হারাম—পবিত্র কোরআনে উহাকে হারাম ঘোষনা করা হইয়াছে। এই হারাম বস্তুদ্বয়কে "লাভ" ও "পুরস্কার" আখ্যা দেওয়ায় ইহার প্রতি মোসলমান সমাজেরও ঘৃণা থাকে না। এমনকি উক্ত আখ্যার কারণে ইহা যে, হারাম তাহাও ধ্যান-ধারণায় থাকে না। অথচ হারামকে হালাল গণ্য করিলে ঈমান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়।

অন্ধকার যুগে কাফেররা "মদ" কে অতিশয় ভালবাসিত এবং ভালবাসার প্রতীক-রূপে মদকে এবং মদের মূল উৎস আঙ্গুরকে "করম" নামে আখ্যায়িত করিত। "করম" শব্দের অর্থ "সম্মানে বিজয়ী"; এই আখ্যার দ্বারা মদের সুনাম সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং উহার প্রতি ঘৃণা থাকে না। তাই ইসলামে মদকে হারাম করা হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) মদের জন্য ঐ নামের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়া দিলেন। আদর্শ জাতি গঠনে লক্ষ্য কত সূক্ষ্ম রাখিতে হয়!

২৩৫৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মোসলমানগণ! তোমরা আঙ্গুরকে (এবং আঙ্গুরের রসে তৈরী মদকে) "করম" নামের আখ্যা দিও না। লোকেরা উহাকে "করম" বলে, কিন্তু (এই ঘৃণিত হারাম বস্তু এই উত্তম নামের যোগ্য নহে। বস্তুতঃ) এই নামের যোগ্য মোমেনের দেল (যাহা ঈমান রত্নের পাত্র)।

আর (কোন কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া) যুগ বা যমানা ধ্বংস হউক—এরূপ বলিও না। কারণ, যুগ বা যমানায় যাহা কিছু ঘটে তাহা এক মাত্র আল্লাহ তায়ালাই ঘটাইয়া থাকেন।

ভাল অর্থের নাম রাখিবে

২৩৫৭। হাদীছ ঃ—মোছাইয়্যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার নাম "হাযান" (যাহার অর্থ শক্ত বা কঠিন)। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার নাম "সাহ্‌ল" (যাহার অর্থ নম্র)। তিনি বলিলেন, আমার বাবা আমার যে নাম রাখিয়াছেন সেই নাম আমি পরিবর্ত্তন করিতে চাই না। মোছাইয়্যেব-পুত্র সায়ীদ (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত নামের পরিণামে আমাদের সকলের মধ্যে কাঠিন্য রহিয়াছে।

নাম পরিবর্ত্তন করা

২৩৫৮। হাদীছ ঃ—আবু ওসাইদ (রাঃ) তাঁহার শিশু পুত্রকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে উপস্থিত করিয়া হযরতের উরুর উপর রাখিলেন। হযরত (দঃ) শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে নাম বলা হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, বরং তাহার নাম "মোনজের" রাখ। সেই দিন হইতে তাহার নাম মোনজের হইয়া গেল।

২৩৫৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি মেয়ের নাম ছিল "বার্‌রাহ" (যাহার অর্থ গোনাহ হইতে পাক পবিত্র)। লোকেরা বলিত, সে উক্ত নামের দ্বারা নিজের গর্ব প্রকাশ করে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "যয়নব" রাখিলেন (যাহার অর্থ মোটা-তাজা)।

নবীগণের নামে নাম রাখা

২৩৬০। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটি ছেলে হইল, আমি তাহাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলাম। নবী (দঃ) তাহার নাম রাখিলেন ইব্রাহীম এবং খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখে দিলেন, তাহার মঙ্গলের জন্য দোয়াও করিলেন।

খারাব নাম

২৩৬১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে (হিসাব নিকাশের সময়) আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ ব্যাক্তির নাম নাপছন্দ গণ্য হইবে যে ব্যক্তি "রাজাধিরাজ" নাম অবলম্বন করে।

ব্যাখ্যা ঃ—"সকল বাদশার বাদশাহ" বস্তুতঃ এই আখ্যার যোগ্য একমাত্র মহান আল্লাহ। এইরূপ আখ্যা যে ব্যক্তি নিজে অবলম্বন করে নিশ্চয় সে অতি বড় অহঙ্কারী, তাই সে আল্লাহ তায়ালার কোপের পাত্র।

বৃথা ঢিল ছোড়িবে না

২৩৬২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বৃথা ঢিল ছোড়িতে দেখিয়া নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বৃথা ঢিল ছোড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা শিকার করা বা শত্রুকে ঘায়েল করা যায় না; অথচ অনেক ক্ষেত্রে কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে বা চোখে আঘাত লাগায়।

অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকেই আর একদিন ঢিল ছোড়িতে দেখিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে হাদীছ শুনাইলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঢিল ছোড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, ; আর তুমি ঢিল ছোড়িয়া থাক। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলিব না।

হাঁছিদাতা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ বলিবে

২৩৬৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দুই ব্যক্তি হাঁছি প্রদান করিল। হযরত (দঃ) তন্মধ্যে একজনের জন্য "ইয়ারহামু-কাল্লাহ্—আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজিল করুন" বলিয়া দোয়া করিলেন, অপর জনের জন্য তাহা করিলেন না। হযরতের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ ব্যক্তি "আলাহাম্‌দু লিল্লাহ" বলিয়াছে (তাই তাহাকে দোয়া করিয়াছি) আর এই ব্যক্তি তাহা বলে নাই।

হাই দেওয়া ভাল নয়

২৩৬৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ

التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ اَنْ يُّشَمِّتَهٗ

وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهٗ مَا اسْتَطَاعَ فَاِذَا

قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা (বন্দাদের পক্ষে) হাঁছি দেওয়াকে পছন্দ করেন এবং হাই দেওয়াকে নাপছন্দ করেন। হাঁছিদাতা আলহামদু লিল্লাহ্ বলিলে যে কোন মোসলমান তাহা শুনিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে সেই হাঁছিদাতাকে "ইয়ারহামু কাল্লাহ" বলিয়া দোয়া করা। পক্ষান্তরে হাই দিতে দেখিলে শয়তান সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং হাই আসিতে চাহিলে যথা সাধ্য উহার প্রতিরোধ করিবে। হাই আসার সঙ্গে মুখ বড়রূপে খুলিয়া হা……করিয়া আওয়াজ করিলে তাহাতে শয়তান আদম-সন্তানের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—হাঁছি মানুষের মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, শরীরের মধ্যে ফূর্ত্তি আনয়ন করে; ইহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা উহাকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই জড়তা ও অলসতার পরিচয় যাহা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই আল্লাহ তায়ালা উহাকে নাপছন্দ করেন, আর শয়তান উহাতে সন্তুষ্ট হয়।

হাঁছি দাতার সঙ্গে দোয়ার আদান প্রদান

২৩৬৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل

الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك

الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ হাঁছি দিলে তাহার কর্ত্তব্য হইবে "আলহামদু লিল্লাহ" বলা এবং অপর মোসলমান ভাই-এর কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে "ইয়ারহামু কাল্লাহ—আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজেল করুন" বলিয়া দোয়া করা। এই দোয়ার উত্তরে হাঁছিদাতা তাহার জন্য দোয়া করিবে—ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছলেহা বালাকুম —আল্লাহ তোমাকে সৎপথের পথিক করুন এবং সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি দান করুন।

কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

وتسلموا على اهلها - ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون -

"হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে প্রবেশ করিও না যাবৎ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং প্রথমে গৃহবাসীকে সালাম কর। এই ব্যবস্থা তোমাদের জন্য উত্তম; তোমাদের উচিৎ এই ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।" (১৮ পারা ৯ রুকু)

সালাম দানের নিয়ম

২৩৬৬। হাদীছ ঃ— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পায়ে হাটিয়া যাইতেছে তাহাকে সালাম করিবে যে যান-বাহনের আরোহী। এবং যে ব্যক্তি বসিয়া আছে তাহাকে সালাম করিবে যে হাটিয়া যাইতেছে। আর ছোট দল সালাম করিবে বড় দলকে।

২৩৬৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছোট বড়কে সালাম করিবে। পথচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম করিবে এবং ছোট দল বড় দলকে সালাম করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে সালাম প্রাপ্তির সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে। এই নিয়মের বিপরীত—সালাম পাওয়ার হক্‌দার ব্যক্তি যদি প্রথমে সালাম দেয় তবে উহা তাহার জন্য অধিক সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

নারীদের জন্য পর্দা ব্যবস্থা

পর্দা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য শক্তি ব্যয় করা অবান্তর। কারণ পাক-পবিত্র, শান্তি ও শৃঙ্খলাময় সমাজ গঠনে পর্দা ব্যবস্থার সুফল, বরং প্রয়োজন জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। এমনকি ইসলামের প্রভাবে এই সুব্যবস্থা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যেই ইউরোপবাসী এই ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিবার যুক্তি ও প্রেরণা মোসলমানদের মধ্যে রপ্তানী করিয়া ছিল তাহাদেরও কোন কোন সুস্থ মস্তিষ্ক

সম্পন্ন ব্যক্তি পর্দ্দা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ঐ ইউরোপবাসীদের শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশীয় অনেকে নিজেদের ছেলে-মেয়ে ও পরিবারবর্গের মধ্যে পর্দ্দাহীনতায় সৃষ্ট শত শত লজ্জা ও অপমানের ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও যদি পর্দ্দার যৌক্তিকতা উপলব্ধি না করে তবে তাহাদেরই দুর্ভাগ্য।

যাহাদের যুক্তি ও আইনে অবিবাহিত যুবক যুবতির অবৈধরূপে হইলেও স্বীয় যৌন পিপাসা নিবারণ করা এবং যে কোন নারীর সম্মতির সহিত তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করা অপরাধ নহে তাহাদের হইতে পর্দ্দা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধির আশা করা অবান্তর। সুতরাং যুক্তি তর্কের পথে না যাইয়া এস্থলে শুধু আল্লার আইন এবং রসুলের আদর্শের ভিত্তিতেই পর্দ্দা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হইবে।

পর্দ্দা ব্যবহার বিরুদ্ধবাদীদের দৌরাত্ম এতই অধিক যে, তাহাদের মুখে অনেক সময় এইরূপ দাবীও শুনা যায় যে, কোরআন-হাদীছে পর্দ্দা-বিধানের অস্তিত্ব নাই। এইরূপ মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদেই ইমাম বোখারী (রঃ) এই আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদটিকে "পর্দ্দা ব্যবস্থার আয়াত" শিরনামা দিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ইহা দ্বারা দেখাইতে চাহেন যে, কোরআন শরীফে সুদীর্ঘ একখানা আয়াত রহিয়াছে যাহাকে আয়াতে-হেজাব বা পর্দ্দা-বিধানের আয়াত বলা হয়। অর্থাৎ ঐ আয়াতখানা নাযেলই হইয়া ছিল পর্দ্দার বিধান প্রবর্ত্তনের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن

وَرَاءِ حِجَابٍ - ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"হে মোমেনগণ! নবীর গৃহে তোমরা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিও না। অবশ্য খানার দাওয়াত (ইত্যাদি) উপলক্ষে অনুমতি প্রাপ্তে প্রবেশ করিতে পার, কিন্তু এমন ভাবে নয় যে, খানা তৈয়ার হওয়ার পূর্ব্বেই অপেক্ষমানরূপে যাইয়া বসিয়া থাক। হাঁ—খানার প্রতি আহ্বান পাইলে পর গৃহে প্রবেশ করিও। অতঃপর খানা খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তথা হইতে চলিয়া আসিও ; তথায় কথা বার্ত্তায় লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিও না। ঐ সবের দ্বারা নবী (দঃ) বিব্রত ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তোমাদের সঙ্গে লজ্জা বোধে কিছু বলেন না। (নবী (দঃ) ত নিজ সম্পর্কীয় ব্যাপার হওয়ায় এখানে কিছু বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন,) কিন্তু হক্ কথা বলিয়া দিতে আল্লাহ তায়ালা কোন দ্বিধা বোধ করেন না, তাই তিনি পরিস্কার বলিয়া দিলেন।

আর এখন হইতে নবীর বিবিগণের (সম্মুখে যাওয়া বা বিনা প্রয়োজনে কথা বলা ত দূরের কথা, তাঁহাদের) নিকট কোন আবশ্যকীয় বস্তু চাহিতে হইলেও পর্দ্দার

আড়াল হইতে চাহিবা। নারী ও পুরুষের মন পাক-সাফ থাকার পক্ষে এই ব্যবস্থাই অধিক কার্য্যকরী।” (২২ পারা ৪ রুকু)

এই আয়াতকে ছাহাবীগণের যুগ হইতেই “আয়াতে-হেজাব” বা পর্দ্দা-বিধানের আয়াত বলা হইয়া থাকে। ওমর (রাঃ), আনাছ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ এই আয়াতকে আয়াতে-হেজাব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত ঘটনায় ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঐরূপ উক্তিটি রহিয়াছে।

পর্দ্দার বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে হযরতের বিবি—উম্মুল মোমেনীনগণ লোক সমাবেশেও হযরতের দরবারে যাতায়াত করিয়া থাকিতেন। সেই সম্পর্কে একদা ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার দরবারে ভাল-মন্দ সব রকম মানুষই আসিয়া থাকে, অতএব উম্মুল-মোমেনীনগণকে পর্দ্দায় থাকার নির্দ্দেশ দিলে ভাল হইত। ইতি মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা আয়াতে-হেজাব (পর্দ্দার বিধান প্রবর্ত্তনকারী উক্ত আয়াত) নাযেল করিলেন।

২৩৬৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদিনায় পৌঁছিলেন তখন আমার বয়স দশ বৎসর। হযরতের মদিনায় অতিবাহিত জীবনকাল—সুদীর্ঘ দশ বৎসর একাধারে আমি তাঁহার খেদমত করিয়াছি। আয়াতে-হেজাব বা পর্দ্দা-বিধানের আয়াত আমার সম্মুখেই নাযেল হইয়াছে; আমি উহা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছি। এই জন্যই উবাই-ইবনে কায়াবের ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী উহা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

উম্মুল-মোমেনীন যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহ-জীবন আরম্ভ করার প্রথম দিনই এই আয়াতটি নাযেল হয়। উম্মুল-মোমেনীন যয়নবের সঙ্গে হযরত নবী (দঃ) প্রথম রাত্রি উদযাপন করিয়া সেই উপলক্ষে সকাল বেলা লোক দিগকে দাওয়াত করিলেন। লোকজন দাওয়াতে উপস্থিত হইল। (সে কালে পর্দ্দার বিধান ছিল না, তাই নব বধূ যয়নব (রাঃ) যে গৃহে ছিলেন তথায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই খানা-পিনার জমাত করা হইয়া ছিল। খানা-পিনা শেষে সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু দুই-তিন জন লোক তাহারা তথায় কথাবার্ত্তার আসর জমাইয়া বসিয়া রহিল। (ঐ সময় হযরতের অভিপ্রায় এই ছিল যে, লোকজন সকলে তথা হইতে চলিয়া গেলে তথায় যয়নব (রাঃ)ও নিরবে থাকিবেন এবং হযরতও কাজের অবসরে একটু আরাম করিবেন, কিন্তু ঐ দুই-তিন জন লোক তথায় বসিয়া থাকায় তাহা সম্ভব হইতে ছিল না। (স্বয়ং হযরত তাহাদিগকে গৃহ ত্যাগ করিতে বলিবেন ইহাতেও হযরত (দঃ) লজ্জা

বোধ করিতে ছিলেন। তাই) হযরত (দঃ) নিজেই তথা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম যেন ঐ লোকগণও বাহির হইয়া যায়। এই অবসরে হযরত (দঃ) আয়েশা রাজিয়ালাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া সালাম-কালামের আদান প্রদান করিলেন। অতঃপর ভাবিলেন, যয়নবের গৃহের ঐ লোকগণ হয়ত তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া হযরত (দঃ) যয়নবের গৃহের দিকে ফিরিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে আছি, কিন্তু দেখা গেল ঐ লোকগণ এখনও তথায়ই বসা রহিয়াছে। তাই হযরত (দঃ) গৃহে প্রবেশ না করিয়া পুনরায় আয়শার গৃহে চলিয়া আসিলেন, আমিও হযরতের সহিত চলিয়া আসিলাম। আবার হযরত (দঃ) ঐ লোকগণ চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া যয়নবের গৃহের দিকে আসিলেন আমিও হযরতের সঙ্গে আসিলাম। এইবার দেখা গেল, বাস্তবিকই তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তখন হযরত (দঃ) বিবি যয়নবের গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পেছনে গৃহে প্রবেশের জন্য উদ্যত হইয়া আছি। হযরতের এক পা গৃহ দ্বারের ভিতরে আর এক পা বাহিরে এমতাবস্থায় (অকস্মাৎ) হযরত (দঃ) আমার ও তাঁহার মধ্যে পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন। (আমি গৃহে প্রবেশ করা হইতে বিরত রহিলাম) এবং জানা গেল পর্দ্দা-বিধানের আয়াত নাযেল হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে যে আয়াতের কথা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখিত আয়াতখানাই—যাহা ২২ পারা ছুরা আহ্যাবের ৭ রুকুতে রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ আয়াতখানার মধ্যে একটি বিশেষ আদেশে সুস্পষ্টরূপে "حجاب হেজাব" তথা "পর্দ্দার বিধান" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, নবীর স্ত্রীগণ যাঁহাদেরকে উম্মুল-মোমেনীন বা সমস্ত মোমেনগণের মাতা গণ্য করা ও বলা হইয়া থাকে তাঁদের বেলায়ও পর্দ্দা-বিধান মান্য করিয়া চলিতে হইবে। এমনকি "তাঁহাদের নিকট কোন প্রয়োজনের বস্তু চাহিতে হইলে পর্দ্দার আড়াল হইতে চাহিতে হইবে।" আদেশটির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই আদেশের অতি সহজ ও সরল এবং স্বাভাবিক একটি যুক্তিও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن "এই ব্যবস্থা তোমাদের অন্তর এবং তাঁহাদের অন্তর উভয়ের অন্তরের পাক-পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।" এই কথাটির দ্বারা দুইটি অতি জরুরী বিষয়ের সুরাহা হইয়া যায়।

প্রথমটি এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রীগণের অন্তরের পবিত্রতা এবং তাহাদের প্রতি দৃষ্টিকারীর অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যদি পর্দ্দা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তবে অন্যান্য নারীগণের পক্ষে পবিত্রতা রক্ষার জন্য পর্দ্দা-ব্যবস্থার হাজার, বরং লক্ষ গুণ অধিক প্রয়োজন হইবে না কি? সুতরাং এই

আয়াতের দ্বারা সাধারণভাবে নারী সমাজের জন্য পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশ প্রমাণিত হওয়া তদ্রূপই যেরূপ—فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا "মাতা-পিতার প্রতি কটু বাক্য বা ধমক ও তিরস্কার প্রয়োগ করিবে না।" এই আয়াতের দ্বারাই মাতা-পিতাকে গালি না দেওয়ার ও তাঁহাদেরকে মার-পিট না করার আবশ্যকতা কটু বাক্য ও তিরস্কার প্রয়োগ না করার আবশ্যকতা অপেক্ষা লক্ষ গুণ বেশী প্রমাণিত হয়।

কোরআন-হাদীছ দ্বারা এইরূপে কোন আদেশ প্রমাণিত হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় دلالة النص "দালালাতুন্-নছ্" বলা হয়। এইরূপে প্রমাণিত আদেশ সরাসরি স্পষ্টরূপে উল্লেখিত আদেশের তুলনায় অধিক কঠোর হইয়া থাকে। যেরূপ মাতা-পিতার প্রতি কটু বাক্য ও তিরস্কার প্রয়োগ না করার আদেশ অপেক্ষা গালি-গালাজ ও মার-পিট না করার আদেশ অধিক কঠোর। তদ্রূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রীগণ সম্পর্কে পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশ অপেক্ষা সমস্ত নারী সমাজের পক্ষে পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশ অধিক কঠোর হইবে।

দ্বিতীয়টি এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই পর্দ্দা-ব্যবস্থা শিথিল বা পরিত্যাগ করার সমালোচনার উত্তরে মনের স্বচ্ছতা ও অন্তরের পবিত্রতার উল্লেখ করিতে শুনা যায়। এই আয়াতের নির্দ্দেশ হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। এস্থলে এক দিকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ যাঁহাদের পবিত্রতা সম্পর্কে কোন মোসলমানের সংশয় থাকা সম্ভব নহে এবং পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট বয়ান وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ অনুযায়ী তাঁহারা হইতেছেন সকল মোসলমানের মা। অপর দিকে ছাহাবীগণ যাঁহাদের পবিত্রতাও তদ্রূপই। এরূপ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা পর্দ্দা-ব্যবস্থা পালনের আদেশ করিয়াছেন।

সরাসরি মোসলেম সমাজকে লক্ষ্য করতঃ পর্দ্দার আদেশ না করিয়া আল্লাহ তায়ালা যে, প্রত্যক্ষ ভাবে রসুলের বিবিগণ এবং ছাহাবীদের মধ্যে পর্দ্দা-ব্যবস্থা পালনের আদেশ করা পূর্ব্বক মোসলেম সমাজকে পরোক্ষ ভাবে উহার আদিষ্ট করিয়াছেন—এই নীতি অবলম্বনের বিশেষ তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, কেহ যেন পর্দ্দা-ব্যবস্থা এড়াইবার জন্য মনের স্বচ্ছতা এবং অন্তরের পবিত্রতার বুলি আওড়াইতে অবকাশই না পায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত আয়াতের দুই রুকু পূর্ব্বে নারী সমাজের জন্য পর্দ্দায় থাকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আদেশ সম্বলিত আরও এক খানা আয়াত রহিয়াছে—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ .... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা নিজ নিজ ঘরের ভিতরেই থাকিবে, পূর্ব্বেকার অন্ধকার যুগে নারীগণ যেরূপে প্রকাশ্যে বেড়াইয়া থাকিত তোমরা ঐরূপ বেড়াইবে না। আর নামায আদায়ে তৎপর থাকিবে, যাকাৎ দানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং আল্লার রসুলের ফরমাবরদাবী করিয়া চলিবে। হে নবীর গৃহিনীগণ! আল্লার ইচ্ছা তোমাদিগকে অপবিত্রতা হইতে দূরে রাখা এবং পূর্ণ পাক পবিত্র রাখা।"

এই আয়াতেও প্রত্যক্ষে হযরতের বিবিগণকে সম্বোধন করিয়া আদেশ করতঃ পরোক্ষে মোসলেম সমাজের সকল নারীগণ সম্পর্কে এই সকল আদেশ-নিষেধের কঠোরতাই আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করিয়াছেন। নামায ও যাকাতের আদেশ যেরূপ সকলের জন্যই রহিয়াছে এবং অন্ধকার যুগে নারীদের বে-পর্দ্দা ভাবে প্রকাশ্যে চলা-ফেরা মোসলেম সমাজের কোন নারীর জন্যই জায়েয হইতে পারে না, নতুবা উহাকে পূর্ব্বেকার অন্ধকার যুগের কার্য্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত না; সুতরাং ইহা প্রত্যেক মোসলেম নারীর জন্যই নিষিদ্ধ। তদ্রূপ নিজ নিজ ঘরে থাকার আদেশও সকল নারীদের পক্ষেই প্রযোয্য। তদুপরি এই আয়াতেও সেই পাক-পবিত্রতার কথা বলা হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণকে পাক-পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে ঘরে থাকার আদেশ করা হইলে অন্যান্য নারীদের পক্ষে সেই আদেশ অবশ্যই অধিক কঠোর ভাবে প্রযোয্য হইবে।

নারীদের জন্য পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশের আরও একটু বিস্তারিত বিবরণ ১৮ পারা—ছুরা নূর ৪ রুকুতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ........

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"হে রসুল! আপনি মোমেন পুরুষদেরে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত রাখে (বেগানা মহিলা দেখার প্রবণতায় দৃষ্টিকে বিচরণ করিতে না দেয়) এবং স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে হেফাজত করে (ব্যভিচারে লিপ্ত না করে।) মোমেন মহিলাগণকেও বলিয়া দিন, তাহারাও যেন স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত রাখে (বেগানা পুরুষ দেখার প্রবণতায় দৃষ্টিকে বিচরণ করিতে না দেয়) এবং স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে হেফাজত করে (ব্যভিচারে লিপ্ত না করে।) আর মহিলাগণ তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারিবে না। (নারীর দৈহিক সৌষ্ঠব হইল সৃষ্টিগত সৌন্দর্য্য যাহার প্রতি স্বভাবতঃ পুরুষের আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে, আর তাহার সাজ-সজ্জা হইল উপার্জিত সৌন্দর্য্য—উভয় প্রকার সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করিতে পারিবে না।) অবশ্য যতটুকু সৌন্দর্য্য (আকস্মিক বা বাধ্যগতরূপে) প্রকাশ পায়; (উহাকে

গোনাহের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে)। এতদ্ভিন্ন মহিলাগণ অবশ্যই তাহাদের ওড়না ঝুলাইয়া রাখিবে স্বীয় বক্ষের উপর। (বক্ষ জামায় আবৃত থাকা সত্ত্বেও উহার উপর ওড়নার উভয় দিক ঝুলাইয়া দিয়া উহার উপর অধিক আবরণ সৃষ্টি করিবে।)

আর মহিলাগণ কোন মানুষের সম্মুখেই তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে না। শুধু মাত্র স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজের সন্তান, স্বামীর সন্তান, ভ্রাতা, ভ্রাতার সন্তান-সন্ততি, ভগ্নির সন্তান-সন্ততি, নিজের মহিলাবর্গ, ক্রীতদাসী, হুস-জ্ঞান ও অনুভূতির অভাবে নারীদের প্রতি আকর্ষণ বিহীন পুরুষ যাহারা পরের গৃহভৃত্যরূপেই জীবন-যাপন করিয়া থাকে এবং ঐ সকল বালক যাহারা এখনও নারীদের গোপন লালিত্যের কোন খোঁজ বা অনুভূতিই রাখে না—এই সকল লোকদের হইতে সৌন্দর্য্য লুকাইবার প্রয়োজন নাই।" দাদা, নানা ও চাচা পিতার শ্রেণীতে শামিল এবং মামু ভ্রাতার ন্যায় এই শ্রেণীভুক্ত।

পাঠকবর্গ! إلا ما ظهر منها "অবশ্য যতটুকু সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ প্রকাশ পায় উহাতে গোনাহ হইবে না" এই বাক্যটির তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ হইতে দুইটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। একটি ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট; উহাতে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশই নাই, আর একটি ব্যাখ্যা দৃষ্টে ভুল ধারণার সূত্রপাত হইয়াছে তাই উভয় ব্যাখ্যাই বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা উত্তম।

১। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উহার উদ্দেশ্য স্থির করতঃ বলেন—

كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها وما يبدو من اسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لان هذا لا يمكنها اخفاؤه

"যতটুকু সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ প্রকাশ পায়, যেমন—আরবের মহিলাগণ সাধারণতঃ (বাহিরে যাইতে হইলে) বড় একটি চাদর দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র আবৃত করিয়া নিত (যেরূপ বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে বোরকা—ইহাও একটি সাজের জিনিষ।) এতদ্ভিন্ন হাটিবার সময় পরিধেয় বস্ত্রের নিম্ন অংশ ঐ চাদরের (বা বোরকার) আবরণ মুক্ত থাকে; এই চাদর এবং পরিধেয় বস্ত্রের এই নিম্ন অংশ প্রকাশ হওয়ার দরুন নারীগণ গোনাহগার হইবে না, কারণ এতটুকু প্রকাশ না করিয়া গত্যন্তর নাই।"

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত বিবৃতি অনুযায়ী মহিলাদের চেহারা ও হাত সহ সম্পূর্ণ দেহ এবং উহার সাজ-সজ্জা পর্দ্দার অন্তরভুক্ত যাহা বেগানা (তথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত লোকগণ ব্যতিত অন্য) লোকদের হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। শুধু মাত্র বোরকা শ্রেণীর চাদর এবং

পরিধেয় বস্ত্রের নিম্ন অংশ প্রকাশ হওয়া ক্ষমার্হ। (তদ্রূপ আকস্মিক কোন কারণে— যেমন বাতাস ইত্যাদির কারণে যদি কোন সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহাও ক্ষমার্হ।) তাবেয়ী হাসান বছরী এবং মোহাম্মদ ইবনে সীরীনের মতও ইহাই। (তফছীর ইবনে কাছীর, ৩—২৮৩)

২। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফছীর এরূপ করিয়াছেন। الا ما ظهر منها "অবশ্য যে সৌন্দর্য্য সাধারণ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে" ইহার উদ্দেশ্য চেহারা ও হাতের কব্জি এবং তৎসংলগ্ন সাজ-সজ্জা।

এই ব্যাখ্যার দরুন অনেকে বলিয়া থাকে, মহিলাদের জন্য বেগানা লোক হইতে হাত-মুখ ঢাকিয়া রাখার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের এই কথা ঠিক নহে।

এস্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, পুরুষের দেহ ঢাকা সম্পর্কে শুধু একটি বিধান তাহা হইল "ছতর—নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখা।" পক্ষান্তরে মহিলাদের দেহ ঢাকা সম্পর্কে দুইটি বিধান রাহিয়াছে—একটি হইল ছতর দ্বিতীয়টি হইল হেজাব বা পর্দ্দা।

ছতরের অঙ্গ ও সীমা দর্শক ব্যতিতও আবৃত রাখা আবশ্যক, অবশ্য যদি শরীয়ত কোন প্রকার তারতম্যের অবকাশ দেয় বা স্থান বিশেষে অনুমতি দেয় তবে তাহা ভিন্ন কথা। এতদ্ভিন্ন ছতরের সীমা ও অঙ্গসমূহ আবৃত রাখা নামাযের একটি অন্যতম ফরজ; উহার কোন একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশ অনাবৃত হইলে নামায শুদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে পর্দ্দার অঙ্গ দর্শকদের হইতে আবৃত রাখা আবশ্যক, সাধারণ ভাবে আবৃত রাখা আবশ্যক নহে এবং উহা আবৃত রাখা নামাযের ফরজও পরিগণিত নহে; উহার সম্পূর্ণ টুকুও অনাবৃত হইলে নামায অশুদ্ধ হইবে না।

মহিলাদের ছতর হইল এই অঙ্গ সমূহ—(১।২) উভয় রান হাটু সহ (৩।৪) উভয় পায়ের গোছা পায়ের গিঁঠদ্বয় সহ (৫।৬) উভয় নিতম্ব (৭) জননেন্দ্রিয়, উহার আশ-পাশ সহ (৮) গুহ্য বা মলদ্বার, উহার আশ-পাশ সহ (৯।১০) পেট ও পিঠ উভয় পার্শ সহ (১২।১৩) উভয় স্তন (১৪) মাথা (১৫) চুল (১৬।১৭) উভয় কান (১৮) ঘাড় (১৯।২০) উভয় কাঁধ (২১।২২) উভয় বাহু কনুইর গিঁঠ সহ (২৩।২৪) উভয় হাত কব্জির গিঁঠ সহ। এই চব্বিশটি অঙ্গ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নারীদের ছতর। ইহার কোন একটি অঙ্গের চতুর্থাংশ নামাযের মধ্যে উন্মুক্ত হইলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গ—(১) চেহারা বা মুখমণ্ডল (২।৩) উভয় হাতের কব্জি (৪।৫) উভয় পায়ের পাতা ছতরের মধ্যে শামিল নহে; ছতর হিসাবে এই অঙ্গসমূহকে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক নহে এবং নামাযের মধ্যে এই সব উন্মুক্ত থাকিলে নামাযের ক্ষতি হইবে না।

ছতর পরিগণিত চব্বিশটি অঙ্গ নামাযের মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই সমভাবে ছতর গণ্য হইবে যাহা ঢাকিয়া রাখা ফরজ, কিন্তু আন্দর মহলে চলা-ফেরার মধ্যে ছতরের সীমানায় তারতম্য করা হইয়াছে—পেট, পিঠ এবং নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত অঙ্গ সমূহকে আবশ্যকীয় ছতর গণ্য করা হইয়াছে, আর অন্য অঙ্গগুলিকে মোস্তাহাব ছতর গণ্য করা হইয়াছে।

এই হইল নারীদের ছতর সম্পর্কীয় বিবরণ। নারীদের জন্য আর একটি সতন্ত্র বিধান রহিয়াছে হেজাব বা পর্দ্দা-ব্যবস্থা ; উহার সীমানা নারীর সম্পুর্ণ দেহ। পর্দ্দার বিধানে হাত-মুখ ইত্যাদি নারী দেহের অঙ্গ সমূহের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। হঁা—দর্শকদের হিসাবে তারতম্য রহিয়াছে যে, মাহ্‌রম তথা যাহাদের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম তাহাদের সম্মুখে পর্দ্দা আবশ্যক নহে।* মাহ্‌রম ব্যাতীত অন্য সকল প্রকার অত্মীয় এগানা-বেগানা সকল পুরুষ হইতে পর্দ্দা করা ফরজ। মোট কথা এই যে, ছতরের বিধানে ত কতিপয় অঙ্গের তারতম্য রহিয়াছে—হাতের কব্জি, পায়ের পাতা ও চেহারা ছতরের সীমানার অন্তরভুক্ত নহে, কিন্তু পর্দ্দার বিধানে কোন অঙ্গের তারতম্য নাই, সমস্ত অঙ্গই উহার সীমানাভুক্ত। অবশ্য এখানে দর্শকের তারতম্য রহিয়াছে যে, মাহ্‌রমদের বেলায় এবং আয়াতে উল্লেখিত অন্যান্যদের বেলায় পর্দ্দার আবশ্যক নহে অন্য সকলের বেলায়ই পর্দ্দা আবশ্যক।

আলোচ্য আয়াতে নারীদের শরীর ও সজ্জাকে ঢাকিয়া রাখার কর্ত্তব্য সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ রহিয়াছে। প্রথমটি হইল—

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"নারীগণ তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে না, অবশ্য যতটুকু সাধারণতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে উহা মাফ করা হইবে।" এস্থলেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) "যতটুকু সাধারতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে" ইহার ব্যাখ্যায় উভয় হাতের কব্জি ও চেহারা উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্যান্য ইমামগণ উভয় পায়ের পাতাকেও এই সঙ্গে শামিল করিয়াছেন। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অঙ্গের তারতম্য ছতরের বিধানে আছে পর্দ্দার বিধানে নাই, সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য হইবে ছতরের বিধান—পর্দ্দার বিধান নয়।

দ্বিতীয় অংশের নিষেধাজ্ঞা হইল—

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ......

---

* অবশ্য স্থান বিশেষে কোন প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টির আশংকা হইলে সে স্থলে অবশ্যই বেগানা পুরুষের ন্যায় ব্যবহার রাখিতে হইবে।

"নারীগণ তাহাদের কোন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে না স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজ সন্তান-সন্ততি, স্বামীর সন্তান-সন্ততি, নিজের ভ্রাতা, ভ্রাতার সন্তান-সন্ততি ভগ্নির সন্তান-সন্ততি······ব্যতীত অন্য কাহারও সমক্ষে।" এই নিষেধাজ্ঞায় কোন অঙ্গের তারতম্য করা হয় নাই—সমুদয় অঙ্গ ও উহার সজ্জাকেই প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাঁ—দর্শকের তারতম্য করা হইয়াছে যে, মাহ্‌রমগণকে, স্বামীকে, নিজেদের মহিলাগণকে, নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অনুভুতি বিহিন পুরুষদেরকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরকে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দর্শকের তারতম্য পর্দ্দার বিধানে রহিয়াছে। এই বিধানে কোন অঙ্গেরই তারতম্য করা হয় নাই—কোন অঙ্গকেই বাদ দেওয়া হয় নাই, অতএব যে ক্ষেত্রে পর্দ্দার আদেশ সে ক্ষেত্রে হাত-মুখ ইত্যাদি সমুদয় অঙ্গেরই পর্দ্দা করিতে হইবে।

সার কথা এই যে—ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها এবং ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن······ উভয় নিষেধাজ্ঞাকে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) পর্দ্দা-বিধানের জন্য বলিয়াছেন, তাই তিনি "الا ما ظهر منها" "অবশ্য যতটুকু প্রকাশ পাইয়া থাকে" বলিয়া যে পরিমাণকে নিষেধাজ্ঞা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে উহার ব্যাখ্যায় কোন অঙ্গ উল্লেখ করেন নাই। কারণ নারীর কোন অঙ্গই পর্দ্দা-বিধান হইতে বাদ নাই, সব অঙ্গই পর্দ্দার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উহার ব্যাখ্যায় নারীদের সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করার বস্ত্র ইত্যাদিকে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটিকে ত পর্দ্দা-বিধানের জন্য নিয়াছেন, কিন্তু প্রথম নিষেধাজ্ঞাটিকে তিনি ছতর-বিধানের জন্য বলিয়াছেন ; তাই তিনি "الا ما ظهر منها" দ্বারা যে পরিমাণ নিষেধাজ্ঞা হইতে বাদ পড়িয়াছে উহার ব্যাখ্যায় উভয় হাতের কব্জি এবং মুখমণ্ডলকে উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ এই সব অঙ্গ নারীদের ছতর বহির্ভূত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যাখ্যা যে, একমাত্র ছতর-বিধানের দৃষ্টিতেই হইয়াছে উহার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁহারই নিজের বর্ণনা যাহা তিনি স্বীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন। তফছীর ইবনে জরীর কেতাবে বর্ণিত আছে—

حدثنى على قال حدثنى عبد الله قال حدثنى معاوية عن على عن ابن عباس قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) الا ما ظهر منها—অবশ্য যতটুকু সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে" ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহা হইল মুখমণ্ডল, চোখের সুরমা, হাতের মেন্দি ও অঙ্গুরী। নারীগণ এই সব অঙ্গ ও উহার সজ্জা আন্দর মহলে ঐ শ্রেণীর লোকদের সম্মুখে যাহারা আন্দর মহলে যাতায়াতের অধিকারী (অর্থাৎ যাহাদের ক্ষেত্রে পর্দ্দার আদেশ নাই) তাহাদের সম্মুখে অনাবৃত রাখিতে পারে।"

এই বর্ণনায় স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হাত ও চেহারা নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত হওয়া একমাত্র আন্দর মহলের জন্য—যেখানে পর্দ্দার প্রয়োজন নাই।

পাঠকবর্গ! নারীদের দেহ ঢাকিয়া রাখা সম্পর্কে ছতর হইল আইন পর্য্যায়ের ও বিধানগত নির্দ্ধারিত সীমানা, তাই উহার ভিত্তিতে কথা বলা হইলে সেই ক্ষেত্রে কোন প্রকার আনুসাঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া শুধু আইনের দৃষ্টিতে হুকুম বয়ান করা হইবে। পক্ষান্তরে পর্দ্দার বিধান হইল পাক-পবিত্র সমাজ গঠনের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা; এই ক্ষেত্রে শুধু শুষ্ক আইনের উপর চোখ বন্ধ করিয়া রাখিলে উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না, বরং ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ভঙ্গির এবং সেই দৃষ্টিতে যদি কোন আনুসাঙ্গিক সাধারণ ভাবেই জড়িত থাকে তবে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন হুকুম বয়ান করা হইবে না, বরং ঐ বিজড়িত আনুসাঙ্গিকের সহিত যে হুকুম হইতে পারে তাহাই বর্ণনা করা হইবে।

নারীদের চেহারা, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা এই অঙ্গ গুলিকে ছতরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, নতুবা সর্ব্বদা কাজে-কর্ম্মে তাহাদের পক্ষে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইত এবং নামাজ ফাছেদ হওয়াকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর হইয়া পড়িত। ঐসব অঙ্গকে ছতর বহির্ভূত রাখায় আন্দর মহলের কাজ-কর্ম্ম ও চলা-ফেরায় এবং নামাজের মধ্যে নারীদের জন্য আছানী হইয়াছে।

ফেকাহ্ শাস্ত্র আইনের শাস্ত্র, তাই সাধারণত: কোন কোন ফেকার কেতাবে ছতরের সীমার উপর ভিত্তি করিয়া শুধু শুষ্ক আইনের দৃষ্টিতে এইরূপ মছআলাহ লেখা হইয়াছে যে, বেগানা পুরুষও নারীর চেহারা এবং হাতের কব্জি দেখিতে পারে। এই মছআলার সূত্র ও উদ্দেশ্য ইহাই যে, যেহেতু এই সব অঙ্গ ছতরের অন্তর্ভুক্ত নহে তাই ছতর হিসাবে ইহা ঢাকিয়া রাখার আবশ্যক নাই। কিন্তু নারীদের পক্ষে দেহ ঢাকা সম্পর্কে শুধু ছতরের বিধানই নহে, তাহাদের জন্য পর্দ্দার বিধানও রহিয়াছে। কোরআন-হাদীছ শুধু শুষ্ক আইনের সমবায়ই নহে, বরং পাক-পবিত্র সমাজ গঠনের প্রতিই লক্ষ্য অধিক, তাই কোরআন-হাদীছে ছতর অপেক্ষা পর্দ্দা-বিধানের বয়ানেই অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য ফেকার কেতাবেও পর্দার মছআলাহ ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে এই আকারে যে, "শাহ্‌ওয়াত উদিত হওয়ার আশংকা বা সম্ভাবনাও যদি থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে নারীর চেহারা সহ যে কোন অঙ্গ দেখা হারাম এবং ঐরূপ স্থলে নারীর চেহারা সহ যে কোন অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা হারাম।"

ফেকা শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য—আইনের চুল-চেড়া দৃষ্টিতে দেখা না হইলে শাহ্‌ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা বা সম্ভাবনাকে শর্ত্তরূপে উল্লেখ করতঃ মছআলাহকে উহার সঙ্গে জড়িত করার আবশ্যক হয় না। বরং মূল মছআলাহই এইরূপ দাঁড়ায় যে, (১) মাহ্‌রম (২) কাম ভাবের অনুভূতি বিহীন পুরুষ (৩) নারীদের প্রতি আকর্ষণের খোঁজ রাখে না এরূপ বালক—এই তিন প্রকার পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন বেগানা (স্বামী নয় এরূপ) পুরুষের সম্মুখে কোন নারীর চেহারা বা কোন অঙ্গ প্রকাশ করা হারাম। কারণ "শাহ্‌ওয়াত" অর্থ হইল নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ বা নরের প্রতি নারীর আকর্ষণ। এই আকর্ষণ একটি স্বভাব-বস্তু, তাই সাধারণতঃ কোন পুরুষ কোন রমনীর আঁচ অনুভব করিলেই পুরুষের মনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। একবার নজরে আসিলে সেই নজরকে দীর্ঘ করার বা পুনঃ পুনঃ নজর করার লিপ্সা হয় এবং নজরে স্বাদ অনুভব হয়।

এই শাহ্‌ওয়াত নর-নারীর স্বভাবগত, বরং জন্মগত জিনিষ। একমাত্র মা-বোন বা তৎশ্রেণীর সৃষ্টিগত সম্পর্কধারিণী তথা যাহাদের মধ্যে বিবাহ চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঐরূপ মাহ্‌রামের স্থলে সেই আকর্ষণ স্বাভাবিকরূপেই স্তিমিত এবং কাম ভাবের অনুভূতি বিহীন পুরুষের মধ্যে সেই আকর্ষনের অস্তিত্বই নাই, আর বালকের মধ্যে সেই আকর্ষণ এখনও পয়দা হয় নাই। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত সকলের মধ্যেই শাহ্‌ওয়াত বা অন্ততঃ হঠাৎ শাহ্‌ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং উল্লেখিত তিন শ্রেণীর পুরুগ ব্যতীত স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষের বেলায়ই নারীদের অন্য চেহারা বা যে কোন অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা হারাম হইবে। এই হারাম হওয়ার হুকুমকে শাহ্‌ওয়াতের আশঙ্কা-শর্ত্তের সহিত জড়িত করার আবশ্যক নাই। কারণ, উল্লেখিত তিন শ্রেণীর পুরুষ ব্যতীত শাহ্‌ওয়াতের আশঙ্কা বিহীন পুরুষ আছে কোথায়? "হঠাৎ শাহ্‌ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা" কথাটির প্রতি ভালরূপে লক্ষ্য করিলে উক্ত দাবীর ব্যাপকতা সম্পর্কে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথম আয়াত—পর্দ্দা-বিধানের আয়াতখানা কত সুস্পষ্ট যে, ছাহাবীদের ন্যায় পবিত্রাত্মার লোকদের হইতেও মোমেনগণের মাতা—নবী-পত্নিগণকে পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে। কারণ, ছাহাবীগণ যতই পবিত্রাত্মার হউন না কেন, কিন্তু তাঁহারাও ত পুরুষ এবং পুরুষের মধ্যে

শাহ্ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন কতিপয় হাদীছ এস্থলে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নর-নারীর মধ্যে কত আশঙ্কাময় অবস্থা বিরাজমান। অতএব কোন বেগানা পুরুষই হঠাৎ শাহ্ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত নয়। যথা--

(১) اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নারী জাতি আড়ালে থাকার বস্তু ; আড়াল হইতে নারী বাহির হইলেই শয়তান তাহার প্রতি উঁকি মারে।"

অর্থাৎ কোন নারী আড়াল হইতে বাহির হইলে শয়তান তৎপর হইয়া উঠে লোকদিগকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে।

(২) اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নারী শয়তানের আকৃতিতে সম্মুখে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে চলিয়া যায়।"

অর্থাৎ নারী কাহারও সম্মুখে আসিলে শয়তান তাহার নজরে ঐ নারীর আকৃতি ফুটাইয়া তোলে যেন সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর চলিয়া গেলেও শয়তান তাহার হৃদয় পটে ঐ নারীর আকৃতির রেখাপাত করিয়া রাখে।

(৩) لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمِنِّىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمُ

"হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামীর অনুপুস্থিতিতে নারীদের নিকটে যাইও না : কারণ শরতান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত চলা-চলের পথে চলিতে সক্ষম। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনার বেলায়ও কি শয়তান ঐরূপ সক্ষম ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার বেলায়ও সক্ষম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য শয়তানের মোকাবেলায় বিশেষ সাহাযোর ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যাহার ফলে আমার উপর তাহার কোন প্রতিক্রিয়া চলে না।"

অর্থাৎ রক্ত যেরূপ মানুষের চোখে, মস্তিষ্কে এবং অন্তরে চলা-চল করিয়া থাকে শয়তানও এই সবের ভিতরে পৌঁছিতে সক্ষম। তাই যে কোন মানুষ যতই পাক-পবিত্র হউক না কেন, কিন্তু শয়তানের প্রচেষ্টায় হঠাৎ তাহার মধ্যে শাহ্ওয়াত উদিত হইতে পারে। শুধু নবীগণ যেহেতু নিষ্পাপ তাই তাঁহারা আল্লার বিশেষ

ব্যবস্থায় ঐ আশঙ্কা হইতে মুক্ত, কিন্তু অন্য আর কোন মানুষ তদ্রূপ নহে, সুতরাং পর্দ্দার হুকুম সর্ব্বত্রই সমান হইবে।

(৪) لا يخلو رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একাকী কোন নারীর সঙ্গে নরের সাক্ষাৎ হইলেই শয়তান তাহাদের তৃতীয় জন হয়।"

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে শাহ্ওয়াত বা আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে শয়তান সচেষ্ট হয়।

বোখারী (রঃ) মূল কেতাবের ৯২০ পৃষ্ঠায় দুইটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বছরীর ভ্রাতা সায়ীদ (রঃ) হাসান বছরী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমোসলেম নারীগণ (রাস্তা-ঘাটে) বক্ষ ও মাথা খুলিয়া চলাফেরা করে এমতাবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? হাসান বছরী (রঃ) বলিলেন, তোমার কর্ত্তব্য হইল, নিজের দৃষ্টিকে ফিরাইয়া রাখা—তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। তুমি আল্লাহ তায়ালার এই আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে—

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم......

"হে রসুল (দঃ)! আপনি ঈমানদার পুরুষগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে নীচু রাখে—সংযত রাখে এবং জননেন্দ্রিয়কে (ব্যভিচার হইতে) হেফাজত করিয়া রাখে। ঈমানদার মহিলাগণকেও বলিয়া দিন, তাহারাও যেন স্বীয় দৃষ্টি নীচু রাখিয়া চলে এবং ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকে।"

(২) আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

ويعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور

"আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারী চোরা দৃষ্টিও জ্ঞাত থাকেন এবং অন্তরের মধ্যে যাহা লুক্কায়িত থাকে তাহাও জ্ঞাত থাকেন।" النظر الى ما نهى الله عنه খেয়ানতকারী দৃষ্টির তফছীর করা হইয়াছে—আল্লাহ তায়ালা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহার প্রতি চোরা দৃষ্টি করা।

ইমাম যুহ্রী (রঃ) বলিয়াছেন, এখনও সাবালীকা হয় নাই, এরূপ রমণীর কোন অঙ্গ দেখিবার প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ।

অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও ঘরের ভিতর বাহির হইতে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ

২৩৬৯। **হাদীছ**ঃ— সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘরের ভিতর একটি ছিদ্র পথে তাকাইল। তখন হযরতের হাতে মেদ্‌রা * নামক একটি যন্ত্র ছিল যদ্বারা হযরত (দঃ) মাথা চুলকাইতে ছিলেন। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি যদি ভাবিতাম, তুমি আমার ঘরের ভিতর নজর করিবে তবে আমি এই মেদ্‌রাটি দ্বারা তোমার চোখে আঘাত করিতাম। ঘরের ভিতর নজর পড়িবে বলিয়াই ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হইয়াছে।

২৩৭০। **হাদীছ**ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি (দরওয়াজার ফাঁক দিয়া) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘরের ভিতরে তাকাইল। হযরত (দঃ) একটি ছোট বর্শা হাতে লইয়া তাহার দিকে আসিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন—আমি যেন এখনও দেখিতেছি, হযরত (দঃ) সুযোগ খুঁজিতেছেন তাহার চোখে আঘাত করার জন্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জেনা

২৩৭১ **হাদীছ**ঃ— عن النبی صلی الله علیه وسلم قال

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهٗ مِنَ الزِّنٰى اَدْرَكَ ذٰلِكَ

لَا مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ

تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْ يُكَذِّبُهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম-তনয়গণ যে যতটুকু জেনার অংশে লিপ্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহা (অবশ্যই জ্ঞাত থাকিবেন, বরং পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন, এমনকি সে অনুসারে তাহা) লিখিয়া রাখিয়াছেন, (আল্লার লেখা ভুল হয় না—) যাহার পক্ষে যতটুকু লেখা আছে সে ততটুকু অবশ্যই করিয়া থাকে; (সেই অনুসারে সর্ব্ব বিষয় অগ্রিম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাহা জানেন। এমনকি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জেনার অংশগুলি এই—)

---

* কাঠের বা লোহার হাতল যাহার অগ্রভাগে চিরুনির দাঁতের ন্যায় কতিপয় দাঁত থাকে উহা দ্বারা চুলকানোর কাজ করা হয় এবং সময় সময় মাথাও আঁচড়ানো হয়।

চোখের জেনা হইল দৃষ্টি, মুখের জেনা হইল কথাবার্ত্তা, অতঃপর মনে খাহেস ও আকর্ষণ উদিত হয় (তাহা অন্তরের জেনা,) তারপর জননেন্দ্রিয় সেই খাহেস ও আকর্ষণকে কার্য্যে পরিণত করে (যাহা জেনার সর্ব্ব শেষ পর্য্যায়,) অথবা মনের খাহেস ও আকর্ষণকে সে প্রত্যাখ্যান করে। (যাহাতে জেনার চরম পর্য্যায় হইতে বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু জেনার ভূমিকা অবলম্বনে তথা দৃষ্টিপাত ইত্যাদির দরুণ গোনাহ হইবে। কারণ এই ভূমিকা কামভাবকে উত্তেজিত করিবে এবং এস্থলে বা অন্যত্র জেনার চরম পর্য্যায়ে লিপ্ত হইবে।)

পুরুষের প্রতি নারীদের দৃষ্টি করা

২৩৭২। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমার প্রতি এতদুর স্নেহ-মমতা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি যে, একদা তিনি আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দ্দা করিয়া রাখিতে ছিলেন এবং আমি ঐ হাবশী লোকদেরকে দেখিতে ছিলাম যাহারা মসজিদের ভিতর জেহাদের অস্ত্র চালনার কলাকৌশল ও ক্রীড়া দেখাইতে ছিল। ক্রীড়া দেখিয়া যাবৎ না আমি নিজে উদবেগ বোধ করিয়াছি হযরত আমার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তোমরাই অনুমান কর, তামাশা দেখার লালায়িতা কিশোরী কত দীর্ঘ সময় তামাশা দেখিলে সে উদবেগ বোধ করিতে পারে। (বোখারী শরীফ ৭৮৮ পৃষ্ঠা)

মছআলাহ ঃ— পুরুষের প্রতি পুরুষের জন্য যেরূপ দৃষ্টি জায়েয অর্থাৎ নাভী হইতে হাটু পর্য্যন্ত ব্যতিরেকে সমুদয় শরীরের প্রতিই দৃষ্টি করিতে পারে ; পুরুষের প্রতি নারীর জন্যও ঐরূপ দৃষ্টি জায়েয। কারণ, পুরুষের দেহ আবৃত করা সম্পর্কে একমাত্র ছতরের বিধানই রহিয়াছে পর্দ্দার-বিধান নাই। কিন্তু কোন নারী শাহ্ওয়াত বা আকর্ষণের সহিত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা হয় হারাম ; তাই সাধারণ ভাবেও পুরুষের প্রতি বিনা কারণে নারীর দৃষ্টিপাত করাকে মকরূহ বলা হইয়াছে। এ সম্পর্কে তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনাহ (রাঃ) এবং উম্মে ছালামাহ (রাঃ) বসিয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) উম্মুল-মোমেনীনদ্বয়কে পর্দ্দার আড়ালে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। উম্মে ছালামাহ (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি ত অন্ধ—আমাদিগকে দেখিতে পায় না। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা দুই জনও কি অন্ধ ? তোমরা কি তাহাকে দেখিতে পাও না ?

অবশ্য যদি বেগানা পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত সরাসরি উদ্দেশ্য না হয়, বরং নারী কোন প্রয়োজনীয় বা জায়েয বস্তু দেখিতে যাইয়া তাহার নজর পুরুষের প্রতি পড়ে তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। যেরূপ শরীয়ত অনুমোদিতরূপে পর্দ্দার সহিত কোন নারী বাহিরে চলিয়াছে, তাহার পথ দেখার সময় অবশ্যই পথিক পুরুষদের উপর নজর পড়িবে তাহা জায়েয আছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত ঘটনাও তদ্রূপ। জেহাদে অস্ত্র চালনার ক্রীড়া দেখা জায়েয, তাহা দেখিতে যাইয়া পুরুষদের প্রতি নজর পড়িয়াছে তাই ইহা জায়েয। অবশ্য যে কোন ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতি দৃষ্টির দরুণ শাহ্ওয়াত বা আকর্ষণ উদয়ের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকিলে সে ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত হারাম হইবে। আর নিষ্প্রয়োজনে সাধারণ দৃষ্টিও মকরুহ।

অনুমতি চাহিবার ক্ষেত্রে তিন বারের অধিক অপেক্ষা করিবে না

২৩৭৩। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আমাদের মদীনাবাসী ছাহাবীদের এক মজলিসে বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, ছাহাবী আবু মূছা (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে হতভম্বের ন্যায় দেখাইতে ছিল। তিনি ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, অদ্য আমি খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহ-দ্বারে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাহিয়াছিলাম—একে একে তিন বার অনুমতি চাহিয়াছি, কিন্তু কোন জবাব পাই নাই, অবশেষে আমি চলিয়া আসিয়াছি। ওমর (রাঃ) ঘরের ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে মগ্ন ছিলেন। যথাসত্তর সেই কাজ হইতে অবসর হইয়াই তিনি আমাকে খোঁজ করিয়াছেন এবং না পাইয়া আমাকে লোক মারফৎ ডাকিয়া আনিয়াছেন এবং আমি যে, চলিয়া আসিয়াছি উহার কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। আমি উত্তরে বলিয়াছি, তিন বার অনুমতি চাহিবার পরও যখন অনুমতির উত্তর পাই নাই তখন আমি চলিয়া গিয়াছি! কারণ, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লম বলিয়াছেন—

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

"তোমাদের কেহ কাহারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি তিন বার চাহিবার পরও যদি অনুমতি না পায় তবে তথা হইতে ফিরিয়া আসিবে।"

আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিলে পর খলীফা ওমর (রাঃ) আমার নিকট ইহার সাক্ষী তলব করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে কেহ হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে উক্ত হাদীছ শুনিয়াছেন কি? এতচ্ছ্রবনে উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) বলিলেন,

এই হাদীছ সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দানের জন্য আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠকে আপনার সঙ্গে পাঠাইব ; (যাহাতে প্রমাণিত হইবে যে, এই হাদীছ আমাদের সকলেই জ্ঞাত আছে।)

মুল হাদীছ বর্ণনাকারী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ঐ মজলিসে আমিই সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলাম, তাই আমিই তাঁহার সঙ্গে যাইয়া খলীফা ওমর (রাঃ)কে জানাইলাম, বাস্তবিকই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা বলিয়াছেন। অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) অনুতপ্ত স্বঃরে বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটা নির্দ্দেশ আমি অজ্ঞাত রহিয়াছি ? ব্যবসা বাণিজ্যের লিপ্ততাই আমার এই অজ্ঞতার কারণ।

ব্যাখ্যা ঃ—একজন ছাহাবী কর্ত্তৃক একটি হাদীছ বর্ণনা করার পর খলীফা ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক উহার উপর সাক্ষী তলব করার তাৎপর্য্য সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম বোখারী (রঃ) কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

"اراد عمر التثبت لا ان لا يجيز خبر الواحد"

অর্থাৎ হাদীছ সম্পর্কে শুধু একজন ছাহাবীর বর্ণনা যাহাকে পরিভাষায় খবরে-ওয়াহেদ বলা হয় উহা গ্রহণীয় না হওয়া এই সাক্ষী তলবের কারণ নহে, বরং এই হাদীছটি অজ্ঞাত থাকার কারণে খলীফা ওমর (রাঃ) নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন ; যেমন মুল হাদীছের বর্ণনায় ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনুতাপের স্পষ্ট উক্তি উল্লেখও রহিয়াছে। তাই তিনি নিজে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে দেখিতে চাহিয়াছেন যে, একাধিক ব্যক্তি যেই হাদীছ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লল্লোহু অ্যালাইহে অসাল্লামের মুখ হইতে শুনিয়াছে আমি ওমর তাহা শুনি নাই।

এই সাক্ষী তলবের উপর ছাহাবী উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) কটাক্ষ করিলে স্বয়ং খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। (ফতহুলবারী)

ছোট বালকদেরকে ছালাম করা

২৩৭৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি কতিপয় বালকের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন ; তখন তিনি ঐ বালকদেরকে ছালাম করিলেন এবং বর্ণনা করিলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়া থাকিতেন।

মোসলেম-অমোসলেম মিশ্রিত দলকে সালাম করা

এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য কোন ভিন্ন রকম সালাম নাই। সাধারণ সালামই এস্থলেও ব্যবহৃত হইবে, তবে সালামের লক্ষ্য শুধু মোসলমানদিগকে করিতে হইবে।

২৩৭৫। হাদীছ ঃ—উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসুস্থ সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)কে দেখিবার জন্য যাইবেন। হযরত (দঃ) একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়াছেন এবং (বালক) উসামা (রাঃ)কে ঐ বাহনের উপরই পেছনে বসাইয়াছেন। হযরত (দঃ) একটি বৈঠকের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন ; যেই বৈঠকে (ভাবী মোনাফেক সর্দ্দার) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বসিয়াছিল। তখনও (মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাকারী) বদরের যুদ্ধ হয় নাই এবং আবদুল্লাহ মোসলমানদের দলভুক্ত হয় নাই। ঐ বৈঠকে মোসলমান, পৌত্তলিক ও ইহুদী সব রকম লোকই ছিল, এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ও ছিলেন। হযরত (দঃ) ঐ বৈঠকের নিকটে গেলেন ; গাধার পদচারণে ধূলা উড়িলে দুষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ স্বরূপ) নাকে কাপড় ধরিয়া বলিল, ধূলা উড়াইবেন না।

হযরত (দঃ) তথায় ছালাম করিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া বাহন হইতে অবতরণ করিলেন। আর সকলকে আল্লার দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং কোরআন তেলাওত করিয়া শুনাইলেন। এই সময় দুষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (হযরত (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিল,) মিঞা সাহেব! আপনার কথাগুলি সত্য হইলে ত খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু আমাদের বৈঠকস্থলে এই সব বলিয়া আমাদেরে কষ্ট দিবেন না। আপনার বাড়ীতে চলিয়া যান ; যে কেহ আপনার নিকটে যাইবে তাহাকে এই সব শুনাইবেন।

দুষ্টের এই কথার প্রতিবাদে তথায় উপস্থিত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি আমাদের প্রত্যেক বৈঠকে তশরীক আনিবেন এবং এইরূপ আহ্বান জানাইবেন ; আমরা ইহা ভালবাসি। পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সহিত মোসলমানদের বিরাট ঝগড়া তথায় বাঁধিয়া গেল, এমনকি সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে চুপ করাইলেন এবং বাহনে আরোহণ করিয়া অসুস্থ সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট পৌঁছিলেন।

নবী (দঃ) সায়াদ (রাঃ)কে দুষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কথাবার্ত্তাগুলি শুনাইলেন। সায়াদ (রাঃ) অনুরোধ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করুণ—মনে কোন কষ্ট নিবেন না। খোদার কসম—আল্লাহ তায়ালা মদীনার এলাকায় আপনার যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন ইহার পূর্ব্বক্ষণে এই অঞ্চলের সকলের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে এই সমগ্র অঞ্চলের প্রধান মনোনীত করিয়া রাজমুকুট তাহার শিরে পরিধান করানো হইবে এবং সর্দ্দারীর পাগড়ী তাহাকে প্রদান করা হইবে।

কিন্তু আপনার প্রাধান্য দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রাধান্যকে বানচাল করিয়া দিয়াছেন, তাই আপনার প্রতি তাহার ভীষণ আক্রোশ ও বিদ্বেষ এবং সেই আক্রোশ ও বিদ্বেষেই সে আপনার সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

মছআলাহ ঃ—নিজ গৃহে পুরুষ মহিলার মধ্যেও সালামের আদান-প্রদান করিবে। অবশ্য বেগানা এবং যাহাদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তার অনুমতি নাই সেই ক্ষেত্রে নহে।

মছআলাহ ঃ—দুরে অবস্থিত কাহারও নিকট অন্যের মাধ্যমে ছালাম পৌছান যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে বলিতে হইবে—অমুক আপনার নিকট সালাম বলিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—ফাছেক, গোনাহে লিপ্ত এইরূপ ব্যক্তি তওবা না করা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সালামের আদান-প্রদান হইতে বিরত থাকা যায়। আবহুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বলিয়াছেন শরাবখোরকে সালাম করিও না।

দেশের অনুগত অমোসলেম সালাম করিলে তাহার উত্তর

২৩৭৬। **হাদীছ ঃ**—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ইহুদী তোমাকে সালাম করিলে উত্তরে তুমি শুধু "আলাইকা" বলিবে। কারণ, তাহারা অনেক সময় "আচ্ছালামু আলাইকুম" এর স্থলে "আচ্ছামু আলাইকুম" বলিয়া থাকে—যাহার অর্থ তোমাদের উপর মৃত্যু। ("আলাইকা" অর্থ তোমার উপর ; এই ক্ষেত্রে এই উত্তরই সমোচিত।)

২৩৭৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদ-নাছারাগণ তোমাদিগকে সালাম করিলে উত্তরে শুধু "আলাইকুম" বলিবে।

মছআলাহ— ইহুদী-নাছারানী অমোসলেমের প্রতি লিপি লিখিতে উহাতে এইরূপ সালাম লিখা যায়—"আচ্ছালামূ আলা মানিত্তাবায়াল-হুদা" সত্যের অনুসারীর প্রতি সালাম।

মছআলাহ—সম্মানিত আগন্তুকের অভ্যর্থনায় সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাওয়া উত্তম। মদীনার বিশিষ্ট গোত্র "আউস" বংশের সর্দ্দার উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)কে একটি ঘটনা উপলক্ষে নবী (দঃ) ডাকাইয়া ছিলেন। তাঁহার আগমন হইলে নবী (দঃ) উপস্থিত লোকজনকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সর্দ্দারের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হও।

মোছাফাহা করা

কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তবুকের জেহাদে গিয়াছিলেন না; যেই কারণে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং আল্লাহ তায়ালারও অত্যন্ত বিরাগ-ভাজন হইয়া ছিলেন। এমনকি দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত নবী (দঃ) সহ সকল মোসলমানের কথাবার্ত্তা এমনকি সালাম এবং তাঁহার সালামের উত্তর দানও নিষিদ্ধ হইয়া ছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৫৬৯ নং হাদীছে রহিয়াছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর তাঁহার তওবা আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়াছে বলিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হয়।

তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত সুসংবাদ প্রাপ্তে আমি মসজিদে উপস্থিত হইলাম; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তথায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতী হওয়ার ঘোষনা প্রাপ্ত বিশিষ্ট ছাহাবী তালহা (রাঃ) দৌড়িয়া আসিয়া আমার সঙ্গে মোছাফাহা করিলেন এবং আমার তওবা কবুলের সংবাদে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হওয়ায় আমাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

২৩৭৮। হাদীছ ঃ—কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ মোছাফাহা করিয়া থাকিতেন কি? তিনি বলিলেন হাঁ।

উভয় হস্তে ধরা

"মোছাফাহা" পরিচ্ছেদের সঙ্গেই বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং প্রমাণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রঃ) ইমাম আবহুল্লাহ ইবনুল মোবারকের সঙ্গে তাঁহার উভয় হস্তে মোছাফাহা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আরও একটি দলীল উল্লেখ করিয়াছেন—যেই দলীলটি উপরের মোছাফাহা পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছেন। বিশিষ্ট ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হস্ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তদ্বয়ের মধ্যে থাকাবস্থায়ই তিনি আমাকে (নামাযের) আত্তাহিয়্যাত শিক্ষা দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লেখিত বর্ণনা ও ঘটনা যে, মোছাফাহার ঘটনা ছিল তাহা ইমাম বোখারীর আলোচনায় সুস্পষ্টই প্রতিয়মান হইল। নতুবা তিনি এই বর্ণনাকে মোছাফাহার পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিতেন না (আর তুই হস্তে মোছাফাহার আকার ইহাই হয় যে, প্রত্যেকের

এক জনের হাত অপর জনের দুই হাতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নবীজির সহিত মোছাফাহা করার এই আকারই বর্ণনা করিয়াছেন।

● ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রঃ)কে মক্কা শরীফে দেখিয়াছি—হাদীছের ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রঃ) তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহার সহিত মোছাফাহা করিলেন উভয় হস্তে। (হাশিয়া ৯২৬ পৃঃ)

● মোয়া'নাকা তথা পরস্পর কোলাকুলি করাও ছুন্নত।

পরিচয় দান ক্ষেত্রে শুধু "আমি" বলা চাই না

২৩৭৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলাম; আমার মরহুম পিতার ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। আমি হযরতের গৃহ দ্বারে করাঘাত করিলাম। হযরত (দঃ) আন্দর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি উত্তরে বলিলাম "আমি"। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও আমি; তিনি যেন আমার উত্তরকে নাপছন্দ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—"আমি" বলিয়া উত্তর দানকে নাপছন্দ করার একটি সরল যুক্তির প্রতিও হযরত (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, "তুমি কে?" এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল পরিচয় অবগত হওয়া। উহার উত্তরে "আমি" বলিলে সরলভাবে উহার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, কারণ "আমি" বলিয়া প্রত্যেকেই নিজকে ব্যক্ত করিতে পারে, অথচ পরিচয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

একত্রিত তিন জনের মধ্যে এক জনকে বাদ দিয়া অপর দুই জন গোপন আলাপ করিবে না

২৩৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন জন সঙ্গী হইলে একজনকে ছাড়িয়া অপর দুই জন গোপন আলাপ করিবে না।

● এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই যে, ঐরূপ করিলে তৃতীয় সঙ্গী মনক্ষুণ্ণ হইবে এবং এই ভাবিবে যে, তাহারা দুই জন বোধ হয় আমার সম্পর্কে কিছু বলিতেছে। অবশ্য যদি ঐরূপ কোন আলাপ করার প্রয়োজন হয় তবে তৃতীয় সঙ্গীর অনুমতি লইয়া সেইরূপ করিতে পারে।

তিনের অধিক সঙ্গী হইলে দুই জনে গোপন আলাপ করিতে পারে

২৩৮১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যদি শুধু তিন জন সঙ্গী হও তবে এক জনকে বাদ দিয়া অপর দুই জন গোপন আলাপ করিবে না যাবৎ না আরও লোক মিলিত হয়। নতুবা তৃতীয় সঙ্গী মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ রহিয়াছে।

রাত্রি বেলা শুইবার সময় গৃহে আগুন রাখিবে না

২৩৮২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, শুইবার সময় গৃহে আগুন থাকিতে দিবে না।

২৩৮৩। হাদীছ ঃ— আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা মদীনা এলাকার একটি বাড়ী উহাতে লোক-জন থাকাবস্থায় আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। সেই সংবাদ অবগত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আগুন তোমাদের শত্রু, অতএব নিদ্রার পুর্ব্বে আগুন অবশ্যই নির্ব্বাপিত করিবে।

খত্না করানো

২৩৮৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—পাঁচটি কাজ পুর্ব্বতন নবীগণ হইতে ছুন্নত রূপে প্রচলিত। (১) খত্না করা (২) নাভির নিচের লোম চাঁচিয়া ফেলা (৩) বগলের লোম উপড়াইয়া ফেলা (৪) মোচ কাটা (৫) নখ কাটিয়া ফেলা।

২৩৮৫। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধান সময়ে আপনার বয়স কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, আমার ঐ সময় খত্না হইয়া গিয়াছে। আরবের লোকেরা কিছু বয়স্ক হইলে পর খত্না করাইত।

——(০)——

২২তম অধ্যায়

দোয়ার বয়ান

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমার নিকট দোয়া কর; আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।"

দোয়ার একটি বিশেষ বিভাগ হইল এস্তেগফার—আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দ্বীন-দুনিয়ার কামিয়াবির জন্য এস্তেগফার একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে—

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

"তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে এস্তেগফার—স্বীয় গোনাহ-খাতার ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তোমাদের পরওয়ারদেগার অতিশয় ক্ষমাকারী। তিনি তোমাদের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদের ধনে-জনে উন্নতি দান করিবেন, তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচার ব্যবস্থা করিবেন এবং নদী-নালার ব্যবস্থা করিবেন। (ছুরা নূহ্ ২৯ পারা)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ...........

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ـ

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ـ

"মোত্তাকীদের পরিচয়—যাহারা কোন অবৈধ কাজ করিলে বা কোন গোনাহ করিয়া স্বীয় ক্ষতি সাধন করিলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে; আল্লাহ ভিন্ন গোনাহ মাফকারী

কেহ নাই। আর তাহারা স্বীয় কৃত গোনাহের উপর জমিয়া থাকে না এবং গোনাহের বিষময় ফল সম্পর্কে তাহারা সচেতন। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য প্রতিদান হইল, তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে ক্ষমা এবং বেহেশত যাহার বাগ-বাগিচার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত থাকিবে। তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে। যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের প্রতিদান কতই না উত্তম হয়।" (৪পাঃ ৪রুঃ)

সায়েয়্দুল-এস্তেগফার

২৩৮৬। হাদীছ ঃ—শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সায়্যেদুল-এস্তেগফার তথা সকল প্রকার এস্তেগফারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এস্তেগফার এই যে, বন্দা অত্যন্ত কাকুতি মিনতির সহিত কাতর স্বরে আল্লার দরবারে এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ۔ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ۔ وَاَنَا عَلٰى

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ۔ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ۔ اَبُوْءُ لَكَ

بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ۔ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ ۔ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

"হে আল্লাহ; তুমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। তুমি ভিন্ন আর কেহ মাবুদ ও মকছুদ নাই। আমাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, আমি তোমারই বন্দা এবং গোলাম ও দাস। আমি আমার শক্তি-সামর্থের সবটুকু ব্যয় করিয়া তোমার নিকট প্রদত্ত ওয়াদা-অঙ্গিকারের উপর দৃঢ় থাকিব ↑। আমার কৃত কর্ম্মের কুফল ভোগ করা হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি যে, তোমার অজস্র নেয়ামতরাশি ভোগ করিয়া বাঁচিতেছি তাহা আমি নতশিরে স্বীকার করিতেছি। আমি যে, অপরাধ করিয়া বসি তাহাও আমি স্বীকার করিতেছি। হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।"

↑ পবিত্র কোরআনে ৯ পারা ছুরা আরাফ ১২৭ আয়াতে সমগ্র মানব হইতে একটি অঙ্গিকার গ্রহণের ইতিহাস স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্মরণ করাইয়াছেন। সেই অঙ্গিকার এবং ইসলামের কলেমা—কলেমা তৈয়্যেবাহ্ ও কলেমা শাহাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ও আল্লার রছুলের আনুগত্যের ওয়াদা-অঙ্গিকার প্রতিটি মোসলমানই প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর অঙ্গিকারসমূহই এস্থলে উদ্দেশ্য।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলা এই এস্তেগফার অন্তরের একীনের সহিত পড়িবে এবং ঐ দিনে সন্ধা হইবার পূর্ব্বে মারা যাইবে সে বেহেশতবাসী হইবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা উহা পড়িবে এবং ঐ রাত্রে ভোর হইবার পূর্ব্বে মারা যাইবে সে বেহেশতবাসী হইবে।

অধিক এস্তেগফার করা

২৩৮৭। হাদীছঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ

اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলিতেন, আমি প্রতি দিন সত্তর বার হইতে অধিক আল্লার দরবারে এস্তেগফার এবং তওবা করিয়া থাকি।

তওবার বয়ান

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন তথা তওবা কর সত্যিকার খাঁটী ও খালেছ তওবা।"

২৩৮৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি গোনাহকে এত ভয়ঙ্কর মনে করিয়া থাকে যে, গোনাহ সংঘটিত হইয়া গেলে তাহার অবস্থা এইরূপ হয়—সে যেন একটি পাহাড়ের তল-দেশে আছে এবং পাহাড়টি তাহার উপর ধ্বসিয়া পড়িবে আশঙ্কা করিতেছে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গোনাহকে এত তুচ্ছ ও হাল্কা মনে করে যেন একটি মাছি তাহার নাকের সামনে উড়িতেছে হাত নাড়া দিলেই উহা দুর হইয়া যাইবে।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বন্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ তায়ালা পথ-হারা বন্দাকে পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি বিপদ-সঙ্কুল পথে ভ্রমন কালে বিশ্রাম স্থানে অবতরণ

করিয়াছে। তাহার খাদ্য ও পানীয় সব কিছু তাহার যান-বাহনের পিঠের উপর বাঁধা রহিয়াছে, ক্লান্তি অবস্থায় স্বীয় মাথা মাটির উপর রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রা আসিয়া গিয়াছে। চক্ষু খোলার পর সে দেখিতে পাইল, তাহার যান-বাহনটি তাহার সমুদয় সম্বল সহ নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিয়াও উহার কোন খোঁজ পাইল না; অবশেষে মরুভূমির ভীষন উত্তাপের মধ্যে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হইয়া পুনরায় সে মৃত্যুর অপেক্ষায় শুইয়া পড়িল। কিছু সময় পর নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল, তাহার যানবাহনটি সব কিছু সহ তাহার নিকট দণ্ডায়মান। এই সময় ঐ ব্যক্তি কিরূপ সন্তুষ্ট হইবে? বন্দার তওবা কালে আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

২৩৮৯। হাদীছ:— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ

مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِىْ اَرْضِ فَلَاةٍ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দার তওবা কালে এত অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, কোন ব্যক্তি বিশাল মরু প্রান্তে স্বীয় যানবাহন হারাইবার পর উহাকে হঠাৎ পুনরায় পাইয়াও ঐরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

শুইবার সময় দোয়া

২৩৯০। হাদীছ:—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, শুইবার জন্য প্রস্তুত হইলে প্রথমতঃ নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিবে, অতঃপর ডান কাতে শুইয়া এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ

اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجٰى

مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি আমাকে তোমার সোপর্দ করিয়া দিলাম, আমার লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছি, আমার ভাল-মন্দ সব কিছু তোমারই

হাওয়ালা করিয়াছি, আমি তোমারই উপর নির্ভর স্থাপন করিয়াছি; তোমারই দানের প্রতি আমি লালায়িত এবং তোমার ভয়েই আমি ভীত। তোমার প্রতি ধাপিত হওয়া ছাড়া তোমার আজাব হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় নাই—আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। আমি তোমার প্রেরিত কেতাবের উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই দোয়া পড়িয়া শয়নের পর যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু হইয়া যায় তবে ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু সাব্যস্ত হইবে। অবশ্য এই দোয়া শয়নের পূর্ব্বে সর্ব্ব শেষ বাক্য হইতে হইবে।

মুল হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বরা (রাঃ) বলেন, দোয়াটি শুদ্ধরূপে মুখস্ত করিয়া নেওয়ার জন্ম আমি হযরত (দঃ)কে পড়িয়া শুনাইবার সময় আমি بِنَبِيِّكَ শব্দের স্থলে بِرَسُولِكَ বলিলে হযরত (দঃ) বাধা দান করিয়া বলিলেন, না—"بِنَبِيِّكَ" বল।

২৩৯১। **হাদীছ**ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রি বেলা শুইবার সময় (ডান) হাত (ডান) গালের নীচে রাখিয়া এই দোয়া পড়িতেন—اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"আয় আল্লাহ! তোমারই নামের উপর আমি মরিব এবং তোমারই নামের উপর আমি জীবন কাটাইব।"

আর নিদ্রা হইতে জাগিয়া হযরত (দঃ) এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্ম যিনি আমাকে মৃত্যু তুল্য নিদ্রায় নিমগ্ন করার পর পুনরায় জীবিত ও জাগ্রত করিয়া উঠাইয়াছেন। (বাস্তব মৃত্যুর পরও এইরূপে) পুনঃ জীবিত হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।

২৩৯২। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ শুইবার জন্ম বিছানায় আসিলে পরিধেয় লুঙ্গি দ্বারা হইলেও বিছানাকে (সেলাই বিহীন) লুঙ্গির ভিতর দিকের সাহায্যে ঝাড়িয়া ফেলিবে, কারণ তাহার দৃষ্টির অগোচরে অন্য কিছু উহাতে অবস্থান করিতে পারে। অতঃপর এই দোয়া পড়িবে—

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا

وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

"হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! তোমার নামের উপরই আমার বাহু বিছানায় রাখিলাম এবং তোমারই সাহায্যে উহাকে উঠাতে সক্ষম হইব। এই নিদ্রার ভিতরই যদি আমার জানকে তুমি রাখিয়া দাও তবে আমার জানের প্রতি তোমার করুণা বর্ষন করিও, আর যদি তুমি আমাকে উহা ফেরৎ দেও তবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ ঐরূপই করিও যেরূপে তুমি তোমার নেককার বন্দাদেরে করিয়া থাক।"

রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ কালের দোয়া

২৩৯৭। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আমার খালা উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলে পর তাঁহার দোয়া সমূহের মধ্যে এই দোয়াটি ছিল—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا (وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّفِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا*) وَعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَّفَوْقِىْ نُوْرًا وَّتَحْتِىْ نُوْرًا وَّاَمَامِىْ نُوْرًا وَّخَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا

"আয় আল্লাহ! আমার দিলে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার কানে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার শিরায় নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার মাংসে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার রক্তে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার চুলে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার চামড়ায় নুর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার জবানে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার আত্মায় নূর সৃষ্টি করিয়া দাও। আমার ডানে-বামে, উপরে-নীচে, সামনে-পেছনে নূর মোতায়েন রাখ এবং আমাকে নূর দান কর।

ব্যাখ্যা ঃ—শুদ্ধ এবং সত্য তথা হককে নূর বা আলো আখ্যা দেওয়া হয়, আর অশুদ্ধ এবং মিথ্যা তথা বাতেলকে জুলমত্ বা অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়। এই আলো ও অন্ধকার চর্ম্ম চক্ষুর পক্ষে নহে বটে, কিন্তু মানবাত্মার পক্ষে উহা প্রকৃত পক্ষেই আলো ও অন্ধকার। কেননা, শুদ্ধ ও সত্যের মধ্যেই আত্মা স্বীয় উন্নতির পথ দেখিতে পায় এবং সেই উন্নতির পথে সে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে পারে।

* বন্দনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যাবলী অন্য কেতাবে উল্লেখ আছে। 'মোনাজাতে মকবুল' দ্রষ্টব্য।

সৃষ্ট জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ ও সত্য হইল সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎ তথা তাঁহার বাস্তব গুণাবলীর সুদৃঢ় উপলব্ধি ও জ্ঞান। এই জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ হইলে পর মানব তাহার সমগ্র অঙ্গ-প্রতঙ্গ সহ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ঝুকিয়া পড়িতে শুধু আকৃষ্টই হয় না, বরং সম্পুর্ণরূপে বাধ্য হইয়া পড়ে এবং তাহার সব শক্তিগুলিই সৃষ্টিকর্ত্তার ফরমাবরদারী ও আনুগত্যে এবং সর্ব্বস্তরে তাঁহার সন্তুষ্টি ভাজন কার্য্যে নিয়োজিত ও ব্যয়িত হইয়া থাকে। মানবের অঙ্গসমূহের ও শক্তিসমূহের এই নিয়োজনকেও নূর বলা হয়। কেননা, ইহা প্রকৃত নূর তথা সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফতেরই প্রতিক্রিয়া। এতদ্ভিন্ন মানুষ উক্ত নিয়োজনে সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিলে তাহার সম্মুখে অনেক অনেক অনাবিষ্কৃত রহস্য আবিষ্কৃত ও উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তাই উক্ত নিয়োজনকে নূর বলা হয়।

সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎ এবং তাঁহার আনুগত্যে আত্মনিয়োগকে যে, নূর বা আলো আখ্যা দেওয়া হয় এই আখ্যার বাস্তবতাও কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাইবে—যে দিন পোল-ছেরাৎ পার হওয়াকালে সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎহীন এবং তাঁহার আনুগত্যহীন নাফরমানগণ অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকিবে আর ঐ মা'রেফৎ ও আনুগত্যের বাহকগণ সম্মুখে এবং ডানে-বামে নূর ও আলো লাভ করিবে—সেই আলো এই চর্ম্ম চোখের পক্ষেও প্রকাশ্য আলো হইবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :—

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

.........هِيَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন প্রত্যেকেই দেখিতে পাইবে ঈমানদার নর-নারীগণের সম্মুখে এবং পার্শ্বে নূর ও আলো ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, আজ তোমাদের প্রতি বেহেশতের সুসংবাদ—যাহার বাগ-বাগিচার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহমান থাকিবে। তোমরা চিরকালের জন্য উহা লাভ করিবে—ইহাই হইল বড় সাফল্য। ঐ দিন মোনাফেক নর-নারীগণ ঐ ঈমানদারগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করুন; আমরা আপনাদের আলোর সাহায্য লইব। ঈমানদারগণ উত্তরে বলিবেন, আমরা এখন অপেক্ষা করিতে পারি না—তোমরা পেছনের দিকে আলোর সন্ধান কর। (এই কথাবার্ত্তার অবস্থাই মোমেনগণ পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করতঃ বেহেশত-প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিবে।) সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীর আড়াল হইয়া যাইবে যাহার ভিতর দিক রহমতের স্থান বেহেশত এবং বাহির দিক আজাবের স্থান দোযখ। ঐ সময়

মোনাফেকেরা আক্ষেপ করতঃ মোমেনদের প্রতি চিৎকার করিয়া বলিবে, আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সঙ্গী সাথী ছিলাম না ? মোমেনগণ উত্তরে বলিবেন, বাহ্যিকরূপে তোমরা আমাদের সঙ্গী সাথী ছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া ছিলে। সত্য দ্বীন ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাউক এই অপেক্ষায় ছিলে, সত্য দ্বীনের প্রতি সন্দিহান ছিলে, আর তোমাদের অবাস্তব কামনা বাসনা তোমাদিগকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়া ছিল এবং ধোকাবাজ শয়তানও তোমাদিগকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় রাখিয়া ছিল—এই অবস্থায়ই তোমাদের উপর আল্লার আদেশ তথা মৃত্যু আসিয়াছে।

আজ তোমাদের ন্যায় কোন কাফেরের জন্যই জীবন বিনিময় দানেরও সুযোগ নাই, তোমাদের ঠিকানা দোযখই হইবে। সর্ব্বদার জন্য উহা তোমাদের ঠিকানা হইবে—বড়ই জঘন্য স্থান উহা।" (২৭ পারা ছুরা হাদীদ)

সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎ এবং তাঁহার ফরমাবরদারীকে যে অর্থে নূর বা আলো আখ্যা দেওয়া হয় সেই অর্থেই উহার বিপরীত—সৃষ্টিকর্ত্তার গুণাবলী হইতে অজ্ঞতা এবং তাঁহার নাফরমানীকে জুলমত বা অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর নূর ও জুলমত বা আলো ও অন্ধকারই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে এই আয়াতের মধ্যে—

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ

অর্থাৎ মোমেনগণ আল্লার সাহায্যে জুলমত বা অন্ধকারকে এড়াইয়া বা বর্জ্জন করিয়া নূর তথা আলোর প্রতি আসে এবং আসিতে থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরগণ শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রভাবে নূর বা আলোকে এড়াইয়া বা বর্জ্জন করিয়া জুলমত তথা অন্ধকারের দিকে আসে এবং আসিতে থাকে। (৩ পারা ১ রুকূ)

এই নূর বা আলোর পরিধি অতিশয় সুবিশাল ও সুপ্রসস্ত। মোমেন ব্যক্তি যে, এই পরিধির ভিতর থাকে বা প্রবেশ করে তাহা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই সে ধাপে ধাপে উন্নতিও লাভ করিতে থাকে—তাহার মা'রেফৎ তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর উপলব্ধি ও জ্ঞান ধাপে ধাপে সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৈহিক ও আভ্যন্তরীন সমুদয় শক্তি ও সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে ও তাঁহার সন্তুষ্টি আহরণে ব্যয়িত ও নিয়োজিত হইতে থাকে।

এই উন্নতি লাভে আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে সদা সাহায্য দান করিয়া থাকেন—ইহাই উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য্য এবং আলোচ্য দোয়ার মধ্যে উক্ত নূরেরই ভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে যে—হে আল্লাহ! তোমার মা'রেফতের নূর দ্বারা আমার দেলকে ভরিয়া দাও এবং তোমার আনুগত্য লাভের নূর আমার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় এবং সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভরিয়া দাও। আমার সব কিছুই যেন তোমার সন্তুষ্টি আহরণে ব্যয়িত হয়।

এতদ্ভিন্ন শয়তান এই পণ করিয়াছে যে, মানবকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সে তাহার চেষ্টা চালাইবে। পবিত্র কোরআনে শয়তানের উক্তি বর্ণিত আছে—

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ

شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

শয়তান আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ইহজগতের সময়কাল পরিমাণ দীর্ঘায়ু মঞ্জুর করাইবার পর সে বলিয়াছে—যেহেতু আমি এই আদমের দরুনই পথহারা বরং সর্ব্বহারা হইলাম, তাই আমি ঐই আদমজাতের জন্য ছেরাতে মোস্তাকীম বা সত্য পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইব। তদুপরি তাহাদিগকেও সর্ব্বহারা করার জন্য "তাহাদেরে আক্রমন করিব—তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, পেছন দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে।" (৭ পারা আ'রাফ ২ রুকু)

শয়তান মানুষকে চার দিক হইতে আক্রমন করার হুমকি দিয়াছে। আলোচ্য দোয়ায় আল্লার রসুল তাঁহার উম্মৎকে নিজ নিজ ছয় দিকের জন্য আল্লার নূর ভিক্ষা চাওয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, হে আল্লাহ! তোমার মা'রেফৎ ও আনুগত্যের নূর আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে, উপরে-নীচে সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া রাখ—যে দিকে আমি নজর করি সে দিকেই যেন আমি তোমাকেই দেখি, তোমার গুণাবলীই যেন আমার চোখে ভাসিয়া উঠে, ফলে আমি যেন তোমার আনুগত্যে অধিক বিলীন হইয়া পড়ি। এই নূর আমার সঙ্গে থাকিলে সর্ব্ব দিক হইতেই শয়তানের আক্রমন প্রতিহত হইবে।

আল্লার মা'রেফতে অলঙ্কিত একজন বুজুর্গ কি সুন্দর বলিয়াছেন:—

نظر کو اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں — تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا

"যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সে দিকেই একমাত্র তোমাকেই দেখিতে পাই, আমার দৃষ্টিতে তুমি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

শয়নকালের তছবীহ

১৩৯৪। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ফাতেমা (রাঃ) গম পেষার চাক্কি চালাইবার দরুণ তাঁহার হাতে ফোস্কা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাই একদা তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে একজন দাস বা চাকর লাভ করার জন্য গেলেন। হযরত (দঃ)কে গৃহে পাইলেন না, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) গৃহে আসিলে পর আয়েশা (রাঃ) সব বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

আলী (রাঃ) বলেন, উক্ত সংবাদে হযরত (দঃ) আমাদের গৃহে আসিলেন, তখন আমরা বিছানায় শুইয়াছিলাম। হযরত (দঃ)কে দেখিয়া আমি শোয়া হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু (হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি তোমার অবস্থায়ই থাক। হযরত (দঃ) আমার ও ফাতেমার মধ্যস্থলে বসিলেন, এমনকি তাঁহার সুশীতল পাদ্বয় আমার বক্ষ স্পর্শ করিল—আমি আমার বক্ষে শীতলতা অনুভব করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এমন জিনিষ শিক্ষা দিব যাহা তোমাদের জন্য দাস ও চাকর হইতে উত্তম হইবে। তোমরা যখন শুইবার জন্য বিছানায় আসিবে তখন ৩৪বার* "আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার "ছোব্হানাল্লাহ্" ৩৩ বার "আল্হাম্দু লিল্লাহ" পড়িবে। এই আমল তোমাদের পক্ষে দাস বা চাকর লাভ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম হইবে।

গভীর রাত্রে দোয়া করা

২৩৯৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ

وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ

الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ وَمَنْ

يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ

---

* বোখারী শরীফের অধিকাংশ ছাপায় "৩৩" লেখা আছে, কিন্তু ফৎহুলবারী কেতাবে যে বোখারী শরীফ ছাপা আছে উহাতে "৩৪" লেখা রহিয়াছে এবং ফৎহুলবারী কেতাবে ব্যাখ্যার মধ্যেও বিশেষ দৃঢ়তার সহিত "৩৪"ই লিখিয়াছেন এবং "৩৪"ই শুদ্ধ। কেননা মোসলেম শরীফেও ৩৪ উল্লেখ আছে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তায়ালার (বিশেষ করুণা-ভাণ্ডারের) অবতরণ হয় সর্ব্ব নিম্ন আকাশের উপর। (জগদ্বাসীদের উপর করুণা বর্ষনের জন্যই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থা হয়।)

আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা দিতে থাকেন, আছে কেউ আমাকে ডাকে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব? আছে কেউ যে আমার নিকট চায় আমি তাহাকে দান করিব? আছে কেউ যে আমার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? (এই শ্রেণীর বহু রকম আহ্বান ও ঘোষনা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রচারিত হইতে থাকে।)

নামাজের পরে জেকের করা ও দোয়া

২৩৯৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা দরিদ্র শ্রেণীর ছাহাবীদের একটি দল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ধনী লোকগণই আখেরাতের বড় মর্ত্তবা ও বেহেশতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হইল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরূপে? তাঁহারা বলিলেন, কারণ ধনী লোকগণ আমাদের সমান নামায পড়িয়া থাকেন, জেহাদ করিয়া থাকেন, তদুপরী তাঁহারা তাঁহাদের অতিরিক্ত মাল আল্লার রাস্তায় খরচ করিয়া থাকেন; আমাদের মাল নাই আমরা খরচও করিতে পারি না। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিব যদ্দারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্ত্তীগণের সমান হইতে পারিবে এবং পরবর্ত্তীদের হইতে অনেক বেশী অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবে। তোমাদের এই আমল অবলম্বন করা ব্যতিরেকে অন্য কেহই তোমাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না।

প্রতি নামাযের পর দশ বার "ছোব্‌হানাল্লাহ্" দশ বার "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্" দশ বার "আল্লাহু আকবার" পড়িবে।

২৩৯৭। হাদীছ ঃ— মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ মাবুদ হইতে পারে না। তিনি এক—অদ্বিতীয়, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি দান করিলে সেস্থলে কেহ কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং আপনি দান না করিলে কেহ দিতে পারে না। আপনার সাহায্য না হইলে কোন ভাগ্যবানের ভাগ্য কোনই উপকারে আসে না।

দোয়ার মধ্যে এক মিলের শব্দ গাঁথায় ব্যাপৃত হইবে না

২৩৯৮। ছাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার বিশিষ্ট শাগেদ এক্‌রেমা (রঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, লোকদিগকে ওয়াজ নছিহত শুনাইও প্রতি সপ্তাহে একবার। তাহাতে যদি সন্তুষ্ট না হও তবে দুই বার। আরও বেশীর ইচ্ছা হইলে শুধু তিন বার মাত্র। পবিত্র কোরআনকে লোকদের বিরক্তির কারণ বানাইবে না।

কোথাও লোকদের নিকট আসিলে যাবৎ তাহারা তাহাদের কথাবার্ত্তায় লিপ্ত আছে তাহাদের নিকট ওয়াজ-নছিহতের কথা বলিবে না। এরূপ করিলে তাহাদের বিরক্তি আসিতে পারে, বরং তুমি চুপ থাক ; যদি তাহারা তোমাকে কথা বলিতে অনুরোধ করে, তবে তোমার কথাও শুনাও, কিন্তু তাহাদের আগ্রহ পরিমাণ। আর দোয়া করা কালে এক মিলের শব্দ গ্রথনে ব্যাপৃত হইবে না। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও তাঁহার ছাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি—তাঁহারা এইরূপ করিতেন না।

দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উঠানো সুন্নত। দোয়ার জন্য কেব্‌লামুখী হওয়া শর্ত্ত নহে।

দোয়ার মধ্যে দৃঢ়তার সহিত আল্লার নিকট চাহিবে

২৩৯৯। ছাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট পোক্তাভাবে চাহিবে। এইরূপ বলিবে না—হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে দাও। প্রকৃত প্রস্তাবেত আল্লাহ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করেন—তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে এমন কেহ নাই।

২ ০০। ছাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এইরূপ দোয়া করিবে না যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে ক্ষমা কর, তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে রহম কর। বরং দৃঢ়তার সহিত আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিবে। বাস্তবে ত ইহা আছেই যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র নিজ ইচ্ছায়ই সব কিছু করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে এমন কেহ নাই।

দোয়ার ফলাফল লাভে তাড়াহুড়া করিলে সেই দোয়া কবুল হয় না

২৪০১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ

يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যক এই যে, সে যেন তাড়াহুড়া না করে, তথা এইরূপ বলিয়া বা ভাবিয়া দোয়া ক্ষান্ত না করে যে—কতবার দোয়া করিলাম, কিন্তু কবুল হইল না অর্থাৎ ফল পাইলাম না।

বালা-মছিবতের সময়ে দোয়া

২৪০২। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপদ-বিপদ ও বালা-মছিবতে আক্রান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় এই দোয়া পড়িয়া থাকিতেন—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ

وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

"আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তিনি অতি মহান অতি ধৈর্য্যশীল। আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তিনি সমস্ত আসমান সমগ্র জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা; এমনকি মহান আরশের সৃষ্টিকর্ত্তা মালিক-মোখ্‌তার এবং পরিচালক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী তিনিই।"

২৪০৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ

الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

"আয় আল্লাহ। আমি তোমার আশ্রয় চাই বালা-মছিবতের যাতনা হইতে, দুর্ভাগাক্রান্ত হওয়া হইতে, দুঃখ-জনক অদৃষ্ট হইতে এবং ঐরূপ অবস্থা হইতে যাহা দেখিয়া শত্রু সন্তুষ্ট হয়।"

কাহাকেও কোন শাস্তি প্রদান করিলে তাহার জন্য দোয়া

২৪০৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ (اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ) فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهٗ (اَوْ اٰذَيْتُهٗ اَوْ لَعَنْتُهٗ اَوْ جَلَدْتُّهٗ) فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهٗ (زَكٰوةً وَّرَحْمَةً وَّاَجْرًا) وَّقُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

"হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ (যাহার মধ্যে ক্রোধ-রিপু রহিয়াছে,) অতএব যে কোন মোমেন-মোসলমানকে আমি মন্দ বলি বা কষ্ট দেই বা লান্-তান্ করি বা মার-পিট করি উহাকে তাহার জন্য সংশোধনকারী এবং তোমার রহমত ও ছওয়াবের অছিলা এবং কেয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভের অছিলা বানাও।"

ফেৎনা তথা দ্বীন-ঈমানের ক্ষতি সাধন করে এইরূপ সব কিছু হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৪০৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা লোকগণ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনেক বেশী প্রশ্ন করিল যাহাতে হযরত (দঃ) বিরক্তি অনুভব করিলেন। এবং তিনি রাগান্বিত হইয়া মিম্বারে আরোহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, যে যত পার জিজ্ঞাসা কর ; আমি উত্তর দিতে থাকিব।

আনাছ (রাঃ) বলেন, এই সময় আমি এদিক-ওদিক নজর করিয়া দেখি সকলেই কাপড়ের আড়ালে মাথা গুঁটিয়া কাঁদিতেছে। হঠাৎ এক ব্যক্তি (যাহার পিতা ছিল হোযায়ফা (রাঃ), কিন্তু) তাহাকে বিবাদের সময় লোকগণ সে তাহার পিতার ঔরসের নয় বলিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত ; (কারণ, তাহার পিতার আকৃতির সহিত তাহার আকৃতির মিল ছিল না।) সেই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা

---

* আলোচ্য দোয়াটি বোখারী শরীফে অসম্পূর্ণ উল্লেখ হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী শব্দগুলি অন্যান্য রেয়ায়েত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। (ফতহুলবারী ১১—১৩৪)

করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার পিতা কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার পিতা (প্রকৃত প্রস্তাবেই) হোযায়ফা (রাঃ)।

(যাহারা হযরতের রাগ উপলব্ধি করে নাই তাহারা হযরতের ঘোষনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করিয়া এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন করিল, কিন্তু বুদ্ধিমানগণ তাহাতে অধিক বিচলিত হইতে ছিলেন, এমনকি) ওমর (রাঃ) হযরতের রাগ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ

"আমরা এক আল্লাহকে প্রভু-পরওয়ারদেগার রূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট আছি, অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না। ইসলামকে দ্বীন ও ধর্ম্ম তথা জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট আছি, অন্য কোন মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না। মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রসুল রূপে গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট আছি, অন্য কাহারও আদর্শের প্রতি নজর করিব না। আমাদের এই দ্বীন ও ঈমানের ক্ষতি সাধন করিতে পারে এমন সব কিছু হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

ঐ ঘটনার দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিলেন, আজ ভাল ও মন্দ উভয়ের দৃশ্যাবলী আমি দেখিতে পাইয়াছি—এইরূপ আর কখনও দেখি নাই। বেহেশত এবং দোযখ উভয়কে আমি এত সুস্পষ্ট এবং নিকটতমরূপে দেখিতে পাইয়াছি যে, উহা যেন এই সম্মুখস্ত দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত।

শত্রুর প্রাবল্য, ভাবনা-চিন্তা, অলসতা ও নিষ্কর্ম্মন্যতা, ভীরুতা, কার্পণ্য এবং ঋণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৪০৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়া থাকিতাম। আমি হযরত (দঃ)কে বহুবার এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই—সব রকম দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হইতে, নিষ্কর্ম্মন্যতা হইতে, অলসতা হইতে, কৃপণতা হইতে, ভীরুতা হইতে ঋণের বোঝা হইতে এবং আমার উপর লোকদের প্রাবল্য ও ভীতি হইতে।"

কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৪০৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি।

২৪০৮। হাদীছ ঃ—সায়াদ (রাঃ) পাঁচটি বস্তু হইতে আশ্রায় প্রার্থনা করা শিক্ষা দিতেন এবং উহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ

اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই—কৃপণতা হইতে, আশ্রয় চাই ভীরুতা হইতে, আশ্রয় চাই লাঞ্ছনাজনক বার্দ্ধক্যের বয়স হইতে, আশ্রয় চাই দুনিয়ার ঐসব বিষয়-বস্তু ও ঘটনাবলী হইতে যদ্দারা দ্বীন-ঈমানের ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং আশ্রয় চাই—কবরের আজাব হইতে।"

জীবন-মরণ সর্ব্বাবস্থার জন্য ভ্রষ্ঠতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা

২৪০৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি—নিষ্কর্ম্মন্যতা হইতে অলসতা হইতে, ভীরুতা হইতে, অধিক বার্দ্ধক্য হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি ইহজীবনে দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকারক বিষয়ের সম্মুখীন হওয়া হইতে এবং মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর—কবরের ছওয়াল-জওয়াব কালে দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকারক বিষয়াবলী হইতে।"

গোনাহ ও জরিমানা এবং দজ্জাল ইত্যাদি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা

২৪১০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ - اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই—অলসতা হইতে, অধিক বার্দ্ধক্য হইতে, গোনাহে লিপ্ত হওয়া হইতে, ঋণ ও ক্ষতিপুরণ ইত্যাদির বোঝা হইতে, কবরের পরীক্ষার কুফল ও কবরের আজাব হইতে। পরীক্ষামুলকভাবে যে তুনিয়াতে দোযখের পথও খোলা রহিয়াছে সেই পরীক্ষার কুফল ও দোযখের আজাব হইতে। ধন-দৌলতের দ্বারা যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষার কুফল হইতে এবং দারিদ্রের দ্বারা যে পরীক্ষা হয় উহার কুফল হইতেও আশ্রয় চাই। আর আশ্রয় চাই, তুষ্ট দুরাচার দজ্জালের দ্বারা যে পরীক্ষা হইবে সেই পরীক্ষার কুফল হইতে।

"হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা আমার হইতে ধুইয়া ফেল বরফের ও শিলের পানির দ্বারা ↑। আমার অন্তরকে সমস্ত গোনাহ-খাতা হইতে পরিচ্ছন্ন করিয়া দাও যেরূপ সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। এবং আমাকে গোনাহ হইতে দুরে রাখ ঐরূপ যেরূপ পুর্ব্ব এবং পশ্চিম একটি হইতে অপরটি দুরে রহিয়াছে।

জাগতিক ভাল লাভের দোয়া করা

২৪১১। হাদীছ :—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়াটি অনেক বেশী পড়িয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আল্লাহ—আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাকে তুনিয়াতেও আখেরাতেও ভালায়ী দান করিও এবং আমাকে দোযখের আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।"

↑ গোনাহের পরিণাম ও পরকালীন আকৃতি দোযখের আগুন। আর অগ্নি নির্বাপনে অধিক ঠাণ্ডা পানিই শ্রেয়, তাই এস্থলে বরফের ও শিলের পানির উল্লেখ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একটি বিশেষ এস্তেগফার

২৪১২। হাদীছ :—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ
ذَلِكَ عِنْدِي اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

"হে প্রভু-পরওয়ারদেগার! মাফ করিয়া দাও আমাকে আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ এবং অজ্ঞতা প্রসূত গোনাহ এবং জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছাকৃত আমি যে সমস্ত কাজের মধ্যে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করিয়াছি—সেই গোনাহ। এতদ্ভিন্ন ঐ সব গোনাহ যাহা আমি জানি না, কিন্তু তুমি জান।

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দাও আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, ইচ্ছাকৃত গোনাহ, অজ্ঞতা প্রসূত গোনাহ, ঠাট্টারূপের গোনাহ—সকল প্রকার গোনাহই আমার মধ্যে আছে।

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দাও, যাহা কিছু গোনাহ পূর্ব্বে করিয়াছি, যাহা পরে করিরাছি এবং যাহা গোপনে করিয়াছি, যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। তোমার সাহায্যেই উন্নতি লাভ হয় এবং তোমার সাহায্য হারাইলেই অবনতি আসে। তুমি সর্ব্ব শক্তিমান।"

বিভিন্ন জিক্‌রের ফজিলত

২৪১৩। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক দিনে এক শত বার এই জিক্‌র করিবে সে দশটি ক্রীতদাস আজাদ করার সমান ছওয়াব লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত আরও এক শত নেকী তাহার জন্য লেখা হইবে এবং তাহার এক শত গোনাহ মুছিয়া ফেলা হইবে। আর এই জিক্‌র তাহার জন্য সারা দিন শয়তান হইতে সুরক্ষিত থাকার সুব্যবস্থা হইবে এবং কোন ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা উত্তম আমলকারী গণ্য হইতে পারিবে না, অবশ্য যদি কেহ এই জিক্‌র তার চেয়ে বেশী করে। জিক্‌রটি এই—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই ; তাঁহার কোন শরীক নাই। সব অধিকার একমাত্র তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান।"

২৪১৪। **হাদীছ ঃ—** আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক দিনে এক শত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়িবে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে যদিও উহা সমূদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।

২৪১৫। **হাদীছ ঃ—**আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের জিক্‌র (তথা অন্তরের অন্তস্থল হইতে স্মরণ ও মুখে জপনা) করে এবং যে ব্যক্তি সেই জিক্‌র না করে তাহাদের উভয়ের মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য যেরূপ পার্থক্য জীবিত ও মৃতের মধ্যে।

২৪১৬। **হাদীছ ঃ—** আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নিযুক্ত করা এক দল ফেরেশতা রহিয়াছেন যাঁহারা আল্লার জিক্‌রে মশগুল লোকদের তালাশে ঘোরিয়া বেড়াইতে থাকেন। কোথাও আল্লার জিক্‌রে মশগুল লোকদেরে দেখিতে পাইলেই তাঁহারা পরস্পর ডাকা-ডাকি করিয়া তথায় একত্রিত হন এবং ঐ লোকদেরে ঘিরিয়া ফেলেন। ঐ ফেরেশতাদের প্রতিটি দলেই তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, ঐ লোকদেরে ঘিরিয়া একত্রিত হওয়া কালে তাঁহাদের জমাত জমিন হইতে আসমান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা যিনি নিজেই তাঁহাদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞাত আছেন, তবুও তাঁহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার এই বন্দাগণ কি বলিতেছে ? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার পবিত্রতার গুণ গাহিতেছে, শ্রেষ্ঠত্বের গুণ গাহিতেছে, আপনার প্রশংসার ধ্বনি দিতেছে এবং আপনার মাহাত্ম জপনা করিতেছে।

হযরত (দঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তখন ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ বন্দাগণ কি আমাকে দেখিয়াছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, না—তাহারা আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, যদি তাহারা আমাকে দেখিয়া থাকিত তবে কি অবস্থা হইত ? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনাকে দেখিতে পাইলে আপনার আরও অধিক বন্দেগী করিত, মাহাত্মের জপনা করিত পবিত্রতার গুণ গাহিত।

হযরত (দঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা আমার নিকট কি চায়? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার নিকট বেহেশত ভিক্ষা চায়। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি বেহেশত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না—তাহারা বেহেশত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, বেহেশত দেখিলে তাহারা কিরূপ করিত? ফেরেশতাগণ বলেন, তাহা হইলে তাহারা বেহেশতের আকাঙ্খী আরও অধিক হইত এবং উহা লাভের চেষ্টা আরও অধিক করিত এবং তাহাদের অভিলাস আরও অধিক হইত।

হযরত (দঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরও জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ বস্তু হইতে তাহারা বাঁচিতে চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, দোযখ হইতে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি দোযখ দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না—তাহারা দোযখ দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, দোযখ দেখিলে তাহারা কিরূপ করিত? ফেরেশতাগণ বলেন, তাহা হইলে তাহারা দোযখকে আরও অধিক ভয় করিত এবং দোযখ হইতে বাঁচিবার আরও অধিক চেষ্টা করিত।

তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে বলেন, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছি। ঐ সময় এক ফেরেশতা বলেন, তথায় একজন লোক ছিল; বস্তুতঃ সে তাহাদের জমাতে শামিল ছিল না, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে তথায় আসিয়া ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এই জমাতের লোকগণ এতই আদরণীয় যে, তাহাদের সংস্রবে যে আসে সে বঞ্চিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই নাম

২৪১৭। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই তথা এক কম এক শত (গুণ-বাচক) নাম রহিয়াছে। তাঁহার কোন দোসর নাই—জোড়া নাই—তিনি বেজোড়, বেজোড়কে তিনি বেশী পছন্দ করেন। যে কোন ব্যক্তি ঐ সব নামকে আয়ত্ব করিবে সে বেহেশত লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা:—আল্লাহ তায়ালার গুণ-বাচক নামসমূহ আয়ত্ব করার অর্থ ঐসব নামকে উহার মর্ম্ম সহকারে হৃদয়-পটে অঙ্কিত রাখা, দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি গুণের যে প্রতিক্রিয়া বন্দার জীবনে হওয়া প্রয়োজন সেই প্রতিক্রিয়া স্বীয় জীবনে সৃষ্টি করা।